রামেন্দ্র-রচনাবলী

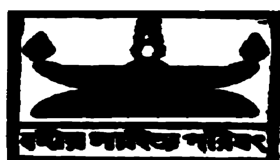
ষষ্ঠ খণ্ড

রামেন্দ্র-রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চৈত্র ১৩৬৩

মূল্য তেরো টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১—২৮. ৩. ৫৭

ভূমিকা

এই ষষ্ঠ খণ্ডের সঙ্গে 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ হইল। তাঁহার জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৪খানি গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রে ও অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সমস্তই ছাপা হইল; শেষোক্ত প্রবন্ধগুলি বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি আমরা বাদ দিয়াছি—

১। Aids to Natural Philosophy 1891, pp. 128

২। পদার্থবিদ্যা (সচিত্র)। ১৮৯৩। পৃ. ১৩৯

৩। ভূগোল ১৮৯৮। পৃ. ১৭০

৪। বিজ্ঞান-পাঠ ১৯০২। পৃ. ১৪০+৷৷০

[ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় লিখিত]

৫। বিজ্ঞান-কথা [?]

৬। A Geographical Reader 1902, pp. 46

'রচনাবলী'র প্রথম পাঁচ খণ্ডে তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থগুলির তালিকা এইরূপ:

প্রথম খণ্ড—১। প্রকৃতি ২। জিজ্ঞাসা (তৃতীয় গ্রন্থ 'মায়াপুরী' ইহার অন্তর্ভুক্ত) ৪। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।

দ্বিতীয় খণ্ড—৫। কর্ম-কথা ৬। চরিত-কথা ৭। বিচিত্র প্রসঙ্গ ১ম ও ২য় পর্য্যায়।

তৃতীয় খণ্ড—৮। শব্দ-কথা ৯। বিচিত্র জগৎ ১০। যজ্ঞ-কথা।

চতুর্থ খণ্ড—১১। নানা কথা ১২। জগৎ-কথা ১৩। পুণ্ডরীক কুলকীর্তিপঞ্জিকা।

পঞ্চম খণ্ড ১৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ষষ্ঠ খণ্ড—সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও এতদিন পর্যন্ত পুস্তকাকারে অমুদ্রিত প্রবন্ধের এবং রামেন্দ্রসুন্দর অপরের গ্রন্থের জন্য যে সকল "ভূমিকা" লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহারই সমষ্টি। 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে তাঁহার "আত্মজীবনী" এবং নির্বাচিত তিনটি পত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রায় আট বৎসর পূর্বে (আষাঢ় ১৩৫৬) 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম—"শেষ খণ্ডে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবে।" ছয় খণ্ডের "ভূমিকা" ও "সূচী"তে এই নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ খণ্ডের কলেবর এমনিতেই বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই জীবনী দেওয়া সম্ভব হইল না। আমরা পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৭০ সংখ্যক গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' বইটি সকলকে পড়িতে বলি। রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে আরও দুইখানি গ্রন্থ তৎপূর্বে রচিত হইয়াছিল; নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সঙ্কলিত বহু খ্যাতনামা মনীষীর রামেন্দ্র-প্রশস্তি 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (১৩২৭) এবং আশুতোষ বাজপেয়ী লিখিত 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-কথা' (১৩৩০)। দুইটি গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনীতে এই দুই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসম্ভব সঙ্কলিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের মহত্তম কীর্তি অক্লান্ত সেবার দ্বারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে প্রতিষ্ঠাদান এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায়:

"তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ…"

বাংলা দেশের একজন অখ্যাতনামা কবি যতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একখানি কাব্যের ('কুরুক্ষেত্রে দশদিন' ১৯০২ খ্রীঃ) "উৎসর্গপত্রে" রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত বঙ্গভাষার সম্পর্কের কথা অতি সহজ ভাষায় চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"বঙ্গ ভাষার উন্নতিকল্পে একান্ত তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের করকমলে।

প্রশান্ত মূরতি স্বভাব সরল
কোমল হৃদয় কবির মত;
বিজ্ঞান জগতে উজ্জ্বল রতন
উন্নতি সাধন জীবন ব্রত।
বঙ্গ ভাষারূপ বিশাল সাগর
ডুবিয়া ডুবিয়া হতেছ পার,
তুলিছ যতনে মণি মুক্তা হীরা
গাঁথিছ কতই নূতন হার!

নব আভাময় 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান'
ভাষার লালিত্য জড়িত কিবা,
যেন ফোটা ফুল নীহার মাখিয়া
ধরেছে হৃদয়ে চাঁদের বিভা ;
তোমার তরুতে নবীন উল্লাসে
ফুটিছে নিয়ত কুসুমদাম।
রবে চিরলেখা সাহিত্য কাননে
অমর অক্ষরে তোমার নাম।…"

ঠিক বারো বৎসর পরে (১৩২১, ৫ই ভাদ্র) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্তি-সম্বর্ধনা সভায় হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ এই সহজেরই সুন্দর ও সার্থক রূপ দিয়াছেন এইভাবে—

"তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।"

—হরপ্রসাদ

"সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

—রবীন্দ্রনাথ

আট বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদান্যতায় যে মহৎ কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, আজ তাহা সাধ্যমত সমাপ্ত করিয়া, ও প্রথম পাঁচ খণ্ডে যে কীর্তিমান পুরুষের সহযোগিতা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম

সেই স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এই শেষ খণ্ড উৎসর্গ করিয়া, ধন্য হইলাম।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৩ শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ

নিকলা তেস্‌লা

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মাইকেল ফারাডে দেখাইয়াছিলেন, একটা ধাতুপদার্থে হঠাৎ তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে দূরস্থ অন্য ধাতুপদার্থে সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। উভয়ের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ থাকার আবশ্যকতা নাই। এই আবিষ্কার বড় সামান্য নহে। ইহার ফলে সভ্যতার মূর্ত্তি নূতন হইয়াছে। আজকাল তাড়িত শক্তির বলে কল চলে, গাড়ী চলে, আলো জ্বলে, সংবাদ যায়, শব্দ বহে, প্যারিসে বসিয়া লণ্ডনের গান শুনা যায়; এ সমস্তই ফারাডের সেই আবিষ্কারের ফল। সংবাদ বা সঙ্কেত দূরে পাঠাইতে হইলে তামার বা লোহার তারযোগে পাঠাইতে হয়; কিন্তু ফারাডের এই প্রণালীমতে কোনরূপ তারের দরকার করে না। প্রীস্ সাহেব আশা দেন, শীঘ্রই টেলিগ্রাফিতে তারের খরচ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।

একটা পদার্থে সঞ্চারিত শক্তি দূরস্থ পদার্থে উপনীত হয়। ফারাডে বলিতেন, এটা অসম্ভব। দুইটার মাঝে এমন কোন একটা কিছু পদার্থ আছে, সেইটা এই শক্তি বহন করে, সঞ্চালন করে। একটা কিছু মাঝে না থাকিলে শক্তি কিরূপে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হইবে, তাহা ফারাডের নিকট সমস্যা বোধ হইত; বাস্তবিকই তাহা বুঝা কঠিন। লণ্ডনে শক্তি-প্রয়োগ করিলাম, প্যারিসে তাহার বিকাশ হইল, এখন তার দিয়া দুইটা স্থানের যোগ থাকে; কিন্তু তার থাকিবে না বা শক্তি বহন করিয়া যাইতে পারে এমন কোন পদার্থ থাকিবে না, অথচ শক্তি লণ্ডন হইতে প্যারিসে যাইবে, বুঝা কঠিন। ফারাডে বলিলেন, এমন একটা কিছু আছে, যাহার অবস্থাবিকারই এই শক্তিসঞ্চারের কারণ।

ফারাডের পর ক্লার্ক মাক্সবেল্। মাক্সবেল্ও বলিতেন, একটা কিছু আছে। এবং সেটা ঈথর। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলো আইসে; মাঝে একটা কিছু আছে, যাহাতে সেই আলো বহিয়া আনে; এই একটা কিছুর অস্তিত্বে আজকাল আর কেহ অবিশ্বাস করে না। অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্বের যে প্রমাণ, ইহার অস্তিত্বেরও সেই প্রমাণ, ইহার নাম ঈথর। তাড়িত শক্তি বহনের জন্যও একটা কিছু আছে; মাক্সবেল্

বলিতেন, যে-ঈথরে আলোক বহন করে, সেই ঈথরেই তড়িৎশক্তি বহন করে। এই একটা কিছু অন্য আর কিছু নহে, সেই আলোকবাহী ঈথর মাত্র। অথচ আলোক তড়িৎশক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। মাক্সবেলের মানস দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল; অন্যে যাহা দেখিত না, তিনি তাহা দেখিতেন। ঈথর কিরূপ বিকৃত হইলে তড়িৎশক্তি জন্মে, ঈথরে কিরূপ আবর্ত্ত ঘটিলে পদার্থ চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত হয়; ঈথরে কিরূপ ঢেউ খেলিলে আলোকপ্রবাহ বহিতে থাকে; তাঁহার চক্ষু সব দেখিয়াছিল, তবে অপরকে তিনি তাহা দেখাইতে অবসর পান নাই।

১৮৭৯ সালে মাক্সবেলের মৃত্যু হয়। ১৮৮৭ সালের শেষ সপ্তাহে অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্ট্‌জ বার্লিন বিজ্ঞানসভার সম্মুখে হার্টজের আবিক্রিয়া উপস্থিত করেন। স্থানান্তরে ইহার বর্ণনা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।* হার্টজের পর আর সংশয় থাকে না যে, আলোক তড়িৎক্রিয়ারই রূপান্তর মাত্র। হার্টজ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।—দুইটা ছোট পিত্তলের ভাঁটা লও। একটায় ধন (positive), একটায় ঋণ (negative) তাড়িত যুক্ত করিয়া ভাঁটা দুইটা পরস্পরের নিকট ধর। ধরিলেই মাঝখানের বায়ুর মধ্য দিয়া ডিস্‌চার্জ ঘটিবে; অর্থাৎ দ্বিবিধ তড়িৎ মিলিত হইয়া যাইবে, এবং মিলনকালে একটি ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যাইবে। এই মিলনকালে তত্রত্য, অর্থাৎ দুই ভাঁটার মধ্যের ঈথর কাঁপিয়া উঠে; সেই আন্দোলনে চতুঃপার্শ্বে ঈথরে ঢেউ উৎপন্ন করে। কিন্তু ত্রিশ হাত দূরে একখানা দস্তার পাটী ধরিলে সেই ঈথরের ঢেউ গিয়া সেই দস্তার পাটীতে ধাক্কা দেয় ও সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া আবার ফিরিয়া আইসে। আলোকের ঢেউ যেমন দর্পণপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়, ইহার সম্বন্ধেও সেইরূপ কার্য্য হয়। সুতরাং সেই ঈথর দিয়া কতকগুলি ঢেউ যায়, কতকগুলি ফিরিয়া আসে। ফলে ঈথর কোন কোন জায়গায় খুব কাঁপে, কোন কোন জায়গায় একেবারে নড়ে না। ইংরাজীতে stationary wave বলে। যেখানে ঈথর খুব কাঁপে, আর যেখানে ঈথর একেবারে নিশ্চল, এই দুই জায়গার ব্যবধান মাপিলে ঈথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। কোথায় কাঁপিতেছে, আর কোথায় কাঁপে না, দেখিবার জন্য হার্টজ সুন্দর কৌশল

* 'সাধনা'—"আকাশতরঙ্গ" প্রবন্ধ দেখ। ['প্রকৃতি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট—সম্পাদক]

বাহির করিয়াছেন। যে দুইটি ভাঁটার ডিস্‌চার্জে তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে, ঠিক তাহাদেরই প্রতিরূপ আর দুইটি ভাঁটা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধরিয়া দেখ। যেখানে ঈথর কাঁপিতেছে, সেখানে ধরিলে তৎক্ষণাৎ এই ভাঁটার তাড়িত শক্তি সংক্রান্ত হইয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে। যেখানে ঈথর নিশ্চল, সেখানে কোন কিছু লক্ষিত হইবে না। এইরূপে ঈথরে প্রবাহিত লম্বা লম্বা ঢেউগুলি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ঈথর যে সর্ব্বত্র আছে, তাহাতে যে ঢেউ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। অধিক কি, ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

হার্টজের পর নিকলা তেস্‌লা। নিকলা তেস্‌লা যুবক। গত বৎসর বিলাতের ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারগণের সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের গৃহে দুই দিন আপনার আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলি দেখান। পঞ্চাশ বৎসর আগে ঐ গৃহে মাইকেল ফারাডে পর্দ্দার পর পর্দ্দা তুলিয়া প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে চমকাইয়াছিলেন। তার পর বুঝি, আর এত বড় গুরুতর ব্যাপার ঐ স্থলে প্রদর্শিত হয় নাই। বড় বড় বৈজ্ঞানিক দর্শকমধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ফাদার লাফোঁ সম্প্রতি কলিকাতায় এই নূতন আবিষ্কারগুলি দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য, দর্শকেরা চমৎকৃত হইয়াছেন ; কিন্তু দর্শকমধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী এখানে কয় জন আছেন যে, স্তম্ভিত হইবার শক্তি রাখেন!

যে যুগল ভাঁটার উল্লেখ করিয়াছি, তেস্‌লার নির্ম্মিত যন্ত্রযোগে তাহাতে সেকেণ্ডে ২০,০০০ বিশ হাজার বার ডিস্‌চার্জ উৎপাদন চলিতে পারে। এই যন্ত্রের নাম রুম্‌কর্ফের কয়েল। আমরা যে কয়েল ব্যবহার করি, তেস্‌লার ব্যবহৃত কয়েলের কাছে তাহা ক্রীড়নক মাত্র। তবে সেই প্রভূতপরাক্রমশালী যন্ত্র ব্যতীতও ঘটনাগুলি দেখান যাইতে পারে। সাধারণ একটা লীডেন জার, অর্থাৎ বাহিরে ও ভিতরে রাংতা-মোড়া একটা কাচের বোতল সাধারণ কয়েলে জুড়িয়া দিলেই হয়। লাফোঁ সাহেবও তাহাই দেখাইতেছেন। লর্ড কেল্‌বিন প্রথমে প্রতিপাদন করেন, লীডেন জার ডিস্‌চার্জ করিলে এইরূপে সেকেণ্ডে সহস্র সহস্র, অথবা লক্ষ লক্ষ বার, তাড়িত আন্দোলন উপস্থিত করে। এই প্রভূতবলসম্পন্ন বহু সহস্র তাড়িত তরঙ্গ সেই ক্ষুদ্র যন্ত্রমধ্যে উৎপন্ন হইয়া সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ

বেগে দর্শকমণ্ডলীর শরীরমধ্য দিয়া অট্টালিকা-প্রাচীর ভেদ করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হইল; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়; দর্শকগণের মধ্যে কাহারও তজ্জন্য কিছুমাত্র অনুভবে আসিল না। অথচ সামান্য তাড়িত shockএ এত যন্ত্রণা অনুভূত হয়।' আবার কাচ-নলের মধ্যস্থ বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া, তন্মধ্যে নানাবিধ বায়ু অতি সামান্য পরিমাণে পূরিয়া, সেই নল গৃহমধ্যে যেখানে সেখানে রাখিলে কি অদ্ভুত বর্ণবিকাশ হয়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। যে তাড়িত প্রবাহ মনুষ্যদেহের ভিতর দিয়া অবাধে কিছুমাত্র অনুভূতির উৎপাদন না করিয়া চলিয়া যায়, এই নলের মধ্যস্থ অণুগুলি তাহারই প্রভাবে উৎকট আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া নানা বর্ণের আলোক উৎপন্ন করিতে থাকে। নলের সমগ্র ভিতরটা জ্বলিয়া উঠে। ঠিক যেন ভোজবাজী। ঠিক যেন স্বপ্ন।

তেস্‌লার আবিষ্কার হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি যেন পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার নাই, তাঁহাদিগকে বুঝানও যায় না। নূতন ব্যাপার ও আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাই উল্লেখমাত্রে নিরস্ত হইলাম। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান দশায় এখন আশা মাত্র ও স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এমন সুখময় স্বপ্ন বুঝি আর বিজ্ঞানের জীবনে কখন ঘটে নাই। ('সাহিত্য ও বিজ্ঞান,' শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩০০)

ফটোগ্রাফি

ফটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিকের অন্যতম অসাধারণ আবিষ্কার। অসাধারণ—কেন না, ফটোগ্রাফির মাহাত্ম্যের পরিমাণ করা যায় না। সকলের নিকট ইহার আদর। দূরকে নিকটবর্ত্তী করে, অতীতকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখে বলিয়া মনুষ্যজাতি অন্তরের সহিত ফটোগ্রাফিকে শ্রদ্ধা করে। ফটোগ্রাফি যখন প্রথম বাহির হয়, তখন সূক্ষ্ম শিল্প ইহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হাসিত। এখন ফটোগ্রাফি সূক্ষ্ম শিল্পকে হারাইয়াছে। বোধ করি, বর্ত্তমান সময়ে সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে ফটোগ্রাফিই সূক্ষ্মতম। বিজ্ঞানের হাতে ইহার মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র অল্পই আছে। গত কয়েক বৎসর মধ্যে ফটোগ্রাফির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। মানুষের চোখ যাহা

দেখিতে পায় না, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা তাহা দেখিতে পায়। এমন কি, যাহা ভাল দূরবীণের সাহায্যে নজরে পড়ে না, ফটোগ্রাফি তাহা ধরিয়া দেয়। ইহার দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ। ফটোগ্রাফি শব্দের অর্থ আলোর দ্বারা চিত্র অঙ্কন। মানুষ তুলির দ্বারা ছবি আঁকে; এখানে আলোকরশ্মি আপনা হইতে সেইরূপ ছবি টানিয়া থাকে। সুতরাং ফটোগ্রাফিতে আলোকের আবশ্যকতা। কিন্তু কাপ্তেন আব্‌নির (Captain Abney) প্রসাদে আর আলোকেরও দরকার নাই। এখন্ ঘোর আঁধার মধ্যেও ছবি তুলা চলে। সেই জন্য বলিতেছি, মনুষ্যের চক্ষু ইহার নিকট পরাস্ত। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার ক্ষমতা বুঝা যাইবে। ঘোর অন্ধকার গৃহের মধ্যে একটা হাঁড়ীতে গরম জল পূরিয়া কাপ্‌তেন আব্‌নি সেই হাঁড়ীর ছবি তুলিয়াছিলেন। ইহাতে যে বিশেষ বিস্ময়কর কিছু আছে, তাহা নহে। আলোকের রশ্মি ও তাপের রশ্মি, মূলে দুই-ই একজাতীয়; উভয়ে কোন বিশেষ নাই। তবে আমাদের চোখ তাপের সব রশ্মিগুলাকে ধরিতে পারে না। যে-গুলাকে ধরে, তাহাকেই আলোক বলিয়া থাকি; বাকীগুলা তাপরশ্মি। সুতরাং চোখের ক্ষমতা যেখানে প্রতিহত, ফটোগ্রাফি সেখানে প্রভাবশালী। আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মঙ্গল ও বৃহস্পতি, উভয়ের মাঝখানে কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। তাহারাও অন্যান্য গ্রহের মত সূর্য্যের চারি দিকে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু আকারে তাহারা এত ছোট যে, খুব ভাল দূরবীণ নহিলে তাহাদিগের মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। ১৮০১ সালের পূর্ব্বে ইহাদিগের অস্তিত্ব কেহ জানিত না। ১৮০১ হইতে গত তিরানব্বই বৎসরে প্রায় চারি শত ক্ষুদ্র গ্রহ বাহির হইয়াছে। আজকাল প্রতি বৎসরই দুই চারিটা নূতন গ্রহ বাহির হয়। গত বৎসর (১৮৯২) ইহাদের আবিষ্কারের জন্য ফটোগ্রাফির প্রয়োগ হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই অক্টোবরের মধ্যে চারিটা নূতন গ্রহ ধরা পড়ে।

ফটোগ্রাফি এতকাল রঙের প্রভেদ বুঝিত না। সাদা ও কালো, এই দুই রকম রঙই ফটোগ্রাফির জানা ছিল। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ রঙকানা থাকে। কোন একটা বিশেষ রঙ, যেমন লাল রঙ, তাহারা দেখিতে পায় না, আর সবগুলা দেখে। ফটোগ্রাফি সকল রঙেই কানা বলিয়া এত দিন পরিচিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি লিপ্‌মান্ প্রভৃতির

কৌশলে ফটোগ্রাফির সে অপবাদ ঘুচিয়াছে। সূর্য্যালোকের বিচিত্র বর্ণপরম্পরা এখন ফটোগ্রাফারের কাগজের উপর চিত্রিত হইতেছে। বিশেষ বিবরণ পরে দিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই অসাধারণ শিল্পের সংক্ষেপে পরিচয় দিব। স্থূল ভাবে ও সামান্যভাবে ফটোগ্রাফির প্রণালী বুঝাইয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে* ফটোগ্রাফির ইতিহাস, উন্নতি, প্রয়োগ প্রভৃতির বিবরণ দিব।

জল হইতে হাইড্রোজেন (বা উদজান) নামক বাষ্প পাওয়া যায়। আবার নুনে সল্‌ফুরিক এসিড ঢালিলেই হরিদ্বর্ণ আর একটা বাষ্প বাহির হয়, তাহার নাম ক্লোরীন্। উদজান ও ক্লোরীন্, এই দুই বাষ্প আঁধারে মিশাইয়া আঁধারে রাখিলে কোন গোলযোগ ঘটে না। কিন্তু আলোতে আনিবা মাত্র আলোকস্পর্শ মাত্রই বাষ্প দুইটি জ্বলিয়া উঠে ও উভয়ে মিলিত হইয়া একটা নূতন জিনিস তৈয়ার হয়। এই নূতন পদার্থটার নাম মুরিয়েটিক্ এসিড। এই সামান্য ঘটনাটিতেই আলোকের রাসায়নিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থলবিশেষে দুইটা স্বতন্ত্র জিনিসকে মিশাইয়া নূতন জিনিস উৎপাদন করিবার শক্তি আলোকে বর্ত্তমান। তেমনি আবার আলোতে একটা জিনিসকে ভাঙিয়া দুইটা বা ততোধিক জিনিসে পরিণত করিতে পারে। এই ক্রিয়ার নাম রাসায়নিক বিশ্লেষণ। মোটের উপর আলোকের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধনের শক্তি আছে। এই হইল ফটোগ্রাফির ভিত্তি।

একটু নাইট্রেট্ অব্ সিলভার (ডাক্তারদের কষ্টিক) জলে গুলিলে বেশ পরিষ্কার স্বচ্ছ দেখায়। এই কষ্টিকে সাদা কাগজ ভিজাইলে প্রথমে কিছুই বুঝা যায় না। কিছুক্ষণ পরে কালো রঙ হইতে থাকে। চর্ম্মের উপর কষ্টিকের প্রলেপ দিলে, কিছুক্ষণ পরে কালো রঙ হয়।

আলোকই এ স্থলে বর্ণপরিবর্ত্তনের কারণ। কষ্টিক আলোকে বিকৃত হয়। আর একটি সামান্য পরীক্ষা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কষ্টিক জলে গুলিয়া তাহাতে একটু নুন ফেলিয়া দাও। অমনি সাদা সাদা ঠিক দধির মত পদার্থ থিতাইয়া নীচে পড়িবে। এই পদার্থটার নাম (সিলভার ক্লোরাইড) অর্থাৎ রূপার ক্লোরাইড। কষ্টিকে রূপা আছে; আর নুনে ক্লোরীন্ আছে। উভয়ে মিলিয়া এই পদার্থটা উৎপন্ন

* দ্বিতীয় প্রবন্ধ আর লেখেন নাই।—সম্পাদক।

হয়। আঁধারে এই পদার্থটা বিকৃত হয় না। সেই দধির মত পদার্থ যতক্ষণ আঁধারে রাখিবে, ততক্ষণ কোন বর্ণবিকার লক্ষিত হইবে না। আলোতে আনিলেই কালো হইতে থাকিবে। রৌদ্রে রাখ, কিয়ৎক্ষণেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। আলোকে রূপার ক্লোরাইডে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। ক্লোরাইডকে ভাঙ্গিয়া অন্য মত পদার্থে রূপান্তরিত করে। তাই রঙ বদলাইয়া যায়। রৌপ্যঘটিত অন্যান্য পদার্থেও আলোকের এইরূপ প্রভাব দেখা যায়। শুধু ক্লোরাইড্ বলিয়া নহে; ব্রোমাইড্ বা আয়োডাইডেরও এইরূপ বিকার ঘটে। এই সকল পদার্থই ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। থায়োসল্‌ফেট্ অব্ সোডা নামে একটা জিনিস আছে। বাজারে ইহাকে হাইপো সল্‌ফাইট্ অব্ সোডা বা সংক্ষেপে হাইপো বলে। ইহার দানা দেখিতে কতকটা ফট্‌কিরির দানার মত। জলে ফেলিলে শীঘ্র গলিয়া যায়। সেই জলকে হাইপো-জল বলিব। রূপার ক্লোরাইড,—যাহাতে আলো পড়ে নাই,—তাহাতে এই হাইপো-জল দিবা মাত্র সেই ক্লোরাইড্ গলিয়া মিশিয়া যায়। সেই সাদা সাদা দধির মত পদার্থ জলের সঙ্গে মিলিয়া যায়। কিন্তু এই ক্লোরাইড্ আলোকে বিকৃত, রূপান্তরিত ও কালো রঙ হইলে আর হাইপো-জল কিছু করিতে পারে না। অর্থাৎ হাইপো-জলে অবিকৃত ক্লোরাইড্ ধুইয়া ফেলা চলে, বিকৃত ক্লোরাইড্ ধোয়া চলে না।

কাচের উপর রূপার ক্লোরাইড্, কি ব্রোমাইড্, কি আয়োডাইড্ প্রলেপ দিয়া ফটোগ্রাফের প্লেট তৈয়ার হয়। কাচের গায়ে প্রলেপ টিকে না। তাই কলোডিয়ন্ অথবা জেলাটিনে কাচ ডুবাইয়া তাহাতে ক্লোরাইড্ প্রভৃতির প্রলেপ দেয়। কলোডিয়ন্ বা জেলাটিনের একখানি সরু আবরণ বা ত্বক্ কাচের গায়ে লাগিয়া থাকে। সেই প্রলেপের উপর রূপার ক্লোরাইড্ মাখাইলেই প্লেট তৈয়ার হইল। এই তৈয়ারি প্লেট খুব সাবধানে আঁধারে বাক্সমধ্যে রাখিতে হয়। আলোক স্পর্শ হইলেই প্লেট নষ্ট হইল।

তার পর ক্যামেরা বা ছবি ফেলিবার যন্ত্র। ক্যামেরা কতকটা মানুষের চোখের মত। একটা কাঠের বাক্স; চারি দিক্ আঁটা-সাঁটা, ভিতরটা কালো; কোন ফাঁক দিয়া আলো যাইতে পারে না। সম্মুখে একটা গোলাকার ফুটা থাকে। সেইখানে একখানা লেন্‌স্ বা কাচের পরকলা

বসান থাকে। ক্যামেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না। বাহিরের আলো লেন্‌সে বা পরকলায় পড়ে। পরকলা সেই আলোর রশ্মিগুলিকে বাঁকাইয়া দিয়া ওধারে একখানা কাচের পর্দ্দার গায়ে ফেলে। বাহিরে কোন বিন্দু হইতে একগোছা আলোকরশ্মি আসিয়া পরকলায় পড়িলে, পরকলা সেই রশ্মির গোছাকে জড় করিয়া বাক্সর ভিতর পর্দ্দার গায়ে আর একটা বিন্দুতে ফেলে। ভিতরের এই বিন্দুটি বাহিরের বিন্দুটির প্রতিবিম্ব। এইরূপে বাহিরে যতগুলি বিন্দু হইতে আলো আসে, পর্দ্দার গায়ে সবগুলিরই এক একটি প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। বাহিরে একটি গাছ থাকিলে ভিতরে ছোট একটি গাছের প্রতিবিম্ব পড়ে, পরকলার ফোকসে পর্দ্দাখানি ধরিলে প্রতিবিম্বটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ফোকস্ হইতে একটু দূরে পড়িলেই ছবি পরিষ্কার হয় না। সেই জন্য খুব সাবধানে ফোকস্ করিতে হয়।

ফোকস্ ঠিক হইলে পর্দ্দাখানি তুলিয়া লইয়া সেইখানে তৈয়ারি প্লেটখানি রাখিতে হয়। প্লেটের উপর সম্মুখস্থ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। প্রতিবিম্ব আলো ও ছায়ার সমাবেশ মাত্র। প্রতিবিম্বের যেখানে যেমন আলো, সেইখানে সেই অনুসারে প্লেটের গায়ে দাগ পড়িয়া যায়। যেখানটায় বেশী আলো, সেখানে প্রলেপ বিকৃত হয়; যেখানে আলো নাই, সেখানে প্রলেপের ক্লোরাইড্ বিকৃত হয় না। এইরূপে ছবিটি রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্লেটের গায়ে অঙ্কিত হইয়া যায়।

এই সময়ে প্লেটখানি আঁধার ঘরে আনিতে হয়। লাল আলোর রাসায়নিক ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়; সেই জন্য অন্ধকার ঘরে লাল কাচের আবরণের ভিতর দীপ জ্বালিয়া, সেই লাল আলোতে কাজ করা চলিতে পারে। এই সময় প্লেটখানি দেখিলে তাহাতে কোন চিহ্ন বা দাগ লক্ষিত হয় না। প্লেটের উপর প্রতিবিম্ব ফেলায় প্লেটের প্রলেপ স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বিকারের মাত্রা এত কম যে, চোখে কিছুই পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সে ছবি এখনও চক্ষুর অগোচর। সেই জন্য সেই অলক্ষ্য ছবিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছবি ফুটানকে ডেবেলপ্ করা বলে। ডেবেলপ্ করিবার জন্য

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ পাইরোগ্যালিক্ এসিড্ প্লেটের গায়ে ঢালিলেই ছবি ফুটিয়া উঠে।

প্লেটের যে যে স্থানে আলোকস্পর্শে রাসায়নিক বিকার আরম্ভমাত্র হইয়াছিল, পাইরোগ্যালিক্ এসিড সেইখানে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন জন্মাইয়া দেয়। যেখানে আলোকস্পর্শ হয় নাই, সে স্থল অবিকৃত থাকে। এই পদার্থ ঢালিতে ঢালিতেই কাচের উপর ছবি ফুটিয়া উঠে। তখন কাচকে হাইপো-জলে ধুইতে হয়। ছবির আশপাশে যেখানে আলোকস্পর্শ বা রাসায়নিক ক্রিয়া হয় নাই, হাইপো-জলে সে সমস্ত একেবারে ধুইয়া যায়। কেবল স্বচ্ছ কাচের গায়ে ছবিখানি লগ্ন থাকিয়া যায়। পরে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পরিষ্কার জলের ধারায় ধুইয়া ফেলিলেই প্রক্রিয়া একরূপ সাঙ্গ হইল।

এইরূপ ছবিকে নেগেটিব্ বা উল্টা ছবি কহে। উল্টা কহিবার কারণ বলিতেছি। মনে কর, কোন মানুষের ছবি তুলিতেছি। তাহার গায়ের পোষাক সাদা। চুল কালো, সাদা পোশাক হইতে প্রচুর পরিমাণে আলোক আইসে। কালো চুল হইতে আলোক আসে না বলিলেই হয়। প্লেটে প্রতিবিম্ব পড়িলে সাদা পোষাকের জায়গায় যথেষ্ট আলোকস্পর্শে সমধিক পরিমাণে রাসায়নিক বিকার ঘটিবে। কালো চুলের জায়গায় কোনরূপ বিকার ঘটিবে না। ছবি ফুটানো ও ধোয়া শেষ হইলে সাদা কাপড় কালো দেখাইবে ও কালো চুলের জায়গা পরিষ্কার ধুইয়া গিয়া স্বচ্ছ কাচ মাত্র বাহির হইয়া পড়িবে।

এই নেগেটিব্ হইতে কাগজে পজিটিব্ তুলা যায়। কাগজের উপরে রূপার ক্লোরাইড্ বা ব্রোমাইড্ বা আয়োডাইডের প্রলেপ মাখাইয়া তাহার উপর নেগেটিব্খানি চাপিয়া বসাইয়া সূর্য্যের আলোতে কিয়ৎক্ষণ রাখিতে হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাগজে ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। নেগেটিবের যে স্থান স্বচ্ছ, তাহার ভিতর দিয়া আলো গিয়া কাগজের উপর পড়ে। কাগজে কালো দাগ পড়িয়া যায়। কাচের যে স্থান কালো, তাহার ভিতর আলো যাইতে পারে না। তাই তাহার নীচে কাগজেও দাগ পড়ে না। এইবার সাদা পোষাকের সাদা ও কালো চুলের কালো ছবি পড়ে। কাগজে ছবি উঠিলে, সেই কাগজকে

হাইপো-জলে ধুইতে হয়। পরে কয়েক ঘণ্টা ভাল জলে ফেলিয়া রাখিলেই পজিটিব্ ছবি প্রস্তুত হইল।

পজিটিবে এখন রঙ্ ফলাইতে হয়। রূপার যেমন ক্লোরাইড্ আছে, সেইরূপ সোনার ক্লোরাইড্ পাওয়া যায়। ইহা জলে দ্রব করিয়া, তাহার কয়েক ফোঁটা খানিকটা জলে ফেলিতে হয়। তাহাতে একটু সোডা মিশাইলে ভাল হয়। এই জলে পজিটিব্ ছবির কাগজ ফেলিলেই কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই রঙ্ ধরিতে থাকে। পজিটিবের রূপার জায়গায় সোনা বসিতে থাকে। তাহাতেই রঙ্ বেশ সুন্দর দেখায়। সোনার ক্লোরাইডে রঙ্ করিলে অল্প লাল বা বেগুনিয়ার আভাযুক্ত রঙ্ ধরে। প্লাটিনমের ক্লোরাইডে রঙ্ করিলে ঘোরাল কালো রঙ্ হয়। যাহার যেমন পছন্দ। এখন ছবি ফ্রেমে বাঁধাইয়া দেওয়ালে রাখিতে পার, কিংবা বন্ধুজনকে উপহার দিতে পার।

ফটোগ্রাফারের প্রণালী সংক্ষেপে বুঝাইলাম। আজি কালি অল্প মূল্যে তৈয়ারি ড্রাই প্লেট, তৈয়ারি কাগজ, তৈয়ারি পাইরোগ্যালিক আরক পাওয়া যায়। কষ্টিক মাখিয়া সঙ্ সাজিবার দরকার রাখে না। যাঁহারা নূতন ফটোগ্রাফি শিখিতে যান, তাঁহাদের এইরূপ তৈয়ারি জিনিস লইয়া আরম্ভ করাই সুবিধা; নতুবা সখ টিকে না, ধৈর্য্যচ্যুতি আসিয়া পড়ে।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্ভিন্ন আরও পাঁচ রকম প্রকারভেদ আছে। একেবারে কাচের উপর পজিটিব তুলিবার স্বতন্ত্র উপায় আছে। এ স্থলে পাইরোগ্যালিক এসিডের পরিবর্ত্তে লৌহঘটিত আরক প্রভৃতি দিয়া ছবি ফুটাইতে হয়। লালবাজারে যাঁহারা ভদ্রলোককে অতর্কিতভাবে টানিয়া ঘরের ভিতর তুলেন এবং ভদ্রলোক তাঁহার ঈদৃশ দশাবিপর্য্যয় হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একখানি সফ্রেম প্রতিমূর্ত্তি হাজির করিয়া চারি আনা পয়সা দাওয়া করেন, তাঁহারা এই সকল প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ফটোগ্রাফিতে বস্তুতঃ রূপার ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয় না। আয়োডাইড্ই সচরাচর প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাচে কলোডিয়ন্ মাখাইয়া, তাহা আয়োডাইডে ডুবাইতে হয়। আধুনিক ড্রাই প্লেটে জেলাটিন মাখান হয়।

নিম্নে সচরাচর ব্যবহৃত ওয়েট কলোডিয়ন্ প্রণালীর সংক্ষেপ আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। কাচে কলোডিয়ন্ মাখাইতে হইবে।

২। রূপার আরকে ডুবাইতে হইবে। এই আরক নিম্নলিখিত হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে।

(১)	রূপার নাইট্রেট (কষ্টিক্)	...	১ আউন্স
	বিশুদ্ধ জল ...	...	২ আউন্স
(২)	পটাস্ আয়োডাইড্	...	৪ গ্রেন্
	পরিস্রুত জল ...	...	১ ড্রাম

(১) ও (২) মিশ্রিত কর। পরে নাড়িয়া ১৪ আউন্স জল ঢালিয়া আধ ঘণ্টা রাখ। পরে এলকোহল ২ ড্রাম ও ঈথার ১ ড্রাম মিশাও।

৩। ক্যামেরাতে ছবির ফোকস্ ঠিক করিয়া পর্দ্দার স্থলে তৈয়ারি কাচ বসাও। কত ক্ষণ রাখিতে হইবে, দেশ কাল ও ফটোগ্রাফারের বিবেচনা মতে স্থির হয়।

৪। অন্ধকার ঘরে লইয়া কাচের ছবি ফুটাও বা ডেবেলপ্ কর।

ফুটাইবার আরক এইরূপে প্রস্তুত হইতে পারে।

জল ...	...	২০ আউন্স
পাইরোগ্যালিক্ এসিড	...	৬০ গ্রেন্
এসেটিক্ এসিড	...	১০ ড্রাম
এলকোহল ...	...	২০ ড্রাম

৫। এইবার হাইপো-সল্‌ফাইটের জলে ধুইয়া, পরে ভাল জলে ধুইলেই নেগেটিব প্রস্তুত হইল।

৬। কাগজে পজিটিব ছাপাইতে হইলে আজকাল তৈয়ারি সেন্-সিটাইজ্‌ড কাগজ ব্যবহার করিলে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। ইহাও পরে হাইপোতে ধুইয়া গোল্ড্ ক্লোরাইডে রঙাইতে হয়। বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ('জন্মভূমি,' ভাদ্র ১৩০০)

বৈজ্ঞানিক সংবাদ (১)

কয়লা, হীরা ও কালো সীসা বা গ্রাফাইট্ (যাহাতে পেন্‌সিল তৈয়ার হয়), এই তিনই এক পদার্থ, বহুকাল হইতে শুনা যায়। কিন্তু কয়লা হইতে এ পর্য্যন্ত হীরা তৈয়ার করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে হানে সাহেব প্রচার করেন, হীরা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু কথাটা শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই। সম্প্রতি ফরাসীস পণ্ডিত মোয়াসাঁ* কয়লা হইতে হীরক উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

লোহা, দ্রব অবস্থায় কয়লা খাইয়া থাকে। লোহায় কয়লা মিশিলে ইস্পাত হয়। আবার সেই ইস্পাতকে নাইট্রিক্ এসিড দ্বারা গলাইয়া ফেলিলে কয়লাটা কালো সীসার আকারে অবশিষ্ট থাকে। হীরক প্রস্তুতের প্রণালীও কতকটা এইরূপ। তবে লোহা যখন কয়লা খাইতে থাকে, তখন খুব চাপ দিতে হয়।

এইরূপে যে হীরকের দানা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে খনিজ হীরার তুল্য; কেবল তত উজ্জ্বল নহে; কিছু ময়লা। পাহাড় খুদিবার জন্য যে ময়লা হীরা ব্যবহৃত হয়, কতকটা সেইরূপ।

বায়ুকে খুব ঠাণ্ডা করিয়া চাপ দিলে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এটিও প্রায় পনর বৎসরের আবিষ্কার। বায়ুর প্রায় তিন আনা অংশ অম্লজান। এই অম্লজান জীবনের প্রধান সহায়। বরফ হইতে প্রায় ২০০ ডিগ্রি (শতাংশিক) নীচে শীতল করিয়া দেখা গিয়াছে, তরল অম্লজান অনেকাংশে লোহার মত চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। বড় চুম্বকের নিকট কয়েক ফোঁটা তরল অম্লজান রাখিলে তাহা লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে লাগে।

তাড়িত প্রবাহ মনুষ্যশরীরে তীব্র যাতনা দেয়। আঙ্গুলে একটি স্ফুলিঙ্গ লইলেই একটু বেদনা অনুভূত হয়। ডাক্তারি ব্যাটারি হাতে ধরিলে থরহরিকম্প উপস্থিত হয়। টিণ্ডাল সাহেব একবার বক্তৃতা করিতেছিলেন। বড় লীডেন্ ব্যাটারি হইতে অকস্মাৎ তাড়িত প্রবাহ তাঁহার শরীরে সঞ্চালিত হইবামাত্র তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয়। আজকাল আমেরিকায় ফাঁসী উঠিয়া গিয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাড়িত প্রবাহ দ্বারা

* Henri Moissan (1853-1907)—সম্পাদক।

প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেকেণ্ডের মধ্যে দু শ পাঁচ শ, কি দু পাঁচ হাজার বার প্রবাহ চালাইতে পারিলে, তীব্র—এমন কি, সাংঘাতিক যাতনা হইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি ইতালীয় যুবক তেস্‌লা দেখাইয়াছেন, সেকেণ্ড মধ্যে লক্ষাধিক বার প্রবাহ চালাইতে পারিলে আর কোন কষ্টই বোধ হয় না।

বেঙাচির মধ্যে গড়ে শতকরা ৫৭ স্ত্রী ও ৪৩ পুরুষ ব্যাঙ উৎপন্ন হয়। একজন জর্ম্মান সাহেব এইরূপ হিসাব করেন। পুষ্টিকর আহার যোগাইলে ৭৮টি স্ত্রী ও ২২টি মাত্র পুরুষ জন্মে। ভেকমাংস না কি বড়ই পুষ্টিকর। ভেকমাংস খাইতে দিলে ভেকজাতির পুরুষ-সন্তানের সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। ৯২ স্ত্রী ও ৮ পুরুষে দাঁড়ায়। আমেরিকার ষ্ট্রীট সাহেব গুটিপোকা ও প্রজাপতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আহার যোগাইলে স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ে, আহার অনটনে পুরুষের সংখ্যা বাড়ে। শুনা যায়, মানুষের মধ্যেও দুর্ভিক্ষের সময় পুরুষ-সন্তান অধিক জন্মে। ভাল বৎসরে কন্যার ভাগ বেশী হয়। ভরসা করি, অনেকে ইহা হইতে নীতি সঙ্কলন করিবেন।

মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কথাই চিরকাল শুনা যায়। কেহ বলেন, মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণে বলজ্ঞান জন্মায়। সুতরাং মাংসপেশী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু বলজ্ঞান স্পর্শজ্ঞানেরই ইতরবিশেষ মাত্র; ইহার জন্য আর একটা ইন্দ্রিয় না থাকিলেও চলিতে পারে। আবার ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শজ্ঞান ভিন্ন শীতোষ্ণতার বোধ জন্মায়। সুতরাং একা ত্বকে দুই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। এই হিসাবে ইন্দ্রিয় ছয়টি বলা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বস্তুতঃই বাহির হইয়াছে; ইহার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার জো নাই। কানের ভিতরে ইহার অবস্থিতি। ইহাতে দিকের বোধ দেয়। হাত পা বাঁধিয়া, চোখ বাঁধিয়া, খাটের উপর শোয়াইয়া, নিঃশব্দে মানুষকে উপরে নীচে বা ইতস্ততঃ ঘুরাইতে থাকিলে, মানুষ কোন্‌ দিকে কখন্‌ কি গতি হইতেছে, বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু সেই বোধশক্তি কানের ভিতর, এইটুকু আশ্চর্য্য। ('সাহিত্য,' পৌষ ১৩০০)

বৈজ্ঞানিক সংবাদ (২)

যুগল নক্ষত্র।—বিখ্যাত সার্ জন হর্শেল আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেকগুলি যুগল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্শেলের পর আজ পর্য্যন্ত এইরূপ যুগল নক্ষত্র বিস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুগল নক্ষত্র, অর্থাৎ দুইটি নক্ষত্র, আয়তনে প্রায় সমান, পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ নক্ষত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা লইয়া বহু দিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। লাপ্লাস্ দেখাইয়াছিলেন, কোনও বর্ত্তুলাকার তরল পদার্থ বেগে আবর্ত্তন করিতে থাকিলে তাহার মধ্যভাগ (অর্থাৎ নিরক্ষরেখার সন্নিহিত স্থল) ক্রমশঃ স্ফীত হয় ও মেরুস্থল ক্রমে চাপিয়া যায়। এই কারণে আমাদের পৃথিবীরও নিরক্ষদেশ স্ফীত ও মেরুপ্রদেশ চাপা। বেগবৃদ্ধি সহকারে সেই স্ফীত ভাগ তফাৎ হইয়া গিয়া একটি অঙ্গুরীর আকারে অন্তঃস্থ ভাগকে বেষ্টন করে। শনিগ্রহে এইরূপ অঙ্গুরীর অস্তিত্ব দেখা যায়। কালক্রমে সেই অঙ্গুরী ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি জর্জ ডারুইন* গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই যে এইরূপ অঙ্গুরীর উৎপত্তি হইবে, এমন নহে। বৃহৎ গোলাকার তরল পদার্থ আবর্ত্তন করিতে করিতে তাহার মধ্যভাগ ক্রমে সরু হইয়া যায়। কতকটা ডম্বেল অথবা ডমরুর আকারে দাঁড়াইয়া যায়। মধ্যভাগ আরও ক্ষীণ হইয়া শেষে একবারে ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তখন একটা বর্ত্তুল হইতে দুইটি বর্ত্তুলের উৎপত্তি হয়। ডারুইন্ বলেন, এইরূপে যুগল নক্ষত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। অন্তরীক্ষে নীহারিকা (ইংরাজীতে নেবুলা) নামক যে বাষ্পময় পদার্থ ভাল দূরবীক্ষণে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির আকার ডমরুর মত। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, এই নীহারিকারূপ বাষ্পময় মশলা হইতে সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং নীহারিকায় ডমরু আকৃতি অনেকটা ডারুইনের অনুমানের পক্ষে আছে বলিতে হইবে।

মঙ্গল গ্রহ।—কিছু দিন হইল, যখন মঙ্গল গ্রহ আমাদের খুব নিকটে আসিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তখন মঙ্গলে জীবাধিবাস সম্বন্ধে

---

* বিখ্যাত চার্লস রবার্ট ডারুইনের পুত্র সার্ জর্জ হাওয়ার্ড (১৮৪৫-১৯১২)
—সম্পাদক।

নানা লোকে নানাবিধ কল্পনা জল্পনা আরম্ভ করেন। অনেকে বলিয়াছিলেন, মঙ্গলের মানুষে বড় বড় আলো জ্বালিয়া আমাদের নিকট সঙ্কেত পাঠাইতেছে। সে যাহাই হউক, মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। চন্দ্রে বায়ু নাই, মঙ্গলে বায়ু আছে। মঙ্গলে মহাদেশ ও মহাসমুদ্র বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মেরুপ্রদেশ সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন দেখা যায়। শীতকালে এই তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশের পরিধি খুব বাড়িয়া যায়, আবার গ্রীষ্মকালে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। মঙ্গলের উত্তরার্দ্ধে মোটের উপর ৩৮১ দিন শীতের ও ৩০৬ দিন গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাব। মঙ্গলের রক্তবর্ণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, পৃথিবীতে উদ্ভিদের বর্ণ হরিৎ, কিন্তু মঙ্গলের উদ্ভিদের বোধ হয় রক্তবর্ণ। এই অনুমান যুক্তিযুক্ত না হইতেও পারে। মঙ্গলে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা বলা যায় না। তবে পৃথিবীর মানুষের অপেক্ষাও উন্নত জীব না থাকিতে পারে, এমন বলা যায় না।

বৃহস্পতির উপগ্রহ।—এত দিন বৃহস্পতির চারি চন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, সম্প্রতি পঞ্চম চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিকারিং* সাহেব বৃহস্পতির চন্দ্রগুলির নিয়ত আকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনুমান করেন, বৃহস্পতির চন্দ্র আমাদের চন্দ্রের মত জমাট এক খণ্ড পদার্থ নহে,—এক একটি চন্দ্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সমবায়ভূত সমষ্টি মাত্র।

ভবিষ্যতের কয়লা।—এক হিসাবে খনিজ পাথর কয়লা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়লা ফুরাইলে, সুতরাং কলকারখানা বন্ধ হইলে, মনুষ্যজাতির ভাগ্যে কি ঘটিবে, ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লার উৎপত্তি নাই, অথচ খরচ যথেষ্ট; সুতরাং কিছু দিনেই যে সমুদয় কয়লা ফুরাইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হইতে সেই কয়লাহীন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বড় বড় ন্যুব্জগর্ভ দর্পণের দ্বারা সূর্য্যকিরণ সংগ্রহ ও একত্র করিয়া, তদুৎপন্ন তীব্র তেজের দ্বারা কল বানাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ ব্যয়, সে পরিমাণ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। একটা উপায় আছে। আজকাল তাড়িত শক্তির প্রয়োগে সমুদয় সাংসারিক

* Edward Charles Pickering (1846-1919)—সম্পাদক।

ব্যাপার চালান যাইতে পারে। তাড়িতে সঙ্কেত ও শব্দ বহন করে, তাপ দেয়, আলো দেয়, গাড়ী টানে, জল তুলে, ময়দা পিষে। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, কলিকাতায় তাড়িত উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা দিল্লীতে কাজ করা যায়। তাড়িতের উৎপাদনেও কোনও রহস্য নাই। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইলে ঐ তারে যত ইচ্ছা, তাড়িত প্রবাহ উৎপাদন করা চলে, তারটা ঘুরাইতে যা কষ্ট। অল্প কাজে মানুষে ঘুরায়, বেশী কাজে এঞ্জিনে ঘুরাইতে হয়। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের নিম্নে চাকা পাতিয়া, সেই জলের ধাক্কায় চিরকাল বিপুল বেগে কল ঘুরান ও তার ঘুরান চলিতে পারে। এবং তাহাতে যে প্রভূত তাড়িত শক্তি জন্মিবে, তাহা পরিচালিত করিয়া সমুদয় ইউরোপের সমুদয় গৃহস্থের সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ইউরোপ, আমেরিকার মুখ চাহিয়া ভরসা বাঁধিয়া থাকিতে চাহিবেন কি না, স্বতন্ত্র কথা। যদি কোন রাজনৈতিক দ্বিধা না থাকে, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা হয়, তাহা হইলে নায়াগ্রার যে শক্তির নিয়ত অপচয় মাত্র হইতেছে, তদ্দ্বারা ইউরোপের চিরকাল স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম্ম চলিতে পারে, কয়লা ফুরাইবে বলিয়া ভাবিতে হয় না। সম্প্রতি নায়াগ্রার জলপ্রপাত হইতে তাড়িত উৎপাদনের জন্য যে সকল কোম্পানি সংগঠিত হইয়াছে, তাহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছে ও শস্তায় দূর দিগন্তে তাড়িত শক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতেছে; খরিদ্দারগণ এতদ্দ্বারা ঘরে রোশনাই করিবেন, নগরের রাস্তা আলোকিত করিবেন, ভাত রাঁধিবেন, আগুন জ্বালিবেন, জল তুলিবেন, পাখা টানিবেন, গাড়ী চালাইবেন, কল চালাইবেন ইত্যাদি। ফলে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে, এখন বলা যায় না।

ভবিষ্যতের আলো।—আজকাল সচরাচর কাষ্ঠ, কয়লা, তেল, বাতি পোড়াইয়া আলোক উৎপাদনই রীতি। কিন্তু এই দহনকার্য্যে যে শক্তির ব্যয় হয়, তাহার এক আনা ভাগও আলো হয় না। পনের আনার অধিক তাপ উৎপাদনে যায়। সে তাপটা কোনও কাজেই লাগে না। তাপ ব্যতীত শুদ্ধ আলোক উৎপাদন ভবিষ্যতের সমস্যা। জোনাকী পোকা কেবল আলো উৎপাদন করে, তাহার আলোর সঙ্গে তাপ নাই। জগদ্ব্যাপী ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ হইতে আলো জন্মে। কিন্তু আমরা সেই ছোট ঢেউ উৎপাদন করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে বড় বড় ঢেউ উৎপাদন করিয়া ফেলি। পাঁচটা ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে পঞ্চাশটা বড় ঢেউ উৎপন্ন

হইয়া পড়ে। এই বড় ঢেউগুলা কোনও কাজে লাগে না। ইহাদের মধ্যে আবার যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাতে তাপ জন্মে; কিন্তু যেগুলি অপেক্ষাকৃত বড় (এবং ইহাদের সংখ্যাই বেশী), তাহার দ্বারা তাপও জন্মে না। নিরর্থক ব্যয় ভালও লাগে না, উচিতও নহে। তাই শুদ্ধ আলোক, অর্থাৎ ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ উৎপাদনের জন্য পণ্ডিতেরা সম্প্রতি আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন। যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে দু দশ বৎসরের মধ্যে উপায় একটা আবিষ্কৃত হইবে, ভরসা হয়। ('সাহিত্য,' ভাদ্র ১৩০১)

গৌরীমঙ্গল

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমোর রাজবাটীতে গৌরীমঙ্গল নামক একখানি পুঁথি দেখিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিবিধ "মঙ্গল"গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু গৌরীমঙ্গল বোধ করি, বাঙ্গালী পাঠকের এ পর্য্যন্ত অপরিচিত। এই প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তুলট কাগজে পুঁথির আকারে ২৪৪টি পত্র আছে; প্রত্যেক পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। অধিকাংশ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত। পয়ারের চল্লিশটি চরণ গড়ে প্রতি পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ ভাগে কবির পরিচয় এইরূপ দেওয়া আছে ;—

গৌড় দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে।
কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃ পূর্ব্ব স্থান নদী সরযূ উত্তরে।
এ দেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে॥
বিখ্যাত ভুবনে নাম পোকরে আলয়।
ভণে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥

পুনশ্চ

গৌড় দেশ রাঢ়ভূমি পর্ব্বত সমীপ।
গঙ্গার দক্ষিণ কূলে রাজ্যের অধিপ॥

আমাড়ি পরগণা নাম পোকর আলয়।
ভণে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥
পুস্তক রচনার তারিখ বার শত তের সাল,—
সতের শ আটাইশ শকে, রচিলাম এ পুস্তকে,
বার শত ত্রয়োদশ সন।
গৌরীমঙ্গলের গীত, শ্রবণে ভক্তের প্রীত,
ভবভয় উদ্ধার কারণ॥

আমাড়ি পরগণার অন্তর্গত পোকর, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপলাইনের পাকুড় ষ্টেসন হইতে অভিন্ন। গ্রন্থকার পাকুড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ত্রিবেদীর পুত্র রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী। রাজা পৃথ্বীচন্দ্র পাকুড়ের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুরের প্রমাতামহ। গ্রন্থখানি নব্বই বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রচিত হইলেও বিষয়, ভাব ও ভাষার বিচারে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত।

পাকুড়ের রাজবাটীতে বা অন্যত্র এ গ্রন্থের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে কি না, জানি না। জেমোর রাজবাটীর পুঁথিখানির নকল ১৭৫১ শকে (১২৩৬ সালে) ২৭শে মাঘ তারিখে শেষ হয়, এইরূপ লিখিত আছে। গ্রন্থরচনার তেইশ বৎসর পরে নকল; সুতরাং মূল গ্রন্থের সহিত পাঠভেদের অধিক সম্ভাবনা নাই।

শুনিলাম, জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (প্রবন্ধলেখকের প্রপিতামহীর পিতা) পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের সহিত সৌহার্দ্দবদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সূত্রেই এখানে এই পুঁথির আবির্ভাব। ১২৩৯ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরলোক হয়। তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুঁথিখানি এখানে আসিয়া থাকিবে। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

সত্যযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ।
সেইমত চালাইল সংসারের জন॥
ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল।
তে কারণে মুনিগণে পুরাণ করিল॥
অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল।
দ্বাপরে মনুষ্যগণে ধারণে নারিল॥

স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল।
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল ॥
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ।
স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে।
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে ॥
বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস।
মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ।
কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন ॥
ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান।
চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল।
অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল ॥
মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা।
শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ ॥
চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল ॥
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালি করিল।
কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল ॥
গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।
কিরীট মঙ্গল আদি হইল সকল ॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হইল।
গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল ॥
সকলে রচিল কথা পুরাণ ভারত।
কৌতুক রচিল কেহ কাহিনীর মত ॥
কেহ না রচিল শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ।
ব্রহ্মলীলা কেহ নাহি করিল রচন ॥

আগম নিগম সব বিচারিয়া মনে।
রচিল কিঞ্চিৎ ব্রহ্মলীলা নিরূপণে ॥
ষড় দরশনে যার দর্শন না পায়।
মম রচা হাস্য ভাষ্য জানিবে সবাই ॥
মূর্খের স্বভাব মতে করিল রচন।
দোষ না লইবে কেহ গুণবান জন ॥
এই পুঁথি রচিল গীতগানের কারণ।
দিলাম দ্বারকানাথে করিতে গায়ন ॥
সেনভূমে (সিংভূম?) বাস রূপপুর নামে গ্রাম।
চক্রবর্ত্তী উপাধি বালকরামনাম ॥
লইলা এ পুঁথি বহু আগ্রহ করিয়া।
গান গৌরীমঙ্গলের গীত শুদ্ধ হইয়া ॥
গুণের সাগর হন দয়ার সাগর।
নারদ তুম্বুরু সম গানে গুণিবর ॥

গ্রন্থকারের সাহিত্যানুরাগ ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভক্তিলতা, ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না; উল্লিখিত কবি ও কাব্যসকলের অধিকাংশই বোধ করি, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাপি স্থান পায় নাই। গত চৈত্রের "সাহিত্যে" [১৩০২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকখানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।

"মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা" ভারতকৃত অন্নদামঙ্গলের প্রতি গৌরীমঙ্গলরচয়িতার এই উক্তি বড় সুন্দর।

অন্যান্য মঙ্গলগ্রন্থের ন্যায় গীত হইবার জন্য গৌরীমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। কোন প্রদেশে এই গীত চলিত হইয়াছে কি না, অবগত নহি।

শুনিতে পাই, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র শক্তিভক্ত ছিলেন; শক্তিতত্ত্ব নিরূপণের জন্য গৌরীমঙ্গল লিখিত হয়; সমগ্র গ্রন্থ শক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনে পরিপূর্ণ।

গৌরীমঙ্গল পাঠ করিয়া উহার সম্বন্ধে মত প্রকাশের অবসর আমার নাই। পাতা উল্টাইয়া যত দূর দেখিলাম, তাহাতে কাব্যাংশে ইহাকে



অন্যান্য প্রচলিত মঙ্গলগ্রন্থের সহিত তুলনীয় করা যায় না। সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে উহা রচিত হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সহিত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে ৪১৯ অধ্যায় আছে। গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম দেবখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণ ও দেবদেবী বন্দনার পর সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও শিবগৌরীর কলহ পর্য্যন্ত যথারীতি বর্ণনায় কোন অংশে ফাঁক পড়ে নাই। এই খণ্ড মধ্যে নারদ হিমালয়ের কথোপকথন-ছলে কৃষ্ণলীলা এবং গৌরীর কলহান্তে পিত্রালয় যাত্রাপ্রসঙ্গে দুর্গোৎসব পদ্ধতির বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী চারি খণ্ডে অবন্তী নগরের রাজা শালবান বা শালিবাহন ও তৎপুত্র জীমূতবাহনের উপাখ্যান। উত্তর দেশ হইতে মত্রসেন রাজা আসিয়া শালবানকে রাজ্যচ্যুত করেন। শালবান পত্নীর সহিত অরণ্যযাত্রা করেন। সেখানে শালবানের মৃত্যু হয়। এই স্থলে গর্গমুনি রাণীর সান্ত্বনার্থ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বিবৃত করেন।

অরণ্যবাসকালে রাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুদ্ধখণ্ডে পুত্র জীমূতবাহনের জন্ম, গর্গমুনির নিকট জীমূতবাহনের শিক্ষালাভ ও তান্ত্রিক মতে দীক্ষাগ্রহণ, পরে বিবিধ তীর্থ পর্য্যটনান্তর তারাপুর নামক তীর্থে ভগবতীর দর্শনলাভ, ভগবতী কর্ত্তৃক বর প্রদান ও তৎপরে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সাহায্যে মত্রসেনের পরাজয় ও জীমূতবাহনের রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্যবর্ণনা যথাযথ স্থান পাইয়াছে। বৈদ্যনাথ, বক্রনাথ, তারাপুর প্রভৃতি প্রাদেশিক তীর্থস্থলের প্রতি গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক, তারাপুর গ্রাম রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী। তারাপুরে তারাদেবীর মন্দির অবস্থিত এবং এই প্রদেশে উহা সিদ্ধপীঠের মধ্যে পরিগণিত। ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিবরণ এইরূপ ;—

চন্দেলে চয়েনসিংহ মহাসেনাপতি। সহস্র সর্দ্দার সঙ্গে অযুত পদাতি॥
বয়েসে বক্তারসিংহ বড় বলবন্ত। যোজনেক যুড়ি থাকে যাহার সামন্ত॥
চোহানে চতুরসিংহ বড় বল ধরে। যাহার সামন্ত অন্ত না হইতে পারে॥

রাঠোরে রাঘব রায় বড় ধনুর্দ্ধর। দেবতা দেখিতে ইচ্ছে যাহার সমর ॥
পোঁয়ারে পর্ব্বত সিংহ যেন যমদূত। যার সঙ্গে অসংখ্য থাকয়ে রজপুত ॥
কছোয়া কুলের কর্ত্তা কিষণ ভূপতি। যার সঙ্গে রঙ্গে ক্ষত্রি যুঝে দিবারাতি॥
ইত্যাদি।

মন্দ্রসেন অতিশয় অধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে গোহত্যা ও বিবিধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচারের প্রচলন করেন ও প্রজার প্রতি নিতান্ত নিপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর জীমূতবাহন কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন ও সন্নীতি প্রতিষ্ঠা ও জীমূতবাহনের বিবাহ ও ঘরকন্নার বর্ণনায় নীতিখণ্ড সমাপ্ত। স্বর্গখণ্ডে জীমূতবাহনের বার্দ্ধক্যে বনবাস ও গর্গমুনির নিকট বিবিধ উপদেশলাভের পর পার্ব্বতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাস প্রবেশে গ্রন্থের সমাপ্তি।

গর্গমুনি জীমূতবাহনকে কলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়া কলিকালে জীবের নিস্তারের উপায় এইরূপ বলিয়াছেন ;—

দেখিয়া কলির রীত আশুতোষ হর।
দ্রাবিড়ে হইবে জন্ম আচার্য্য শঙ্কর ॥
চতুর্দ্দশ মত ভিন্ন করিয়া সন্ন্যাস।
মুক্তির সরণি প্রভু করিবে প্রকাশ ॥
রামানুজ গোস্বামিন হইবে আচার্য্য।
সাত মত বিষ্ণুপথ করিবেন ধার্য্য ॥
ইহাতে পাইবে মুক্তি বহু সাধু নর।
তাহে কলি কামলোভী করিবে বিস্তর ॥
কলিকালে পাপী নরে করিতে নিস্তার।
দয়া করি গোবিন্দ করিবে অবতার ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে মিশ্র পুরন্দর।
শচীগর্ভে জন্ম নিবে দেব গদাধর ॥
চৈতন্যকরণে নাম ধরিয়া চৈতন্য।
হরিনাম দিয়া আচণ্ডালে কৈবে ধন্য ॥
ধরিয়া চৈতন্যবেশ ভ্রমি দেশে দেশ।
সর্ব্বনরে ভক্তির দিবেন উপদেশ ॥

সেই জন ধন্য যে লইবে হরিনাম।
ভবফাঁস কাটিয়া যাইবে বিষ্ণুধাম ॥

মদ্রসেনের সহিত শালিবাহন বা শালবান রাজার বিরোধ কোন পৌরাণিক উপাখ্যান বা প্রাদেশিক জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে কি না, জানি না। মহাভারতের কর্ণ পর্ব্বে কর্ণের সহিত শল্যের বিসংবাদ প্রসঙ্গে মদ্রকগণের যেরূপ নিন্দাবাদ পড়িয়াছিলাম, তাহাতে মদ্রকগণ পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী কোন প্রদেশের আর্য্যাচারবহির্ভূত অধিবাসী ছিল বলিয়া আমার ধারণা আছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের প্রণীত দক্ষিণাপথের ইতিহাসে শালিবাহনোপাধিক অন্ধ্র ভৃত্য রাজগণের সহিত বৌদ্ধ অনার্য্য শক ভূপতিগণের মালবদেশ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের আধিপত্য লইয়া যে বিবাদের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনে রাখিলে গৌরীমঙ্গলোক্ত উপাখ্যান সেই ঐতিহাসিক ঘটনারই দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়।

"শক্তিতত্ত্বনিরূপণ" ও "ব্রহ্মলীলা বিরচন" যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহাতে সর্ব্বত্র কাব্যরসের উচ্ছ্বাসের আশা করা যায় না। কিন্তু যত দূর দেখিলাম, গৌরীমঙ্গল কাব্যাংশে নিতান্ত নিকৃষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য নহে। রচনা প্রায় সর্ব্বত্রই সরস বোধ হইল। এমন কি, তীর্থমাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকরণাদিও পাঠকের সম্পূর্ণ বিরক্তি উৎপাদন করে না। স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুকরণচেষ্টা দেখা যায়। এক স্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণে একটি তোটকের অবতারণা দেখিলাম। পুঁথির প্রথমার্দ্ধ প্রায় সমগ্র ভাগই কৃষ্ণলীলাবর্ণনে গিয়াছে। এই স্থানে রচয়িতা সরস ও কবিতাময় বর্ণনার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছেন। আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ এবং উহার মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন।* আমার বিবেচনায় প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থ মাত্রই পরিষৎ কর্তৃক প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল গ্রন্থ কাব্যাংশে ও সাহিত্য হিসাবে নিকৃষ্ট, তাহাদেরও ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ ও সমাজতত্ত্ববিদের নিকট যথেষ্ট মূল্য থাকিতে পারে।

গৌরীমঙ্গলের কবিতার নমুনাস্বরূপ কতিপয় স্থল যদৃচ্ছাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

---

* এই গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।—সম্পাদক।

১। শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

বন্দিব নাগর হরি মদনমোহনে। তুলনা দিবার যার নাই ত্রিভুবনে॥
চরণের তলে অরুণের ছটা জিনি। পক বিম্বাধর কিবা রক্তপদ্মশ্রেণী॥
দশ নখে শশী শোভা শারদ জিনিয়া। কনকনূপুর তাহে ঘুঙ্গুরু মিলাইয়া॥
উরুর উপমা রম্ভা কদাচিত নয়। কটি আঁটি পরিপাটি পীতবাস রয়॥
কণ্ঠে মণি কৌস্তুভের দীপ্তি মনোহর। কণ্ঠমালা করে আলা তাহার উপর॥
বয়ানের বয়ান বর্ণিতে হয় ভার। কত শত শারদ শশীর শোভা যার॥
অবিরত গোপাঙ্গনা বয়ানে সুস্থির। হেরিলে হরয়ে জ্ঞান যতেক নারীর॥
বিহরয়ে বৃন্দাবনে যমুনার তটে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম নব বংশীবটে॥
সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনায় বেষ্টিত। নয়ানে বয়ানে যার সদাই জড়িত॥

২। হর গৌরীর কোন্দল সূচনা

দেবদেব মহাদেব কৈলাসশিখরে। ইচ্ছা হইল যাইবারে কোচনী নগরে॥
ভিক্ষাছলে বৃষবরে করি আরোহণ। বিশ্বনাথ কোচপাড়া করিলা গমন॥
বাজান ডম্বুর শিঙ্গাবর ঘনে ঘন। শুনিয়া ধাইল যত কোচবধূগণ॥
সভে উনমত্তা হৈয়া যায় হর পাশে। কটিতে বসন মাত্র গাত্র নগ্ন বেশে॥
তুঙ্গস্তনী নিতম্বিনী দেখি পঞ্চানন। হৃষ্ট হৈয়া দৃষ্টি করে স্থির করি মন॥
দিগম্বর হরবর জানি নারীগণে। কৌতুক করয়ে সভে মহাদেব সনে॥
বনপুষ্প তুলি মালা দেয় শিবগলে। হর নাচে নারীগণ নাচয়ে বিভোলে॥
হেন কালে নারদ আসিয়া প্রণমিল। হরের কৌতুক সব সাক্ষাত দেখিল॥

৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

গগনে নিবিড় মেঘ করয়ে গর্জ্জন। দামিনী দমকে ঘন বরিষে সঘন॥
হইল যামিনী ঘোর অন্ধকারময়। যোগনিদ্রা জগতে প্রচাররূপ হয়॥
দ্বারে দ্বারে প্রহরী যতেক নিয়োজিত। অচেতন নিদ্রায় থাকয়ে বিমোহিত॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ। গায় হরিগুণ নাচে বিদ্যাধরীগণ॥

৪। সখীগণের শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ওকালতি

শুন লো শ্রীমতি, কহি যে ভারতী, কেন কর এত মান।
ছাড়িয়া কি হরি, থাকিবে পাশরি, ধরিতে নারিবে প্রাণ॥

নাগরের দোষ, ক্ষমা কর রোষ, মান কর রাই দূরে।
আপন শরীরে, যদি দোষ করে, ছাড়িতে কে পারে তারে॥
যাহার কারণে, না রহে পরাণে, তারে কি তেয়াগ ধনি।
বায়ুর গমনে, উড়ায় বসনে, তাঁহা বিনে বাঁচে প্রাণী॥
অনল পরশে, সকল বিনাশে, তাহা বিনা না কি চলে।
জলে শীত হয়, বৃষ্টে অতি ভয়, তবে কি তেজিবে জলে॥
শুন লো সুন্দরি, তোমারি সে হরি, অপরাধ ক্ষমা কর।
তেজি মান মনে, নাগরের সনে, আনন্দে কুঞ্জে বিহর॥

শ্রীদুর্গার ধ্যানের অনুবাদ

জটাজুট অর্দ্ধ ইন্দু কপালে শোভন। ত্রিনয়ন পদ্ম ইন্দুসদৃশ আনন॥
তপ্ত স্বর্ণ জিনি রুচি নবীনযৌবনী। সর্ব্ব আভরণ অঙ্গে সুচারুদশনী॥
অতি পীন পয়োধর করিকুম্ভ জিনি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম মহিষমর্দ্দিনী॥
মৃণাল সদৃশ দশ বাহু সুশোভন। দক্ষিণে ত্রিশূল খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
তীক্ষ্ণ বাণ শক্তি অধঃক্রমে প্রহরণ। বাম করে খেটক ধনুক যুতগুণ॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা কিবা পর সুশোভন। অধঃক্রমে দশ ভুজে শোভে অস্ত্রগণ॥
অধেতে মহিষাসুরে কৈল শির ছেদ। হৃদে শূল দিয়া বক্ষে করিলেন ভেদ॥
রক্ত বিস্ফুরিতাসুর বিকট দশন। নাগফাঁসে বান্ধি চুলে করিল ধারণ॥
দক্ষিণে চরণ সম সিংহের উপরে। কিছু উর্দ্ধে পাদাঙ্গুষ্ঠ মহিষে বিহরে॥

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৩ ১ম, সংখ্যা)

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে* গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গল নামক একখানি পুঁথি কিছু দিনের জন্য আমার হাতে আইসে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুচবিহার কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ঐ পুঁথিখানি তাঁহার এক প্রতিবেশীর নিকট সংগ্রহ করিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন। ঐ প্রতিবেশীর নিবাস আমার স্বগ্রাম জেমো; মুরশিদাবাদ জেলায় কান্দির অন্তর্গত। এই পুঁথিকে বর্ত্তমান প্রবন্ধে জেমোর পুঁথি বলিয়া উল্লেখ করিব।

* জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬—সম্পাদক।

এই পুঁথি দেখিয়া আমি জানিতে পারি, গ্রন্থকার গদাধর দাস মহাভারতপ্রণেতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুঁথির মধ্যে গদাধর *বংশপরিচয় ও গ্রন্থরচনার কাল* বিস্তৃতভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া ১৩০৬ বৈশাখের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পাইয়া দেখিলাম, পত্রিকায় বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত যে পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পুঁথির উল্লেখ আছে। পত্রিকার ৫৭ পৃষ্ঠে ২৬০ সংখ্যক পুঁথি গদাধর দাসকৃত 'জগৎমঙ্গল' ও পূর্ব্বোক্ত 'জগন্নাথমঙ্গল' অভিন্ন গ্রন্থ। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও 'জগন্নাথমঙ্গল,' কোথাও বা সম্ভবতঃ ছন্দের অনুরোধে 'জগৎমঙ্গল' এই নামের ব্যবহার আছে। গ্রন্থের বিষয়—উৎকলখণ্ডানুসারে জগন্নাথদেবের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্যবর্ণনা।

বিশ্বকোষ অফিসের পুঁথি হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত জেমোর পুঁথির তত্তৎ অংশের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক আধটুকু যা প্রভেদ আছে, তাহা লিপিকারের দোষে উৎপন্ন।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথির তারিখ সন ১১৬৫ সাল ২২শে আষাঢ়, লেখকের নাম অনুপচন্দ্র ঘোষ, সাকিম ঝেঞ্রা, পরগণে বারহাজারী, চৌকি কোতলপুর।

জেমোর পুঁথির বিবরণ এইরূপ—'ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণোক্ত উৎকলখণ্ডে শ্রীজগন্নাথমঙ্গল সংপূর্ণঃ ॥ সন ১২০৯ বারসত্ত নয় সাল তারিখ ২৪ য়াশাঢ় মোকাম মামুদপুর পরগণে নলদী চাকলে ভুসনা ॥ জিলা জসহর লিখিতং শ্রীনবকিশোর সিংহ সাকীম বহড়ান পরগণে মোনহরসাহী জিলা বর্দ্ধমান।'

পুঁথিখানি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত থাকায় কোথাও খণ্ডিত, ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ হয় নাই। পত্রসংখ্যা ১০২; প্রতি পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক-সংখ্যা আনুমানিক ছয় হাজার।

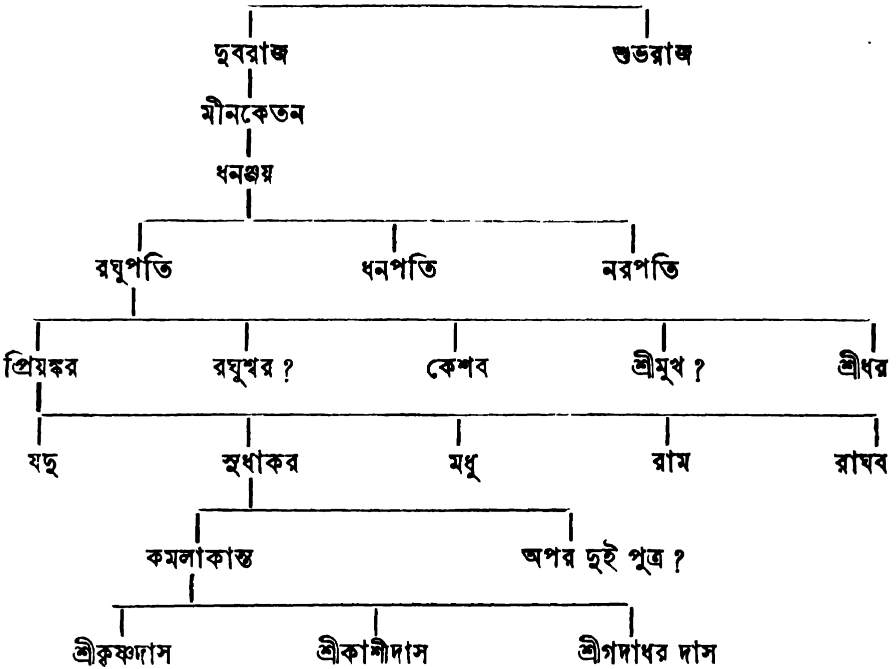
"ইন্দ্রাণী নামেতে গ্রাম পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥" ইত্যাদি বহুকালপ্রচলিত বর্ণনা হইতে আমরা জানি, মহাভারত-প্রণেতা কাশীরাম দাসের নিবাস সিঙ্গিগ্রাম গঙ্গাতীরে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত। [ঐ গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকট অদ্যাপি বর্ত্তমান। কাশীরামসম্পৃক্ত কেশে পুকুর প্রভৃতির অস্তিত্বও শুনিতে পাওয়া যায়।]

কাশীরাম দাস কায়স্থকুলে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন ভাই। প্রিয়ঙ্কর দাসের পুত্র সুধাকর; সুধাকরের পুত্র কমলাকান্ত; কমলাকান্তের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীদাস ও কনিষ্ঠ গদাধর। "তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" ইত্যাদি শ্লোক অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে।

জগন্নাথমঙ্গলের রচয়িতা এই গদাধর। জগন্নাথমঙ্গল হইতে আরও বিস্তৃত বংশপরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উভয় পুঁথি হইতে যাহা পাইলাম, ঐ অংশ উদ্ধৃত করা গেল। জেমোর পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন চেষ্টা করি নাই। অন্য পুঁথির বর্ণনা পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

জেমোর পুঁথি	বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি
ভাগিরথি তিরে বাস ইন্দ্রায়নি নাম।	অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠীত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥	নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
অগ্রদ্রপ গোপীনাথ বামপদ তলে।	তাহাতে সাণ্ডিল্যগোত্রে দেব যে দৈত্যারি।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥	দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥
তাহাতে সাণ্ডিল্যগোত্র দেব জে দৈত্যারি।	ভুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥	ভুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।	তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
ভুবরাজ পুত্র হৈল মিন জে কেতন॥	তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।	রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয়॥	রঘুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
রঘুপতি ধনপতি নাম নরপতি।	প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর।
রঘুপতি পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠীত মতি॥	চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর রঘুশ্বর কেশব সুন্দর।	প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥	অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল পঞ্চ উদ্ভব।	সুধাকরনন্দন যে এ তিন প্রকার।
অনু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব॥	ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
সুধাকর নন্দন জে এ তিন প্রকার।	প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
শ্রীমন্ত কমলাকান্তের এ তিন কোঙর॥	রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করণ।	দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
দ্বিতিয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান॥	রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥
ত্রিতিএ কনেষ্ঠ দিন গদাধর দাস।	জগতমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥	তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥
ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রয়ানী নাম।	
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥	

নামগুলির সম্বন্ধে উভয় পুঁথিতে স্থানে স্থানে একটু পাঠভেদ আছে। জেমোর পুঁথিখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও উহার পাঠ অধিক সঙ্গত বোধ হইতেছে। কাশীরামের বংশতালিকা এইরূপ দাঁড়ায়।—



কাশীদাসের বংশের এত সুবিস্তৃত পরিচয় ইহার পূর্ব্বে সাধারণের অগোচর ছিল।

কাশীরাম দাস কোন্ সময়ের কবি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণের বড় সুবিধা ছিল না। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন কেবল অনুমানমাত্র-বলে কাশীদাসের সময় ১০৭৫ সনের নিকটবর্ত্তী স্থির করেন। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তৎকৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে কাশীদাসের আনুমানিক সময় নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে দেখা যাইতেছে, ইঁহাদের উভয়ের নির্দ্ধারিত কাল কাশীদাসের প্রকৃত সময় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন :—

"কাশীরাম কবির প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর; পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল;

কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এই হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা, সে আজ ২৬৩ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহোদয় বলেন, কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত। বলা বাহুল্য, এই দানপত্রোক্ত সন আমাদের সনের অনুকূল।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩১০-৩১১)।

পরপৃষ্ঠে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "গদাধরলিখিত পুঁথি আমরা দেখি নাই।" কিন্তু জগন্নাথমঙ্গলে যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ঐ পুঁথির অস্তিত্বে ও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ থাকিতেছে না। গ্রন্থের শেষাংশে যেখানে গ্রন্থরচনার তারিখ আছে, তাহা উভয় পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

জেমোর পুঁথি

স্কন্দপুরান মত শুনিয়া রচিত্র।
কথা ব্রহ্মপুরাণের প্রস্তাব বিচীত্র॥
না পূজে পুরান ইহ সত্যাদি লোকেতে।
তে কারনে করিলাম পাঁচালির মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ন॥
চতুঃসষ্ঠী সকাব্দা সহস্র পঞ্চ শত।
সহস্র পঞ্চাস সন দেখা লিখা মত॥
নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি॥
জগন্নাথ সেবা বিনে নাহি জানে আন।
রাজ্য তৃণবত হরি কার্য্যে পণণপ্রাণ॥
অনেক করিল কর্ম্ম প্রিয় জগন্নাথ।
দুষ্ট জন দমন দুঃখিত জন ত্রাণ॥
পুত সম করে সদা প্রজার পালন।
জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরন॥
রাজচক্রবর্ত্তি সহি যেন দীলীপতি।
ধর্ম্ম ন্যায় তোসন করিল বসুমতি॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদস।
মহাসুপ্রতাপী হয় বৈরী গায় জস॥
উৎকলে অনেক গনি নিকট নিগর।
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিসএর বাড়ি স্থিতি সেই বাসস্থান।
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তি পড়িল পুরান॥
সুনিয়া পুরান বড় ইৎসা হৈল মনে।
পাচালির মত রচি শ্রীহরি কির্ত্তনে॥
নাহি সন্ধ্যা জ্ঞান নাহি পড়ি ব্যাকরন।
কেবল মূর্খের মতে করিল রচন॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অসুদ্ধ হরিপ্রসঙ্গ জানিবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদপঙ্কজ অভয়।
ভব নারদাদী জাহা মাগয়ে আশ্রয়॥

দিনহীন মতি চাহে সে পায় স্মরন।
চন্দ্র পরসিতে জেন মণ্ডুকের মন॥
সভে মাত্র ভরোশা আছএ এক আর।
পতিত পাচনদিনবন্ধু নাম সার॥
সেই নাম বিনে নাহিক আমার নিস্তার।
গদাধর বসিয়াছে ভরসায় তার॥

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি

নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি॥
স্কন্দপুরানের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র॥
না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চজন।
ইহ লোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে॥
মহালয়া তাপী হয় বেরিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগবর॥
মাখনপুরেতে ঘর তাহার ভিতর।
বিশেশ্বরবাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে।
শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥
পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ॥
আমি অতি মূঢ় মতি করিব রচন।
ভাগবত গ্রন্থ করি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অশুদ্ধ হরিপ্রশংসা জানিবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম যে করে আশ্রয়।
ভব আদি পাদপদ্ম মাগয় অভয়॥
দীন হীন চাহি আমি সে পদ স্মরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডুকের মন॥
সবে মাত্র ভরসা আছয়ে এক আর।
পতিত পাবন দীনবন্ধু নাম যার॥
সেই নাম বিনে নাঞি আমার নিস্তার।
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার॥
তার মন * * কষ্টেতে বিস্তার।
জগৎমঙ্গল কহে গদাধর দাস॥

জগন্নাথমঙ্গল রচনার তারিখ সন ১০৫০ সাল। ঐ সনে শকাব্দ ১৫৬৫ হয়। কিন্তু একখানি পুঁথিতে ১৫৬৪, অন্যখানিতে ১৫৬৭ দেখা যাইতেছে; সম্ভবতঃ ইহা লিপিকরের প্রমাদ। আর এক কথা, উৎকলের রাজা নরসিংহদেবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই নরসিংহ দেবের সম্বন্ধে হণ্টার সাহেবের উড়িষ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত উড়িষ্যার রাজগণের তালিকায় কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে।

হণ্টার সাহেবের তালিকানুসারে নরসিংহদেবের রাজত্ব ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে আরম্ভ ধরিলে তাহার পঞ্চদশ বর্ষ ১৬৪৩ হয়। ইংরাজী ১৬৪৩ খ্রীঃ অব্দ বাঙ্গালা ১০৫০ সাল। ঐ সময়েই জগন্নাথমঙ্গল রচিত হয়।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথি অনুসারে ইহার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণদাস "কৃষ্ণের গুণ" রচনা করেন ও শ্রীকাশীদাস "ভারত পুরাণ" রচনা করেন।

জেমোর পুঁথিতে এই উল্লেখটা নাই। রাইপুরের রাজবাড়ীর পুঁথি প্রকৃত হইলে তাহাই সমর্থিত হয়। মহাভারত রচনার সময় যাহাই হউক, কাশীদাসের কাল সম্বন্ধে আর সংশয় রহিল না।

কাশীদাস মহাভারত রচনা অসম্পূর্ণ করিয়া পরলোকে যান, এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। জগন্নাথমঙ্গলে গ্রন্থকার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" যোগ থাকায় তিন ভ্রাতাই ১০৫০ সালে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ বুঝায় কি না পাঠকগণের বিবেচ্য। তাহা হইলে ঐ প্রবাদ অমূলক।

কাশীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের রচিত গ্রন্থের নাম কি, তাহা জানা গেল না। গদাধরের নাম বঙ্গসাহিত্যে ইহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিল; তাঁহার গ্রন্থের কথা এত দিনে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির একটু পরিচয় দিব।

গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উৎকলে বাস করিতেন। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর নিকট স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলের কথা শুনিয়া তদবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে মহর্ষি জৈমিনি (জয়মুনি) বক্তা, নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শ্রোতা। আরম্ভে নারায়ণ, জগন্নাথ, চৈতন্যদেব, দশাবতার, গুরু ও বৈষ্ণব, ইঁহাদের বন্দনার পর গ্রন্থকারের পূর্ব্বোদ্ধৃত পরিচয় ও তৎপরে জৈমিনি-মুখে কথারম্ভ। গ্রন্থোক্ত বিষয়ের নির্ঘণ্ট কতকটা এইরূপ,—নীলাদ্রিমাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুণ্যক্ষেত্র অন্বেষণ, সমুদ্রতীরে শবর বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক অর্চ্চিত নীলমাধবের আবিষ্কার, ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল গমন ও নীলমাধবের অন্তর্দ্ধান, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞ, শ্বেত দ্বীপ হইতে আগত সমুদ্র জলে ভাসমান দারু প্রাপ্তি, দারু হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের নির্ম্মাণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোক যাত্রা, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া জগন্নাথাদির প্রতিষ্ঠা করেন, রথযাত্রার উৎপত্তি ও বিবরণ, বিবিধ যাত্রার বর্ণনা, ক্ষেত্রমাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদমাহাত্ম্য, কলির বর্ণনা, গ্রন্থশেষে গ্রন্থের উৎপত্তি বর্ণনা।

গ্রন্থের কবিত্ব প্রাঞ্জল ও সরস। রচনার গুণে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনাও নীরস হয় নাই। আগাগোড়া পড়িয়া শেষ করা যায়। কবিতার নমুনা-স্বরূপ নিম্নে দুইটা স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

একদিন মেনকা পার্ব্বতী প্রতি বলে।
কহ ঝিএ এই হেতু তপস্যা করিলে॥
কনক বরণ সব শরীরের জ্যোতি।
এ দেহে ভূষণ হয় সদাএ বিভূতি॥
চাঁচর চিকুর তোর চামর নিন্দিত।
জটাধর সহ হয় কেমনে পিরীত॥
বদনকমল তোর কোটি চান্দ জিনি।
পাকা দাড়ি দন্ত সে এ মুখ শূলপাণি॥
মণি মুকুতার হার তড়িত তপনে।
হাড়মালা আলিঙ্গন করহ কেমনে॥
মাছি অঙ্গে লাগিলে কস্তুরী দিয়া ধোয়।
এবে অঙ্গে সর্পগণ সদা যারে ছোয়॥
অম্লান বসনে সেজে নিদ্রা নাহি আস্যে।
কেমতে কাঁথার ত্রাণ থাক হর পাশে॥
বৃদ্ধ হইয়া শিবের তিলেক নাহি লাজ।
উলঙ্গ হইয়া থাকে ভূত প্রেত মাঝ॥
অনুক্ষণ দুই চক্ষু ভাঙ্গ খাঞা রাঙ্গা।
স্মশানে নাচিয়ে বোলে বাজাইয়া শিঙ্গা॥
কভু বাঘাম্বর থাকে কভু দিগম্বর।
লাজে কেহ পড়শিনী না আইসে ঘর॥
ইত্যাদি।
বেদান্ত (বেদজ্ঞ ?) ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া বিস্তর।
জলে হৈতে দারু ব্রহ্ম তুলিল উপর॥
উপরেতে ছায়া কৈল পীত পটাম্বর।
লক্ষ লক্ষ চারি ভিতে ঢুলায় চামর॥
হেমরত্ন বসন করিল নির্ম্মঞ্ছন।
মুহুমুহু কৈল দান গো অন্ন কাঞ্চন॥
বিচিত্র বিমানে দারু করি আরোহণ।
আপনে চলিল রাজা চরণে গমন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরী গায় দুন্দভি বাজনা।
স্থানে স্থানে যুথে যুথে নাচে বরাঙ্গণা॥
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে মহাকলরব।
প্রলয় কালেতে যেন উছল অর্ণব॥
ঢাক ঢোল ভেরী বাজে দামামা দগড়া।
পটিকা মৃদঙ্গ বাজে বাজে ঘোষকাড়া॥
ঢেমচা খেমচা বাজে ডেম্ফ কোটি কোটি।
লিখনে না যায় বাদ্যের পরিপাটী॥
শঙ্খ করতাল বাজে ঘণ্টিকা ঘাঘর।
মন্দিরা বিচিত্র বাজে শব্দ ঘোরতর॥
বেণু বংশী শঙ্খ শিঙ্গা বাজএ মুহুরি।
অসংখ্য কাহাল বাজে বর্ণিতে না পারি॥
রবার পিণাক বাজে বিনাক পিনায।
স্বর মণ্ডলের শব্দে পরশে আকাশ॥
হস্তী অশ্ব বৃষ নর মুখের নিস্বন।
শ্রবণে লাগিল তালা এ তিন ভুবন॥
মত্ত হঞা নাচে যত ক্ষেত্রবাসী জন।
হরি হরি শব্দ সভে করে ঘনে ঘন॥

আর অধিক উদ্ধৃতি করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ ইহাতেই তৃপ্ত হইবেন আশা করি। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৬, ২য় সংখ্যা)

অলঙ্কারশাস্ত্র

ইংরাজী সাহিত্যের সংস্রবে আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন নূতন রস, নূতন, নূতন গুণ ও নূতন নূতন দোষ ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা রচনামধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও রুচিবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র গঠন করিতে হইলে কেবল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন গঠনক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সহিত কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে অলঙ্কার-শাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা আসিবে।

তথাপি সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী।

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৬ ৩য় সংখ্যা)

একখানি প্রাচীন দলীল*

নিম্নে একখানি দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গেল। দলীলের তারিখ সন ১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন। দলীলের মর্ম্ম এইরূপ,—জয়পুরের মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহের সভায় কয়েক জন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচার হয়। স্বকীয়া ভজন ও পরকীয়া ভজন, ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রশস্ত, তাহাই বিচারের বিষয়। পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা স্বকীয়ার পক্ষপাতী ও বঙ্গদেশীয়েরা পরকীয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা পরাজয় স্বীকার করেন। পরে তাঁহাদের অনুরোধে মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার সভাস্থ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা তাঁহার

* ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ২৭১ পৃষ্ঠে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ কবি জগদানন্দ প্রসঙ্গ উপলক্ষে এই দলীলের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু সে স্থলে নবাব জাফর খাঁকে ভ্রমক্রমে মীরজাফর বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত হন। নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদ কুলি খাঁ) বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অনুমতিক্রমে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিয়োগক্রমে, এই বিচার হয়। এই বিচারে পরকীয়ামতাবলম্বী বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা জয়লাভ করেন। এই জয়লাভের পর যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত পশ্চিমে পরাজিত হইয়া স্বকীয়া মত অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণের পঞ্চ পরিবার হইতে খারিজ হইয়া এই ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দলীলের সাক্ষিগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েক জন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে। সম্ভবতঃ ইহাঁরা নবাবের নিযুক্ত। দলীলে নবাবের ও নবাবকর্ম্মচারীদের মোহর স্বাক্ষর প্রভৃতি যথারীতি বর্ত্তমান। ডাহাপাড়া, মহিমাপুর প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী; ইহাতে বোধ হয়, মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারেই বিচার হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালী পক্ষের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। ইনি পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিবিশনের অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। সেই গ্রামে তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

আমার বন্ধু টেঁয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের নিকট প্রথমে এই দলীলের কথা শুনিতে পাই। মূল দলীলখানি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরগণের নিকট মালিহাটি গ্রামেই বর্ত্তমান ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বেও ঐ দলীলখানি সেই স্থানে ছিল শুনিয়াছি; সম্প্রতি আমি ঠাকুর মহাশয়গণের বাটী অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই। মালিহাটির নিকটবর্ত্তী টেঁয়া গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মূল দলীলের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। সেই প্রতিলিপি মূল দলীল হইতেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, এইরূপ শুনিয়াছি। এ স্থলে সেই প্রতিলিপিরই অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এই প্রতিলিপি বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সম্ভবতঃ লিপিকারেরই

অজ্ঞতা হইতে এই বর্ণাশুদ্ধির উৎপত্তি। ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।

ঐ বিচারসভায় রাধামোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার শিষ্য টেঁয়ানিবাসী গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই উভয় ব্যক্তি পদকল্পতরুর সঙ্কলনকর্ত্তা ও ঐ গ্রন্থে তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ যে, দলীলে লিখিত বিচারের সময় রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

মূল দলীলখানি চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল, উহার যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

৺শ্রীশ্রীহরি

শরণং

মহর সহি মহর
কাজাই কাননগো নবাব
জাফর খাঁ

মহর মহর
ফৌজদারি সাহিনা
নিগার মহর
নকল বিমজ্জীম আবস্কা
আশ নিগার

শ্রীমদনমোহন দেবস্য
সাং ভাপপুর
শ্রীজয়ানন্দ দেবস্য
সাং কানাইডাঙ্গা
শ্রী৺অদ্বৈত সন্তান
শ্রীগোপালগোবিন্দ দেবসর্ম্মণ
সাং শান্তিপুর
শ্রীকৃষ্ণকীঙ্কর দেবসর্ম্মণঃ
সাং বাঘনা
শ্রীপঞ্চানন দেবসর্ম্মণ
সাং বাহাদুরপুর

শ্রীরাধানন্দ দেবস্য
সাং নতা
শ্রীরাধাবিন্দ দেবস্য
সাং শ্রীপাট বরাহ
শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য
সাং গয়নাপুর মালাদহ
শ্রীআত্মারাম দেবস্য
সাকীন সুপুর
শ্রীবল্লবিকান্ত দেবস্য
সাং বিরচন্দ্রপুর

৫ গোবিন্দজিউ
৫ জিব গোস্বামী ৯ চৈতন্য ২ বৃন্দাবন
৪ গোস্বামী

লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্য তথা শ্রীরাঘবেন্দ্র দেবস্য তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য তথা শ্রীআত্যারাম দেবস্য শ্রীবিশ্ববিকান্ত দেবস্য তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্য শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য ও গয়রহ ইস্তফাপত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সওাই জয়শীংহ মহারাজা মহাশয় শ্রীশ্রী৺ তিনলক্ষ বর্ত্তিষহাজার ভাগবত সাস্ত গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺ জমুনায় সমার্পন করিআছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺পদ্মাসনে গচগীরি গারা ছিল বাকী এক লক্ষ বর্ত্তিষ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছে শ্রীমন্দীরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পদ্মাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ আনীয়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনীয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনীয়া সেই সকল গ্রেন্থ বিচার করিয়া সকিয়া ধর্ম্ম প্রেধান করিয়াছিলা সকলে কহিলেন সকিয়াধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়াধর্ম্ম প্রেকাষ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন তোমরাহ সকীয়াধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্থাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দস্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌর দেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পাদাস্কীত স্থান সেখানে শ্রীশী৺ ভাগবত সাস্তি আছেন এবং সভাসতস্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যায় বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়াধর্ম্ম লবে কেন এখানে জেমৎ সভাসদ হইল গৌরদেশে অনেক সভাসত আছে বিচার করিবেক অতএব এখানকার সভাসদ এক পণ্ডিত ও এক মনস্বোপদার জায় তবে বিচার করিয়া সকীয়াধর্ম্ম সঙ্গস্থাপন করিয়া আইসে তাহাতে সর্ব্বসনমৎ মতে শ্রীযুক্ত মহারাজা সভাসদ শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য জিহোঁ সকীয়া পরকীয়া বিভিন্ন্য করিলেন তিহোঁ দিগবিজয় মহারাজার সভা হইতে তাহাকে আনীয়া এবং এক মনস্বোবদার সহিত প্রেয়াগ ও কাশী হইয়া আইলাম তারাও সকীআঅ দস্তখত করিয়া দিলেন পরে গৌড়দেশে আসীয়া গোস্বামীগণ এবং মহান্তসন্তান মহান্ত-সাখাগণ জে জে স্থানে আছেন সর্ব্বত্রে অনেক বিচার হইল সকলে বিচারে দিগবিজই স্থানে অজয়পত্র দিলেন পরে শ্রীপাট খণ্ডে আইলাম তাহাদের সহিত অনেক কথপকথন হইল তাহারা কহিলেন আমরা শ্রীশ্রী৺

মহাপ্রভুমতালম্বি তাহার মতাঅধিকারী শ্রীশ্রী৺ ছয় গোস্বামী তাহারা জে মত অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেইমত আমরা জাজন করি সেই স্বব মতের সার গোস্বামীরা বেদ প্রিণিত এবং ওন প্রিণিত এবং রস প্রিণিত জে সকল ভাগবত সাস্ত করিআছেন তাহা বিতিরেক করিয়া আমরা সকীআয় কিমত দস্তখত করিব অতএব শ্রীযুত গোস্বামীর গাদির গ্রন্থসাস্তে অধিকারী শ্রীশ্রী৺ চিনিবাষ আচার্য্য ঠাকুর তাহার সন্তান সকল আছেন তাহাদের স্থানে আগে দস্তখত করাহ তবে আমরাহ দস্তখত করিআ দিব এ কথায় আমরা শ্রীপাট জাজিগ্রাম জাইয়া দখল করিতে কহিলেন আমরা সকীআঅ দস্তখত বিনাবিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতালম্বি অতএব বিচারে জে ধর্ম্ম স্থাই হয়ে তাহাই লইবে এইমত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিহোঁ কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেইমত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বিপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার শোনারগ্রামের শ্রীশ্রীরাম-রাম বিদ্যাভূসন ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি ও শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ও গয়রহ একর্ত্ত হইয়া শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য ঠাকুরের সন্তান তাহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজা সওায়ের সভাপণ্ডীত অনেক সাস্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলেন তাহাতে শ্রীশ্রী৺ আচার্য্য প্রভুর সন্তান শ্রী৺ রাধামোহন ঠাকুরকে পরাভব করিতে পারিলেক না অতএব শ্রীদ্বিগবিজয় ভট্টাচার্য্য পরাভব হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া ঠাকুরের স্থানে শীষ্য হইয়া পরকীয়াধর্ম্ম গ্রহণ করিলেক এবং দস্তখত পরকিয়ায় ধর্ম্মের পর করিয়া দেসকে গেলেন এখানে জে সকল সাস্তগ্রেন্থ লইয়া বিচার হইল সেই সাস্ত শ্রীদ্বীগবিজয় শ্রীযুত মহারাজার নিকট গেলেন পুন ২ সভা শ্রীযুত রাজার সভাসতে বিচার হইল বিচারে পরক্রিয়াধর্ম্ম মোক্ষ হইল শ্রীমৎ আগম শ্রীমৎ ব্রহ্মবৈবত্ত এবং শ্রীমৎ ব্রেসদেবের শ্রীমৎভাগবৎ এবং শ্রীমৎ হরিবংস আদি ভাগবত সাস্ত এবং শ্রী৺ গোস্বামীদিগের শ্রীমৎ ভক্তি সাস্ত এই সকল গ্রেন্থের মতে পরাভব হইয়া জয়নগরে গেলেন সেখানে পুন সভাসত হইয়া বিচার হইল শ্রীশ্রী৺ রাধাকুণ্ডে পরক্রিয়া ধর্ম্মের ঢাণ্ডা গারা গেল এখানে পরকীয়া অধিকারী চারি অধিকারী শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অতএব

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবার ও আচার্য্য ঠাকুরের পরিবার শ্রীমৎ নরত্তম ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর পরিবার এইচার শুবে বাঙ্গলায় আমরা পঞ্চ পরিবারের মধ্যে খারিজ হইলাম তোমরা আপন ২ পরিবারে বিলাতে দখল করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ আমরা এই চারি পরিবারে পর দখল করিবনা দখল করি শ্রীশ্রী৺ সরকারে দণ্ডী এবং গুনাকার হইব এতদর্থে বিচার পরাভব হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ১৭ ফাল্গুন

	ইসাদি		
	শ্রীআসান খাঁ	শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ
শ্রীদক্ষনারায়ণ মজুমদার	মনসোপ ফোজদারি	সাং শ্রীপাট নবদ্বীপ	সোণারগ্রাম
সাকীম ডাহাপাড়া			
	শ্রীরামহরি মজুমদার	শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার	শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারি
শ্রীকাজী ছদরুদ্দী	মনষোপ অবস্থানিগর	সাং উৎকল কটক	সাং শ্রীকাশী
সাং মহিমাপুর	শ্রীসেখ হিঙ্গান	শ্রীনয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য	
	মনষোপ ঘউরী	সাং মহলা	

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৬ ৩য় সংখ্যা)

ভৌগোলিক পরিভাষা

১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় ও সংবাদ-পত্রে এই পরিভাষার সমালোচনা বাহির হয়। তৎকালে প্রকাশিত পরিভাষার সংশোধনের আবশ্যকতা অনেকেরই উপলব্ধি হইয়াছিল। সমালোচকগণের নিকট পরিভাষা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

সংশোধিত পরিভাষা নিম্নে প্রকাশিত হইল। পরিভাষার বর্ত্তমান সংস্করণ পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক[রামেন্দ্রসুন্দর]কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও পরিভাষাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। আশা করা যায়, পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ইহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইবে। সাধারণের সমালোচনা বাহির হইলে পরিভাষাসমিতি ইহার পুনর্ব্বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

সংশোধিত পরিভাষা আদ্যবর্ণানুক্রমে না সাজাইয়া সদৃশার্থক একশ্রেণী-ভুক্ত শব্দগুলিকে একত্র উপস্থিত করা গেল। ইহাতে বিচারের পক্ষে সুবিধা হইবে।

বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

বিজ্ঞানে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে দুই শ্রেণীর শব্দ আছে। এক শ্রেণীর শব্দ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়; চলিত কথোপকথনের ভাষায় উহাদের ব্যবহার নাই; যথা Lithosphere, Carboniferous, Palearctic, Protoplasm, Quadramana ইত্যাদি। এই সকল শব্দ পণ্ডিতদিগের জন্য পণ্ডিতের ভাষায় প্রচলিত। ইহাদের অনুবাদে তদনুযায়ী সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আবশ্যক। Carnivora পারিভাষিক শব্দ, বিজ্ঞানের ভাষায় প্রচলিত; flesh-eating animals চলিত ভাষায় ব্যবহৃত। উভয়ই প্রায় সমানার্থক; কিন্তু প্রথমটির যেমন পারিভাষিকত্ব আছে, দ্বিতীয় শব্দের তেমন নাই। কথাবার্ত্তার ভাষার অন্তর্গত নহে বলিয়াই প্রথম শব্দটির পারিভাষিকত্ব। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে flesh-eating-এর স্থলে 'মাংসাশী' বলিলে সকলেই বুঝিবে। কিন্তু Carnivora স্থানে 'ক্রব্যাদ' ব্যবহার করিলে সর্ব্বথা সুন্দর অনুবাদ হইবে। বর্ত্তমান সংস্কৃত পরিভাষায় এইরূপ স্থলে এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ চলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এই জন্য এ স্থলে সম্ভ্রান্ত শব্দের ব্যবহারের অবকাশ ঘটে না। Breeze, gale, soil, hill, cable, canal. dredge প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই সকল শব্দ লোকমুখে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও থাকিবে। ইহাদের বদলে দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে চলিবে না। ইহাদের অনুবাদের সময়ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা হইতে গৃহীত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। Breeze = হাওয়া, Gale = ঝড়, Hill = পাহাড়, Cable = তার, Canal = খাল, Basin = কোশা, Dredge = ঝুরি প্রভৃতিই এরূপস্থলে উপযোগী; Wind = সমীরণ, Gale = প্রভঞ্জন, Hill = শৈল, Cable = ধাতব রজ্জু, Dredge = তলকর্ষণী, Basin = অববাহিকা প্রভৃতি নিতান্ত অনুপযোগী।

প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলি সাধারণতঃ গ্রীক লাটিন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং ইউরোপের সকল দেশের বিজ্ঞানশাস্ত্রেই চলিত; দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলি ইংলণ্ডে একরূপ, অন্যান্য দেশে অন্যরূপ; ইংলণ্ডে ইংরাজী, ফ্রান্সে ফরাসী ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অনুবাদে প্রথম শ্রেণীর জন্য পণ্ডিত-জনপ্রিয় সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য খাঁটি বাঙ্গালার, কথোপ-কথনের বাঙ্গালার ব্যবহারই সঙ্গত। সেই খাঁটি বাঙ্গালা, সংস্কৃতমূলক অথবা দেশজ হউক বা বৈদেশিক ভাষা হইতে উৎপন্ন হউক, তাহাতে যায় আসে না। বর্ত্তমান পরিভাষায় এই প্রণালী অনুসারে অনুবাদের চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। কেন না, সংস্কৃত শব্দ অভিধান হইতে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গালায় নূতন প্রবেশ করান চলে; কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ নূতন করিয়া গড়া চলে না।

আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, তাহাদের অনুবাদের আদৌ আবশ্যকতা নাই। Hurricane, Monsoons, Typhoon প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী শব্দ নহে; উহারা বৈদেশিক ভাষা হইতে ইংরাজীতে অক্ষরান্তরিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। উহাদের অর্থও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ আছে। Hurricane বলিলে যে কোন ঝড়কে বুঝায় না; আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে যে ঝড় ঘটে, তাহারই নাম হরিকেন; চীন-সমুদ্রের বাত্যার নাম typhoon; ভারতবর্ষের ঋতু অনুসারী বায়ু-প্রবাহের নাম monsoons; এরূপ স্থলে বাঙ্গালাতেও সেই সেই শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার চলিবে। Firth, Frith, Fiord, Llanos, Pampas, Selvas প্রভৃতি স্থলেও এই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে।

Sound ও Channel, এই দুই শব্দের প্রয়োগস্থল অতি অল্প। Channelএর মধ্যে English Channel ও Irish Channelই উল্লেখ-যোগ্য; ঐরূপ Soundএর সংখ্যাও অধিক নহে। উহাদের জন্যও স্বতন্ত্র শব্দের আবিষ্কার আবশ্যক বোধ হয় না; প্রণালী শব্দেই চলিতে পারে। তবে Strait হইতে উহাদের পার্থক্য দেখাইতে হইলে শব্দ দুইটি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে।

বেলুন, টনেল, লেবেল, কোম্পাশ, থিয়োডোলাইট প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়া প্রচলিত বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়াছে। এরূপ স্থলে অনুবাদের চেষ্টা পণ্ডশ্রম।

পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিভাষায় আর একটি গুরুতর দোষ আছে, সেটি পরিহার্য্য। কয়েক স্থানে পারিভাষিক শব্দের ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়া পরিভাষিকত্ব একবারে নষ্ট করা হইয়াছে। যথা Oasis=অন্তর্মরুগ্রাম, Gulfstream=উপসাগরীয় স্রোত, Pot-hole=মণ্ডলাকার গর্ত্ত, Ozone=অম্লজানসার, Valley=অনুনদী নিম্নভূমি। এইরূপ অনুবাদ চেষ্টা বর্জ্জনীয়।

কতকগুলি শব্দ পরিভাষা মধ্যে কিরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারেই বোধগম্য নহে। উদাহরণ, Parallel of latitude= অক্ষাংশীয় সমান্তরাল বৃত্ত, Tropic of Cancer=উত্তর পরমাল্পক্রান্ত্যাবৃত্ত, Eccentricity=মন্দ পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। এইগুলিকে অচিরে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সংস্করণে পরিভাষার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করান হইয়াছে। এই জন্য তালিকার আয়তন অনেক বাড়িয়াছে।

অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দ ভৌগোলিক পরিভাষার অন্তর্গত না হইলেও তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার Oxygen, Hydrogen, Carbon, Carnivora, Quadrumana প্রভৃতি শব্দ ত্যাগ করা গিয়াছে। উহারা রাসায়নবিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনার সময়ে বিচার্য্য।

সংস্কৃত ভৌগোলিক পরিভাষা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা গেল। সমালোচনা সাদরে গৃহীত হইবে।—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

Air—বায়ু
Wind—বাতাস
Breeze—হাওয়া
Land-breeze—স্থল সমীর (১)
Sea-breeze—সমুদ্র-সমীর
Storm—ঝটিকা, ঝড়
Gale—ঝড়
Whirl-wind—ঘূর্ণি
Cyclone—বাতাবর্ত্ত
Anti-cyclone—প্রতীপাবর্ত্ত (২)

(১) সমীর শব্দে প্রবাহের ভাব আসে। সেই জন্য প্রবহমান বায়ু বা wind, breeze প্রভৃতি স্থলে সমীর শব্দ ব্যবহার চলিতে পারে।

(২) প্রতীপবাতাবর্ত্ত অতিশয় দীর্ঘ হয়; একটু ছাঁটিয়া লওয়া প্রয়োজন; পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে আর অর্থগ্রহে গোল থাকিবে না।

Tornado—ভ্রমি
Waterspout—জলস্তম্ভ
Hurricane—হরিকেন
Typhoon—তুফান
Thunder-storm—ঝঞ্ঝা
Snow-storm—তুষারঝটি
Trade-winds—বাণিজ্য-সমীর
Anti-trades— —
Monsoons—মৌশুমী বাতাস
Belt of Calms—নির্বাত বলয় (৩)
Aeronaut—ব্যোমযায়ী
Aeronavigation—ব্যোমযাত্রা
Balloon—ব্যোমযান, বেলুন
Atmosphere—অন্তরীক্ষ-মণ্ডল, অন্তরীক্ষ (৪)

(৩) Belt, Zone প্রভৃতিতে 'বলয়' শব্দ সুসঙ্গত।

(৪) ভূগোলকে মোটামুটি তিনটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত অংশে ভাগ করা হয়; মধ্যগত কঠিন nucleus বা lithosphere; তাহাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া liquid crust বা hydrosphere; তাহাকে ঘেরিয়া gaseous envelope বায়বীয় আবরণ atmosphere.

অন্তরীক্ষ শব্দ আকাশ অর্থে প্রয়োগ না করিয়া atmosphere অর্থে প্রয়োগ করিলেই ভাল হয়। যথা "দিব্যান্তরিক্ষ-ভৌমাস্ত্রিবিধাঃ স্যুঃ কেতবো যস্মাৎ।" বৃহৎসংহিতা ১২। ২। বৈদিক দেবতাগণকে পৃথিবীস্থান, অন্তরিক্ষস্থান, দ্যুস্থান, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এইরূপ স্থলে স্পষ্টতঃই অন্তরিক্ষ = atmosphere, দ্যৌঃ = sky.

'বায়ুমণ্ডল' শব্দ সচরাচর atmosphere অর্থে ব্যবহৃত হইলেও এই শব্দের তেমন পারিভাষিকত্ব নাই।

Hydrosphere—আপ্যমণ্ডল
Lithosphere—আশ্মমণ্ডল
Altitude—উৎসেধ
Height, Elevation—উচ্চতা
Altitude (of a Star)—উন্নতি
Azimuth—আশাংশ (৫)
Antarctic—যাম্য
Arctic—উদীচ্য
Antarctic Circle—যাম্য বৃত্ত
Arctic Circle—উদীচ্য বৃত্ত
Antarctica—অবাচিকা (৬)
Archipelago—দ্বীপপুঞ্জ (৭)

(৫) আশা = দিক্।

(৬) কুমেরুবেষ্টক মহাদেশের নাম।

(৭) এই শব্দে বহুদ্বীপবিশিষ্ট সমুদ্র বুঝায়; ঠিক এই অর্থের উপযোগী শব্দ দুষ্প্রাপ্য; 'দ্বীপপুঞ্জ' গ্রহণ করিলে কার্য্যতঃ বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

প্রশান্ত মহাসাগর ও তাহার সমীপস্থ কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নামের অর্থ এইরূপ—

Australasia = দাক্ষিণাত্য দ্বীপপুঞ্জ
Polynesia = বহুদ্বীপসমষ্টি
Melanesia = কৃষ্ণকায় মনুষ্যের অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জ
Mikronesia = ক্ষুদ্রদ্বীপপুঞ্জ

Australasia—অস্ট্রেলেসিয়া
Polynesia—পলিনীশিয়া
Melanesia—মেলানীশিয়া
Mikronesia—মাইক্রনীশিয়া
Oceania—সাগরিকা
Astronomy—জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ

Astrology—ফলিত জ্যোতিষ
Horology—হোরাশাস্ত্র
Almanack, Calendar—পঞ্জিকা
Almanack, Nautical—নাবিক পঞ্জিকা

Average—গড়
Mean (*substantive*)—মধ্য
Mean (*adjective*)—মধ্যম (৮)
Angle—কোণ (৯)
Angular Distance—কৌণিক অন্তর

Distance—দূরত্ব, ব্যবধান
Direction—দিক্
Point of the Compass—দিক্

Antipodes—প্রতীপপদ স্থান(১০)

Alluvium—পলল (১)
Silt, Sediment—পলি
Mould—কর্দ্দম (২)

Area—ক্ষেত্রফল
Perimeter—পরিণাহ
Volume—ঘনফল, আয়তন
Size—আয়তন
Shape—আকৃতি, মূর্ত্তি
Surface—পৃষ্ঠ, তল (৩)

Aurora—ঊষা (৪)

কিন্তু এরূপ স্থলে অনুবাদের আবশ্যকতা নাই। কেবল Oceania শব্দের অনুবাদ গ্রহণ করা গেল।

(৮) Mean Sun=মধ্যম সূর্য্য; mean temperature=মধ্যম উষ্ণতা।

(৯) Angular=কোণগত।

(১০) 'প্রতীপাঙ্ঘ্রি' দুরুচ্চার্য্য; 'কুদলান্তরস্থ' অতি দীর্ঘ ও পারিভাষিক-লক্ষণবর্জ্জিত। গোলাধ্যায়ে "অধঃশিরস্কাঃ কুদলস্তরস্থাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'কুদলান্তরস্থ' এই দীর্ঘ শব্দ ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

(১) Alluvial=পললময়।

(২) e. g. black mould, vegetable mould.

(৩) Superficial=পৃষ্ঠগত

(৪) প্রচলিত ভাষায় ঊষার অন্য অর্থ থাকিলেও ভূগোলবিবরণে ঊষা পারিভাষিকরূপে aurora অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থবোধে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এমন সুন্দর প্রতিশব্দ আর পাওয়া যাইবে না।

Aurora Borealis—উদীচী উষা
„ Australis—অবাচী উষা
Axis (of rotation)—অক্ষরেখা(৫)
Axis (of an ellipse)—অক্ষরেখা
Axis, major—দীর্ঘাক্ষ
Axis, minor—হ্রস্বাক্ষ
Axis (of a crystal)—ধ্রুবরেখা
Axis (of a continent)—
কশেরুকা (৬)
Axis (of a mountain range)—

Bay
Bight —উপসাগর (৭)
Gulf

Sea—সাগর
Ocean—মহাসাগর
Ocean Atlantic—আতলান্তিক মহাসাগর
„ Pacific—প্রশান্ত মহাসাগর
„ Indian—ভারত মহাসাগর
„ Arctic or Northern —উত্তর মহাসাগর, উদীচ্য মহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর
„ Antarctic—
কুমেরু মহাসাগর, যাম্য মহাসাগর (৮)
„ Southern—দক্ষিণ মহাসাগর
Sea, Mediterranean—ভূমধ্য সাগর

---

(৫) অক্ষ=axis, axle, pivot; "দৃঢ়ধূঃ অক্ষ," "জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডঃ" (Apte S. E. Dictionary). Ellipse-কে তাহার axis-এর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে ellipsoid of revolution উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে axis-কে অক্ষরেখা বলিতে পারা যায়। 'ব্যাস' শব্দ তেমন উপযোগী নয়। ধ্রুব শব্দ fixity-জ্ঞাপক; crystal-এর মধ্যস্থ axis-গুলি fixed direction নির্দ্দেশ করে মাত্র। ধ্রুবরেখা, ধ্রুবযষ্টি প্রভৃতি শব্দের axis অর্থে জ্যোতিষে প্রয়োগ আছে।

(৬) কশেরুকা=back-bone.

(৭) Bay of Bengal =বঙ্গোপসাগর
Persian Gulf=পারস্যোপসাগর
Bight of Benin=বেনিন উপসাগর

Bay, Bight ও Gulf এই তিনের মধ্যে যে অর্থগত বিভেদ আছে, তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিবার সুবিধা দেখা যাইতেছে না। কাহারও মতে Gulf শব্দে 'সাগরশাখা' বলিলে চলিতে পারে। কিন্তু Persian Gulf=পারস্যসাগরশাখা কার্য্যতঃ চলিবে না।

(৮) ভারত মহাসাগরের দক্ষিণবর্ত্তী মহাসাগরকে দুই ভাগ করা সম্প্রতি প্রথা হইয়াছে। দক্ষিণে ৪০° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত Southern Ocean, তদ্দক্ষিণে কুমেরু-বেষ্টনকারী Antarctic Ocean.

Sea, North—উত্তর সাগর
Sea-level—সাগরপৃষ্ঠ
Sea, inland—স্থলগর্ভিত সাগর(১)
" enclosed—স্থলরুদ্ধ সাগর(২)
Abysmal Region—
অগাধাব্ধি (৩)
International Deep—(৪)
Coast, Shore —বেলা, বেলাভূমি
Coast-line—বেলারেখা, বেলায়তি
Incurve—পরাঙ্মুখ বেলাভূমি
Outcurve—পুরোমুখ বেলাভূমি
Continental Shelf—
মহীসোপান (৫)

(১) যথা, Caspian Sea.

(২) যথা, Black Sea.

(৩) মহাসাগরের গভীর অংশের নাম।

(৪) ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার উত্তরে আতলান্তিকের গভীরতম অংশের নাম।

(৫) মহাদেশকে বেষ্টন করিয়া কতকটা অপ্রশস্ত ভূমি মহাসাগরে মগ্ন রহিয়াছে, তাহার উপর মহাসাগর গভীর নহে। উহারই নাম Continental Shelf; ইহাকে অতিক্রম করিয়া গভীর জল। গভীর মহাসাগরগর্ভ হইতে মহাদেশে আরোহণের ঘাট বা সোপানের মত বলিয়া shelf নাম।

Bank, Sand-bank, Shoal —কচ্ছ (৬)
Dune—বালিয়াড়ি
Bar—চর (৭)
Pool—ঝিল
Firth—ফার্থ
Frith—ফ্রিথ
Fiord—ফায়র্ড
Estuary—খাড়ী
Cliff—ভৃগু
Strait—প্রণালী
Channel—চানেল
Sound—সাউণ্ড
Gulf-stream—সাগর-গঙ্গা (৮)

(৬) Bank=a sandy ridge near the seacoast, that does not rise above the surface of water. কচ্ছ শব্দের অর্থ একটু পরিবর্ত্তন করিলে bank অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৭) Bar=a ridge of sand at the mouth of a river dropped by the stream when the current slackens.

(৮) "উপসাগরীয় স্রোত" পারিভাষিক লক্ষণবর্জ্জিত কদর্য্য অনুবাদ। Gulf-Stream আতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে একটা বৃহৎ নদীর মত প্রবাহিত; অন্যত্র ইহার তুলনা নাই; আকাশের Milky Wayকে যেমন স্বর্গগঙ্গা বলা হয়, সেইরূপ ইহাকে সাগরগঙ্গা বলিলে বেশ শুনায় ও পারিভাষিকত্ব বজায় থাকে।

Sounding—গভীরতা মাপ

Basin
„ Catchment
„ Drainage
„ Ocean
—কোশা, কোশিকা (৯)

(৯) Basin বলিলে a shallow vessel শরাব বা নিম্নমধ্য অগভীর পাত্র বুঝায়। Basin of the Ganges অর্থে যে সমগ্র প্রদেশ হইতে জল গড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থ নিম্নপ্রদেশে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়, যেমন শরাবে জল ঢালিলে তাহা চারিধার হইতে গড়াইয়া মধ্যস্থলে একত্র হয়। Basin-এর অনুবাদে এই ভাবটা বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

"অববাহিকা" শব্দে এ রকম ভাব আসে না। দ্রোণী (ডোঙ্গা) শব্দে ঠিক্ এই অর্থ আসে। কিন্তু দ্রোণী শব্দ valley অর্থে ব্যবহার করাই অধিকতর সঙ্গত; valley অর্থে দ্রোণী শব্দের প্রয়োগও আছে। Valley ও Basin প্রায় তুল্যার্থ-জ্ঞাপক; basin-এর বিস্তৃতি অধিক, valleyর পরিসর সঙ্কীর্ণ। শরাব বাঙ্গালায় সুশ্রাব্য হয় না; কোষা বা কোশা গ্রহণ করা গেল। "শরাবঃ কোশিকা পুনঃ" ইতি হেমচন্দ্র। আমাদের পূজার সময় ব্যবহৃত জল রাখিবার জন্য তামার কোষা অনেকটা river basin-এর ভাব আনে; চারিধারের জল গড়াইয়া মাঝে পড়িয়া এক পাশ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

Watershed
Waterschied
Water-parting
Divide
—সীমান্ত-রেখা (১০)

Base—ভূমি

Base-line—ভূমি-রেখা

Survey—জরীপ

Geometry—জ্যামিতি

Trigonometry—ত্রিকোণমিতি

„ Spherical—গোলমিতি

Contour-line—সমোন্নতি রেখা (১১)

(১০) যে রেখার উভয় পার্শ্বে জল গড়াইয়া বিপরীত মুখে চলিয়া যায়, তাহার নাম watershed বা divide. "জলবাধ" শব্দে এরূপ অর্থ আসে না। Watershed প্রকৃতপক্ষে bounding line between two contiguous river basins. এই অর্থে সীমন্তরেখা ব্যবহার করা গেল। সীমন্ত=সীমা+অন্ত —a boundary line, a land-mark (Apte), a dividing line (Wilson). সীমন্ত প্রচলিত অর্থে সীঁথি; সীঁথির উভয় পার্শ্বে চুল বিপরীত মুখে টানা থাকে; যেমন watershed-এর উভয় পার্শ্বে নদীনালাসমূহ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়া যায়।

(১১) Contour-line=line passing through points having same height above sea level.

Gradient }
Slope } —প্রবণতা
Level—লেবেল
Theodolite—থিয়োডোলাইট
Sextant—ষষ্ঠাংশ যন্ত্র, ষষ্ট্যংশ যন্ত্র
Quadrant—তুরীয় যন্ত্র
Boundary—সীমা
" natural—নৈসর্গিক সীমা
" artificial—কল্পিত সীমা
Cape—অন্তরীপ
Promontory—শৈলান্তরীপ
Headland—ভূশীর্ষ

Cataract }
Fall } —জলপ্রপাত
Waterfall }
Torrent—প্রপাত
Cascade—নির্ঝর (১২)
Rapid—নদীপ্রপাত

Canal—খাল

Coal—পাতর কয়লা

Configuration }
Structure } —গঠন, গঠন-প্রণালী
Distribution—বিন্যাস, সন্নিবেশ, অবস্থান (১৩)

---

(১২) A fall less than a cataract.

(১৩) Distribution (of land and water) = সন্নিবেশ ; Distribution (of strata) = বিন্যাস ; Distribution (of plants) = অবস্থান।

Crust (of the earth)—ভূত্বক্ (১৪)

Conduction—সঞ্চালন
Convection—সংবাহন (১৫)
Radiation—বিকিরণ
Coral—প্রবাল
Coral island—প্রবালদ্বীপ
Coral reef—প্রবালপ্রাচীর
Atoll—অবাল (১৬)
Circle—বৃত্ত
" great—বৃহদ্বৃত্ত
" small—লঘুবৃত্ত
" Centre of—কেন্দ্র
Radius—ব্যাসার্দ্ধ
Diameter—ব্যাস
Circumference—পরিধি

(১৪) 'পঞ্জর' শব্দে skeleton বুঝায় ; সুতরাং ভূপঞ্জর অব্যবহার্য্য।

(১৫) পরিবাহন শব্দে overflowing, draining বুঝায় ; সংবাহন = carrying along, bearing as a burden. Convection অর্থেও carrying along.

(১৬) অবাল = আলবাল ; আলবাল যেরূপ বৃক্ষমূল বেষ্টন করিয়া থাকে, atoll সেইরূপ প্রবালদ্বীপ বেষ্টন করিয়া থাকে। আবল শব্দ বাঙ্গালায় অপ্রচলিত ; atoll অর্থে পারিভাষিকরূপে এই শব্দ ব্যবহার করিতে কোন গোল হইবে না।

Circle, Segment of—বৃত্তখণ্ড
„ Sector of—বৃত্তাংশ
Arc—চাপ
Chord—জ্যা
Tangent—স্পর্শক
Sphere—বর্ত্তুল
Spheroid— উপবর্ত্তুল
„ Oblate—অভিগত „
„ Prolate—প্রগত „
Ellipsoid—অপবর্ত্তুল (১৭)
Ellipse—বৃত্তাভাস (১৮)
Parabola—ক্ষেপণী (১৮)
Hyperbola—অধিক্ষেপণী
Cable—তার
Tunnel—সুরঙ্গ
Chart—চিত্র
Plan—নকসা
Map—মানচিত্র
Chartography—মানচিত্রবিদ্যা
Projection—প্রতিক্ষেপ
Topography—স্থানবিবরণ
Chemistry—রসায়ন

(১৭) অপ উপসর্গ অপকর্ষদ্যোতক; ellipsoid, যাহা figure of revolution নহে, তাহাও symmetry-বর্জ্জিত অপকৃষ্ট বর্ত্তুল।

(১৮) বৃত্তাভাস ও ক্ষেপণী শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে; উহাদের ব্যবহারেও কার্য্যতঃ কোন অসুবিধা নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

Chemistry Inorganic —
„ Organic —
Crystal—অর্ক (১)
Crystallography—অর্কবিদ্যা
Crystalline—অর্কময়
Crystallisation—অর্কতাপত্তি
Crystallized—অর্কতাপন্ন
Amorphous—অনার্কিক, অর্কতাহীন
Isotropic—সমসংহত (২)
Oeolotropic—বিষমসংহত
Fibrous—অংশুময়
Colure—ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত
„ Equinoctial—বিষুবপ্রোত বৃত্ত (৩)
„ Solsticial—অয়নান্তপ্রোত বৃত্ত (৪)
Continent—মহাদেশ
Country—দেশ, জনপদ (৫)

(১) স্ফটিক শব্দ দুরুচ্চার্য্য, বিশেষতঃ তাহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ সমুদায় আরও দুরুচ্চার্য্য। "অর্কঃ স্ফটিকসূর্য্যয়োঃ" ইত্যমরঃ।

(২) যাহার সর্ব্বত্র সঙ্ঘাত (molecular structure) সমান। Isotropic-এর বিপরীত Oeolotropic.

(৩) অথবা বিষুবগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৪) অথবা অয়নান্তগত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।

(৫) Country (as opposed to *city*)=জনপদ।

Province—প্রদেশ (৬)
Division—বিভাগ
District—জেলা, উপবিভাগ
Department—বিভাগ (৭)
County—কাউন্টি (৮)
Region—প্রদেশ, বিষয়
Capital—রাজধানী (৯)
Town } —নগর (১০)
City }
Suburb—শাখানগর
Urban—পৌর, নাগরিক
Rural—জানপদ
Provincial—প্রাদেশিক
Village—গ্রাম, পল্লী
Sanitarium—স্বাস্থ্যাবাস
Citizen—নৈগমিক
Citizenship—নৈগমিকতা
Civic—নৈগম

(৬) বিষয়, ভুক্তি প্রভৃতি শব্দগুলির এইরূপ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় এখন আর চলিবে না।

(৭) কেবল ফ্রান্স মধ্যে division অর্থে প্রচলিত; তজ্জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন নাই।

(৮) কেবল ব্রিটিশ দ্বীপে প্রচলিত।

(৯) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্; ফ্রান্সে রাজা না থাকিলেও পারিভাষিক অর্থে রাজধানী শব্দের প্রয়োগে আপত্তি ঘটিবে না।

(১০) বাঙ্গালায় প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই।

Civilisation—সভ্যতা (১১)
Colour—বর্ণ
Red—রক্ত
Orange—অরুণ
Yellow—পীত
Green—হরিৎ
Blue—নীল
Indigo—ইন্দীবর
Violet—কাপোত (১২)
Spectrum—লেখা (১৩)
Spectroscope—লেখাবীক্ষণ

(১১) Civilize=সভ্যতাপাদন।

(১২) পায়রার গলার রঙ্ violet ধরা যাইতে পারে।

(১৩) Spectrum শব্দের অনুবাদ যে কয়টি শব্দ (দর্শন, বর্ণছত্র ইত্যাদি) চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কোনটিই সুশ্রাব্য বা সুসঙ্গত নহে। 'লেখা' শব্দ বিচার্য্য। ইংরাজী শব্দটি দর্শনবাচী ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বাঙ্গালাতেও তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে এমন কথা নাই।

Spectrum=যাহা দেখা যায়
লেখা=যাহা আঁকা যায়
অর্থবাচনে উভয়েই তুল্য মূল্য।

Spectrum বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি রেখার সমবায় মাত্র; এই হিসাবে রেখা (=লেখা) শব্দের সহিত সম্বন্ধ টানিয়া আনা যাইতে পারে।

Solar Spectrum=সৌর লেখা
Stellar Spectrum=নাক্ষত্রিক লেখা

Spectrum Analysis—লৈখিক বিশ্লেষণ

Delta—বদ্বীপ
Littoral—সৈকত
Deposit—
Deposition—ন্যাস

Drain—পরিবাহ (১৪)

Depth—গভীরতা
Length—দৈর্ঘ্য
Breadth—বিস্তার
Thickness—বেধ

Density—নিবিড়তা (১৫)
Rarity—বিরলতা

Defile } —গিরিসঙ্কট
Pass } —গিরিবর্ত্ম
Gorge—গিরিদ্বার
Canon } —কানিয়ন্ (১৬)
Canyon }
Escarpment —

Degree (of arc)—অংশ
" (of temperature)—উষ্ণতাংশ

Minute (of arc)—কলা
Second (of arc)—বিকলা
Desert—মরুভূমি
Oasis —
Mirage—মরীচিকা
Forest—অরণ্য
Tundras—তুন্দ্রা
Steppes—ষ্টেপী
Pampas—পাম্পা
Llanos—লানো
Selvas—সেলবা
Savannahs—সাবানা
Prairies—প্রেয়ারী

Earth—পৃথিবী

---

(১৪) পরিবাহ = Overflowing, inundation, overflow ; a water course, drain or channel to carry off excess of water "পুরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।" (উত্তর চরিত) Apte's Dictionary.

Drainage, draining = পরিবাহন

Drainage area = পরিবাহিত প্রদেশ

Drainage basin = প রি বা হ-কোশিকা

(১৫) সান্দ্রতা অপেক্ষা সুশ্রাব্য ;

Dense = নিবিড়, সান্দ্র

Rare = বিরল

(১৬) A deep, narrow, straight-walled valley cut out by streams in a plateau. কেবল মেক্‌সিকো দেশে ব্যবহৃত ; যথা Canon of Colorado.

Earth—মৃত্তিকা
World—পৃথিবী, জগৎ
Old—পুরাতন পৃথিবী
New—নূতন পৃথিবী
Globe—ভূমণ্ডল
Globe—গোলক

Earthquake—ভূমিকম্প
Earth tremour—ভূস্পন্দ
Seismograph—স্পন্দনমান যন্ত্র
Seismography, Seismology—ভূস্পন্দবিদ্যা

Erosion, Denudation—ক্ষয়
Subsidence—অধোগমন
Elevation, Upheaval—উদ্গমন
Landslip—পাহাড় ধসা
Element—মূল পদার্থ
Compound—যৌগিক পদার্থ
Metal—ধাতু
Non-metal, Metalloid—অপধাতু (১৭)

Alloy—উপধাতু
Acid—শট
Base—উষ (১৮)
Salt—সর (১৯)
Alkali—ক্ষার
Combination—রাসায়নিক সংযোগ
Decomposition—রাসায়নিক বিয়োগ
Dissociation—বিশ্লেষণ (২০)

---

(১৭) ধাতু শব্দে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যতীত গন্ধকাদি গৈরিক মাত্রকেই বুঝায়। স্থূলতঃ ধাতু শব্দের বিস্তৃততম অর্থ mineral matter as opposed to organic matter. এস্থলে ধাতু শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে metal-এর জন্য রাখিয়া অন্যান্য পদার্থের জন্য অপধাতু শব্দ রাখা গেল। সচরাচর যাহাদিগকে non-metal বলে তাহারাও অনেক বিষয়ে metalদের ধর্ম্মবিশিষ্ট; বস্তুতঃ metal ও non-metal এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ঠিক যুক্তিযুক্ত নহে; অনেক রসায়নবেত্তা এইজন্য non-metal মাত্রকে metalloid বলিয়া থাকেন। Metalloid = অপধাতু বা অপকৃষ্ট ধাতু। Metalliod শব্দের অন্য অর্থেও ব্যবহার আছে। Arsenic, antimony প্রভৃতিকে metalloid or semi-metal বলা হয়; বাঙ্গালায় এই প্রভেদ রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

(১৮) উষ = ক্ষার।

(১৯) Salt = সর (হেমচন্দ্র) ইংরাজীর সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য থাকায় শট, উষ, সর এই তিনটি শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিলে মন্দ শুনাইবে না।

(২০) Dissociation ও Decomposition রসায়ন শাস্ত্রের ঠিক এক নহে। Dissociation = Splitting up of complex molecules into

Analysis—ব্যাস ক্রিয়া
Synthesis—সমাস ক্রিয়া
Ecliptic—ক্রান্তিবৃত্ত
Equator (terrestrial)—নিরক্ষবৃত্ত
Equator (celestial)—বিষুববৃত্ত
Equinox—বিষুবকাল
Equinoctial point—বিষুব বিন্দু
Solstice—অয়নান্ত
Equinox, Spring—মহাবিষুব
" , Autumn—জলবিষুব
Solstice, Summer—উত্তরায়ণান্ত
" , Winter—দক্ষিণায়নান্ত
Latitude—অক্ষাংশ
Longitude—দেশান্তর
Latitude, Parallel of—সমাক্ষ বৃত্ত
Meridian—যাম্যোত্তর বৃত্ত
" Prime—মধ্যরেখা
Tropic—অয়নান্ত বৃত্ত
" of Cancer—কর্কট বৃত্ত
" of Capricorn—মকর বৃত্ত
Season—ঋতু
Summer—গ্রীষ্ম
Winter—শীত
Spring—বসন্ত

---

simpler ones with rise of temperature, the process being reversed with fall of temperature. Decomposition এইরূপ reversible নহে।

Autumn—শরৎ
Climate—জলবায়ু
Weather—
Zone—বলয়
" Torrid—উষ্ণ বলয়
" Temperate—মন্দোষ্ণ বলয়
" North Temperate—উত্তর " "
" South Temperate—দক্ষিণ " "
" Frigid—হিমবলয়
" North Frigid—উত্তর হিমবলয়
" South Frigid—দক্ষিণ হিমবলয়
Geography—ভূগোলবিদ্যা
" Mathematical—সিদ্ধান্ত ভূগোল
" Astronomical—জ্যোতিষিক ভূগোল
" General—ব্যবহারিক ভূগোল, কলিত ভূগোল
" Physical—প্রাকৃত ভূগোল
" Political—রাষ্ট্রিক ভূগোল
" Commercial—বাণিজ্য ভূগোল
" Historical—ঐতিহাসিক ভূগোল

Geology—ভূবিদ্যা
Epoch } —যুগ
Period }
Age—কল্প
Azoic—নির্জীবক
Palaeozoic—প্রত্নজীবক
Mesozoic—মধ্যজীবক
Cainozoic—নব্যজীবক
Primary—প্রাথমিক
Secondary—দ্বিতীয়ক
Tertiary—তৃতীয়ক
Quarternary—চতুর্থক
Archæan—আর্কিক
Cambrian—কাম্ব্রিক
Silurian—সিলুরিক
Devonian—ডিবনিক
Carboniferous—অঙ্গারবহ
Cretaceous—খটিক
Laurentian—লরেনশিক
Huronian—হুরণিক
Permian—পার্মিক
Triassic—ত্রায়াসিক
Jurassic—জুরাসিক
Liassic—লায়াসিক
Eocene—প্রাগাধুনিক
Miocene—মধ্যাধুনিক
Pliocene—অন্ত্যাধুনিক
Pleistocene—আধুনিক

Geocentric—পৃথিবীকেন্দ্রক
Heliocentric—রবিকেন্দ্রক

Glacier—হিমসরিৎ, হিমনদী (২১)
Glacial Epoch—হিমনদী, যুগ
Glaciation— „
Snowfield—তুষারক্ষেত্র
Snow line—তুষারসীমা
Line of perpetual snow—চিরতুষারসীমা
Boulder—গণ্ডশৈল
Moraine—গ্রাবরেখ (২২)
„ lateral—„ পার্শ্বগত
„ terminal—„ প্রান্তগত
„ medial—„ মধ্যগত
Pot-hole—দহ
Iceberg—হিমপ্লব (২৩)
Avalanche—„ (২৪)

---

(২১) Glacier=a *river* of ice creeping down a mountain valley.

(২২) A line of blocks and gravels extending along the sides of separate glaciers and along the middle part of glaciers, formed by the union of one or more separate ones. গ্রাব=উপল=gravel.

(২৩) A *huge* mass of *floating* ice ; *ice* and *berg* (=mountain) হিমশিলা শব্দে ভাসিয়া যাওয়ার ভাব আসে না।

(২৪) 'হিমপাতিকা' ভাল শুনায় না।

Gas—অনিল (২৫)
Vapour—বাষ্প
" aqueous—জলীয় বাষ্প
Steam—উষ্ণ বাষ্প
Liquid—তরল
Fluid—সরিল (২৫)

Solid—কঠিন
Rigid—দৃঢ়
Hard—কঠোর
Soft—কোমল
Brittle—ভঙ্গুর
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Stable—স্থাণু
Viscous —
Mobile —
Tenacious—ভারসহ
Flexible—নমনীয়

---

(২৫) Gas শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। বাষ্প=vapour; vapour ও gas বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট; কেহ কেহ অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্যাস শব্দ চালাইতে চাহেন। কথাবার্ত্তার ভাষায় 'গ্যাসের আলো' চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে গ্যাস শব্দ চালাইলে অত্যন্ত কদর্য্য দেখাইবে। উহার উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষার genius-এর অনুপযোগী। সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থে gas=বায়ু, gaseous=বায়বীয়, এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে। যথা oxygen gas= অম্লজান বায়ু। কিন্তু সাধারণ air ও gas উভয়ের জন্য পৃথক শব্দ থাকা আবশ্যক; নতুবা air is a gas, ইহার অনুবাদ কি হইবে? ইংরাজী gas শব্দও বহুদিনের প্রাচীন নহে। রাসায়নিক Van Helmont এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। সম্ভবতঃ জর্ম্মাণ geist=(ghost, spirit) হাই জর্ম্মাণ gescht=ফেন, প্রভৃতি শব্দের অনুকরণে এই শব্দ প্রস্তুত হইয়াছিল; প্রথম প্রথম ইহা air অর্থেই ব্যবহৃত হইত; ক্রমে অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণ, অপান, ব্যান আদি বিবিধ বায়ুর উল্লেখ দেখা যায়; এগুলিকে বিভিন্ন gas বলিয়া ধরা যাইতে পারে; সকলেরই মূলে অন্ ধাতু বর্ত্তমান; অন্ নিশ্বাস ফেলা। অনিল সেই অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বায়ু শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত 'অনিল' শব্দ gas-এর জন্য রাখা যাইতে পারে। Oxygen একরূপ অনিল, Hydrogen একরূপ অনিল। জড় পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা, কঠিন, তরল ও অনিল—এইরূপ প্রয়োগে অসুবিধা নাই। gaseous= অনিলাবস্থ, gaseous state of matter =জড় পদার্থের অনিলাবস্থা। Fluid শব্দে liquid ও gas উভয়ই বুঝায়। Fluid=that which flows=যাহা প্রবাহিত হয়। সংস্কৃত সলিল ও সরিল শব্দেরও অর্থ প্রায় এইরূপ। সলিল শব্দে জল ভিন্ন আর কিছু বুঝাইবে না। সমানার্থক অথচ অপ্রচলিত সরিল শব্দকে পারিভাষিকভাবে fluid অর্থে প্রয়োগ করিলে অসুবিধা হইবে না।

Ductile —
Malleable—ঘাতসহ
Volatile—উদ্বায়ী
Solution—দ্রাবণ, দ্রব পদার্থ
Soluble—দ্রাব্য
Solvent—দ্রাবক
Mixture—কবর
Freezing, Solidification—সংহনন
Melting, Fusion—গলন
Evaporation—বাষ্পীভবন
Sublimation—উদ্বান
Boiling, Ebullition—স্ফোটন, ফোটা
Liquefaction—তরলতাপত্তি
Condensation—ঘনীভবন
Rarefaction—বিরলতাপাদন
Compression—নিবিড়তাপাদন
Neutralisation—জারণ
Saturation (of a solution)—
Supersaturation —

Government—গবর্ণমেন্ট, সরকার, শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র
Administration—শাসন
Monarchy—রাজতন্ত্র
Republic, Commonwealth—সাধারণতন্ত্র

Democracy—প্রজাতন্ত্র, প্রকৃতিতন্ত্র
Aristocracy—অভিজাততন্ত্র
Oligarchy —
Autocracy, Despotism—স্বৈরতন্ত্র
Kingdom—রাজ্য
State—রাষ্ট্র
Empire—সাম্রাজ্য

Harbour —
Haven —
Port—বন্দর
Horizon—ক্ষিতিজ, হরিজ (১)
Horizontal—ক্ষিতিজগামী
Vertical—উল্লম্বী

Halo—পরিবেষ
Corona—ছটা
Rainbow—রামধনু, ইন্দ্রধনু
Mock-sun—উপসূর্য্য, প্রতিসূর্য্য(২)

Heat—তাপ
Temperature—উষ্ণতা
Calorimeter—তাপমান
Thermometer—উষ্ণতামান

---

(১) "যদ্ভ্রাশিত্র্যজতি হরিজম্"—বৃহজ্জাতক ; "যত্রা কাশং ভূম্যা সহাসক্তং দৃশ্যতে তদ্ধরিজম্"—Commentary by Utpala.

(২) প্রতিসূর্য্য—বৃহৎসংহিতা।

Melting point—গলনাঙ্ক
Boiling point—স্ফুটনাঙ্ক
Expansion } —প্রসারণ
Dilatation }
Contraction—সঙ্কোচন

Light—আলোক
Reflection—পরাবর্ত্তন
Refraction—তিরোবর্ত্তন
Dispersion—বিশ্লেষণ
Diffraction—সাচিবর্ত্তন (৩)
Polarisation—ধ্রুবতাপত্তি (৪)

Interference—বিরোধ

Hour—ঘণ্টা
Minute—মিনিট
Second—সেকণ্ড
Clock—ঘড়ী
Sundial—ছায়াঘড়ী
Chronometer—নাড়ীমান (৫)
Time—কাল
Day—দিন, দিবস
„ civil—সাবন দিবস
„ solar—সৌর দিবস
„ sidereal—নাক্ষত্রিক দিবস
Night—রাত্রি
Month—মাস
Lunar month } —চান্দ্র মাস
Lunation }
Year—বৎসর

---

(৩) আলোকের সোজা এক মুখে যাওয়াই সাধারণ ধর্ম্ম; ইহার নাম rectilinear propagation. কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ দ্বার বা ছিদ্র পথে যাইতে হইলে আলোক কেবল সম্মুখে না গিয়া আশপাশ দিয়া বক্র পথে চলে; এই ঘটনার নাম diffraction; ইহা আপাততঃ rectilinear propagation-এর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিরোধী নহে। Diffraction-এর অনুবাদে সাচিবর্ত্তন গ্রহণ করা গেল।

(৪) আলোকের স্পন্দনগুলি যখন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে আবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে polarised light বলে। Polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট মুখ প্রাপ্তি; আলোক যে অর্থে polarised হয়, অক্ষোপরি আবর্ত্তনশীল পৃথিবীকেও ঠিক সেই অর্থে polarised বলা যাইতে পারে। চুম্বকের অণুসমূহও ঠিক এই অর্থে polarised. কোন electrolyte-এর ভিতর তাড়িত প্রবাহ চলিলে উহার ion সকলও এইরূপ polarised হয়। সর্ব্বত্রই polarisation অর্থে নির্দ্দিষ্ট রেখায় অবস্থিতি। এই নির্দ্দিষ্ট রেখাকে ধ্রুব রেখা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে জ্যোতিষে ধ্রুব রেখা বলে। এই রেখার সম্মুখস্থিত নক্ষত্রকে ধ্রুবতারা বলে। ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি ও polarisation এইজন্য সমানার্থক।

(৫) "নাড়ী কালেঽপি ষট্‌ক্ষণে"—অমরকোষ।

Leap-year—পরিবৎসর (৬)
Inland—স্থলগত
Overland—সমুদ্রগত
Submarine—সাগরমগ্ন
Underground } —অধোভূমিক
Subterranean }

Island—দ্বীপ
Peninsula—উপদ্বীপ
Isthmus—যোজক

Land—স্থল
Water—জল

Lake—হ্রদ
Lagoon—উপহ্রদ
Marsh } —বিল
Bog }

Language—ভাষা
Dialect—উপভাষা

Patois—অপভাষা

Meteor—কেতু, উল্কা
Meteorite—উল্কাপিণ্ড, উল্কাশ্ম (৭)
Aerolite—ব্যোমাশ্ম
Siderite—ব্যোমায়স
Siderolite—ব্যোমায়সাশ্ম
Fireball—বহ্নিগোলক
Meteor, detonating—নির্ঘাত (৮)
Bolide } —উল্কা
Shooting star }
Radiant point—নির্গমকেন্দ্র

Meteorology—অন্তরিক্ষ বিদ্যা
Humidity—আর্দ্রতা
Hygroscope—সেকবীক্ষণ
Hygrometer—সেকমান (৯)

---

(৬) পরিবৎসর = a particular year in a cycle of five years. Leap-year প্রতি বর্ষচতুষ্টয়ে একবার ঘটে। সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিবৎসর ও leap-year এক না হইলেও বাঙ্গালায় পরিবৎসর leap-year স্থানে ব্যবহার চলিতে পারে। কেননা আধুনিক জ্যোতিষে পরিবৎসর শব্দের প্রাচীন অর্থে ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই।

(৭) Meteorites are large masses that pass through the atmosphere and actually reach the earth. They are of three classes :—(1) *aerolites* = meteoric *stones*, (2) *siderites* = meteoric *irons*, (3) *siderolites* = intermediate varieties.

(৮) বৃহৎসংহিতায় প্রয়োগ আছে।

(৯) আর্দ্র ও সিক্ত সমানার্থক। Hygrometer = আর্দ্রতা বা সিক্ততা মাপিবার যন্ত্র। উচ্চারণ সুবিধার জন্য সেকমান গ্রহণ করা গেল।

Moist } —আর্দ্র, সিক্ত
Humid }

Dry—শুষ্ক

Saturation—পরিষেক (১০)

Supersaturation—অতিসেক

Dew-point—পরিষেকাঙ্ক (১১)

Rain—বৃষ্টি

Rainless Region—নির্ব্বর্ষদেশ

Region of constant precipitation—নিয়তবর্ষ দেশ

Rain-gauge—বৃষ্টিমান

Hail—শিলা

Cloud—মেঘ

Stratus—স্তর মেঘ

Cumulus—স্তূপ মেঘ

Cirrus—অলক মেঘ (১২)

Nimbus—বলাহক (১৩)

Lightning—বিদ্যুৎ

Thunder—বজ্র

Electricity—তাড়িত

Lightning rod—তাড়িত দণ্ড

Fog } —কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা
Mist }

Snow—তুষার

Snow-flake—তুষারোর্ণা

Ice—বরফ

Dew—শিশির

Frost } —তুহিন
Hoar-frost }

Sleet—তুষার বৃষ্টি

Magnet—চুম্বক

Magnetism—চৌম্বকতা

Magnetic axis—চুম্বক অক্ষ

Magnetic meridian—চৌম্বক যাম্যোত্তর রেখা

Declination—চুম্বক ক্রান্তি

Dip } —চুম্বকাবনতি
Inclination }

Dip circle—অবনতি চক্র

Isogonic line —

Isodynamic line —

Magnetic needle—চুম্বক শলাকা

Compass—কোম্পাস

Mariner's compass—নাবিক কোম্পাস

---

(১০) Saturated=পরিষিক্ত, unsaturated অপরিষিক্ত।

(১১) Dew-point = Temperature of saturation.

(১২) ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'অলক মেঘ' ব্যবহার করিয়াছেন।

(১৩) Nimbus=বর্ষপ্রদ, এইরূপ ব্যবহার আছে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রাকৃতিক ভূগোল); বলাহক=বারিবাহক=বর্ষপ্রদ; সংস্কৃত সাহিত্যে আবর্ত্তাদি মেঘচতুষ্টয়ের মধ্যে বলাহক অন্যতম।

Mountain—পর্ব্বত
Mountain range—পর্ব্বতশ্রেণী
Mount—গিরি
Hill—পাহাড়, শৈল
Hillock—পাহাড়ি
Ridge—শৈলশ্রেণী
Peak—শৃঙ্গ
Summit—শীর্ষ
Flank—কটক
Cave—গুহা
Cavern—কন্দর
Ravine—দরী
Gorge—দ্বার
Pass } —গিরিসঙ্কট
Defile }
Valley—উপত্যকা, দ্রোণী
Plateau } —মালভূমি
Table land }
Plain—সমতল
Low plain } —সমতট (১৪)
Lowlands }
Highlands—অধিত্যকা
Sunk plain—অধোগত সমতল
Depression —
Stratum—স্তর
Bed—স্তর
Fold—ভাঁজ

(১৪) বঙ্গদেশের lowlandsকে পূর্ব্বে সমতট বলিত।

Stratification—স্তরবিন্যাস, স্তরাধান
Tilting—হেলিয়া থাকা
Syncline—অবক্রম (১৫)
Anticline—অধিক্রম

Mine—খনি
Mineral—গৈরিক (১৬)
Mineralogy—গৈরিকবিদ্যা
Ore—আকরিক
Fault—ফাট
Vein—শিরা
Seam —
Machine—যন্ত্র
Mechanical—যান্ত্রিক, ভৌতিক
Mechanics—যন্ত্রবিজ্ঞান
Statics—স্থিতিবিজ্ঞান
Dynamics —
Kinematics—গতিবিজ্ঞান
Kinetics—বলবিজ্ঞান
Pneumatics—অনিলবিজ্ঞান
Hydrostatics —

(১৫) In a folded bed of rocks, a downward fold is a *syncline*, an upward fold an *anticline*.

(১৬) Mineral শব্দ কেবল খনিজ পদার্থে আবদ্ধ নহে; rock মাত্রকেই বুঝায়। Mineral oil এরূপ স্থলে খনিজ তৈল বলা চলিবে।

Hydrodynamics —
Physics—পদার্থবিজ্ঞান
Physical—ভৌতিক
Engine—এঞ্জিন
Steam Engine—বাষ্পযন্ত্র

Maximum—পরম
Minimum—অবরম

Migration—নির্যাণ
Emigration—প্রবাসন
Immigration —
Colony—উপনিবেশ (১৭)

Nadir—অধঃস্বস্তিক
Zenith—ঊর্দ্ধস্বস্তিক

Nebula—নীহারিকা
Nebular Theory—নীহারিকাবাদ

Navigation—নৌযাত্রা
Navigator—নাবিক, নৌযাত্রী
Navigable—নাব্য
Nautical—নাবিক সম্বন্ধী
Navy- নৌসেনা
Sailor—মাল্লা
Circumnavigation—ভূপ্রদক্ষিণ

(১৭) Colonist ঔপনিবেশিক, colonisation উপনিবেশ স্থাপন।

Exploration—ভূমি আবিষ্কার
Cruise —
Orbit—কক্ষা
Rotation—আবর্ত্তন (১৮)
Revolution—ভগণ গতি, ভভ্রম, পরিবর্ত্ত (১৮)
Translation—ভ্রমণ
Precession—অয়ন চলন, অয়ন গতি
Nutation—অক্ষস্পন্দন
Perturbation—কক্ষাভ্রংশ

Observation—বেধকর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ
Observatory—বেধমন্দির, মানমন্দির

(১৮) "ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।" এস্থলে আবর্ত্তন—rotation.

"ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ"

ইতি উৎপলধৃত মূলপুলিশ সিদ্ধান্ত বচনম্। ভ=নক্ষত্র, ভগণ=নক্ষত্রগণ=সমগ্র রাশিচক্র; প্রত্যেক গ্রহ সমুদয় রাশিচক্র ঘুরিয়া আসে। এই পরিভ্রমণ ক্রিয়াকেও 'ভগণ গতি' বা 'ভগণ' বলা প্রচলিত আছে। যথা, "ক্রান্তিপাতস্য ভগণাঃ=revolutions of the point of intersection between the Ecliptic and the Equator.

Aphelion—মন্দোচ্চ
Perihelion—শীঘ্রোচ্চ
Line of apsides—উচ্চগ রেখা

Organ—অবয়ব, দেহ (১৯)
Organism—অবয়বী জীব, দেহী
Cell—কোষাণু (২০)
Protoplasm—জৈবনিক, জীবপঙ্ক
Pressure—চাপ
Barometer—বায়ুমান
Hypsometer—উৎসেধমান
Manometer—চাপমান
Anemometer—বেগমান
Isobar—সমচাপ রেখা
Isothermal—সমোষ্ণ রেখা
Force—বল
Velocity—বেগ

Plant, Vegetable—উদ্ভিদ্
Animal—জন্তু, প্রাণী
Life—জীবন
Biology—জীববিদ্যা
Botany—উদ্ভিদ্বিদ্যা
Zoology—প্রাণীবিদ্যা
Palæontology—প্রত্নজীববিদ্যা

(১৯) Organisation = অবয়বিতা-পাদন, দেহপ্রাপ্তি।

(২০) Unicellular = ঐককোষিক
Multicellular = বহুকোষিক

Morphology—শরীরবিদ্যা
Physiology—প্রাণবিদ্যা
Domestic—গ্রাম্য
Domestication—গ্রাম্যতাপাদন
Wild—আরণ্য
Fauna—প্রাণিবর্গ
Flora—উদ্ভিদ্বর্গ
Ethnology—জাতিবিদ্যা
Anthropology—মানববিদ্যা
Anthropometry—মানবমিতি

Pole—মেরু
— north—সুমেরু
— south—কুমেরু
— magnetic (of the earth)—চৌম্বক মেরু
—(of a magnet)—মেরু
—(of an electric battery)—দ্বার
Pole-star—ধ্রুব তারা
Polar region—মেরু প্রদেশ
Polarization—ধ্রুবতাপাদন
Gyrostat—ভ্রমর যন্ত্র
Population—লোকসংখ্যা
People —
Nation—জাতি
Race—কুল
Type—বংশ, বর্ণ
Tribe—দল

Clan—গোত্র
Caste—বর্ণ
Herd (of animals)—যূথ, পাল
Society—সমাজ
Corporation —
Guild—সার্থ
Community—সঙ্ঘ (২১)
Communism—সাঙ্ঘিকতা
Socialism—সমাজতান্ত্রিকতা
Individualism—ব্যক্তিতান্ত্রিকতা
Nihilism—ধ্বংসবাদ
Anarchism—অরাজকতা
Barbarous—অসভ্য
Savage —
Settled—সমাজবদ্ধ
Aborigines—আদিমনিবাসী
Civilized—সভ্য
Nomadic—যাযাবর
Industry—পরিশ্রম, শিল্প
Agriculture—কৃষি
Trade—ব্যবসায়
Commerce—বাণিজ্য
Art—কারুশিল্প
Fine art—কলা

Religion—পন্থা
Sect—সম্প্রদায়

(২১) একালে community বলিলে যাহা বুঝায়, বৌদ্ধগণের সঙ্ঘ ঐরূপ একটা community ছিল।

Animism—প্রেতবাদ
Shamanism—পিশাচ পূজা
Totemism —
Taoism —
Fetishism —
Idolatry—পৌত্তলিকতা

Rock—প্রস্তর
Sedimentary—পললজ
Stratified—স্তরীভূত
Fragmental—কর্করিল
Igneous—আগ্নেয়
Extruded } —বহিঃস্রুত (২২)
Effusive }
Intrusive—অন্তঃস্রুত
Plutonic—পাতালজ (২৩)
Metamorphic—পরিণত
Eruptive—উৎপাতিত
Lava—লাবা
Volcano—আগ্নেয় পর্ব্বত
Crater—গহ্বর
Cone—মোচা
Ash—ভস্ম
Eruption—অগ্ন্যুৎপাত
Extinct—নির্ব্বাপিত

(২২) Extrusive = Flowing out of the earth.

(২৩) Plutonic = deepseated igneous. Pluto পাতালের দেবতা।

Dormant—সুপ্ত
Active—জাগ্রত
Fossil—জৈবাশ্ম
Stone—পাথর
Gravel—উপল, গ্রাব
Clay—কাদা
Soil—মাটি, মৃত্তিকা
Sand—বালি, বালুকা

Region }
Realm } —বর্ষ
—Palæarctic—প্রত্নোদীচ্য বর্ষ
—Ethiopian—ইথিয়োপীয় বর্ষ
—Oriental—প্রাচ্য বর্ষ
—Neo-tropical—নবোষ্ণ বর্ষ
—Nearctic—নবোদীচ্য বর্ষ

River }
Stream } —নদী
Affluent }
Tributary } —শাখা
Distributary —
Source—উৎপত্তিস্থল
Mouth—মুখ, মোহানা
Junction—সঙ্গম
Bank—তীর
Bed—গর্ভ
Channel—খাত
Basin—কোশা
Rivulet—নালা

Spring—উৎস, প্রস্রবণ
Hot spring—উষ্ণ প্রস্রবণ
Geyser—গীসার
Surface spring—পৃষ্ঠোৎস
Deepseated spring—গর্ভোৎস

Silica—সিকতা
Lime—চূণ
Calcareous—চূর্ণময়
Iron—লৌহ
Ferrugenous—লৌহময়

Sun—সূর্য্য
Moon—চন্দ্র
Star—তারা
Planet—গ্রহ
Planetoid }
Asteroid } —গ্রহক, অপগ্রহ
Constellation—তারা-প্রকোষ্ঠ
Star cluster—নক্ষত্রপুঞ্জ
Satellite—উপগ্রহ
Ring (of Saturn)—মেখলা
Solar System—সৌর জগৎ
Sidereal System—নক্ষত্র জগৎ
Stellar Sphere—ভপঞ্জর (২৪)
Uranus—বরুণ
Neptune—ইন্দ্র
Comet—ধূমকেতু

(২৪) "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্য" ইত্যাদি।

Head } —শীর্ষ
Coma

Tail—পুচ্ছ

Nebula—নীহারিকা

Zodiac—রাশিচক্র

Zodiacal Light—ভচক্রভা

Galaxy } ছায়াপথ,
Milky Way } ব্যোমগঙ্গা

Eclipse—গ্রহণ

—total—পূর্ণ গ্রাস

—partial—অংশ গ্রাস

—annular—কঙ্কণ গ্রাস

Tide—জোয়ার ভাটা, বেলা

—high } —জোয়ার
—flow

—low } —ভাটা
—ebb

Bore—বান

Race —

Spring tide—কটাল

Neap tide—মরা কটাল

Tidal wave—বেলোর্ম্মি

Cotidal line—সমোচ্ছ্বাস রেখা

Wave—তরঙ্গ

Undulation—উর্ম্মি, লহরী

Ripple—হিল্লোল

Groundswell—উল্লোল (২৫)

Wind-wave—বাতোর্ম্মি

Crest (of wave)—শীর্ষ

Hollow (of wave)—গর্ভ

Breaker—ভঙ্গ

Spray —

Vibration } —স্পন্দন, কম্পন
Oscillation

Wave-length—তরঙ্গায়তি

Wave-front—তরঙ্গধারা (২৬)

Frequency—কম্পন সংখ্যা

Period—কম্পনকাল

Amplitude } —কম্পন প্রসার
Range

Stream } —স্রোত, প্রবাহ
Current

Surface Drift—পৃষ্ঠপ্রবাহ

Whirlpool—আবর্ত্ত

---

(২৫) উল্লোল = a large wave or billow (Wilson)

(২৬) ধারা = Edge, boundary in general, the advancing van of an army.

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০৬ ৪র্থ সংখ্যা)

রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ

মুর্শিদাবাদ জেলা, কান্দি মহকুমা, গোকর্ণ থানার মধ্যে, ফতেসিংহ পরগণার উত্তর সীমাতে রাঙ্গামাটি গ্রাম অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা মানসিংহের জনৈক সৈনিক পুণ্ডরীক-গোত্রজ পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত রণনৈপুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ ফতেসিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি ফতেসিংহ পরগণা সবিতাচাঁদের বংশধরগণের অধিকারে আছে। ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ জেমোর রাজবংশের ও অপরার্দ্ধ বাঘডাঙ্গা রাজবংশের সম্পত্তি। বাঘডাঙ্গার অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি হস্তান্তরিত হইয়া মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে।

রাঙ্গামাটি অতি প্রাচীন কালে কোন সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রাঙ্গামাটির সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়। রাঙ্গামাটির নৈসর্গিক অবস্থান প্রকৃতই একটা রাজধানীর উপযুক্ত। পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে একটা বহুক্রোশবিস্তৃত নিম্ন জলাভূমি বা বিল এই গ্রামকে একটা নৈসর্গিক দুর্গে পরিণত করিয়াছে। ঐ বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাঁকি নদী ও দ্বারকা নদী পরিখার আকারে রাঙ্গামাটি ও সন্নিহিত গ্রামগুলিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। রাঙ্গামাটি অতি উন্নত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার উপর অবস্থিত; এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকাকে ছোট নাগপুর ও বীরভূম প্রদেশের রক্তমৃত্তিকার পূর্ব্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাঙ্গামাটিই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর সম্যক্ কারণ নাই। কর্ণসেনের সহিত কর্ণসুবর্ণের নাম কিরূপে জড়িত হইল, বলা যায় না। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ নাম হইতেই কর্ণসেনের প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। চাঁদপাড়া ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সহিত চাঁদ সদাগরের প্রবাদ জড়িত আছে। দ্বারকা নদীর তীরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া ময়ূরাক্ষী পার্শ্বস্থ নবদুর্গা গোলাহাট গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চাঁদ সদাগরের নৌকা গিয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কান্দির অন্তর্গত বাঘডাঙ্গা গ্রামের নীচে যেখানে চাঁদ সদাগরের নৌকা বাঁধা হইয়াছিল, এখনও লোকে সে স্থান দেখায়।

দীঘাপাতিয়া রাজবংশধর কুমার শরৎকুমার রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি পদ্যে রচিত বাঙ্গালা হিতোপদেশ আমার নিকট আছে। সংস্কৃত হিতোপদেশে যে সকল উপাখ্যান আছে, তদ্ব্যতীত অনেকগুলি লেখকের স্বরচিত অথবা সংগৃহীত নূতন উপাখ্যান এই বাঙ্গালা হিতোপদেশের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পুঁথিখানি ১৫৯ পত্রে সম্পূর্ণ, ১৫০ হইতে ১৫২ পত্র মধ্যে একটি রাজনীতিঘটিত উপাখ্যান আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৫১ পাতাটা না থাকায় উপাখ্যানটি সমস্ত পাওয়া গেল না। গল্পটির প্রথম ও শেষ ভাগ, যাহা পাওয়া গেল, তাহা এইরূপ :—

মদন পাল গেল রণে হইল হড়বড়।
বেড়িয়া লইল দলে কর্ণসিংহের গড় ॥
করিল অনেক যত্ন যুদ্ধ অতিশয়।
কদাচ তাহার গড় নহে পরাজয় ॥
মরিল অনেক সৈন্য না হইল কাজ।
তাহা দেখি মদন পাল মনে পায় লাজ ॥
চাঁপাকর্ণ নামে পাত্র কহিল তাহায়।
কিরূপে লইব গড় চিন্তহ উপায় ॥
যদি এহি রাজ্য তুমি পার লইবার।
সর্ব্বথা তোমাকে আমি দিব অধিকার ॥

* * * *

(এই স্থানে পুঁথি খণ্ডিত)

আপনার লস্কর গিয়া কহে পাত্র স্থানে।
যে কার্য্য করিবা তাহা করিবা যতনে ॥
এহি কথা শুনি তবে রায় মদন পাল।
হরষিত হয়া অতি বুকে মারে তাল ॥
শীঘ্রগতি সাজে রণে লইয়া দলবল।
চারি দিকে গড়খান বেড়িল সকল ॥
গরল ভক্ষণে সব কাতর বদন।
মদন পাল রণ জয় করিল তখন ॥
জ্ঞানানন্দ দাসে কহে জানিবা নিশ্চয়।
পাত্র বোলে সেহি কাক সেহি জানি হয় ॥

কানসোনা গড় ক্রমে কর্ণসেনের গড় ও কর্ণ সিংহের গড়ে পরিণত হইয়াছে কি? মদন পাল কি প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজা? রাজা মদন পাল বিষ প্রয়োগে অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া কর্ণ সিংহের গড় বা কানসোনা গড় অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বনে কি উক্ত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে? ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩০৭, ৪র্থ সংখ্যা)

আর একখানি প্রাচীন দলীল

১৩০৬ সালের চতুর্থসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় একখানি প্রাচীন দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গিয়াছিল।* নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানিও সেই একই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পত্র দুইখানির তারিখে কিছু তফাত আছে। সেখানার তারিখ ১১২৫ সাল ৫ই ফাল্গুন; এখানির তারিখ ১১৩৮ সাল বৈশাখ। স্বাক্ষরকারীর ও সাক্ষীর নামেও কতক কতক তফাত আছে। এই দ্বিতীয় পত্রখানি জেমো (কান্দি) বিশ্বাস-পাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে উহা অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইল। ইহার স্বতন্ত্র টিপ্পনী অনাবশ্যক। ইতি।

শ্রীশ্রীহরি।

শ্রীরামানন্দ সেবার্পণ
শ্রীমুরলীধর সেবার্পণ
শ্রীব্রজানন্দ সেবার্পণ
শ্রীবল্লবীকান্ত সেবার্পণ

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ
শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু
সধর্ম্মান্বিত শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু

শ্রীজগদানন্দ সেবার্পণ
শ্রীমদনমোহন সেবার্পণ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ সেবার্পণ
প্রভুসন্তান বর্গেষু

* বর্ত্তমান গ্রন্থের ৩৩-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং স্নপুর তস্যপর শ্রীরামানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্যপর শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্যপর শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্যপর শ্রীবল্লবিকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বিরচন্দ্রপুর তস্যপর শ্রীসাহেব পঞ্চানন দেবশর্ম্মণ সাং গএষপুর তস্যপর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা প্রভু সস্তবর্গেষু।

ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺ স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড় মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেয়ায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড় মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমারা সর্ব্বে থাকীয়া সধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবর্দ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্মঅধীকারি ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমারা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া স্বংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমারাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন পরকীয় ধর্ম্ম সে দেষে ও সেখানে সভাপণ্ডীত লইয়া ও দেবালয় আদি একত্র হইয়া তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম অধীকারি তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন হইতে সিরোপা তোমাকে আইল আমারা পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উড়স্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাও শ্রীমদজীব গোস্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত স্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধীকার করি

তবে শ্রীশ্রী৺তে বহির্ভূত এবং শ্রীশ্রী৺ সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাওা ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ

শ্রীকৃষ্ণদেব দেবশর্ম্মণ
সাং জয়নগর

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য অজয়পত্রমিদং আমীহ স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মর পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় সংস্থাপন করিতে আশীয়াছিলাম এবং শ্রীযুত পাতসাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্ব স্থুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আশীয়াছিলাম মালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্ম বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺ গোস্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিস্য হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ

ইসাদী

শ্রী৺অদ্বৈত গোস্বামী মহান্ত সন্তান

সন্তান

শ্রীকালাচান্দ দেবশর্ম্মণ শ্রীবক্রেশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং শ্রীপাট সান্তিপুর সাং বসতপুর
শ্রীকৃষ্ণকীশোর দেবশর্ম্মণ শ্রীআত্মারাম ঠাকুর
সাং বাবলা সাং কুলীনগ্রাম
শ্রীকৃষ্ণরাম দেবশর্ম্মণ শ্রীলালাজীউ দেবশর্ম্মণ
সাং নবদ্বীপ সাং মালিপাড়া
শ্রীসাহেব পঞ্চানন শর্ম্মণ শ্রীদর্পনারায়ণ রায় কাহুনগো
সাং বাহাদুরপুর সাং কাশীমহাট পুখরিয়া
শ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণ শ্রীসম্ভূনাথ মিত্র
সাং নাসিগ্রাম সাং চুনাখালী
শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মণ শ্রীদামোদর ঘোষ
সাং শোনারগ্রাম বিক্রমপুর সাং কুরড় পাড়া
শ্রীব্রজভূষন দুবে শ্রীসেখ কাজী সদরদ্দীন
সাং বিষ্ণুপুর রামডিহা সাং কুড়ারিয়া
শ্রীরাধাবল্লভ দাস শ্রীসৈএদ করমউল্লা
সাং বিষ্ণুপুর সাং চোঘরিয়া

শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণ
সাং জয়নগর

ইতি

শ্রীপ্রাণনাথ রায়

সহবাশী

শ্রীশ্রীধর দেবশর্ম্মণ বিদ্যাবাগীষ
সাং দিনাজপুর

শ্রীনয়নানন্দ দেবশর্ম্মণ
সাং উৎকল জাজপুর

শ্রীকাশীশ্বর দেবশর্ম্মণ
সাং বানারস

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩০৮, ১ম সংখ্যা)

কাশীরাম দাস

১৩০৬ সালের দ্বিতীয়সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে ও ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে।* তৎপরে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের আর একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। জেমো (কান্দি) বিশ্বাসপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয় এই পুঁথির অধিকারী।

এই পুঁথিতে গ্রন্থকর্ত্তা গদাধর দাসের নিম্নলিখিত বংশপরিচয় আছে।

ভাগীরথী তট নদী ইন্দ্রায়ণি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব জে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সে বেহারী॥
হুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
হুবরাজ পুত্র হইল মীন জে কীর্ত্তন॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল জেই এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেবল সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখ দেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব॥
সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত * * মন্ত আর॥

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থের ২৫-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

কমলাকান্তের হৈল এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ॥
দ্বিতীয়তে কাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ ॥
তৃতীয়ে কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগতমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬।২।১৭৩ পৃষ্ঠে* প্রকাশিত কাশীরাম দাসের বংশতালিকার সহিত এই পরিচয়ের বিশেষ অনৈক্য নাই। ঐ তালিকায় রঘুপতির পাঁচ পুত্র—প্রিয়ঙ্কর, রঘুশ্বর (?), কেশব, শ্রীমুখ (?), শ্রীধর উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিতে রঘুশ্বর স্থলে সুরেশ্বর ও বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথিতে শ্রীমুখদেব স্থলে শ্রীরঘুদেব রহিয়াছে। এই দুই নাম প্রকৃত ধরিলে, রঘুপতির পাঁচ পুত্র—প্রিয়ঙ্কর, সুরেশ্বর, কেশব, শ্রীরঘুদেব ও শ্রীধর। প্রিয়ঙ্করের পুত্র সুধাকর। সুধাকরের তিন পুত্র; শ্রীমন্ত ও কমলাকান্ত দুই জনের নাম; তৃতীয়ের নাম এখনও স্থির হইল না। কমলাকান্তের মধ্যম পুত্র কাশীদাস।

এই পুঁথির তারিখ ১২৪৬ সাল চৈত্র মাস। লিপিকারের আত্মপরিচয় পুঁথির শেষে রহিয়াছে।

নিজ বিবরণ শুন, জন্ম শ্রীকরণ কুল, আত্মস্থল ঘোষ কান্দি বসতি।
মাতামহ আশ্রিতে, নিবসি পাতগুাতে, সাধিকার মাতুল শ্রীপতি ॥
হরিপদ মকরন্দ, লিখি স্মরি কৃষ্ণচন্দ্র, কেবল ভরসামাত্র তার।
আমি অতি দীন হীন, ভজনবিহীন জন, তোমা বই কে করে নিস্তার ॥
তুমি মাতা হর্ত্তা কর্ত্তা, ত্রিজগতের হও মাতা, তব পদ সদা করি আশে।
সময় দিবা দেড় প্রহর, বসি পূর্ব্বদ্বারী ঘর, লিখিল শ্রীতারাচরণ ঘোষে ॥

('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩০৮, ১ম সংখ্যা)

* বর্ত্তমান গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।—সম্পাদক।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কারপরম্পরা বলা উচিত; কেন না, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের মত ধারা বাঁধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নূতন তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছে, আবার প্রত্যেক নির্ণীত তত্ত্ব এক একটা আঁধার দেশ আলোপূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত অধিক আছে, তাহা নহে।

আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্তু সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন লণ্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনষ্টিটিউশনের) প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারপরম্পরা একের পর এক বাহির হইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল, সেই সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকটা মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভাল।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাড়িত ঊর্ম্মির অস্তিত্ব ধরিবার জন্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তখন কথাটাতে বিশ্বাস হয় নাই। কেন না, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহা ত একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহু পূর্ব্বে অবধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আর একটা ছোট বাক্সের ভিতর রক্ষিত লোহার তারের উপর পতিত হইবামাত্র সেই তারে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং প্রবাহবলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ পর্য্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

বস্তুতই সে দিন বিজয়ের দিন বটে; কেন না, এত অল্প আয়াসে এত বড় দুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান অধ্যাপক হার্ৎজ্ তাড়িত তরঙ্গের উৎপাদনের ও তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত অল্প আয়াসে

সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ যেখানে যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্ত্তা।

সেই দিন হইতে নূতন নূতন সংবাদ সহকারে ভারতবাসীর এই বিজয়বার্ত্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, কিন্তু আনন্দপ্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্যের ও সবলতার প্রয়োজন, সেইটুকু বল ও স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নাই।

ঘটনা বৃহৎ, কিন্তু এই বৃহৎ ঘটনা কিরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা বুঝিতেছি না।

ধাতুদ্রব্য কাহাকে বলে, বুঝাইতে হইবে না ; কোন্ জিনিস ধাতু নহে, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। ধাতু, যথা—সোনা, রূপা, তামা। ধাতু নহে—জল, বায়ু, ইট, কাঠ। কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার স্বরূপ ঠিক বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই হয় ত বুঝিবেন না। কিন্তু সে কথা বুঝাইবার এখন সময় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, এবং সূর্য্যমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে সংবাদবহন এই আকাশের নিরূপিত কার্য্য। সূর্য্যের ও নক্ষত্রের শরীরগত পরমাণুগুলি এই আকাশে যে ধাক্কা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন করিয়া আমাদের চোখে লাগে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই বলি আলো ও তাহার অভাবই আঁধার। এবং সেই আলোকের অনুভূতি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ঐখানে ওটা সূর্য্য, আর ঐখানে ওটা একটা তারকা। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত বেশী যে, সেই ঢেউগুলি প্রায় সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে আকাশ বাহিয়া চলিয়া থাকে।

আলোকের উৎপাদক শক্তি সেই আকাশের ঢেউ, কিন্তু তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি নামে আরও দুইটা আমাদের অতিপরিচিত শক্তি আছে, সেই দুইটার সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। উপরে যে মনস্বী পুরুষ মাইকেল ফ্যারাডের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই আবিষ্কারপরম্পরা

১০

প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া দেয় যে, সেই আলোকবাহী আকাশপদার্থই তাড়িত শক্তির ও চৌম্বক শক্তিরও আধার হইতে পারে।

তৎপরে মাক্সোয়েল, ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রায় প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশমধ্যে কোনরূপ টান পড়িলেই তাড়িত শক্তির ও আকাশমধ্যে কোনরূপ ঘূর্ণি উৎপন্ন হইলেই চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও একখানা দস্তার থালা উপরি উপরি স্পর্শ করিয়া দুইখানাকে বিচ্ছিন্ন করিলেই, উভয়ের মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টান পড়ে; তখন আমরা বলি, থালা দুখানা তাড়িতযুক্ত হইয়াছে।* এই টানটা বায়ুর মধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর স্থায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যস্থ আকাশেই পড়ে; ধাতুদ্রব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান সংক্রান্ত হয় না। ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাবর্জ্জিত; যেন উহা টান সহিতে পারে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন টানসহ। অধাতব পদার্থের আকাশ যেন রবারের মত বা ইস্পাতের মত, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত। ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশে এই টান দিলে সেই আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত বা গুড়ের মত বা জলের মত সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায়, উহাতে টান পড়ে না; এইরূপে উহাতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে টান দিলে উহা রবারের মত বা স্প্রিংএর মত খেঁচিয়া ধরে; উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে না।

ধাতুপদার্থের উদাহরণ একটা তামার তার। এই তারের ভিতর আকাশে টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায় ও এইরূপে উহার মধ্যে তাড়িত প্রবাহ জন্মে। এই তাড়িত প্রবাহের সাহায্যে আমরা আজকাল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করি ও টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম-পথে গাড়ী চালাই ও রাজপথে ও গৃহমধ্যে আলো জ্বালি।

তারপথে এই তাড়িত প্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে বায়ুমধ্যস্থ আকাশে ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। সেইখানে একটা লোহার কাঁটা ধরিলে লোহার অণুগুলা সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাঁটাটাও ঘুরিয়া গিয়া সেই আবর্ত্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই

ব্যাপারের নাম চৌম্বক ব্যাপার, এবং সেই তদবস্থ লোহার কাঁটার নাম চুম্বকের কাঁটা বা কম্পাসের কাঁটা বা দিগ্দর্শন-শলাকা।

মাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের কোন অংশে একটা টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছুক্ষণ দুলিবার সম্ভাবনা ;—একটা স্প্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা দুলিতে থাকে। এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই আন্দোলনের ধাক্কায় চারি দিকে ঢেউ উঠিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবার সম্ভাবনা। আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলিতে পারে, তবে এই তাড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিও ঠিক সেই লক্ষ ক্রোশ বেগেই চলিবার সম্ভাবনা।

মাক্সোয়েল বলিয়াছিলেন, আকাশই যদি তাড়িত শক্তির আধার হয়, তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের ঊর্ম্মি চলিয়া থাকে, তবে বড় বড় তাড়িত ঊর্ম্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তাড়িত শক্তির আধার বটে কি না ; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড় বড় ঢেউ উঠে কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। আলোক বহন করে যে আকাশ, সেই আকাশই তাড়িত শক্তির আধার না হইতেও পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আকাশ বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। এবং তাড়িতের ঢেউ একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত নূতন ব্যাপার—কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক।

হার্ৎজ্ সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন ; একটাতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপাদন করিবে, আর একটাতে উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে একবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন জন্মিবে ; দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া পৌঁছিলে, সে কোন রকমে সাড়া দিবে। আলোকের সঙ্গে তুলনা কর। প্রথমটা যেন দীপশিখা, সেই স্থলে আকাশে ধাক্কা লাগিয়া আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ, সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। মেঘের কোলে যখন বিদ্যুল্লতা চমক দেয়, তখন আকাশে সহসা ধাক্কা পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাক্কা লাগে। বিড়ালের গায়ে একটা চাপড় দিলেও যে আকাশে ধাক্কা না লাগে, এমন নহে।

হার্ৎজের বাহাদুরী এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির আবিষ্কারে—যে যন্ত্রটি তাড়িত তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মত কাজ করে। দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তাড়িত তরঙ্গ আকাশ বহিয়া এই যন্ত্রে ধাক্কা দিলে সেই যন্ত্রমধ্যেও তাড়িতের খেলা আরম্ভ হয়, এবং সেই তাড়িতের খেলার বিবিধ প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। তাড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। আলো জ্বালা হইতে গাড়ী টানা পর্য্যন্ত তাহার উদাহরণ।

হার্ৎজ্ এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বাস্তবিকই আকাশের মধ্য দিয়া তাড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। দূরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দিলে, সেই তাড়িত নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দূরস্থিত আর একখানা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দেয় ও সেই নর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়। মাক্সোয়েল যাহা জ্ঞান-চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, হার্ৎজ্ তাহা চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দিলেন।

তাড়িত প্রবাহ ও তাড়িত তরঙ্গ, এই দুইটি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, প্রবাহ ও তরঙ্গ, উভয়ের অর্থে তফাত আছে। প্রবাহের বশে পদার্থ এক মুখে চলে, যেমন—নদীতে স্রোতের জল। আর তরঙ্গের বশে গতি ইতস্ততঃ ঘটে; নদীর তরঙ্গে তরণী উঠা-নামা করে ও দোদুল্যমান হয়। সেইরূপ তাড়িতের প্রবাহে আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে—এই প্রবাহে টেলিগ্রাফের খবর চলে। আর তাড়িতের তরঙ্গে আকাশ ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে; দোদুল্যমান হয়। ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ সংক্রামিত হইলে আকাশ একবার এ-ধার যায়, একবার ও-ধার যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সর্ব্বত্র এই অর্থগত প্রভেদটি মনে রাখা আবশ্যক। তরঙ্গের সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উপরে

'দোলন,' 'আন্দোলন,' 'নৃত্য,' 'নর্ত্তন,' 'নাচ' প্রভৃতি স্পন্দনবোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে।

এখন দেখা গেল, আকাশমধ্যে ছোট বড় বিবিধ ঊর্ম্মি উৎপন্ন হইয়া সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। ছোট ছোট ঢেউগুলির নাম আলোকতরঙ্গ, বড় বড় ঢেউগুলির নাম তাড়িত তরঙ্গ; ছোট বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ। উপযুক্ত ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশতরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাহার পক্ষে ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। উপযুক্ত ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের অভাবেই হার্ৎজের পূর্ব্বে কেহ বড় বড় আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

হার্ৎজের পরবর্ত্তী কালে এই ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশতরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কি জানি কিরূপে উহার তাড়িতপ্রবাহ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। এই তাড়িত প্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পার বা আলো জ্বালিতে পার বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পার বা গাড়ী টানিতে পার। এই লোহাচুরে ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরাজীতে Coherer বলে।

ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক। নিরেট ধাতুপদার্থে তাড়িত প্রবাহ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,—কিন্তু ধাতুচূর্ণে এই ফাঁক পার হইয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক লজ অনুমান করেন যে, আকাশ-তরঙ্গের প্রভাবে কোন মতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তাড়িত প্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগসাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer।

ধাতুর গুঁড়া না হইলেই যে coherer প্রস্তুত হয় না, এমন নহে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের coherer কতকগুলি তারে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তারে তারে স্পর্শ থাকে, স্পর্শস্থলে তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলেই তারের প্রবাহ-পরিচালন-শক্তি জন্মে।

ফলে যেরূপেই হউক, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে অপরিচালক দ্রব্যে পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচালক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায়। Coherer অর্থাৎ উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই।

মার্কণি যে উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত তাড়িত তরঙ্গ অবলীলাক্রমে ধরা পড়িতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কণি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্ত্তা প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়। মার্কণি এই কয় বৎসর মধ্যে বহু ক্রোশ দূর হইতে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র বহু দূর হইতে সংবাদ প্রেরণ জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাঁহার বন্ধুবর্গ এই জন্য কতকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। জগদীশবাবু তাঁহার বন্ধুগণের নিকট অনুযোগভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সংবাদপ্রেরণের ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এ জন্য স্বদেশ কালে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত বটে, কিন্তু আজ আমরা যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতেছি, সে আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইত।

যাহা হউক, তৎকালে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্রেণীর বা তদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত আর সকল যন্ত্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাড়িত তরঙ্গের বিবিধ ধর্ম্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে,—আকাশবাহিত তাড়িত তরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্ত্তমান নাই।

আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। ধাতুপদার্থের মধ্যে আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ধাতুপদার্থ অনচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোকতরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে বা প্রতিফলিত বা পরাবর্ত্তিত হয়।

সান্দ্র পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া যায়, অর্থাৎ আলোকরশ্মি তির্য্যগ্‌গামী হইয়া তিরোবর্ত্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই এই ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত তরঙ্গের যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন পুরাণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়িত তরঙ্গ একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর বহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে না; চুলের গোছার ভিতর চলে, ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে চলে না; কাষ্ঠদণ্ডের ভিতরে আঁশগুলি কোন্ মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়; প্রস্তরখণ্ডের কোন্ দিকে পরিচালকতা বেশী, কোন্ দিকে কম, তাহা ঠিক ধরিয়া দেয়; ইত্যাদি তত্ত্ব চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নূতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তাড়িত তরঙ্গের যে অভিনব ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ধাতুচূর্ণ তাড়িত প্রবাহের অপরিচালক, কিন্তু ধাতুচূর্ণের উপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলে উহার পরিচালকতা সহসা বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। ইহা পুরাণ কথা, এবং ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক coherer যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার স্বভাবে আনিতে হইলে একটা আঙ্গুলের ঠোকা দেওয়া প্রয়োজন হয়; একবার নাড়িয়া দিলে তবে উহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার স্বাভাবিক অপরিচালকত্বশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

দুই বৎসর হইল জগদীশচন্দ্র দেখান, এইরূপ নাড়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক নহে। এমন অনেক ধাতুদ্রব্য আছে, যাহাকে নাড়া না দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে ঘুরিয়া আইসে। একটা তারে একটা মোচড়

দিলে প্রথমে পাক লাগে, কিন্তু তারটার পাক আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, কতকটা সেইরূপ।

ফলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে। স্থিতিস্থাপক তারকে মোচড়ান দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্থাপকতা-গুণে আপনা হইতেই সেই পাক খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু এই সীমার ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে, আর সে পাক আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক খুলিতে হয়।

ইস্পাতে ও সীসাতে এইখানে প্রভেদ; কুঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ইস্পাত ঘুরিয়া আসে। সীসাকে বাঁকাইয়া ধরিলে উহার আকুঞ্চন স্থায়ী হইয়া যায়।

ধাতুপদার্থের অণুগুলাতেও যেন এইরূপ একটা স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম আছে। তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া অণুগুলি স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও আপনার স্থিতিস্থাপকতাগুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধাক্কাটা যদি অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর আপনা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন জোর করিয়া নাড়া দিয়া আঙুলের ঠেলা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এই জন্য coherer যন্ত্রে আঙুলের ঠোকর দেওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার আরও বিচিত্র। এ পর্য্যন্ত জানা ছিল যে, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে ধাতুচূর্ণের তাড়িতপ্রবাহ-পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান, কতিপয় ধাতুর পরিচালনক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু অনেক ধাতুর পরিচালনক্ষমতা আবার কমিয়া যায়। এইরূপে "সোনা রূপা আদি করি যত ধাতু আছে," সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, ধাতুগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; কাহারও পরিচালনশক্তি তাড়িততরঙ্গসংস্পর্শে বাড়িয়া যায়; কাহারও বা কমিয়া যায়। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব; ইয়ুরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত তরঙ্গের সহিত পরিচালনশক্তির এই সম্বন্ধ কেবল ধাতুবিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপদার্থ মাত্রেই—কেবল ধাতুপদার্থ কেন—ধাতু, অপধাতু বা অধাতু—

সকল পদার্থেই অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার হইল বলা যাইতে পারে। মাইকেল ফ্যারাডে বহু দিন পূর্ব্বে পদার্থমাত্রেরই চুম্বকত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। এই নূতন আবিষ্কারের সহিত সেই প্রাচীন আবিষ্কারের অনেকটা তুলনা হইতে পারে।

গোটা সত্তর মূল পদার্থ এখন রাসায়নিকগণের পরিচিত। ইহাদের সকলেরই পরিচালকতা তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে পরিবর্ত্তিত হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। আবার কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রায় আবার তারতম্য আছে। কোন দ্রব্যের বেশী বাড়ে, কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশী কমে, কাহারও কম কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখিলে একটা বিস্ময়কর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রুসীয় রাসায়নিক মেন্দেলীয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাইতে গিয়া উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সত্তরটি মূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একটা অদ্ভুতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বর্ত্তমান আছে, মেন্দেলীয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পায়। ক্রুক্‌স প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই জ্ঞাতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর প্রকার দ্রব্য কিরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার নিরূপণের জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ প্রাণিজাতির ও উদ্ভিজ্জাতির মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ডারুইন যেমন এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টিপ্রণালীর আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই সত্তরজাতীয় মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টিপ্রণালী আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টিরহস্য ভবিষ্যতের যে ডারুইন আবিষ্কার করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলীয়েফের আবিষ্কৃত সম্পর্কের সমর্থন দ্বারা তাঁহার পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই।

তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে কোন বস্তুর পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরাইল না। এই আঘাতের প্রবলতানুসারে

আবার একই ধাতুরই পরিচালকতা হয় ত কমে, অথবা বাড়ে। আঘাতের তারতম্যানুসারে কখনও বা বাড়িয়া যায়, কখনও বা কমিয়া যায়। আবার যে সকল ধাতুর পরিচালকতা সহজে বাড়ে কমে না, তাহাকে একটু গরম করিলে আবার বাড়িতে থাকে বা কমিতে থাকে। অণুগুলি যেন জমাট বাঁধিয়া ছিল; উত্তাপ পাইয়া তাহারা কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া হেলিবার দুলিবার অবকাশ পাইল। এখন তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কায় তাহারা হয় এ-দিকে, কিংবা ও-দিকে হেলিয়া পড়িবার অবকাশ পাইল।

কেবল যে মৌলিক পদার্থেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থাবিকার ঘটে, তাহা নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ তরঙ্গের ঘা পাইয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র লোহাভস্ম (সাদা কথায়, লোহার মরীচা) লইয়া তদুপরি তাড়িত তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার অদৃশ্য অণুগুলিকে কিরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক।

তরঙ্গপ্রতিঘাতে ধাতুচূর্ণের পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন। উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া কণিকাগুলির অণুগুলি কতকটা সংহত ও সন্নিকৃষ্ট হয় ও জমাট বাঁধে; যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা কাছাকাছি আসে; ফলে পরিচালকতা বাড়িয়া যায়। এই সংহতি বাড়ে বলিয়াই পরিচালকতা বাড়ে। সংহতির ইংরাজি নাম cohesion; এই জন্য ধাতুচূর্ণ-নির্ম্মিত ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র coherer আখ্যা পাইয়াছে।

কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও আবার কমে; এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে; ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে আর সংহতির ব্যাখ্যা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়; অধ্যাপক লজের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোটা কথায়, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা খাইলে জড় পদার্থমাত্রেরই,—ধাতুই বল, আর অপধাতুই বল,—জড় পদার্থমাত্রেরই পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া এ-দিকে ও-দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এ-দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায়; ও-দিকে বিক্ষিপ্ত

হইলে পরিচালনশক্তি হ্রাস পায়। এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আবার অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতাবলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই বিচলিত হইলেও কিছু ক্ষণ পরে আপনা হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও স্বাভাবিক পরিচালনশক্তি ফিরিয়া পায়। প্রবল ধাক্কা পাইলে স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না; তবে বাহির হইতে কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য মুখে কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। পেণ্ডুলমকে যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করিতে গিয়া আবার বামে উঠিয়া পড়ে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপ, যাহা ক্ষণেকের জন্য অতিপরিচালক হইয়াছিল, তাহা আবার ক্ষণেকের জন্য অপরিচালক হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারস্রোত যদি এই পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাঁহার কার্য্যের জন্য বিস্মিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সেই স্রোত এখন যে নূতন মুখ অবলম্বন করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে, তাহাতে কোথায় যে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন্ কূলহীন প্রকাণ্ড মহাসাগরে লীন হইয়া আমাদিগকেও ভাসাইয়া দিবে, তাহা বিস্ময় ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গ হইতে ধরাতলে নামাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে কোন্ সগরসন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারি না; যিনি অগ্রণী হইয়া এই পুণ্যধারার পথপ্রদর্শন করিতেছেন, তিনিও হয় ত জানেন না, ইহার সমাপ্তি কোথায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা পুরাতন কথার আলোচনা আবশ্যক।

নির্জ্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। জীবদেহে সাধারণ জড়ধর্ম্ম সমুদয়ই বিদ্যমান আছে; তবে জড়ধর্ম্ম ব্যতীত কোন অসাধারণ ধর্ম্ম বা অতিজড়ধর্ম্ম—যাহা নির্জ্জীব জড়ে

বিদ্যমান নাই, এরূপ কোন অসাধারণ ধর্ম্ম—বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্য-পরিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলির সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু তথাপি জীবশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায় না। গতিবিজ্ঞান, আর তাপবিজ্ঞান, আর তাড়িতবিজ্ঞান, আর রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়ার অর্থ কতক কতক বুঝা যায়; কিন্তু সমস্ত বুঝা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতে বলেন,—জীবন-তত্ত্বের সমগ্র ভাগ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার কখনও সম্ভাবনা নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ অজ্ঞাত ক্রিয়ার প্রভাবে জীবনযন্ত্র প্রধানতঃ কাজ করে। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে vital force বা জীবনীশক্তি বা এইরূপ একটা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে বা হইবে না। জড় পদার্থে এই জীবনীশক্তি নাই; কাজেই উহা জড়। জীবদেহে উহারই প্রভুত্ব; এই জন্য জীবদেহে জীবন। জীবে ও জড়ে এই জন্য মূলগত বিরোধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা প্রাকৃতিক পরিচিত শক্তিসমূহের সাহায্যেই জীবনের কাজ সমস্ত বুঝাইতে পারিব। জীবের ও জড়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নাই। জীবদেহে ও জড়দেহে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। জীববিজ্ঞান কালে জড়বিজ্ঞানেই পরিণত হইবে।

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয় পক্ষে মতের প্রকৃত অনৈক্য নাই; কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। মূলে কেবল কথার অর্থ লইয়া ঝগড়া। এখানেও অনেকটা সেইরূপ।

বর্ত্তমান কালে আমরা জড় উপকরণ লইয়া জীবশরীর নির্ম্মাণ করিতে পারি না, এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক জৈব পদার্থ,

ইংরাজিতে যাহাকে অর্গানিক পদার্থ বলে, যথা—ঘি, তেল, চিনি, মদ প্রভৃতি পদার্থ, যাহা সচরাচর প্রাণিদেহে বা উদ্ভিদের দেহমধ্যে নির্ম্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্ম্মিত হইতেছে। এমন দিন ছিল, এই সকল পদার্থ মানুষে জড় উপাদান লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিত না। ঘির জন্য গরু ও তেলের জন্য সরিষাগাছ ও চিনির জন্য ইক্ষুদণ্ড ও মদের জন্য দ্রাক্ষালতা প্রভৃতির অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই সকল জৈব অর্থাৎ জীবজ পদার্থ জড় উপাদান হইতে অবাধে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের এক সময়ে অত্যন্ত দুরাশা হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক কয়লা, আর জল, আর আমোনিয়া উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ডাল রুটী, এমন কি, মাছ মাংস পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সে আশা অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই। এখনও ডাল রুটী ও মাছ মাংসের জন্য রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রকৃতিদেবীর বৃহত্তর কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইতে হয়, এবং শীঘ্র যে সে আশা সফল হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু দিন পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল, এবং অদ্যাপি অনেক অপণ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, জড় পদার্থ হইতে কৃমি কীট, মাছি মশা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাণিবর্গকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু অধিক দিনের কথা নহে, এই বিশ্বাসের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জীব হইতেই নূতন জীব জন্মে; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীজ হইতেই জন্তু হয়। এখন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্বেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই অণ্ডজ।

জীবের উৎপাদন দূরে থাক, যে মশলায় জীবদেহ নির্ম্মিত, ইংরাজিতে যাহাকে প্রোটোপ্লাজম বলে, যাহার বাঙ্গলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলিল না, তাহা এ পর্য্যন্ত জড় উপাদানে নির্ম্মাণ করিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না। সেই প্রোটোপ্লাজম পদার্থ এখনও কোনও রসায়নবিৎ

কয়লা, জল ও আমোনিয়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি কখনও সমর্থ হয়েন, তখন জীবের ও জড়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে বলিয়া নৃত্য করিবার কারণ মিলিবে; এখন নহে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু—

প্রোটোপ্লাজম এখনও নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং জীবদেহ জড় উপাদানে গঠিত হইলেও সেই জড় উপাদানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি না। আমরা পারি না, কিন্তু প্রকৃতি পারেন। নৈসর্গিক কারণে জড় উপাদানেই জীবদেহ গঠিত হইতেছে। উদ্ভিদের শরীর বা জন্তুর শরীর বিশ্লেষণ করিয়া জড় উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান এক কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা কিই বা পারি? আমরা জীবদেহনির্ম্মাণে অসমর্থ; জড়দেহনির্ম্মাণেই কি আমরা সমর্থ? যখন আমরা উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সে নির্ম্মাণ কি আমাদেরই কাজ? এক হিসাবে উহা আমাদের কাজ বটে, আর এক হিসাবে আমাদের কাজ নহে। উদজান আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে অম্লজানসংযুক্ত হইয়া পোড়ে ও জলে পরিণত হয়; গন্ধকও আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে পুড়িয়া গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়, আমাদের সেখানে প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা আমাদের কৃত কর্ম্ম নহে। আমরা জিনিসগুলাকে এমন ভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া মিশাইয়া আগুন ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে আগুন ধরাইয়া হাওয়া আর জল মিশাইয়া দিই, তখন উদজান আর গন্ধক আপনা হইতে প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পুড়িতে থাকে ও জল তৈয়ার হয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈয়ার হয়। এইটুকুই যা আমাদের কর্ত্তৃত্ব। অর্থাৎ, আমাদের যা কিছু কর্ত্তৃত্ব এই যোজনাকার্য্যে; পাঁচটা উপকরণকে আমরা এইরূপে জোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন আপন ধর্ম্মবশে নূতন নূতন জিনিসের উৎপত্তি করে।

জীবদেহের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। জল আর গন্ধকদ্রাবক আমরা জড় উপাদান লইয়া নির্ম্মাণ করি; কিন্তু জড় উপাদান লইয়া জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি না। উভয়ে এই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধানের অর্থ কি? এই নির্ম্মাণের অর্থ কি? নির্ম্মাণ আমরা করি

না; নির্ম্মাণ প্রকৃতি করেন; প্রাকৃতিক ধর্ম্মে নির্ম্মাণকার্য্য চলে, উভয়ত্রই চলে। আমাদের নির্ম্মাণের নাম যোজনা। একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ; অন্যত্র এই যোজনাকার্য্যে অসমর্থ। জীবদেহেও জড় উপাদান ব্যতীত অজড় অপরিচিত অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই কয়লা আর উদজান আর অম্লজান আর যবক্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ—নিতান্ত পরিচিত জড় পদার্থ। কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কিরূপে যোজনা করিলে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হইবে, কিরূপে উপাদান-গুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া সমাবেশ করিলে প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ নির্ম্মিত হইবে—প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে নির্ম্মিত হইবে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানি না। এই যোজনাকার্য্যে আমরা একান্তই অজ্ঞ, কাজেই আমাদের জীবদেহনির্ম্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। প্রকৃতিতে এই নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে; প্রকৃতির কারখানায় জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই আপনা আপনি সর্ব্বদাই নির্ম্মিত হইতেছে। জড় হইতেই জড় নির্ম্মিত হইতেছে ও জীবদেহ হইতে জীবদেহ ও জড়দেহ, উভয়ই নির্ম্মিত হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই যোজনাকার্য্য ঘটে বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই নিয়ত গঠিত হইতেছে। জড়দেহের নির্ম্মাণানুযায়ী যোজনাকার্য্যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু জীবদেহ নির্ম্মাণের জন্য যে যোজনার প্রয়োজন, তাহা আমরা এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসমর্থ।

এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় কার্য্য-প্রণালীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিব যে, কিরূপে উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে। তখন অবশ্যই আমরা জীবদেহ "নির্ম্মাণ" করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন না আসিতেও পারে; যদি না আসে, তাহা হইলে আমরা জীবদেহগঠনে কখনই সমর্থ হইব না। তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রুটি মাংস কোন কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয় ত পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা এখন এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, আর এখন জড় উপাদানের সেইরূপ সংযোজন-ঘটনাই জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়-শক্তির সাহায্যে জড় উপাদান হইতে জীবদেহের নির্ম্মাণচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সে যাই হউক, আমাদের পক্ষে নির্ম্মাণের অর্থ যোজনা মাত্র, এবং জীবই বল, আর নির্জ্জীবই বল, সর্ব্বত্রই নৈসর্গিক নিয়মে গঠনকার্য্য চলে, তাহার উপর আমাদের প্রভুত্ব কিছুই নাই। আমরা এক জায়গায় যোজনাকার্য্যে সমর্থ হইয়াছি, অন্যত্র এখনও হই নাই বা হইতে পারিব না; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নির্জ্জীবের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না।

আসল কথা, যাঁহারা জীবনী-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত বলিতে চাহেন, এবং জীবনীশক্তি নামে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহারা সকল সময়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা গোল আছে। মনুষ্যজাতির অধিকাংশ লোকে "সৃষ্টিকর্ত্তা" নামক এক সৃষ্টিছাড়া "কি-জানি-কি-ময়" পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালায় যখন একটা অদ্ভুত গোছের রহস্যাবৃত যোজনা-ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্যভেদ কুলায় না, অথচ মনের বোঝা ভারী হইয়া আসে, তখন মানুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগের অবসর পায়। জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বত্র এই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া, স্বয়ং চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত আরাম পায়; এবং যখনই কোন ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোন একটা অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্পিত প্রভুর শক্তিসঙ্কোচের আশঙ্কা করিয়া চীৎকারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতির রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার করিবার, অথবা প্রকৃতির নাটমন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার শক্তি ও অধিকার যখন মানুষের আছে; এবং সেই শক্তি জ্ঞানের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়াতেও যদি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুশক্তি সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে, এখনও হইবার কোন আশঙ্কা নাই। মাধ্যাকর্ষণ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আবিষ্ক্রিয়ায় ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিষ্কারে পুনঃ পুনঃ এই ব্যবধান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; এখন জীব ও

নির্জ্জীবের মধ্যে পর্দ্দাটা কেহ তুলিয়া ফেলিলেও বিশ্বব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

জীবনীশক্তি নামক কোন অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞান যে কয়টি শক্তির অস্তিত্ব অবগত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তি যে থাকিবে না, তাহার কোনই কারণ নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই যে সমস্ত জীবনীক্রিয়ার তথ্য বুঝান যাইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা একই শক্তির অভিনব মূর্ত্তির সহিত আমাদের নূতন পরিচয় স্থাপিত হইতেছে। তখন জীবনীক্রিয়ার জন্য যদি একটা অভিনব, অচিন্তিতপূর্ব্ব বা অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি বা শক্তির অভিনব মূর্ত্তি, কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি বা Vital force বা যাহা ইচ্ছা নাম দাও, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সেই শক্তির কার্য্যপ্রণালীর সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন নিয়মবন্ধনহীন অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

জীবন্ত জড়দেহে আর নির্জ্জীব জড়দেহে প্রধান বিভেদ কতকটা এইরূপ,—

(১) জীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাজ করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। চিমটি কাটিলেই মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে ; চোখের স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোক-তরঙ্গের ধাক্কা লাগিলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত পায়ের মাংস-পেশীকে নাড়িয়া দেয়। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায়। আজ বাহিরের শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল ; সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি স্নায়ুযন্ত্রে কোনরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় সেই ধাক্কার ফল সহসা প্রকাশ পাইল। পেশীযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূলে এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এবং এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে,

এমন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness জড়দেহে বর্ত্তমান দেখা যায় না। জড়দেহেও বাহ্য শক্তির সংঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ এরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কিরূপ তফাত, তাহা সহজে অল্প কথায় বুঝান যায় না। তবে জড়দেহের ও জীবদেহের এ বিষয়ে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ স্থলে তজ্জন্য বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ এই সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ্য জগৎ হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ আবশ্যকমত তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্যকমত বিলম্বে বা অবিলম্বে আত্মপ্রসার বা আত্মসঙ্কোচ বা আত্মবিকার সাধিত করিয়া, সেই আক্রমণ নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার নিরন্তর চেষ্টার নামই জীবন।

(২) জীবদেহের আত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নির্জীব জড় পদার্থ তৈয়ারি মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে বাহিরে সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটা মিছরীর দানা বা ফটকিরির দানা অথবা একখানা মেঘ বা কুয়াসা। আর জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতা হাওয়া আর জল আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নির্ম্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস মজ্জা স্নায়ু নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্ট ও বৃদ্ধি পায়।

(৩) জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ রক্ষা করে ও সন্তান উৎপাদন করে। এক খণ্ড জীবদেহ হইতে বহু খণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের সমুদয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

প্রধানতঃ জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ আশ্রয়ে জীবদেহে ও জড়দেহে প্রভেদ, উল্লিখিত তিনটি। প্রথম—জীবদেহ বাহ্য শক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়। দ্বিতীয়—জীবদেহ বাহিরের অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধিত করিয়া বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়—জীবদেহ কালে কালে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংশবিস্তার করে ও সন্তান সর্ব্বাংশেই পিতৃধর্ম্ম পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি, স্বতন্ত্র জীবধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, একটু তর্কের স্থল। জন্মের অর্থ, পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। উহা তৃতীয় লক্ষণের অন্তর্গত। মৃত্যু অর্থে সেই স্বাধীন জীবনের সমাপ্তি। স্পেন্সারের সংজ্ঞানুসারে বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যখন জীব সেই আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারে না, তখনই তাহার মৃত্যু। উন্নত জীবমাত্রেরই জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটে, সে দিন বাহির হইতে বিবিধ শক্তি আক্রমণ করিলেও সেই জীব সেই আক্রমণ নিবারণে চেষ্টা করে না; সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবমাত্রের না বলিয়া উন্নত জীবমাত্রের বলিলাম; কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহা আজিকার দিনে বোধ করি আর বলা চলে না। ওয়াইজমান (Weismann) স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; তাহারা প্রকৃতই অমরত্বের অধিকারী। জন্ম ও মৃত্যু গেল; থাকে ব্যাধি। জীব বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা চলে, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ফলে জীব এই ক্ষমতার বলে বাহ্য শক্তিকে আপনার জীবনের অনুকূল করিয়া লয়; এই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। আর যখন বাহ্য শক্তি জীবনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ নিবারণে জীব অংশতঃ অশক্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় যাহা জীবনের অনুকূল, ব্যাধির অবস্থায় তাহা প্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও ব্যাধিকে এই ভাবে দেখিলে জীবদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া বলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতাত্ত্বিক-গণের বিবেচনায় এই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোন মূলগত বিভেদ নাই। বংশবৃদ্ধি দেহপুষ্টিরই একটা অবান্তর ভেদ মাত্র, আধুনিক জীববিদ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। নিম্নতম পর্য্যায়ের জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ প্রায় অসাধ্য। এই সকল জীবের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে নির্ম্মিত। খাদ্য গ্রহণ সহকারে এই কোষটি অর্থাৎ জীবের দেহটি ক্রমে পুষ্টি পায় ও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিসহকারে একটা সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সমগ্র শরীরটি ভাঙ্গিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ নির্ম্মিত হইয়া দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। এক পিতৃপুরুষ আপনাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দুইটি সন্তানের উৎপাদন করে। পিতা বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র। কেবল নিকৃষ্ট জীবে কেন, উন্নত জীবের মধ্যেও এই প্রণালী বর্ত্তমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া শাখা বিস্তার করে। সেই শাখাকে ছেদন করিয়া পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে শাখাই আবার স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। ফলে বংশপুষ্টি ও আত্মপুষ্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি লক্ষণকে দুইটি মাত্র লক্ষণে আনা যাইতে পারে। এবং এই দুই লক্ষণ থাকায় জড়দেহে ও জীবদেহে ব্যবধান।

জড়ে ও জীবে এখন এই দুই বিষম ব্যবধান বর্ত্তমান। জগদীশচন্দ্রের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাৎ প্রথম ব্যবধান দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জীবদেহের এই বাহ্য শক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, এই সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জীবদেহের প্রত্যেক অংশেই ও প্রত্যেক অঙ্গেই বর্ত্তমান। এক খণ্ড মাংসপেশী লইয়া বা একটা স্নায়ুতন্ত্রী লইয়া তাহাতে চিম্‌টি কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে কোন পুস্তক উদ্ঘাটন করিলেই মাংসপেশীর ও স্নায়ুতন্ত্রীর এই সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। দুই চারিটার এখানে উল্লেখ করিব।

১। একখানা মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলেই উহা একটু পরে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সঙ্কোচ, তার পর ক্রমশঃ স্বভাবে ফিরিয়া আসে।

২। এই সঙ্কোচের একটা সীমা আছে। প্রবল ধাক্কায় সঙ্কোচমমাত্রা এই সীমায় পৌঁছে ; তার পর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না।

৩। একবারে প্রবল ধাক্কা না দিয়া সামান্য আঘাত দিলে খানিকটা সঙ্কোচ হয়। আবার আঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর একটু। পর পর আঘাতে সঙ্কোচ একটু একটু করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রথম আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে ; তৃতীয়ে আরও কম ; চতুর্থে আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌঁছিলে সঙ্কোচ আর বাড়ে না।

প্রথম আঘাতে যতখানি সঙ্কোচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে ততখানি ঘটে না, জীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ। এক সের বোঝার উপরে আর এক সের বোঝা স্পষ্ট ভার বাড়ায়। কিন্তু এক মণ বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপাইলে আর তেমন ভার বোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতন্ত্র ভাবে ভারী, কিন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি নগণ্য। আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলো কত উজ্জ্বল, কিন্তু সূর্য্যালোকে প্রদীপের সেই আলোর উজ্জ্বলতা কোথায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner's Law* ও Weber's Law† নামে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসূচক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই।

৪। আঘাতের পর আঘাত, সঙ্কোচের পর আর একটু সঙ্কোচ। কিন্তু এই আঘাতের পর আঘাত খুব তাড়াতাড়ি দিলে, সঙ্কোচন ব্যাপার আর বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশী একবারে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৫। আঘাত যখন খুব প্রবল হয়, তখন সঙ্কোচনের মাত্রা পরম বা চরম সীমায় পৌঁছে ; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সঙ্কোচলাভের পর মাংসপেশী আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন ধাক্কা দিলেও আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মাংসপেশীটা যেন প্রবল

* Gustav Theodor Fechner, 1801-1887—সম্পাদক

† Earnst Heinrich Weber, 1795-1878—সম্পাদক।

আঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই শ্রান্তির অপনোদন ঘটে; সঙ্কুচিত মাংসপেশী তখন ধীরে ধীরে স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মাংসপেশী বা স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিষ্ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বল, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বল, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই সাধারণ ধর্ম্ম, এবং বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তির অপনোদনও নিত্য ঘটনা। উত্তাপপ্রয়োগে বা মর্দ্দনে ক্লান্ত মাংসপেশীর স্বাস্থ্যলাভ ঘটে।

৬। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশী আবার স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃদু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘাতের পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাবপ্রাপ্তিতে ও স্বাস্থ্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহারই নাম ঔষধ।

ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখনও বা ঔষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহা ঔষধ। কোন দ্রব্য অবসাদক, কোন দ্রব্য উত্তেজক। আবার একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও বা উত্তেজক, কখনও অবসাদকের কাজ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ঔষধের ফল জন্মায়। হোমিওপাথির আচার্য্যেরা বলিবেন, যাহা মাত্রাধিক্যে বিষবৎ, তাহাই ন্যূন মাত্রায় পরম ভেষজ।

আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশীর উল্লিখিতরূপ বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিবিধ বাহ্য শক্তির প্রয়োগে মাংসপেশী ভিতর হইতে নানারূপে সাড়া দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে সমবেত ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের এবং গত মে মাসে লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমীপে যে নূতন আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড়দেহেরও ঠিক্ এইরূপ প্রতিক্রিয়া-শক্তি বর্ত্তমান আছে। আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশী বা স্নায়ুতন্ত্রী যেমন সাড়া দেয়, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে নির্জ্জীব জড় পদার্থ ঠিক সেই একই রকমে সাড়া দিতে পারে।

জীবদেহে ও নির্জ্জীব জড়দেহে প্রভেদ কিসে, জিজ্ঞাসা করিলে মোটামুটি এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে :—

১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির হইতে বৃদ্ধি পায়। জীবদেহ অপরিণত অপূর্ণগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অভ্যন্তরে গ্রহণ করে ও তাহাকে পূর্ণগঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায়; এবং বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনি বিভক্ত হইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। বিসদৃশ বস্তু দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্টি; উভয় ব্যাপারই মূলতঃ অভিন্ন; জীবদেহে উভয়ই বর্ত্তমান; জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই।

২। জড়দেহ বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকৃত হয় ও প্রতিক্রিয়াও উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাশুভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাহ্য শক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া সাড়া দেয়; এবং সেই বাহ্য শক্তিকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতে চায়। এই সাড়া দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা, এই আক্রমণ নিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। যখন উচিতমত সাড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রয়াস যখন সম্পূর্ণ সফল হয় না, তখম বাহ্য শক্তি জীবনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনকার অবস্থা ব্যাধি; এবং যখন সাড়া দিবার ক্ষমতা চিরতরে লোপ পায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ আর নিরস্ত হয় না, তখন মৃত্যু।

সংক্ষেপে এই দুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কিরূপ? বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা যে জড়ের একবারে নাই, এমন নহে। বায়ুমধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্ব্বতশীর্ষে তুষারশৈল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, চিনির সরবতে মিছরীর দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই জড়দেহের বৃদ্ধি ও জীবদেহের বৃদ্ধি (আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি), উভয়ের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে, উভয় বৃদ্ধিকে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে সাহস হয় না। সেইরূপ আবার বাহ্য শক্তির আহ্বানে নির্জ্জীব জড়ও যে সাড়া না দেয়, এমন নহে। বাত্যাবলে শৈলশিখর ভূমিসাৎ হয়, ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়; পর্ব্বতবক্ষে যুগব্যাপী নৈসর্গিক উৎপাতের চিহ্নসকল অঙ্কিত রহিয়া যায়। এ সমস্তই বিকার বা বিক্রিয়া;

কিন্তু জীবদেহে বিকার বা বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া আছে; তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নির্জ্জীব জড়ে খুঁজিয়া মেলে না। এই প্রতিক্রিয়াই জীবন, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার আংশিক বিলোপে ব্যাধি ও পূর্ণ বিলোপে মৃত্যু। জড়ের স্বাস্থ্য বা ব্যাধি বা মৃত্যু কাব্যের ভাষাতে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতে উহার এত দিন স্থান ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে বোধ করি, উহা বিজ্ঞানের ভাষাতেও স্থান পাইতে চলিল।

লোহাভস্মের মত নিতান্ত নির্জ্জীব জড় পদার্থের উপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা দিয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—

১। তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচালনক্ষমতা সহসা বাড়িয়া যায়। এক ধাক্কায় বাড়ে; আবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক পরিচালকতা ফিরিয়া আসে।

২। পরিচালনশক্তির বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, প্রবল ধাক্কায় পরিচালনমাত্রা সেই সীমায় পৌঁছে; তখন আর ধাক্কা দিলে বাড়ে না।

৩। ধাক্কার পর ধাক্কা দিলে প্রতি আঘাতে পরিচালনক্ষমতা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে ততটা নহে, তৃতীয় আঘাতে আরও কম ইত্যাদি।

৪। পুনঃ পুনঃ দ্রুতগতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়া বিরামের অবকাশ না দিলে পরিচালনশক্তি এক টানে আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাই জড় পদার্থের ধনুষ্টঙ্কার।

৫। প্রবল আঘাতে পরিচালনশক্তি একবারে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাই জড় পদার্থের ক্লান্তিলাভ। ইহাই উহার সাময়িক ব্যাধি, এবং এই ব্যাধির ফল স্থায়ী হইলেই মৃত্যু। আবার একটা নাড়া দিলে অথবা একটু গরম করিলে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রচলিত coherer যন্ত্রে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে এই ক্লান্তির অবস্থা ঘটে, নাড়া না দিলে সেই ক্লান্তির অপনোদন হয় না।

৬। নির্জ্জীব জড়দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কখনও অবসাদকের, কখনও বা উত্তেজকের মত কাজ করে। কোন দ্রব্যে সেই জড়দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোন দ্রব্যে কমাইয়া দেয়। কোনটা বিষের মত কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অন্তরায়

হয় ; কোন দ্রব্য ঔষধের কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে। একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে।

তাড়িতোর্ম্মির উত্তেজনায় জড় দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তিঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম যে জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তি ও স্বভাবপ্রাপ্তির অনুরূপ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। জগদীশচন্দ্র গত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের সম্মুখে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আবিষ্কারপরম্পরা সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটিতে আরও কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন ও রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এ দেশে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিজ্ঞানের গহন বনে যে নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীরের মত তিনি যাত্রাকালে মরুপৃষ্ঠে অম্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, "নাব্যা নদী"কে "সুপ্রতরা" করিয়া ও কুঠারাঘাতে "বিপিন"সকলকে "প্রকাশ" করিয়া পুরোমুখে অগ্রগামী হইতেছেন।

আঘাত পাইলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় ; স্নায়ুতন্ত্রীতে সঙ্কোচন-পরিবর্ত্তে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংসপেশীর সঙ্কোচন লাভের প্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রীর তাড়িত বিকার লাভের প্রণালী ঠিক্ একই নিয়মের অনুসরণ করে। শরীরবিদ্যাশাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ কোন শাস্ত্রেই নাই। একটা স্নায়ুর সূতার এক প্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই জানেন ; কিন্তু একটা তামার তারের এক প্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না।

আবার আঘাতপরম্পরায় স্নায়ুসূত্রে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরূপ আঘাত-পরম্পরায় তারমধ্যে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম পরিণামের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম পরিণাম ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। অতিশয় উত্তাপের বা অতিশয় শৈত্যের প্রয়োগে স্নায়ুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে না, উহা সকলেই জানিত। কিন্তু একটা নির্জ্জীব ধাতুময় তারের তাড়িত প্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে লোপ পায়, তাহা কেহ জানিত না। দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ে; আবার দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত। কিন্তু নির্জীব ধাতুপদার্থনির্ম্মিত একটা তার যে দ্রব্যগুণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, উহার প্রতিক্রিয়াশক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত? ঔষধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদকতা ও আফিমের অবসাদকতা, এত দিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণস্বরূপে প্রযুক্ত হইত। জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশূন্য হইবে না।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোকসম্পাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় কিরূপে আহত হয়, তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর ভিতরে স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ বিকার লাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িত তরঙ্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, দর্শনক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র; কিন্তু সেই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কিরূপ, তাহা শরীরবিদ্যাশাস্ত্র ঠিক জানে না; এখন সেই কাজকর্ম্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধ হয় বাহির হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু

বৈজ্ঞানিকসমাজ-শরীর সেই উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দিবে, জানি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্থিতিশীলতায় বৈজ্ঞানিকসমাজের কোথাও প্রতিদ্বন্দী নাই। কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকেন। নূতন সত্যকে সহসা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সত্য যতই মনোরম বেশে আসুক, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহাকে বাস দান করিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। জ্বলন্ত আগুনে উহার "বিশুদ্ধি" বা "শ্যামিকা" পরীক্ষা না করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্ম মাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার আকার কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতা মাত্র।

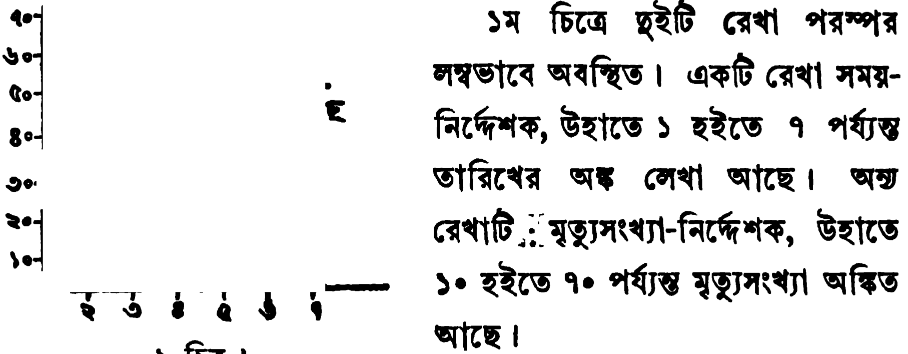
এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্যতর প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতির উত্তেজনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরামে বাহ্য জগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে; এই প্রয়োগকার্য্যে অবিরাম চেষ্টাই জীবন। জড়দেহেরও যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকার লাভ করিয়া সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্ততঃ একটা ব্যবধান তিরোহিত হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্ন রহিবে, তাহা বলা আবশ্যক। জীব, বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধি সাধন করিয়া স্বয়ং সংসার হইতে অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্ম্মের সংক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট জীবধর্ম্ম, তখনও জড়ের ও জীবের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত রাখিয়া সম্প্রদায়বিশেষকে আরও কিছু দিন সান্ত্বনা প্রদান করিবে। ('সাহিত্য', ভাদ্র ১৩০৮)

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার

কলিকাতা সহরের দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা প্রত্যহ খবরের কাগজে বাহির হয়। সাত দিনের সংবাদ একত্র করিয়া এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—

তারিখ।	মৃত্যুসংখ্যা।
১লা বৈশাখ	৫০
২রা "	৪৫
৩রা "	৬২
৪ঠা "	৭০
৫ই "	৩৫
৬ই "	৬০
৭ই "	৫৫

এই তালিকা দেখিলে কোন্ দিন কত লোক মরিয়াছে, জানা যায়। তালিকার পরিবর্ত্তে রেখা দ্বারা দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা-নির্দ্দেশ চলিতে পারে।



১ চিত্র।

১ম চিত্রে দুইটি রেখা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত। একটি রেখা সময়-নির্দ্দেশক, উহাতে ১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত তারিখের অঙ্ক লেখা আছে। অন্য রেখাটি মৃত্যুসংখ্যা-নির্দ্দেশক, উহাতে ১০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা অঙ্কিত আছে।

১০ অঙ্ক ও ২০ অঙ্কের মাঝের স্থানটুকু দশ ভাগে বিভক্ত করিলে ১১, ১২, হইতে ১৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক পাওয়া যাইতে পারে। চিত্র কদাকার হইবার ভয়ে ঐ সকল চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। পাঠকগণ মনে মনে ঐরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারেন।

১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত তারিখ-নির্দ্দেশক অঙ্কের উপরে ক,* খ ইত্যাদি ক্রমে ছ পর্য্যন্ত সাতটি বিন্দু রহিয়াছে। এক এক অঙ্কের উপর এক এক বিন্দু। ৩ অঙ্কের উপর গ, ৬ অঙ্কের উপর চ, ইত্যাদি।

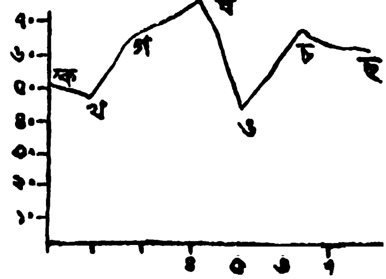
---

* "ক" চিহ্নটি চিত্রে উঠে নাই, উহা পঞ্চাশের ঘর ঘেঁষিয়া অবস্থিত এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।—সম্পাদক।

সকল বিন্দুর উচ্চতা সময়-নির্দ্দেশক রেখা হইতে সমান নহে। কোনটির উচ্চতা অধিক, কোনটির কম। ঘ-বিন্দু সর্ব্বোচ্চে আছে, আর ঙ-বিন্দু সকলের নিম্নে আছে। কোন্ বিন্দু কত উঁচুতে আছে, মাপিতে হইলে পাশের মৃত্যুসংখ্যা-নির্দ্দেশক রেখায় তাকাইলেই চলিবে। ক-বিন্দুর উচ্চতা ৫০; খ-বিন্দুর উচ্চতা ৪০ ও ৫০এর মাঝামাঝি অর্থাৎ ৪৫; গ-এর উচ্চতা ৬০এর একটু বেশী অর্থাৎ ৬২; ঘ-বিন্দুর উচ্চতা ৭০; ঙ-বিন্দুর উচ্চতা আবার ৩৫ মাত্র।

২য় চিত্রে বিন্দুগুলির মাঝ দিয়া একটা ভাঙা-চুরা বাঁকা রেখা টানা গিয়াছে।

এই রেখার অন্তর্গত কোন্ বিন্দু কত উচ্চে আছে দেখিলেই, কোন্ তারিখে কত লোক মরিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে।



২ চিত্র।

মনে কর, জানিতে চাই—৬ই তারিখে কত লোক মরিয়াছে। তারিখের অঙ্ক ৬এর উপরে রেখাস্থ চ-বিন্দু; চ-বিন্দুর উচ্চতা ৬০; স্থির হইল, ৬ই তারিখে ৬০ জন লোক মরিয়াছে।

তালিকার কাজ এইরূপ রেখা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। রেখায় একটা সুবিধা আছে, তালিকায় তাহা নাই। রেখার উঠা-নামা দেখিলেই মৃত্যুর হারের উঠা-নামা বুঝিতে পারা যায়—রেখাটি যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, মৃত্যুসংখ্যা কোন্ দিন কত বাড়িয়াছে, কোন্ দিন কত কমিয়াছে। ৪ঠা তারিখে মৃত্যুর হার একবারে ৭০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তার পরদিন একবারে সহসা ৩৫এ পতন। কলিকাতার যিনি বাসেন্দা, তাঁহাকে এইরূপ রেখা দেখাইলে, তিনি রেখার সহসা ঊর্দ্ধগতি দেখিলে আতঙ্কিত হইবেন; রেখার নিম্নে পতনে, তাঁহার আশ্বাসলাভ ঘটিবে।

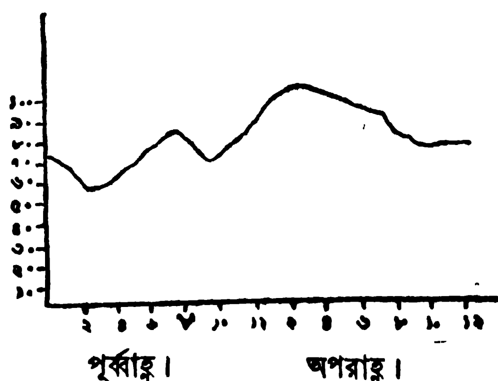
আর একটা উদাহরণ লওয়া যাক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে কোন্ বৎসর কত ছাত্র বি, এ, পাশ করে, তাহার তালিকা বাহির হয়। সেই তালিকার বদলে ৩য় চিত্র দেওয়া গেল। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, কোন্ বৎসরের পাশের ফল কিরূপ।

৮৫ হইতে ৯৫ পর্য্যন্ত ইংরাজী বৎসরের অঙ্ক; ৮৫ অর্থে ১৮৮৫, ৯৫ অর্থে ১৮৯৫। অন্য রেখায় ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত অঙ্ক উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা-নির্দ্দেশক। বক্র রেখাটি দেখিয়া কোন্ বার কত ছাত্র পাশ করিয়াছে, অক্লেশে বুঝা যায়। ৮৫ সালে পাশের সংখ্যা প্রায় ৩১০; ৮৬ ও ৮৭ সালে প্রায় সমান, সাড়ে চারি শতর কাছাকাছি; ৮৮ সালে কিঞ্চিৎ পতন, প্রায় পৌনে চারি শতে; ৮৯ ও ৯০ দুই বৎসর ক্রমিক উত্থান, ৮৯এ ৪০৯; ৯০এ ৪৩৫; ৯১ সালে একবারে অধঃপতন ৩০৩ সংখ্যায়। আবার ৯৫ পর্য্যন্ত ক্রমশ উত্থান। ৯৫ সালে উন্নতির সীমা প্রায় পাঁচ শত পর্য্যন্ত।



৩ চিত্র

কলিকাতা সহরের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব ২৪ ঘণ্টা পর পর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসর অন্তরে ছাত্রেরা বি, এ, পাশ করে। কিন্তু এমন বিবিধ ঘটনা আছে, যাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়; ক্ষণে ক্ষণে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন বায়ুর উষ্ণতা। বায়ুর উষ্ণতা চব্বিশ ঘণ্টায় সমান থাকে না, উহা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। বড় বড় মানমন্দিরে থার্ম্মমিটার দ্বারা এই অবিরাম পরিবর্ত্তনের হিসাব রাখা হয়। এবং সেই অবিরাম পরিবর্ত্তন রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। ৪র্থ চিত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতা কখন্ কিরূপ ছিল, দেখান হইতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ; বেলা ১২টা হইতে পররাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অপরাহ্ণ। সময়-নির্দ্দেশক রেখার পূর্ব্বাহ্ণের ও অপরাহ্ণের ঘটিকাচিহ্ন এইরূপে অঙ্কিত আছে। উষ্ণতা-নির্দ্দেশক অপর রেখায় উষ্ণতা-অংশ থার্ম্মোমিটারের ডিগ্রি ১০০ পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে।



৪ চিত্র।

রেখার উত্থান-পতনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কোন্ সময়ে বায়ুর উষ্ণতা কত ডিগ্রি ছিল। রাত্রি বারটার সময় উষ্ণতা প্রায় ৭৫ ডিগ্রি ছিল, ক্রমশ কমিয়া রাত্রি ৪টার সময় ৬০ ডিগ্রির নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশ উঠিয়া বেলা ৯টার সময় ৮০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। হয় ত সেই সময় একটু মেঘ করিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছিল। উষ্ণতা সেইরূপ কোন একটা কারণে বেলা ১২টার সময় আবার কমিয়া যায়। আবার ৪টা বেলার সময় উষ্ণতার মাত্রা ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অহোরাত্রমধ্যে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি চিত্রস্থিত বক্র রেখাটির উত্থান-পতনের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইতেছে।

যে কোন ঘটনার পরিবর্ত্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি এইরূপ রেখা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এইরূপ কতিপয় রেখা দ্বারা ধাতুপদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রেখাগুলির অর্থ কি, বুঝাইবার জন্য এতখানি ভূমিকা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন, তাঁহাদের নিকট ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন না, তাঁহাদের জন্য এই ভূমিকা আবশ্যক। নতুবা জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাগুলি তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য বোধ হইবে।

মাংসপেশীতে আঘাত করিলে উহার সঙ্কোচ ঘটে। আঘাতের ফলে একটু খাটো হয়। কতটুকু খাটো হয়, মাপিয়া দেখা চলে। আবার কতটা আঘাতে কতটুকু খাটো হয়—তাহাও মাপিয়া দেখা চলে। এই সঙ্কোচন চিরস্থায়ী হয় না; আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ ঘটে; আবার একটু পরে মাংসপেশী স্বভাবে ফিরিয়া আসে। একটা ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচবৃদ্ধি, আবার কিছু ক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি। শরীরবিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই সকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণে দিন কাটান। একটা ধাক্কায় কত ক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটিল, আবার কত ক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি হইল, ঘড়ি ধরিয়া ও মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া থাকেন; এবং যাহা দেখেন, তাহা রেখা টানিয়া অন্যকে দেখান।

এক খণ্ড মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলে, কত ক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটে ও কত ক্ষণে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা নিম্নের ৫ ক চিত্রে দেখান

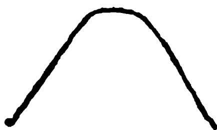
গেল। এই চিত্র Brodie's Experimental Physiology পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই চিত্রে ও পরবর্ত্তী চিত্রসকলে লম্বরেখা দুইটি আর অনাবশ্যক বোধে দেওয়া যায় নাই। পাঠকগণ মনে মনে কল্পনা করিয়া লইবেন, সেই রেখাদ্বয় যেন চিত্রে অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে। একটি রেখা ভূমিগত—উহা কালনির্দ্দেশক। অপরটি উহার উপর লম্বরূপে দণ্ডায়মান—উহা সঙ্কোচের মাত্রানির্দ্দেশক।



৫ ক চিত্র।

এ চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ধাক্কা পাইয়া সঙ্কোচ ক্রমে বাড়িতেছে; পূর্ণমাত্রায় উঠার পর আবার সঙ্কোচ কমিয়া গিয়াছে। মাংসপেশী ক্ষণিকের জন্য বিকৃতি-লাভের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা বা তদনুরূপ একটা ধাক্কা পাইলে, ধাতুপদার্থ বিকৃতি লাভ করে; উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি সহসা বাড়িয়া যায়। একটা ধাক্কায় ক্ষণেকের মত বাড়ে মাত্র; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই পরিচালন-শক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসও রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখান যাইতে পারে। জগদীশচন্দ্রও তাহা দেখাইয়াছেন। ৫ খ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।



৫ খ চিত্র।

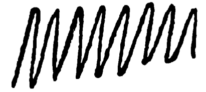
মাংসপেশীর অবস্থার উত্থান-পতন, আর ধাতু-পদার্থের অবস্থার উত্থান-পতন, উভয়ের সাদৃশ্য কত অদ্ভুত, তাহা ৫ (ক) ও ৫ (খ), দুই চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পরবর্ত্তী চিত্রগুলির বোধ করি, বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। পাঠক মহাশয় আপনি বুঝিয়া লইবেন। কয়েক জোড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে প্রথম চিত্র ক-চিহ্নিত ও দ্বিতীয় চিত্র খ-চিহ্নিত করা গেল। ক-চিহ্নিত চিত্রগুলি শরীরবিজ্ঞান-শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; এই সকল চিত্রের কোনটায় মাংসপেশীর, কোনটায় বা স্নায়ুসূত্রের বিকারপ্রাপ্তি দেখান হইয়াছে। খ-চিহ্নিত চিত্রগুলি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের অঙ্কিত। ধাতুচূর্ণে, ধাতুর তারে ধাক্কা দিয়া, মোচড় দিয়া, তাড়িত তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহাতে বিকার উৎপাদন করিলে, সেই বিকারের কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কিরূপ উত্থান-পতন ঘটে, তাহা এই সকল চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার ক-এর সহিত খ-এর

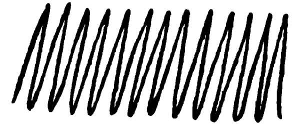
সাদৃশ্য কত বিস্ময়কর। মাংসপেশী বা স্নায়ুসূত্রের মত জীবন্ত দ্রব্য যে নানাবিধ বিকার লাভ করে, তাহা সকলেই জানিত; কিন্তু নির্জীব ধাতুচূর্ণ বা ধাতুতন্ত্রীতে যে এমন বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ জানিত না। এবং মাংসপেশীর বা স্নায়ুসূত্রের বিকারলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তির সহিত নির্জ্জীব ধাতুপদার্থের বিকারলাভের ও স্বভাবপ্রাপ্তির এত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বা কে জানিত? সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, যে দ্রব্য পেশীর পক্ষে বা স্নায়ুর পক্ষে মাদক বা উত্তেজক, তাহাই আবার ধাতুপদার্থের পক্ষেও মাদক ও উত্তেজক; যাঁহা সজীব পদার্থের পক্ষে অবসাদক, নির্জ্জীবের পক্ষেও তাহাই অবসাদক।

এখন আমরা এক এক জোড়া চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব ও উহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিব। ক চিত্রের সহিত খ চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া, সজীবের ও নির্জ্জীবের সাদৃশ্য পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

৬ ক।—এক খণ্ড মাংসপেশীতে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা পড়িলে উহার সঙ্কোচ কিরূপে বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখান হইতেছে।


৬ ক চিত্র।

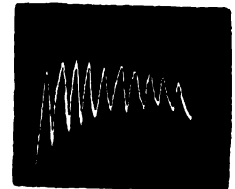
৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা পড়িলে উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি কিরূপ বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখান হইতেছে।


৬ খ চিত্র।

৭ ক।—পুনঃ পুনঃ আঘাতে মাংসপেশী যেন ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম প্রথম আঘাতে যতটা সঙ্কোচ হইতেছিল, পরের আঘাতে আর ততটা সঙ্কোচ ঘটে না। সঙ্কোচের মাত্রা পর পর আঘাতে কমিয়া আসিতেছে। রেখার উত্থান-পতনের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে; তাহার অর্থ—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় মাংসপেশীরা ক্রমশঃ যেন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।


৭ ক চিত্র।

৭ খ।—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা পাইয়া ধাতুপদার্থও ক্রমশঃ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।


৭ খ চিত্র।



৮ ক চিত্র। ৯ ক চিত্র।

৮ ক।—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় পেশীর ক্রমশঃ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ ক চিত্রেরই অনুরূপ।

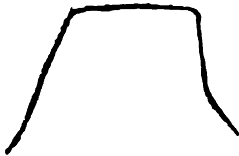
৮ খ।—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ধাতুদ্রব্যের ক্রমশঃ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ খ চিত্রের অনুরূপ।



৮ খ চিত্র। ৯ খ চিত্র।

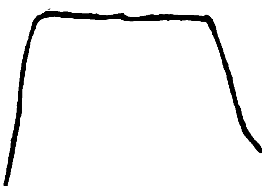
৯ ক।—প্রথমেই প্রবল আঘাত পাইয়া মাংসপেশী যেন একই আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে। তার পরের আঘাতে যেন অতি ক্ষীণভাবে সাড়া দিতেছে। আর পূর্ব্বের মত প্রতিক্রিয়ার যেন ক্ষমতা নাই। তার পর আঘাত থামিলে, ক্রমশঃ স্বভাবপ্রাপ্তি ও অবসাদলোপ।

৯ খ।—ধাতুদ্রব্যের অবস্থাও তদনুরূপ—প্রবল আঘাতে ধাতুপদার্থও যেন কাতর ও অবসন্ন; পরের আঘাতগুলিতে তাহার আর পূর্ব্বের মত সতেজে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা নাই।



১০ ক চিত্র।

১০ ক।—প্রথম আঘাত এত প্রবল যে, সেই আঘাতে মাংসপেশী একবারে সম্পূর্ণভাবে অবসন্ন; এবার অবসাদের মাত্রা পূর্ণ; আর আঘাতে সাড়া দেয় না। সঙ্কোচ-নির্দ্দেশক রেখাটি চরম উন্নতি লাভ করিয়া একবারে সোজা চলিয়াছে; আঘাত সত্ত্বেও, উত্তেজনা সত্ত্বেও, কিছু কাল উহার আর উত্থান-পতন নাই। মাংসপেশীর এই পূর্ণ অবসাদের অবস্থায় ধনুষ্টঙ্কার ঘটে। ধনুষ্টঙ্কারে মাংসপেশীর সঙ্কোচনমাত্রা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; তখন উহা এরূপ কাঠিন্য ও জড়তা লাভ করে যে, আর কোনরূপে কোন উত্তেজনায় উহাকে কোমল করা যায় না; উহার জড়তার অপনোদন হয় না। আবার কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের পর এই শ্রান্তি দূর হয়; তখন উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাকে রোগমুক্তি বলা যাইতে পারে। উত্তাপপ্রয়োগ, ঔষধপ্রয়োগ প্রভৃতি রোগমুক্তির অনুকূল।

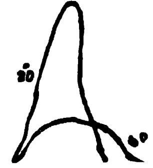


১০ খ চিত্র।

১০ খ।—ধাতুদ্রব্যের পূর্ণ অবসাদ। প্রবল আঘাতে ধাতুদ্রব্যেরও আর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকে না। উহার পরিচালনশক্তি একবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন উত্তেজনায় সে শক্তির আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাড়িতোর্ম্মি

প্রদর্শনের জন্য নির্ম্মিত Coherer যন্ত্রে ধাতুদ্রব্যের এই অবসাদপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। বিশ্রাম লাভের পর, অথবা উত্তাপ প্রয়োগে এই অবসাদের দশা আবার দূর হয়।

১১ ক।—উত্তাপে অবসাদ নষ্ট করে, উত্তাপ যোগমুক্তির অনুকূল। ১১ ক চিত্রের অন্তর্গত উভয় রেখায় ইহা দেখান হইয়াছে। ৩০ ডিগ্রি উষ্ণতায় মাংসপেশী যেন সতেজে সাড়া দিতেছে; উত্তেজনা পাইবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হইতেছে; আবার ক্ষণমাত্রেই স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। আর ৬ ডিগ্রি মাত্র গরমে মাংসপেশী যেন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ; উত্তেজনা তেমনই; কিন্তু উহার সঙ্কোচ-মাত্রা কত কম। ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ লাভ করিয়া আবার ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতেছে।



১১ ক চিত্র।

উত্তাপের এই অবসাদ-নাশক শক্তি সকলেই জানেন। দারুণ শীতে শরীর অবসন্ন হয়; উত্তাপে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। পরিশ্রমে মাংসপেশী শ্রান্ত ও অবসন্ন হইলে, উষ্ণতাপ্রয়োগে উহার অবসাদ দূর হয়। মাংসপেশীর স্ফূর্ত্তিলাভের জন্য ডাক্তারদের ফোমেণ্টেশন্ প্রয়োগের ব্যবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ।

১১ খ।—এখানেও দুইটি রেখা; একটিতে ধাতুদ্রব্য গরম—২১ ডিগ্রি, অন্যটিতে ধাতুদ্রব্য ঠাণ্ডা—২ ডিগ্রি মাত্র। উভয় রেখায় কত তফাত। গরমে কত তেজ; ঠাণ্ডায় কত অবসাদ।

১১ খ খ।—এই চিত্রের তিনটি রেখা ধাতুদ্রব্যের উষ্ণতার মাত্রাভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দেখাইতেছে। প্রথম রেখায় ০ ডিগ্রি, দ্বিতীয়টিতে ৪০ ডিগ্রি ও তৃতীয় রেখায় ১০০ ডিগ্রি গরমে ধাতুর অবস্থা কিরূপ থাকে, বুঝা যাইতেছে। ০ ডিগ্রির অপেক্ষা ৪০ ডিগ্রিতে উত্তেজনা যেন কিছু বাড়িয়াছে; আবার ১০০ ডিগ্রিতে যেন একটু অবসন্ন হইয়াছে। অল্প উত্তাপে উত্তেজনা বাড়ে; কিন্তু উত্তাপের আতিশয্য আবার উত্তেজনার বদলে অবসাদ উৎপন্ন করে।



১১ খ চিত্র।



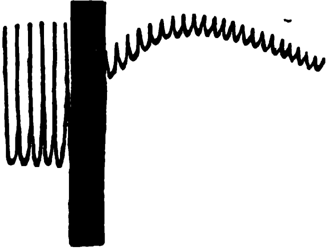
১১ খ খ চিত্র।

১২ ক।—এই চিত্র দেওয়া গেল না। আমোনিয়া অতি পরিচিত উগ্রগন্ধি বাষ্পীয় পদার্থ। আমোনিয়া প্রয়োগে শরীরের কিরূপ অবসাদ-নাশ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই জানেন।



১২ খ চিত্র।

১২ খ।—এই চিত্রে ধাতুদ্রব্যের উপর আমোনিয়ার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বামের রেখার উত্থান-পতনে আমোনিয়া প্রয়োগের পূর্ব্বতন অবস্থা ও ডাহিনের রেখার উত্থান-পতনে আমোনিয়া প্রয়োগের পরবর্ত্তী অবস্থা দেখান হইতেছে। নির্জ্জীব ধাতুপদার্থ আমোনিয়া প্রয়োগে যে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা কে জানিত।



১৩ ক চিত্র।

১৩ ক।—বিষপ্রয়োগে স্নায়ুসূত্রের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি এই চিত্রে দেখান হইতেছে। যাহাতে অস্বাভাবিক অবসাদ উৎপাদন করে, তাহাই বিষ। ক্লোরোফর্ম্মের অবসাদক ক্রিয়া সকলেই জানেন। অতিমাত্রায় প্রয়োগে স্নায়ুযন্ত্র অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় জীবনহানি পর্য্যন্ত ঘটে। এই চিত্রের বামাংশে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগের পূর্ব্বে স্নায়ুসূত্রের স্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থা ও দক্ষিণের অংশে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগের পরে অবসন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্নায়ুসূত্রে আঘাত করিলে উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে; দ্রুত প্রবাহে স্নায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার ও ক্ষীণ প্রবাহে উহার অবসন্ন অবস্থার সূচনা করে। ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে স্নায়ু ক্রমে অবসন্ন হয়; উহার আর দ্রুত প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। চিত্রে তাহাই দেখান হইতেছে।



১৩ খ চিত্র।

১৩ খ।—ধাতুপদার্থে বিষের ক্রিয়া। বামাংশে বিষ প্রয়োগের পূর্ব্বের ও দক্ষিণের অংশে বিষ প্রয়োগের পরের অবস্থা দেখান হইতেছে।

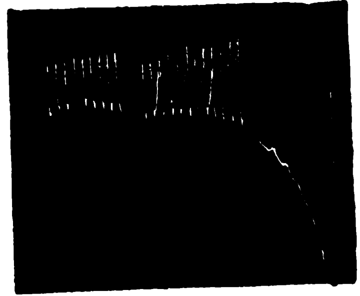
১৪ খ।—এই চিত্রে তিনটি রেখা ধাতুর ত্রিবিধ অবস্থার জ্ঞাপক। প্রথম রেখায় বিষ প্রয়োগের পূর্ব্বতন অবস্থা—ধাতুপদার্থ এখন স্বভাবস্থ; উত্তেজনা পাইলেই সতেজে সাড়া দেয়। দ্বিতীয় রেখায় বিষ প্রয়োগের পরবর্ত্তী দশা—নির্জ্জীব ধাতু এখন সজীবের মত

অবসন্ন—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ। তৃতীয় রেখা ঔষধ প্রয়োগের পর—ঔষধ প্রয়োগে অবসাদ দূর হইয়াছে; ধাতু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে। ১৪ ক চিত্র দেওয়া আবশ্যক হয় নাই।



১৪ খ চিত্র।

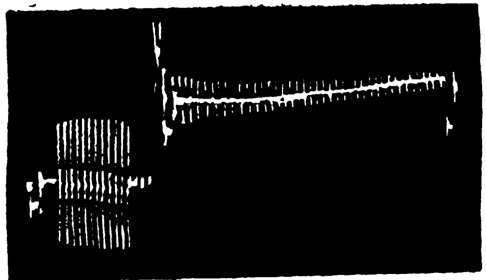
১৫ খ।—এখানেও তিনটি রেখা। প্রথম রেখা ধাতুদ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞাপক। অল্পমাত্রায় উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োগে ধাতুদ্রব্য কিরূপে উত্তেজিত হয়, তাহাও দ্বিতীয় রেখায় বুঝা যাইতেছে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগে ঔষধও কিরূপে বিষবৎ হয়, উত্তেজনা কিরূপে অবসাদে পরিণত হয়, তাহা দেখা যাইতেছে। আফিম, বেলাডোনা, ইপিকাকুয়ানা প্রভৃতি দ্রব্য কিরূপে মাত্রাভেদে স্নায়ু-যন্ত্রের উপর, কখনও ঔষধের, কখনও বিষের কাজ করে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; স্বতন্ত্র চিত্রে তাহা দেখান গেল না।



১৫ খ চিত্র।

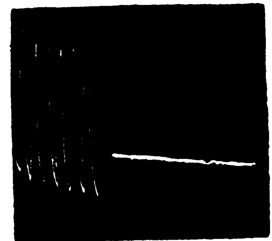
১৬ ক।—স্নায়ুযন্ত্রের উপর আফিমের ক্রিয়া দেখান হইয়াছে। বামাংশে প্রয়োগের পূর্ব্বতন, দক্ষিণাংশে পরবর্ত্তী ক্রিয়া দেখান হইয়াছে।

১৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে আফিমের তদনুরূপ ক্রিয়া।



১৬ ক চিত্র।

জড়দেহে ও জীবদেহে যে কতটা সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত চিত্রগুলি দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। এই সাদৃশ্যের বিষয় এত দিন কেহ জানিত না। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এই সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটা নূতন রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া



১৬ খ চিত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা কোন্ নূতন দেশে উপস্থিত হইবেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না। জীবদেহের মত জড়দেহ বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জীবদেহের ন্যায় জড়দেহ বিষপ্রয়োগে অবসন্ন হয়, আবার ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই। জড়েরও জীবন আছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অনেক বড় বড় পণ্ডিত মীমাংসা অসাধ্য বলিয়া একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন্ পথে চলিলে এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশেও এ পর্য্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরা সেই সমস্যার পূরণে কত দূর সফল হইবে, তাহার নির্দ্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তমোময় রহস্যাবৃত প্রদেশাভিমুখে একাকী অগ্রণী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতৃভূমির বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছেন ;—তাঁহার জননীর আশীর্বচন তাঁহার জয়যাত্রায় রক্ষাকবচ হউক। ('বঙ্গদর্শন,' আশ্বিন ১৩০৮)

জড় ও চৈতন্য

জড় ও চৈতন্য, এই দ্বিবিধ পদার্থ আমাদের উপলব্ধির বিষয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আমরা নিত্য অনুভব করিতেছি। বলা বাহুল্য, জড় শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে উহার অর্থ অন্যরূপ।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, জড় পদার্থ আমাদের বাহিরে এবং চিৎ পদার্থ আমাদের অন্তরে। যেমন ইট কাঠ, হাতী ঘোড়া—এমন কি, আমার নিজের শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়। আর আমার সুখ দুঃখ, শোক তাপ আমার অন্তরের প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রত্যক্ষ বলিলে হয় ত ভুল হয়, আমার উপলব্ধির বা অনুভবের বিষয় বলিলে বোধ করি ভুল হইবে না। আর একটা কথা, জড় পদার্থ দেশব্যাপী,—ইট কাঠ, হাতী ঘোড়া, সমস্তই খানিকটা জায়গা লইয়া থাকে। কিন্তু সুখ দুঃখ,

শোক তাপের জন্য বাক্স বা সিন্দুকের দরকার হয় না। উহাদের দেশব্যাপিতা নাই।

আরও একটা কথা। আমার চৈতন্য স্পষ্টতঃ আমার অনুভবগম্য; আমার সুখ দুঃখ, শোক তাপ আমি স্বয়ং অনুভব করি। কিন্তু তোমার চৈতন্য, তোমার সুখ দুঃখ শোক তাপের অস্তিত্ব আমার অনুমান মাত্র। তোমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া আমি উহাদের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র করিয়া লই, উহা আমার নিজের উপলব্ধির বা প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না।

এই জড়ের সহিত এই চৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন—জড় আছে, চৈতন্য নাই বা চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; উহা নির্জ্জলা জড়বাদ, ইংরাজিতে বলে materialism। কেহ বলেন—চৈতন্য আছে, কিন্তু জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই; ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদ—ইংরাজি নাম idealism বা এইরূপ একটা কিছু। অপরে বলেন—উভয়েই স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত। জড়ও আছে, চৈতন্যও আছে, উভয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

প্রথম দুই মতকে আমরা অদ্বয়বাদ—ইংরাজি monism বলিব। কেন না, উহাতে এক ভিন্ন দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই:—অদ্বয় জড়বাদ অথবা অদ্বয় চৈতন্যবাদ। তৃতীয় মতকে দ্বয়বাদ—ইংরাজি dualism বলিব; কেন না, এই মতে উভয়ই স্বাধীন সত্তাবান্।

আবার প্রথম ও তৃতীয়, এই দুইকে জড়বাদের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। প্রথম মত বিশুদ্ধ জড়বাদ; তৃতীয় মত অর্থাৎ যে মতে জড় ও চৈতন্য, উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, উহা বিশিষ্ট জড়বাদ—কেন না, ইহাতেও ত জড়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

আজি কালি অথবা কিছু দিন পূর্ব্বে, এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রথম মতের বা নির্জ্জলা জড়বাদের কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল। বুকনারের* মত জর্ম্মান পণ্ডিত এই মত লইয়া কোলাহল করিতেন। ইহার অর্থ, জড়ই স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন। চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম মাত্র, প্রক্রিয়াগুণে চিনিতে যেমন মাদকত্ব উৎপন্ন হয়, প্রক্রিয়াগুণে সেইরূপ জড়ে চৈতন্য

* Friedrich Karl Christian Ludwig Buchner, 1824-1899.

—সম্পাদক।

জন্মে। অধ্যাপক টিণ্ডাল* ও অধ্যাপক হেকেল† সময়ে সময়ে এমন কথা কহিতেন, যাহাতে তাঁহাদিগকেও এই মতাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ জন্মিত। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বৃহস্পতি, চার্ব্বাক প্রভৃতি হয় ত এই মতাবলম্বী ছিলেন; হয় ত,—কেন না, তাঁহাদের নামে প্রচারিত যে দুই চারিটা বচন প্রচারিত আছে, তাহা হইতে এই কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা কঠিন। ফলে এই বিশুদ্ধ জড়বাদের কোন কালে বিশেষ প্রতিপত্তি ঘটে নাই; সে কালেও ছিল না, এ কালেও নাই। আর আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র এক রকম বিদ্রোহী হইয়া এই মতকে অবজ্ঞা সহকারে ত্যাগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

সে কালের ও বোধ করি এ কালের অধিকাংশ পণ্ডিতই দ্বয়বাদী; অর্থাৎ তাঁহারা জড় ও চৈতন্যের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। তবে উভয়ের স্বরূপ কি ও সম্বন্ধ কি, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম, স্বরূপের কথা। আমরা জড়ের যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখি, উহাই কি উহার স্বরূপ? বলা কঠিন। কেন না, আমাদেরই মানসিক অবস্থা-ভেদে, জড়ের মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। জাগরণে যে মূর্ত্তি থাকে, তন্দ্রার অবস্থায় সে মূর্ত্তি দেখি না; আমি যে রঙ দেখি, রঙ্‌কানা লোকে সে মূর্ত্তি দেখে না। সুস্থ অবস্থায় যে মূর্ত্তি দেখি, রোগে বা নেশায় সে মূর্ত্তি দেখি না। সম্ভবতঃ আমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে যে মূর্ত্তি দেখি, তুমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে ঠিক সেই মূর্ত্তি দেখ না। আবার জড়জগৎ আমাদেরও যেরূপ প্রত্যক্ষ, কীট পতঙ্গেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মানুষে ও কীটে এত তফাত যে, উভয় প্রাণীর নিকটে জগতের মূর্ত্তি এক রকম হওয়া সম্ভব নহে। আমার দুইটা চোখ, কোন কোন কীটের হাজার চোখ। আমার নিকট জড়জগতের যেরূপ মূর্ত্তি, সহস্রলোচন কীটের নিকট সে মূর্ত্তি হইতেই পারে না। কোন্ মূর্ত্তি, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ?

কেহ হয় ত বলিবেন, পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মনুষ্যে যে মূর্ত্তি দেখে, তাহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ। আপত্তি

* John Tyndall, 1820-1893.—সম্পাদক।

† Ernst Heinrich Haeckel, 1834-1919.—সম্পাদক।

উঠিবে—কেন ? মানুষের অপেক্ষা উন্নত পর্য্যায়ের কোন প্রাণী যদি থাকে বা কালে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট জড়ের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইতে পারে ; সে তোমার আমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিকে প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিবে কেন ? আবার মানুষের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি কে ? তুমি ? আমি মানি না। আমি ? তুমি মানিবে না।

ফলে জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা হতাশ হইয়া স্বীকার করেন, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানি না বা জানিবার উপায়ও নাই। তবে একটা স্বরূপ আছে, উহা অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয়, উহা noumenon ; আর যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ও জ্ঞাত, উহা phenomenon. প্রত্যক্ষের পশ্চাতে, অন্তরালে, অভ্যন্তরে এই অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ আছে, ইহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ, উহাই substance, আসল জড়। আমরা যাহা দেখি, তাহা আসল নহে—আসলের বিকৃতি মাত্র।

চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বন্দ্ব উঠে। আমরা চৈতন্যের যে মূর্ত্তি দেখি, উহাই কি চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ ? না, উহার ভিতরে কোন অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় প্রকৃত স্বরূপ—substance আছে—যাহা বাহিরে সুখদুঃখময় শোকতাপময় মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় ? অনেকেই বলেন, চৈতন্যেরও স্বরূপ অজ্ঞেয়, উহারও ভিতর একটা অনির্দ্দেশ্য substance আছে, তাহাই noumenon, খাঁটি জিনিস ; যাহা আমরা দেখি, তাহা phenomenon মাত্র।

এই গেল স্বরূপ লইয়া কথা। তার পর দ্বিতীয় কথা, সম্বন্ধ লইয়া। জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ আছে। অনেকেই স্বীকার করেন—আছে। প্রমাণ—আফিম। আফিম খাইলেই যখন জগতের মূর্ত্তিটা বদলাইয়া যায়, তখন আর প্রমাণান্তরে দরকার কি ? আফিম ঘোরতর জড়পদার্থ—উহা যখন মানসিক বিকার উৎপন্ন করিয়া চেতনাকে বিকৃত করে—এমন কি, চেতনাকে লুপ্ত পর্য্যন্ত করে, তখন জড়পদার্থ চৈতন্যকে বিকৃত করিতে পারে, ইহাতে সংশয় কি ? আবার আমরা যখন ইচ্ছাপ্রয়োগে খাই, শুই, নাচি, গাই, তখন আমাদের চৈতন্যও যে জড়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাও স্বীকার্য্য।

স্বীকার্য্য হইলেও সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, উহা কেবল সমবায়সম্বন্ধ মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে বলে association;—অর্থাৎ জড়ে যখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়, চৈতন্যে তখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়। সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বটে, কিন্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধ নহে। জড়ে কেবল জড়কেই বিকৃত করিতে পারে, চৈতন্যে কেবল চৈতন্যকেই বিকৃত করে। আফিমে মস্তিষ্কের বিকার হয়, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ। চৈতন্যের বিকার মস্তিষ্কের বিকারের আনুষঙ্গিক মাত্র। উহা মস্তিষ্কের বিকারের ফল বা কার্য্য নহে।

যাক, সে সকল তর্ক এখানে তুলিয়া প্রয়োজন নাই। জড় ও চৈতন্য, উভয়ই স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ববান্; উহাদের স্বরূপ ও সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন। এই মতকে দ্বয়বাদ বলিয়াছি, অথবা ইহাকে বিশিষ্ট জড়বাদ বলা যাইতে পারে; কেন না, জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলে এই মতের আচার্য্যেরা লাঠি লইয়া আসেন।

প্রাচীনের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ দ্বয়বাদী ছিলেন। তাঁহারা জড় ও চৈতন্য, উভয়েরই স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তবে বলিতেন, উহাদের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞেয়, অনির্দ্দেশ্য। চৈতন্যের substance আছে; উহা অজ্ঞেয় পুরুষ। জড়েরও substance আছে; উহা অজ্ঞেয় প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতির সম্মুখীন হইলে প্রত্যক্ষ phenomenonএর বিকাশ হয়।

এই পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব আধুনিক প্রচলিত সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় মিশিয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও শাক্ত শাস্ত্র পুরুষ ও প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া, তাঁহাদের উপাস্য দেব-দেবীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও কখনও বৈদান্তিকের ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে বৈদান্তিকের ভাষার আড়াল হইতে সাংখ্যভাব উঁকি মারিতে থাকে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে এই দ্বয়বাদীর সংখ্যা কম নহে; বোধ হয়, অধিকাংশই এই দলভুক্ত। বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধেও সেই কথা। জড় ও চৈতন্য, উভয়ই বর্ত্তমান; উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা হয় ত জানি না। উভয়ের সম্বন্ধ কি, বলা কঠিন। কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান্।

বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টানধর্ম্ম এই দ্বয়বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়জগৎ সত্তাবান্; নতুবা জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যকতা থাকে না। জড়জগৎ আছে। এমন দিন ছিল, তখন জড়জগৎ ছিল না, এক দিন সহসা ইহার সৃষ্টি হইল; যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি জড়জগতের বহিঃস্থিত এক **ব্যক্তি**; তিনি **খোদা**।

ইংরাজি God ও আমাদের 'ঈশ্বর,' অভিধানের প্রমাণ সত্ত্বেও সমানার্থক নহে। সেই জন্য এ স্থানে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার না করিয়া গডের বাঙ্গলায় খোদা শব্দ ব্যবহার করিলাম।

জড়জগৎ নিয়মবদ্ধ; সেই ব্যক্তি এই নিয়মের বিধানকর্ত্তা বা বিধাতা।

জড়জগতের যন্ত্রে একটা ব্যবস্থা দেখা যায়। ঘটিকাযন্ত্রে একটা যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারী একটা বিশেষ নির্ম্মাণের প্রণালী আছে, জগৎ-যন্ত্রেও সেইরূপ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটা বিশেষ গঠনপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইহাই জগৎযন্ত্রের design, এই প্রণালী যাঁহার মন হইতে উদ্ভূত, তিনিই designer নির্ম্মাণক বা ব্যবস্থাপক—তিনি খোদা।

গঠনপ্রণালী হইল design; আর সেই designএর একটা উদ্দেশ্য আছে; কি উদ্দেশ্য, বলা কঠিন, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে—উহা purpose; একটা Great Purpose—বড় হাতের G ও বড় হাতের P যুক্ত;—যাঁহার এই উদ্দেশ্য, তিনি খোদা।

এই উদ্দেশ্যের সহিত মানবের নৈতিক জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অস্তিত্বের বোধ করি, প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবস্থার—moral orderএর প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতা খোদা, তিনিই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের বিচারক ও দণ্ড-পুরস্কারের বিধাতা।

জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতারও অস্তিত্বে টান পড়ে। সেই জন্য খ্রীষ্টানধর্ম্ম জড়জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য। খ্রীষ্টানেরা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কাজেই ইহারা জড়বাদী, materialist।

আমাদের হিন্দুসমাজের মধ্যে এক সম্প্রদায় খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে এই খোদাকে ধার করিয়া আনিয়াছেন; এবং বৈদিক মন্ত্রে তাঁহার শুদ্ধি বিধান করিয়া চৈতন্যবাচী ব্রহ্ম নামটি উপনিষৎ ও বেদান্ত হইতে আ-হরণ

করিয়া, সেই বিজাতীয় ম্লেচ্ছটির নূতন নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু নামে বর্ণ বদলায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও এই দ্বয়বাদেরই বোধ করি প্রাধান্য। তবে এ কালে জড়পদার্থের সহিত গতির সম্বন্ধ লইয়া কতকটা আলোচনা হইয়াছে। বহু দিন হইল, লর্ড কেলবিন্* একটা অনুমান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। জড়পরমাণু আকাশে আবর্ত্ত মাত্র। আবর্ত্ত একরূপ গতির প্রকারভেদ; কাজেই জড়ের সমুদয় ধর্ম্ম কেবল আবর্ত্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ গতিবিশেষের ধর্ম্ম মাত্র। ইহা সেই বিখ্যাত vortex theory; সোনা রূপা, কয়লা গন্ধক ইত্যাদি স্থূল জড়ের পরমাণু আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই আকাশও ত আবার জড়; না হয় সূক্ষ্ম জড়, কিন্তু জড়। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, আকাশ কোন সূক্ষ্মতর জড়ের কোনরূপ গতিবিশেষে উৎপন্ন। হয় হউক, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা জড়ের ভিত্তি পাওয়া যাইতেছে, সেই জড়ের স্বরূপ কি?

যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখেন, তাঁহারা বলেন, স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক, জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? আমাদের সম্বন্ধ গতির সহিত। ইন্দ্রিয়যোগে যাহা মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা জড় নহে, তাহা গতি; কোনরূপ ধাক্কা, কোনরূপ ঢেউ, কোনরূপ ক্রিয়া। সুতরাং যাহা আমরা মুখ্যভাবে অনুভব করি, তাহা জড় নহে, তাহা গতি মাত্র। গতি কাহার, গতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এ প্রশ্ন নাই বা তুলিলাম। আর নিরবলম্ব নিরাশ্রয় গতিই কি একবারে অসম্ভব ব্যাপার? বিখ্যাত বস্‌কোবিচ্† ত জড় পরমাণুকে ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বীকৃত অংশহীন ও পরিমাণহীন বিন্দুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড‡ ত একবার জড়কে জড়ত্ববর্জ্জিত শূন্য দেশের (spaceএর) বিকৃতি মাত্র কল্পনায় সাহসী হইয়া নূতন জড়বিজ্ঞান নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

---

* 1st. Baron Kelvin—William Thomson, 1824-1907.—সম্পাদক।

† Ruggiero Giuseppe Boscovich, 1711-1787, ইতালীয়।—সম্পাদক।

‡ William Kingdon Clifford, 1845-1879.—সম্পাদক।

ইহারা kinesis, এই একটি শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন, উহার অর্থ গতিবস্তু। এই গতিবস্তুসকলের সমবায়ে ও পরম্পরায় জড়জগৎ নির্ম্মিত। আর একটি শব্দ psychosis অর্থাৎ চিদ্বস্তু—এই চিদ্বস্তুসকলের সমবায় ও পরম্পরায় চৈতন্যের কলেবর গঠিত। গতিবস্তু ও চিদ্বস্তুর মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যখন এই এই গতিবস্তু থাকে, তখনই এই এই চিদ্বস্তুর আবির্ভাব হয়। উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান। বস্তু দ্বিবিধ—গতিবস্তু ও চিৎবস্তু; যাঁহারা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা লয়েড মর্গান-প্রণীত *Animal Life and Intelligence* পুস্তক দেখিবেন।

এই দ্বয়বাদকে একটু রূপান্তরিত করিয়া অদ্বয়বাদে পরিণত করা না যায়, তাহা নহে। তাহা হইলে কতকটা হার্ব্বার্ট স্পেনসারের মত আইসে। বস্তু একটা, তাহা দুই বিভিন্ন রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত হয়। এক দিক্ হইতে দেখিলে জড় বা গতি (kineses); অন্য দিক্ হইতে দেখিলে চিৎ (psychoses);—হার্ব্বার্ট স্পেনসারের ভাষায় ক ও খ;—উভয়েরই স্বরূপ অজ্ঞেয়।

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। জড়ই বল, আর গতিই বল উহার স্বাধীন সত্তা নাই; উহাদের প্রতীতি মাত্র আছে; কিন্তু এই প্রতীতিটাই চিদ্বস্তু। সুতরাং ক্লিফোর্ড অদ্বয়বাদী। তাঁহার মতে চিদ্বস্তুময় চৈতন্য ছাড়া আর কিছু বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ নাই। এই চিদ্বস্তুর তিনি ইংরাজিতে নাম দিয়াছিলেন mind-stuff।

পাশ্চাত্ত্য অদ্বয়চৈতন্যবাদীদের মধ্যে বার্কলি, ফিকৃতে* প্রভৃতির নাম করিতে হয়। বার্কলি যে যুক্তিবলে জড়পদার্থকে প্রতীতি মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে যুক্তির বোধ করি উত্তর নাই। যাঁহারা সঙ্গত উত্তর দিয়াছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সেই প্রসাদ লাভে বঞ্চিত করিবার পক্ষে কোন আইন নাই। কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের নাম আত্মপ্রতারণা।

যে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত, তাহাও ধীরে ধীরে এই চৈতন্যবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বোধ করি,

---

* George Berkeley, 1685-1753; Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814.—সম্পাদক।

অচিরেই এই অদ্বয় চৈতন্যবাদ ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। কেন না, জড়পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে কেহই এ পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই।

ফলে, জগৎ যে চৈতন্যরূপী, কেবল চৈতন্য মাত্রই স্বাধীন অস্তিত্বযুক্ত, ইহাতে বিসংবাদের তত কারণ নাই, অথবা কিছু দিন পরে থাকিবে না। কিন্তু এই চৈতন্যের স্বরূপ লইয়া গণ্ডগোল চলিতে পারে।

চৈতন্য—কি না, আমার চৈতন্য। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অপরের চৈতন্য আমার কল্পনা মাত্র; সুতরাং উহার অস্তিত্ব জড়ের অস্তিত্বের মতই অমূলক। বেদান্তের ভাষায় উহাকে চিৎ না বলিয়া চিদাভাস বলাই সঙ্গত। আমার চৈতন্য স্পষ্ট অস্তিত্বযুক্ত পদার্থ; কিন্তু ইহার স্বরূপ কি?

হিউম* হয় ত বলিতেন, যে সকল প্রতীতি—শব্দ স্পর্শ গন্ধ, সুখ দুখ, শোক তাপ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেছি, তাহার সমষ্টিই চৈতন্য। এইগুলিই ত প্রতীত পদার্থ, এইগুলিই সত্য; চৈতন্য এই সকলের সমষ্টি মাত্র। ইহার অভ্যন্তরে, ইহার অন্তরালে কোন অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য substanceএর কল্পনা অনাবশ্যক। প্রতীতিগুলি phenomenon মাত্র, কিন্তু এই phenomenonই সত্য; উহার অন্তরালে noumenonএর কল্পনা নিরর্থক ও অযুক্ত। হক্সলীও কতকটা এই পথে গিয়াছেন। যাঁহারা হক্সলীকে জড়বাদী বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৌদ্ধেরাও কতকটা এইরূপ কথা বলিতেন। নাভি, নেমি, অর প্রভৃতি চক্রাঙ্গের সমবায়ে গাড়ীর চাকার উৎপত্তি। চাকা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু নাই; নাভি, নেমি, অর যদি না থাকে, চাকা থাকিবে না। চৈতন্যের অন্তরালে কোন খাঁটি বস্তু নাই; যদি কিছু থাকে, বৌদ্ধমতে তাহা শূন্য। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত।

যাঁহারা substanceএর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন—নাভি, নেমি, অর না থাকিয়াও কাঠ ত থাকিতে পারে, সেই কাঠের বিকারে চাকা। সেইরূপ প্রতীয়মান চৈতন্য যাহার বিকার, তাহাই substance, তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ।

এই মত বেদান্তের। বেদান্ত এইরূপ substance বা noumenon স্বীকার করেন। তাহার নাম দেন আত্মা বা আমি। তাহার স্বরূপ

* David Hume, 1711-1776—সম্পাদক।

কি? তাহা অনির্দ্দেশ্য—উপনিষদের ভাষায় ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আমি আছি অর্থাৎ আমি সৎ—আর আমি চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ বেদান্ত সময়ে সময়ে আর একটা বিশেষণ যোগ করেন—আমি আনন্দস্বরূপ; কেন না, আমি আছি ও থাকাই আমার আনন্দ, সেই আনন্দের উদ্দেশ্যেই আমি আছি। সেই আত্মা 'পরানন্দ' ও 'পরপ্রেমাস্পদ'।

স্বরূপ যাহাই হউক, বেদান্ত বলেন,—সেই আমিই ঈশ্বর—সেই আমিই এই জগৎ রচনা করিয়াছি—সূর্য্য চন্দ্র হইতে অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সকলই আমার প্রতীত, আমারই কল্পিত, আমারই সৃষ্ট। কেন এরূপ রচনা করিয়াছি, কেন এরূপ কল্পনা করিয়াছি, ইহার উত্তরে বলা হয়, উহা আমার মায়া, আমার লীলাকৈবল্য, আমার খেয়াল; তদপেক্ষা সদুত্তর নাই। অন্ততঃ এইরূপ একটা বাহ্য জগৎ কল্পনা করিয়া, আমাকেই আবার 'জীব'রূপে সেই জগতের মধ্যে স্থাপিত যদি না করিতাম, তাহা হইলেও জগৎও থাকিত না, আমিও হয় ত থাকিতাম না অথবা আমি থাকিলেও প্রত্যয়সিদ্ধ হইতাম না; বৌদ্ধদের মতানুরূপ সমস্তই অকল্প্য মহাশূন্যে পরিণত হইত।

উপনিষৎসমূহ এই 'আমার' একটা নামকরণ করিয়াছিলেন 'ব্রহ্ম' এবং অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি,' আমিই সেই ব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষা অনেক সময় দুরূহ ও কবিত্বময়, কিন্তু পরবর্ত্তী বেদান্তগ্রন্থসমূহ ভাষার কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখিয়াছেন, বোধ হয় না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন—যদি কিছু থাকে, 'সোঽহম্'—সে আমি। ব্রহ্ম বলিয়া যদি তাহার নামকরণে ইচ্ছা হয়, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই ব্রহ্ম শব্দে 'আমি' ভিন্ন আর কিছু বুঝিও না। যত ক্ষণ বুঝিবে, তত ক্ষণ তোমাকে অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ বলিব। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের অবিদ্যার ঘোর যায় নাই। যিনি বুঝিয়াছেন—আমিই আছি, আর সমস্ত আমার কল্পনা, তিনিই মুক্ত।

এই ভাষা অতি স্পষ্ট, অথচ অবিদ্যার এমনই মোহ যে, কেহ বলেন—বেদান্তশাস্ত্র একটা pantheism; কেহ বা বলেন—বেদান্তশাস্ত্র একটা theism। বেদান্ত হাসিয়া বলিবেন, এই সকল উক্তি অবিদ্যার আস্ফালন মাত্র। ('প্রদীপ' মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮)

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্রের ভেরী নীরব হইয়াছে; আশা করি, বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না।

মধুসূদনের অপমৃত্যু নিবারণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজ যত্ন করে নাই। স্মৃতিরক্ষা দূরের কথা। মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্গসমাজ কবিমুখে রোদন করিয়াছিল মাত্র; তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের পরিচালক 'বঙ্গদর্শন' উহাই বঙ্গসমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র স্বয়ং সেই রোদনগীতি গাহিয়াছিলেন।

চক্রনেমির অনুকরণে হেমচন্দ্রেরও দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। ইদানীন্তন বঙ্গসমাজ তাহার প্রতিকারে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা বিষয়েও বঙ্গসমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট নাই। ইহাকেও শুভ লক্ষণ মনে করা যাইতে পারে।

হেমচন্দ্রকে আমরা মুখ্যতঃ জাতীয় ভাব উদ্বোধনের কবি বলিয়া জানি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়' বলিয়া করুণ স্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতকে জননী সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কি না জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে। তাহার পরে বঙ্গের পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানের মুখে আমরা 'বন্দে মাতরম্' গীতি শুনিয়াছি। তাহার পরে বঙ্গের অন্যতর মনীষী সন্তান ভগ্নকণ্ঠে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বান করিয়াছেন—কিন্তু হায়, আমাদের নিদ্রা এখনও ভাঙ্গে নাই। ভাঙ্গিবে কি না, তাহা জানি না।

আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক নিদ্রাদশায় সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারকল্পে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া আমরা জানি। রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লোকশিক্ষা, এ সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে গতি হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। নতুবা সব মিছা অভিনয়,—ভুয়া বাজি। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, কংগ্রেস, শিল্পমেলা, সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সমস্তই জলের বুদ্বুদ—চিহ্ন না রাখিয়া জলে মিশাইবে।

বৃত্রসংহার দশমহাবিদ্যা বিস্মৃতির কুক্ষিতে মিশিয়া গেলেও ক্ষতি হইবে না। হেমচন্দ্রের ভেরীর প্রতিধ্বনি যেন থামিয়া না যায়। হেমচন্দ্র এখন নাই। 'হেমচন্দ্রের ভেরী অক্ষয় হউক'। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা, ১৩১০)

গণেশপূজা

অগ্রহায়ণের 'বঙ্গদর্শনে' [১৩১০] "সিদ্ধিদাতা গণেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় [বিজয়চন্দ্র মজুমদার] আমাদের দেবমন্দিরে গণপতির আবির্ভাবের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তিনি গণপতিকে যত আধুনিক বলিতে চাহেন, গণপতি ততটা আধুনিক নহেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে গণপতি পূজা পাইতেন, তাহা অনুমানের কারণ আছে।

ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে 'গণপতি' এই নাম দেখা যায়। যথা—দ্বিতীয় মণ্ডলে ত্রয়োবিংশতিতম সূক্তমধ্যে ঋক্—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥

এই ঋকের গণপতি কিন্তু আমাদের বিঘ্নরাজ গণপতি নহেন। উক্ত ঋকের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তাঁহাকেই 'গণানাং গণপতিং' বলা হইতেছে। ভাষ্যকার সায়ণও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"হে ব্রহ্মণস্পতে, গণানাং দেবাদিগণানাং সম্বন্ধিনং গণপতিং স্বীয়ানাং পতিং...... ত্বা ত্বাং হবামহে আহ্বয়ামঃ।"

এই গণপতি আমাদের গণেশ না হইলেও গণপতি উপাধিটা অতি প্রাচীন, তাহা পাওয়া গেল।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশকে পাওয়া যায়। ঐ আরণ্যকের অন্তিম অর্থাৎ দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী উপনিষৎ নামে পরিচিত। ঐ প্রপাঠকের প্রথম

অনুবাকেই কতিপয় দেবতার উদ্দেশে কয়েকটি গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। মন্ত্র কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—

১। পুরুষস্য বিদ্মহে সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

২। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৩। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৪। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৫। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৬। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম দুইটির উদ্দিষ্ট মহাদেব, পরবর্ত্তী তিনটির উদ্দিষ্ট গণেশ, নন্দি, কার্ত্তিকেয় ও শেষটির উদ্দিষ্ট দেবতা 'কাত্যায়ন,' 'কন্যকুমারী' ও 'দুর্গি'। বলা বাহুল্য, ইনি গণেশজননী কাত্যায়নী দুর্গা।

গণেশের উদ্দিষ্ট তৃতীয় মন্ত্রটির সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য এইরূপ :—

বীজাপূরগদেক্ষুকার্ম্মুকেত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরং বিনায়কং প্রার্থয়তে। তৎপুরুষায় * * * প্রচোদয়াদিতি। গজসমানবক্ত্রত্বেন দীর্ঘস্য তুণ্ডস্য রত্নকলসাদিধারণার্থং বক্রত্বম্। দন্তিঃ মহাদন্তঃ।

অতএব স্বীকার্য্য যে, যাজ্ঞিকী উপনিষদের সময়ে বক্রতুণ্ড মহাদন্ত-দেবতার পূজা প্রচলিত এবং ইহার সহিত মহাদেবের সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল।

এখন যাজ্ঞিকী উপনিষদের কাল লইয়া তর্ক চলিতে পারে। মোক্ষমূলর এককালে বলিয়াছিলেন, আরণ্যকসমূহ সূত্ররচনার পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্থাৎ তাঁহার মতে ৬০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। এ কালের মতে বৈদিক সাহিত্যের কাল আরও পিছাইয়া গিয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যাজ্ঞিকী উপনিষদের প্রাচীনত্বে কিছু সন্দেহ আছে। ঐ উপনিষৎ আরণ্যকের মধ্যে 'খিলরূপ' বা পরিশিষ্টভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রপাঠক অর্থাৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে গণ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য লিখিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী যাজ্ঞিকী উপনিষদের লিখেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও যাজ্ঞিকী উপনিষদে আকাশ-পাতাল ভেদ। পাতা উল্টাইলেই ভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। যাজ্ঞিকী উপনিষৎকে ব্রহ্মবিদ্যা বলাই কঠিন, উহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ; পাঠের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র

পড়িতেছি। সায়ণাচার্য্যের সময়ে দ্রাবিড়দেশে চলিত যাজ্ঞিকী উপনিষদে চৌষট্টি অনুবাক বর্ত্তমান ছিল। অন্ধ্রদেশে আশী, কর্ণাটে চুয়াত্তর, অন্যত্র উননব্বই অনুবাক প্রচলিত ছিল। কাজেই বুঝা যাইতেছে, উহাতে কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িয়া গিয়াছে। সায়ণ স্বয়ং দ্রাবিড়ানুযায়ী চৌষট্টি অনুবাকের ভাষ্য করিয়াছেন।

সন্দেহের এই সকল কারণ থাকিলেও যখন যাজ্ঞিকী উপনিষৎ বহুকাল হইতে অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তখন ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর তুলনায় বহু প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। ('বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১৩১০)

গণেশপ্রসঙ্গ

[১৩১০, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "সিদ্ধিদাতা গণেশ" প্রকাশিত হইলে রামেন্দ্রসুন্দর ফাল্গুনে "গণেশপূজা" লেখেন। চৈত্রে মজুমদার মহাশয় "গণেশের পূজা" প্রবন্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে প্রত্যুত্তরে ত্রিবেদী মহাশয় চৈত্র সংখ্যাতেই "গণেশপ্রসঙ্গ" লেখেন।—সম্পাদক।]

দেখিতেছি, আমার অনুসন্ধানের সুযোগ্যতাটুকু ব্যতীত অন্য বিষয়ে লেখক মহোদয়ের সহিত আমার মতভেদ যৎসামান্য। নারায়ণোপনিষদের তারিখটা ঠিক হইলেই গণেশ ঠাকুরের বয়সের কতকটা কিনারা পাওয়া যায়। লেখক মহাশয়ের মতে ঐ উপনিষৎখানি খ্রীষ্টের অন্তত আট শত বৎসর পরের। অসম্ভব নহে। ঐ উপনিষৎখানি পড়িয়া আমার যত দূর ধারণা হইয়াছে, তাহার উপর লেখক মহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণগুলি চাপাইয়াও উহা যে খ্রীষ্টের আট শত বৎসর পূর্ব্বে হইতেই পারে না, তাহাও আমি শপথ করিতে প্রস্তুত নহি। কাজেই হাজার দেড়েক বৎসর উভয়ের মধ্যে তফাত দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের বিচারে হাজার দেড়েক বৎসরের তফাত ধর্ত্তব্যই নহে। কাজেই আমাদের মতভেদ যৎসামান্য।

লেখক মহাশয়ের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক। গণপতি ঠাকুর অর্ব্বাচীন; অতএব যে গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে, তাহা

অর্ব্বাচীন ; অতএব ঐ অর্ব্বাচীন গ্রন্থে যে গণেশ ঠাকুরের উল্লেখ দেখা যায়, সে ঠাকুরও অর্ব্বাচীন।—এই বিচারপ্রণালী কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক।

কাজেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতামাত্রকে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী ধরিয়া লইয়া, যে বৈদিকগ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ আছে, তাহাও অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী, এরূপ এক নিশ্বাসে নির্দ্দেশ করিতে সাহস হয় না। বিশেষতঃ পুরাণের ও তন্ত্রের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহারই যখন ঠিকানা নাই।

পুরাণ বেদের সময়েও ছিল। আবার শুনা যায়, বোপদেবও পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক আচারের প্রাদুর্ভাব হর্ষচরিতেও দেখি, আবার আকবর বাদশার আমলেও দেখি।

"বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ"— নারায়ণোপনিষদের এই মন্ত্রের 'লালীল' নাম গণেশাথর্ব্বশীর্ষ হইতে গৃহীত হইতে পারে ; তাহার উল্টাও হইতে পারে। সায়ণ যখন ঐ মন্ত্রের ভাষ্য দেন নাই, তখন উহাকে প্রক্ষিপ্ত ধরিয়াও নারায়ণোপনিষদের প্রাচীনত্ব বজায় থাকিতে পারে। আর গণেশাথর্ব্বশীর্ষেরই যখন তারিখ জানি না, তখন ঐ বিচারও নিরর্থক।

আকবরের আমলে জাল উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল মানিলেও উপনিষৎ মাত্রই জাল হয় না। যে কয়খানা উপনিষৎ শ্রুতিশাস্ত্রমধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার প্রাচীনত্ব সন্দেহের পূর্ব্বে আরও পাকা প্রমাণ আবশ্যক।

শ্রুতিশাস্ত্রকে জাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ দেশে যেমন যত্ন হইয়াছিল, অন্য কোন দেশে কোন সময়ে কোন শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তেমন যত্ন হয় নাই। ইহা সাহেবলোকেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে কোন ব্যক্তি একটা রচনা করিয়া উহাকে চতুরাননের মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিচয় দিলেই তাহা শ্রুতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইত না, যিনি প্রাচীন শাস্ত্রের কিছু সংবাদ রাখেন, তিনিই ইহা বিশেষরূপে জানেন।

জাল উপনিষৎ আজিও রচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা শ্রুতিবাক্য বলিয়া গণ্য হওয়া সহজ হইবে না।

ফলে নারায়ণোপনিষৎ কত দিনের, তাহা যখন স্থির করিবার সম্প্রতি কোন উপায় দেখিতেছি না, এবং তৎসম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের ও আমার মতে ভেদ যৎসামান্য, তখন ঐ বিষয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

তবে একটা কথা বক্তব্য আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভারতবর্ষ-ঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে অবলম্বিত প্রণালীটা কতকটা এইরূপ :—ধরিয়া লও, পলাশীর লড়াইয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কিছুই ছিল না; যিনি বলিতে চাহেন, অমুক জিনিসটা তৎপূর্ব্বে ছিল, প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। এই বিষম ভার মাথায় লইয়া পুরাতত্ত্বব্যবসায়ীকে কিছু দূর চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া থামিতে হয়। আবুলফজল, আলবিরুনি, ফাহিয়াং, মেগাস্থিনিস্ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে ঠেলিয়াই সেইখানে থামিতে হয়। কেন না, মহাভারতে উল্লেখ আছে বা বেদে উল্লেখ আছে বলিতে গেলেই মহাভারত বা বেদ পলাশীর লড়াইয়ের পূর্ব্বে ছিল কি না, এই আর একটা নূতন বোঝা মাথায় চাপে। এই প্রণালীটা ষোল আনা বৈজ্ঞানিক, এবং এতদ্দারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তও খুব পাকা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে চলিয়া গোড়ায় পৌঁছিতে পারিয়াছি, এরূপ শপথে কিছু বেশী মাত্রায় সাহস আবশ্যক হয়। ('বঙ্গদর্শন,' চৈত্র ১৩১০)

রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ

গত চৈত্র মাসের [১৩১১] 'বঙ্গদর্শনে' "রঘুবংশ" নামক প্রবন্ধে রঘুবংশের অন্তর্ভুক্ত দিলীপের উপাখ্যানের মূল কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের অন্তর্গত ঋতম্ভরের উপাখ্যান উহার মূল হইতেও পারে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

প্রবন্ধের লেখক বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত কয়েকখানি মুদ্রিত পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বহু দিন হইতে আমার জানা ছিল, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম অংশটা অর্থাৎ প্রথম আট সর্গের বর্ণিত বৃত্তান্তসমুদয় রহিয়াছে। আমার খুল্লপিতামহের সংগৃহীত হাতে-লেখা

পুরাণসমূহের মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড একখানি রহিয়াছে। ঐ পুঁথিখানি আমার ঐ বিশ্বাসের অবলম্বন।

এই পাতালখণ্ডের প্রায় আরম্ভেই সূর্য্যবংশবর্ণনা। ভগবান্ শেষ বক্তা, ঋষি বাৎস্যায়ন শ্রোতা। চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনু হইতে খট্টাঙ্গ পর্য্যন্ত রাজগণের কথা। পঞ্চমে দিলীপের কথার আরম্ভ ও একাদশে অজের স্বর্গারোহণ। পাতালখণ্ডের এই সাতটি অধ্যায়, আর কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম আট সর্গ,—এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, একে অন্যের নিকট ঋণী, তাহার কোন সংশয় থাকে না।

নমুনাস্বরূপ গোটাকতক শ্লোক এখন এখান হইতে তুলিয়া দেখাইব। পাতালখণ্ডের শ্লোক তুলিব—রঘুবংশ হইতে তুলিবার প্রয়োজন নাই।

দিলীপস্তু মহাভাগঃ সর্ব্বসদ্‌গুণভূষিতঃ।
মহোরস্কো মহাপ্রাণো মহাস্কন্ধো মহাভুজঃ॥

* * *

কন্যাং মগধরাজস্য নাম্না বিপ্র সুদক্ষিণাম্।
উপযেমে মহাশীলাং পতিব্রতপরায়ণাম্॥

* * *

দম্পতী রথমাস্থায় বৃদ্ধসারথিসংহিতম্।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ সায়ং শিষ্যগণৈর্যুতম্॥

* * *

স্কন্ধাসক্তসমিদ্দর্ভৈঃ প্রত্যায়াতৈর্বনান্তরাৎ।
শিষ্যৈঃ প্রপূজ্যমানঞ্চ সায়ং সন্ধ্যার্থিভির্দ্ধৃতম্॥

* * *

মুনিকন্যাগণৈঃ সিচ্য তরুমূলানি সর্ব্বতঃ।
বিশ্রামার্থং নিষণ্ণৈশ্চ পরিতঃ পরিশোভিতম্॥

* * *

এষা ব্রহ্মংস্তব বধূর্ভার্য্যা মম সুদক্ষিণা।
ন ধারয়তি যদ্‌গর্ভং তেন দুঃখং . * * ॥

* * *

মত্তোঽথ দুর্লভঃ পিণ্ডঃ পূর্ব্বেষাং পরমেব হি।
বংশবিচ্ছেদকর্ত্তাহং পিতৄণাং দুঃখকারণম্॥

* * *

অথামুং বোধয়ামাস সন্ততিস্তম্ভকারণম্ ॥

* * *

সুদক্ষিণামৃতুস্নাতাং স্মৃত্বা জাতত্বরাধিকঃ।
বিলোকিতঃ সুরভ্যা ত্বং কল্পতর্ব্বঙ্‌ঘ্রিসংস্থয়া ॥

* * *

শাপস্তু ন শ্রুতো রাজন্ ত্বয়া সারথিনাপি ন।
কূজৎসু রথচক্রেষু নদৎসু দিগিভেষু চ ॥

* * *

নাম্নি কীর্ত্তিত এবাসৌ যদায়াতি সুমঙ্গলা।
তৎ সিদ্ধিং তব রাজেন্দ্র বেদ্মি হস্তগতামিব ॥

* * *

পশ্চাত্তামনুগচ্ছেথা অনুতিষ্ঠেরপি স্থিতাম্।
নিষণ্ণায়াং নিষীদেথাঃ পিবন্ত্যাঞ্চ জলং পিবেঃ ॥

* * *

নিবর্ত্ত্য ভৃত্যবর্গঞ্চ ততো রাজা সুদক্ষিণাম্।
প্রত্যাবর্ত্ত্য স একাকী ধেনুমন্বগমদ্‌বলী ॥

* * *

অন্যেদ্যুঃ সা বশিষ্ঠস্য হোমধেনুর্মহীপতেঃ।
ব্রতদার্ঢ্যং পরীক্ষন্তী প্রবিবেশ হিমালয়ম্ ॥
নপ্তীয়ং সুরভের্ধেনুর্ন প্রধৃষ্যা হি হিংসকৈঃ।
ইতি বিশ্বাসবান্ রাজা শোভামৈক্ষত ভূভৃতঃ ॥

* * *

অদহ্যত স্বতেজোভিঃ স্বয়মেব স ভূপতিঃ।
চিত্রার্পিত ইবাতিষ্ঠচ্চাপার্পিতকরস্তদা ॥

* * *

ভৃত্যোঽহং দেবদেবস্য গৌরীভর্ত্তুঃ পিনাকিনঃ।
কুম্ভোদরোঽস্মি বিখ্যাতো ভবান্যাশ্চ প্রিয়ঃ সদা ॥

* * *

দেবদারুরয়ং দেব্যা স্বয়ং যত্নৈরুপার্জ্জিতঃ।
স্তন্যেন পয়সা স্কন্দপীতশেষেণ বর্দ্ধিতঃ ॥

* * *

মদীয়েন শরীরেণ স্বাহারমতিবর্ত্তয়।
দিনাবসানক্ষুধিতবৎসামেনাং বিমুঞ্চ গাম্॥
* * *
যদিয়ং ভবতাক্রান্তা কাতরা মাং নিরীক্ষতে।
সাশ্রুপাতং ততঃ সিংহ হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে॥
ক্ষতাৎ ত্রাণাৎ ক্ষত্রশব্দো বিমুখস্য ততো মম।
কিং জীবনেন তৎ সিংহ কীর্ত্তিলোপান্মৃতির্বরা॥
* * *
কৃপালুর্ভব তত্ত্বং মে যশো দেহি মহত্তরম্।
ত্যজৈনাং মচ্ছরীরেণ মৃগেন্দ্র কুরু পারণাম্॥
* * *
পীত্বা সুদক্ষিণায়ৈতৎ পীতশেষং প্রদাস্যতি।
ভবিষ্যতি কুমারস্তে বংশকর্ত্তা মহীপতিঃ॥
* * *
অথামন্ত্র্য মহাত্মানং বশিষ্ঠং যমিনাং বরম্।
স্বং পুরং প্রাযয়ৌ যানমারুহ্য স্বগণৈর্বৃতঃ॥

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে রঘুর জন্ম, অশ্বমেধে অশ্বহারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ, রাজ্যপ্রাপ্তি ও দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়ের সবিশেষ বর্ণনা নাই), সর্ব্বস্বদক্ষিণ-যজ্ঞসমাপ্তি, কৌৎসাগমন, অজের জন্ম, অজের বিবাহার্থ যাত্রা, পথে হস্তিবধ, ইন্দুমতীস্বয়ংবর (সভাবর্ণনা নাই), রাজাদের সহিত যুদ্ধ, রাজ্যশাসন, ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপ।

কালিদাস গ্রন্থারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বসূরিদের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন। রামকথা ভিন্ন পূর্ব্বকালীন বা পরকালীন রঘুবংশবর্ণনার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। অথচ কালিদাসের কাব্যের কোন পৌরাণিক মূল ছিল। সে মূল কোথায়?

পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ডে যখন অজবিলাপ পর্য্যন্ত সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে, তখন স্বতই মনে হইবে, মূল এইখানে। কিন্তু কেবল একখানা পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

পাতালখণ্ডের পুঁথি বোম্বাইয়ে, পুনায় ও কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে। কলিকাতায় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের ও বঙ্গবাসীর প্রকাশিত পাতালখণ্ড

আছে। আনন্দাশ্রমের বহি দেখি নাই। অন্য তিনখানিতেই ঠিক এই অংশটিরই অভাব।

এই সংস্করণগুলি কোন্ কোন্ পুঁথি দেখিয়া প্রকাশ করা হইল, তাহা প্রকাশকেরা লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। •কলিকাতার সংস্করণ দুইখানি একরূপ। বোম্বাইয়ের সহিত ইহাদের কিছু তফাত আছে। আমার পুঁথির ১—৩ অধ্যায় ভূমিকা, ৪ অধ্যায়ে মনু হইতে খট্টাঙ্গ, ৫—১১ অধ্যায়ে দিলীপ হইতে অজ, ১২—২৮ অধ্যায়ে দশরথ হইতে রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত। আমার পুঁথির যাহা ২৯ অধ্যায়, বোম্বাই যন্ত্রের পুস্তকের ও বঙ্গবাসীর পুস্তকের তাহা প্রথম অধ্যায়। এই স্থলে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথার পুনরায় সবিস্তারে আরম্ভ। এই অশ্বমেধের বর্ণনা আমার পুঁথিতে ২৯—৯৬, বোম্বাই পুস্তকে ১—৬৮ ও বঙ্গবাসীর পুস্তকে ১—৩৭ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই মনে হইতে পারে, আমার পুঁথিতে রঘুবংশের যে বর্ণনাটুকু আছে, অর্থাৎ উহার প্রথম ২৮ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। বলা আবশ্যক, আমার পুঁথির কাগজ দেখিয়া উহার বয়স খুব অধিক বোধ হয় না। ১০০ বৎসরের কমই হইবে।

তিন পুস্তকেই রামের অশ্বমেধবর্ণনা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে। বাৎস্যায়ন শেষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সূর্য্যবংশের রাজাদের কথা ত শুনিলাম, তন্মধ্যে রামের অশ্বমেধের কথাও সংক্ষেপে শুনিলাম, এখন ঐ অশ্বমেধের কাহিনী সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, রঘুবংশের বর্ণনা কেবল আমার পুঁথির নিজস্ব নহে। উহা সম্ভবতঃ অন্য পুস্তকেরও পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডে অর্থাৎ স্বর্গখণ্ডে আছে। পাতালখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গখণ্ড। স্বর্গখণ্ডের পুস্তক খুঁজিবার আমার সময় হয় নাই। পাঠকেরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গখণ্ডের শেষ ভাগে রঘুবংশবর্ণনা আছে কি না, সন্ধান দিলে বাধিত হইব।

ফলকথা, পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক না দেখিয়া মীমাংসা চলে না। রঘুবংশের বিবরণ আমার পুঁথিতে পাতাল-খণ্ডের আরম্ভে, অন্য পুস্তকে স্বর্গখণ্ডের শেষে থাকিলে, উহাকে পদ্মপুরাণ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিবার উপায় থাকে না। ধরিয়া লইলাম, উহা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত।

আর এই বর্ণনা যদি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে কালিদাসের দিলীপকর্ত্তৃক গোসেবাঘটিত উপাখ্যানের মূল সন্ধানের জন্য ঋতম্ভরের উপাখ্যানের আশ্রয় লইতে হয় না। কেন না, ঋতম্ভরের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের উপাখ্যানের সাদৃশ্য যৎসামান্য মাত্র।

এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রবন্ধলেখক পদ্মপুরাণের আর এক জায়গায় ঐ গোসেবার বৃত্তান্ত আমাকে দেখাইয়াছেন। বোম্বাই সংস্করণ ও কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সংস্করণ, উভয়ত্র পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডমধ্যে এক জায়গায় দিলীপকৃত গোসেবার কথা বর্ণিত দেখিলাম। সেখানে সূর্য্যবংশবর্ণনা নাই, তবে পুত্রপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশের প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, দিলীপ নামে সূর্য্যবংশে এক রাজা ছিলেন, তিনি গোসেবা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমগমন, গোসেবা, মায়াসিংহদর্শন ও বরলাভে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানটুকুর ভাষার সহিতও কালিদাসের ভাষার খুব সাদৃশ্য। আমার পাতালখণ্ডের ভাষা, এই উত্তরখণ্ডের ভাষা ও কালিদাসের ভাষা, পরস্পরে এত মিল যে, একটাকে অন্যটার paraphrase বলা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন, কালিদাসের রঘুবংশ সম্মুখে রাখিয়া কোন মহাত্মা পাতালখণ্ডে দিলীপ হইতে অজবিলাপ পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়াছেন এবং আর কোন মহাত্মা উত্তরখণ্ডে দিলীপের গোসেবাঘটিত উপাখ্যানটুকু বসাইয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়।

এখন এই গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কে কাহার নিকট ঋণী? কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে লইয়াছেন বা পদ্মপুরাণলেখক কালিদাস হইতে লইয়াছেন? ইহার মীমাংসা আমার অসাধ্য। এ দেশের পণ্ডিতেরা দ্বিধাহীন হইয়া বলিবেন, কালিদাসই ঋণী; সাহেবী দল তেমনই নিঃসঙ্কোচে বলিবেন, পদ্মপুরাণই ঋণী।

মীমাংসা আমার অসাধ্য; তবে এ প্রসঙ্গে দুটা কথা বলিয়া ফেলিতেও চাই। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের আগাগোড়া উল্টাইয়া দেখিয়াছি। রামাশ্বমেধকথার পর কৃষ্ণকথার আরম্ভ। উহা বাঙ্লার ছাপা পুঁথি, বোম্বাইয়ের ছাপা পুঁথি ও আমার হাতে-লেখা পুঁথি, তিনেই রহিয়াছে। কৃষ্ণকথামধ্যে বৃন্দাবনমণ্ডলের যে বর্ণনা দেখিলাম, শ্রীরাধিকার সখীগণের

যে বর্ণনা দেখিলাম, গোপীভাবে কৃষ্ণভজনার যে মাহাত্ম্য দেখিলাম,* তাহাতে এই বর্ত্তমান পাতালখণ্ড যে কালিদাসের বহু পরবর্ত্তী, তাহাতে সংশয় করা বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আমার অত সাহস নাই। আমি আধুনিক পদ্মপুরাণের ভাষা কালিদাসের অনুকরণ স্বীকার করিতে সম্মত আছি।

তবে কালিদাসের পূর্ব্বেও যে পদ্মপুরাণ ছিল না, তাহা বলিতেও আমার সাহস হয় না। পুরাণশাস্ত্র বৈদিক কাল হইতেই আছে। পদ্মপুরাণও কালিদাসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেও বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত ও সম্ভব। কালিদাস পৌরাণিক মূল হইতেই যখন রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন, তখন সেই আদি পদ্মপুরাণের সেই অংশটুকুও আধুনিক পদ্মপুরাণে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? বর্ত্তমান পদ্মপুরাণের কৃষ্ণকথা বা অন্যান্য অংশ অর্ব্বাচীন হইয়াও সূর্য্যবংশকথাটুকু প্রাচীন হইতে পারে। এ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম। এই অক্ষমতা স্বীকার করিয়া আমার এই নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চার উপসংহার করিলাম। ('বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১৩১২)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সার্ আলফ্রেড ক্রফট্ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বলিয়াছিলেন—"The University which was setup in our midst a generation ago has only just touched the surface of society and has not yet created an atmosphere favourable to learning or research * * * What then has his University training done for him (*i.e.*, the student)? It has sharpened his faculties and given him greater aptitude for mastering whatever practical work he may set his hand to, it has made him perhaps a ready writer or a fluent speaker,—but as to the higher life, the divine spark, all that we mean by the flower and the fruit of liberal education,—of that there is but little trace."

কথাগুলা বড় শক্ত কথা ; এরূপ শক্ত কথা শুনিতে শুনিতে আজকাল আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গেল। এক এক বার অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর গাহিতে ইচ্ছা হয় : তোমরা আমাদিগকে শিখাইয়াছ কি যে, আমাদের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা কর। তোমাদের এই যে একটা নির্জীব চালুনী যন্ত্র—যাহার নাম দিয়াছ বিশ্ববিদ্যালয়, তাহা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কেবল মোটা বিদ্যা আর সরু বিদ্যা ছাঁকিয়া আসিতেছে মাত্র। ঐ জড় পদার্থ হইতে কি "divine spark" জন্মায়? আর জাপানের সহিত তুলনা করিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবার পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষায় জাপানী কত টাকা খরচ করে ও কি বন্দোবস্তে খরচ করে, তাহার সঙ্গে একবার আমাদের খরচের ও বন্দোবস্তের তুলনা করিয়া দেখা উচিত হয় না কি?

কিন্তু সে উত্তর গাহিয়া বিশেষ ফল নাই। পরে আমাদিগকে তুলিবে না বলিয়া, আমরা চিরকাল শুইয়াই থাকিব, এরূপ প্রতিজ্ঞাটা আমাদের পক্ষে শুভ নহে। আর আমাদেরও কি লজ্জার কথা নাই? আমাদের ক্ষমতা কম, হাতে পায়ে শিকল, বুকে জাঁতা, গলা টিপিয়া শ্বাসরোধের ব্যবস্থা ; তবু উহারই মধ্যে একটু রক্ত চলাচলের নিদর্শন দেখান না চলে, এমন নহে। সার্ আলফ্রেডের পরবর্ত্তী অনুযোগের উত্তর দেওয়া কঠিন—

"In such subjects as general Physics and Mathematics, it is true, workers in India have no special advantages, indeed, they are to that extent handicapped by the volume of scientific knowledge existing in the world and by the rate at which it progresses—a rate which they can hardly hope to overtake. But there are other subjects in which Indian students enjoy varying unique and ample opportunities. To take a single example. It has been said that on the fundamental question of the origin of the Indian people, European scholarship is at a standstill for want of local Indian research. ... Europe waits for a body of Indian workers to enter this utmost limitless field but it looks for them as yet in vain."

এ কথাটাও সত্য কথা। আমার স্বদেশীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমাদের নিজের ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা এমন অক্ষম কেন?

ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন রিজলি, ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন বীম্‌স্‌, হর্‌নলী, গ্রিয়ার্সন। এখানে ভারতবাসীর নাম দেখি না কেন?

উত্তর দেওয়া হইবে,—সাহেবদের, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর, এই সকল সংগ্রহে যে সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই। ঠিক কথা। একজন মোটা সাহেব কল টিপিলেই ভারত গবর্ণমেণ্ট সিমলা হইতে মাথা নাড়া দেন। সমুদয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আন্দোলন উপস্থিত হয়। পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারগণ সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, কন্‌ষ্টেবলেরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, ডেপুটিবর্গ comparative mythology বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিখিতে বসেন; সদরের সেরেস্তায় সমুদয় সরঞ্জাম সংগৃহীত হইয়া সরকারী মুদ্রাযন্ত্রে সরকারী খরচে ভীমাকৃতি গ্রন্থে পরিণত হয়। আমাদের সে অর্থবল, লোকবল, তোড়জোড়, যন্ত্রতন্ত্র নাই। আমরা একায়েক এই বিপুল ভারতবর্ষের এক কোণে বসিয়া কতটুকু কাজ করিব?

ঠিক কথা, সেই ক্ষুদ্র কতটুকুর বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কতটুকুই বা করি না কেন? কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধার গল্প ত আমাদের মধ্যেই আছে। কাজটা যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে এতটুকুর বেশী পারি না—অতএব কিছুই করি না—এই সাফাই গাহিলে ধর্ম্মের দুয়ারে খালাস পাইব না।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এ স্থলেও আমরা এতটুকুর বেশী কাজ পারি না? সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নিজের ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাহা মোটা সাহেবদের নাই, তাহা সিমলাশৈলবাসী ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। অন্ততঃ চৌকিদারের ও ডেপুটির চেয়ে বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে। নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে—পাপ হইবে।

সাহেবেরা আমাদের ভাষা বোঝেন না, আমাদের চরিত্র বুঝেন না; লর্ড কর্জ্জনের ভাষায় এশিয়াটিকের চরিত্রই সাহেবের দুরধিগম্য। এক পক্ষে আমাদের অসুবিধা সহস্র দিকে, অন্য পক্ষে সাহেবদের অসুবিধা লক্ষ দিকে। অতএব এ ওজর চলিবে না।

বলা হইবে, সাহেবেরা যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। ভুল হইবারই কথা। তাহাতে বিস্ময়ের কিছু মাত্র কারণ নাই। সাহেবেরা এত উর্দ্ধে অবস্থান করেন যে, দূরবীণ যোগেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যকলাপ ঠিক দেখিতে পান না। তাহার উপর আমাদের গায়ের গন্ধ এত বিকট যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য বহু উর্দ্ধে থাকিতে বাধ্য। তথাপি তাঁহারা যে দুটা কথা লেখেন ও বলেন, তাহা তাঁহাদের অনুগ্রহ ও বাহাদুরি। তাহার নিন্দা করা উচিত নহে।

স্বীকার করিলাম, তাঁহারা ভুল বলেন। কিন্তু আমরাই বা সে ভুল সংশোধনের কি চেষ্টা করিলাম? কেবল ঘরে বসিয়া হাসিলে, সে হাস্য শ্বেতশরীরে কলঙ্কলেপ করিবে না। আমরা আমাদের সম্বন্ধে কয়টা নির্ভুল কথা জানি বা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি?

অথচ কথা জানিবার আছে। এ যে অতল বারিধি—ইহার পার নাই; ইহার জলতলে কত রত্ন আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কেহ কি একবার সেই রত্নের জন্য জাল ফেলিবে না? এই ঔদাস্য, এই অশ্রদ্ধা মার্জ্জনীয় নহে। ইহা মহাপাতক।

মাতর্জন্মভূমি, তোমার কোলে শুইয়া, তোমার স্তন্যে লালিত হইয়া আমরা এই জড়দেহ ধারণ করিয়াছি, তোমাকে আমরা চিনিতে চাহি না—তুমি কে, তাহা জানিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কোন্ কালে তোমার কি মূর্ত্তি ছিল, আমরা তাহা দেখিতে চাহি না; কবে তুমি কেমন ছিলে, কেন তুমি এমন হইলে, তাহা অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন বুঝি না। তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণ কেমন ছিল, কি করিয়াছিল, আমাদিগের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের ব্যাকুলতা নাই। ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়া আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; সেই ঋণশোধে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ধিক্ আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়কে! প্রাচীনেরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহারা দেশের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। আমরা বৎসর বৎসর ইতিহাসে পাণ্ডিত্যের উপাধি লাভ করিতেছি, আমরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছি!

এরূপ তর্কও শুনিয়াছি—ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবার কি আছে যে, তাহার আলোচনা করিব? অরে হতভাগ্য! বিদেশী আসিয়া যখন

ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া দিবে, তখন তাহা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের উপাধি লইবে। অরে পাপিষ্ঠ!

আবার এমন তর্কও না শুনিয়াছি, এমন নহে—শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেব যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার ফলভোগ করিতেছি, জীবনে তাহা কাজে লাগাইয়া জীবনকে উন্নত করিতেছি, তাঁহারা কোন্ তারিখে জন্মিয়াছিলেন, কোন্ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া কি লাভ? অরে চতুর! কেবল ঋণ গ্রহণ করিব—তাহার পরিশোধের জন্য ভাবিব না। ইতিহাস আলোচনা—উহা অতীতের উপাসনা—উহা পিতৃপুরুষের নিকট ঋণমোচনের একটা উপায়।

প্রাচীনেরা ইতিহাস আলোচনা করেন নাই; তাঁহারা এই ঋণদায়ে বদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কি ধর্ম্মে পতিত হইয়া গিয়াছেন? সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের সমালোচনায় ফল নাই, সে অনেক কথা—তাহাতে পুঁথি বাড়িবে। তাঁহারা যদি ধর্ম্মে পতিত হইয়া থাকেন, তবে জ্ঞাতসারে হন নাই। আমরা জ্ঞানকৃত পাপে পাপী হইতেছি।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান—আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিব। যেন পদার্থবিদ্যা, আর, রসায়নশাস্ত্র আর দেহতত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান! যেন কলের গাড়ীতে, আর টিনের কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ! মানবতত্ত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে—ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত!

বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়, তাহা বিজ্ঞানের বিষয়—আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আমাদিগকেই লিখিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা আমরা আমাদিগকে চিনিব না; আমাদের ধাতুতে, মজ্জায় কি বল আছে, তাহা জানিব না; আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইব না। আমাদের স্নায়ুযন্ত্র শিথিল থাকিবে, আমরা ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া শবদেহ লইয়া পূতিগন্ধ উৎপাদন করিব।

নতুবা আমরা আমাদের জননী মাতৃভূমিকে চিনিব না—আমাদের মাতৃভক্তি জন্মিবে না—সেই ভক্তি মহাভাবে পরিণত হইবে না—যে

মহাভাব আমাদিগকে মহৎ কার্য্যে প্রেরিত করিবে, যাহার বলে আমরা জয়শীল হইব—যাহার বলে আমরা লজ্জা হইতে ও অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। একমাত্র পন্থা;—অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, অন্য পন্থা আমাদের নাই;—আর সকল পথ বিপথ ও কুপথ। ইহাই এখন আমাদের কর্ম্ম—ইহাই আমাদের যুগধর্ম্ম।

এতগুলা লম্বাচৌড়া কথায় অসংযত লেখনীর চালনা করিয়া ফেলিলাম; বর্ত্তমান প্রবন্ধের শীর্ষভাগে লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নামক ক্ষুদ্র সমাজটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, একটুকু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ঐ ক্ষুদ্র সমাজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য স্বদেশের তত্ত্বের আলোচনা, উহার ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল নিরতিশয় ক্ষুদ্র। উহা কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন চেষ্টার মত ক্ষুদ্র ফল উৎপাদন করিয়াছে ও সম্ভবতঃ করিবে; কিন্তু উহা কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছে, অথবা চলিবে আশা করি বলিয়াই আজ এই ক্ষুদ্র লেখনীর চালনা করিতে বসিয়াছি।

একটা কথা বলিয়া রাখি। ঐ সমাজের সহিত উপস্থিত লেখকের বর্ত্তমান বৎসরে একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে; উহা অস্থায়ী সম্পর্ক। ঐ সমাজের কৃত বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা আমার সম্পাদকীয় উক্তি বলিয়া যেন গণ্য না হয়। উহা আমার ব্যক্তিগত কথা; উহার ফলাফলের জন্য ঐ সমাজ বা সমাজের সংসৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি দায়ী নহেন।

সাহিত্য-পরিষদের জীবনের এগার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। উহা এই এগার বৎসরে কি করিয়াছে, একবার দেখা আবশ্যক।

আমি যত দূর জানি, প্রথমে যখন উহার উৎপত্তি হয়, তখন উহার উদ্দেশ্য কি, তাহার সম্বন্ধে অতি অস্ফুট ধারণা ছিল। পরিষৎ স্বয়ং ঠিক জানিতেন না, তিনি কি কাজের জন্য অকস্মাৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। "বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন"—এইরূপ একটা দীর্ঘ ছন্দের কথা উহার নিয়মাবলীর প্রথম পৃষ্ঠে মুদ্রিত আছে; কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ পদসমষ্টির তাৎপর্য্য কতটুকু, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না।

কেহ আশা করিয়াছিলেন যে, অসদ্‌গ্রন্থকে সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-

চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক শশধরে পরিণত করিবে। ভাগ্যে পরিষৎ সেই সম্মার্জ্জনী ধারণ করেন নাই। ইংরেজের রাজ্যে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের দিনে আবর্জ্জনা পরিষ্কার মনুষ্যের অসাধ্য; ইংরেজের আইনে অসৎকে অসৎ বলিলে আইনের আমলে আসিতে হয়। ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এত দিন পরিষদের সভ্যগণের পরস্পর সম্মার্জ্জনী প্রহারে প্রভাসযজ্ঞের পুনরভিনয় হইত মাত্র।

কেহ আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটা রমণীয় ভীমকান্ত স্বরূপ সর্ব্বদোষ-বিমুক্ত বিশুদ্ধ আদর্শ বাঙ্গালা ভাষা গঠন করিয়া ফেলিবে; তাহাতে গ্রাম্যতা দোষ থাকিবে না, তাহাতে শ্রুতিকটু শব্দপ্রয়োগ থাকিবে না, তাহাতে বিদেশী গন্ধ থাকিবে না; তাহা পরম পবিত্র সর্ব্বজনসেব্য বাঙ্গালা ভাষা হইবে। সাহিত্য-পরিষৎ তাহাও করিলেন না বা করিবার চেষ্টা করিলেন না। কেন না, দুষ্ট সরস্বতী মানবের রসনায় আবিভূর্ত হইয়া মানবকে দুর্ভাষা ব্যবহার করান, সে দেবতাকে সংযত করিবার কোন উপায়ই সাহিত্য-পরিষদের হস্তে নাই। আর যাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের নৌকাখানির কর্ণধার, তাঁহারাই বিজ্ঞ জনের মতে দুষ্ট সরস্বতীর প্রধান সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগের উপর শাসনদণ্ড সঞ্চালনের কোন উপায় নাই।

কেহ মনে করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে একবারে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিবে। কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সদ্‌গ্রন্থ-প্রণেতার আবশ্যক এবং সদ্‌গ্রন্থ-প্রণেতার প্রসবের ভার সম্প্রতি বঙ্গমাতার উপর। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে বঙ্গমাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্প্রতি অক্ষম। অতএব এই উদ্দেশ্যও চলিল না।

কেহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীদের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যসেবার সফলত্ববিধান পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ং ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; সেই ভিক্ষাজীবীর অন্নে সাহিত্য-সেবীর পোষণ অসাধ্য।

একবার একজন সভ্য নীতিগ্রন্থ রচনা করিয়া সন্নীতির প্রচারের জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্ট

যাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, সাহিত্য-পরিষৎ তাহাতে হস্তক্ষেপে সাহস করেন নাই।

এইরূপে নানা জনে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানা কথা তুলিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্দেশ্য যে সাহিত্য-পরিষদের লক্ষ্যের বহির্ভূত, তাহা বলিতে পারি না। প্রস্তাব মাত্রই সাধু এবং সাধু সঙ্কল্পের সিদ্ধিতে যত্নবান্ হওয়াই উচিত;—সাহিত্য-পরিষদেরও উচিত।

প্রথমে যখন সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হয়, তখন সুবিখ্যাত ফরাসী আকাডেমির আদর্শ অনেকের মনে ছিল। এমন কি, সাহিত্য-পরিষদের ইংরেজি নাম—Bengal Academy of Literature সেই আদর্শেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী আকাডেমি যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে কত দূর সফল হইয়াছেন, ঠিক জানি না। হইয়া থাকিলেও হাতীর অনুকরণ মূষিকের পক্ষে বিজ্ঞানুমোদিত নহে।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সাধনার্থ সাহিত্য-পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত সভাকে নিম্নোক্তস্বরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতার সাহিত্যসেবীদিগের ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রধান সম্মিলনস্থান। এইখানে তাঁহারা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার উপস্থিত হইয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় করেন, কাব্য দর্শন, ইতিহাস ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ একটি সাহিত্যিক আড্ডা নানা কারণে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসেবীদের সমাজে পরস্পর প্রীতিবন্ধনের ইহা একটা সমীচীন উপায়। উদ্দেশ্য মহৎ। দ্বিতীয়, এ দেশের ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি নিকট। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাপ্রণালীর পরিচালক। সাহিত্য-পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির উপর চক্ষু রাখিয়া বসিয়া আছেন। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার কিঞ্চিৎ আদর হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষদের প্রার্থিত শিক্ষা-সংস্কার অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে। তৃতীয়,

সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর পরিচালিত একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা; এবং বর্ত্তমান কালে উহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সাধারণকে একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝান আবশ্যক।

একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা বলিলে প্রথমেই ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার কথা মনে আসে। উক্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীর তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। আলোচনা সম্প্রতি ছাত্রবর্গকে তত্তৎবিষয়ে উপদেশদানে পরিণত। বিজ্ঞানচর্চ্চা বা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতার অভীপ্সিত থাকিলেও উহা অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ পদার্থবিদ্যা বা তৎশ্রেণীস্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। কিন্তু স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের সাহিত্য ও স্বদেশের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুশীলন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ অনেকটা বাঙ্গালার এশিয়াটিক সোসাইটির মত। ঐ প্রাচীন সোসাইটি এশিয়ার ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে এক আধটা রসায়নশাস্ত্রের বা গণিতশাস্ত্রের প্রবন্ধ বাহির করিয়া আমোদ বোধ করেন। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের এবং মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও ভাষার অনুশীলন করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠা ও কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়াছেন। সোসাইটির পত্রিকায় যে সকল ব্যাঙের ও ফড়িঙের কথা প্রকাশিত হয়, তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বড় একটা বিস্ময় উৎপাদন করে নাই; কিন্তু সার্ উইলিয়াম জোনস্ ও কোলব্রুক ও প্রিন্সেপ প্রভৃতির কীর্ত্তিকথা পৃথিবী ব্যাপিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের জন্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ বাঙ্গালার জন্য আপনার চেষ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বৃহৎ ব্যাপার; উহাতে হস্তক্ষেপে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নাই। কাজেই সাহিত্য-পরিষদের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকা উচিত মনে করি। আবার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার বৃহৎ কারখানা লইয়াই এত ব্যস্ত যে, ক্ষুদ্র বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার ভাষা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে

আলোচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। সাহিত্য-পরিষদের মত একটা স্বতন্ত্র সমাজ ইহা লইয়া নিযুক্ত থাকেন, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালায় আলোচনার কি আছে? কি নাই? বাঙ্গালার ইতিহাসের আমরা কি জানি? "বাঙ্গালী জাতির কিরূপে উৎপত্তি হইল, কে বলিতে পারে? ইহার কতটুকু আর্য্য, কতটুকু অনার্য্য, কে বলিতে পারে? বঙ্গে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার কবে আরম্ভ, কিরূপে আরম্ভ, কে বলিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কবে, কিরূপে হইল? লক্ষ্মণসেনের সময় বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় আছে কি? বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য্য শব্দ কত প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যে সকল অনার্য্য জাতি এই শব্দসম্পত্তি ভাষায় দিয়াছে, তাহারা গেল কোথায়? তাহাদের বংশধর কোথায়? বাঙ্গালার আচার ব্যবহার পূজা পার্ব্বণ, পশ্চিম হইতে কতটুকু বিভিন্ন, কেন বিভিন্ন, কবে হইতে বিভিন্ন, ইহা কে বলিতে পারেন?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। এখন আশ্বিনে অম্বিকাপূজা প্রতি ঘরে ঘরে। এই পূজা কোন্ দিন, কিরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হইল? জরাসন্ধের সময়ে ছিল কি? অশোকের সময়ে ইহা ছিল কি? পালরাজার ও সেনরাজার সময়ে এই মহামহোৎসব কি সম্পাদিত হইত? যাঁহারা 'রাবণস্য বধার্থায়' শ্লোক তুলিয়া দুর্গোৎসবকে ত্রেতাযুগের আবিষ্কৃত পূজা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই ত্রেতাযুগের পূজা সমস্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এই বাঙ্গালার কোণ আশ্রয় করিল কেন?

ইতিহাস আলোচনার দিকে আমাদের মতি একটু আকৃষ্ট হইয়াছে, আনন্দের বিষয়। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত স্বাধীন ভাবে সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস আরম্ভ করেন; তাঁহার সম্বল ছিল কিন্তু ইংরেজের লেখা বহি। তার পর অক্ষয়বাবু, নিখিলবাবু, কালীপ্রসন্নবাবু, কেবল ইংরেজের বহির উপর নির্ভর না করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই ইতিহাস ইংরেজ শাসনের ইতিহাস ও মুসলমানের শাসনের ইতিহাস। ইহার মূল্য আছে; কিন্তু ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস নহে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস এখনও আলোচিত হয় নাই। নগেন্দ্রবাবু

কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। আশা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সিদ্ধিলাভ করুন। দীনেশবাবু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন বলিলে ভুল হয়, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। এখন সেই খনি হইতে বিবিধ মণি রত্ন, কয়লা প্রস্তর সংগৃহীত হইতেছে মাত্র। সাহিত্য-পরিষৎ এই সংগ্রহকার্য্য প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের এই মহৎ ব্রতে কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক। সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউক। এই সাহিত্যের খনি হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিত হইবে।

বাঙ্গালা দেশের এই ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, আমোদের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলন সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহাই আমার ধারণা। এ স্থানে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—এখানে এখন দাঁড়াইয়া সীমা দেখিতে পাই না। খাটিবার জন্য লোক চাই—উচিতসংখ্যক লোক দেখিতে পাই না। যাহা হউক, মজুর খাটা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার আবশ্যকতা অনেকে বুঝিয়াছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ বিবেচনা করি।

সাহিত্য-পরিষৎ অন্য কাজ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, বেদ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়া চিত্তবিনোদন করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্র সাহিত্য-পরিষদের নিজের নহে। পরিষৎ যেন নিজের কাজ না ভুলিয়া যান, ইহাই প্রার্থনা করি।

চাই এখন বঙ্গবাসীর সহানুভূতি—লোকবল চাই, আর অর্থবল চাই। গরিবের দেশের গরিব সভা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া স্বদেশীর নিকট দাঁড়াইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহার অনুরাগ আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে তাঁহার মুষ্টিভিক্ষা অর্পণ করুন। পরিষৎ সকলকেই সমাদরে আহ্বান করিবেন। ভিক্ষাভাণ্ডে মাসে মাসে আট আনা প্রদান করিয়া তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা করুন।

যাঁহারা এই ভিক্ষাদানে অসমর্থ, তাঁহারাও পরিশ্রম দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিন; প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া, ব্রতকথা, গ্রাম্য কবিতা, গ্রাম্য গান, ছেলেভুলান গল্প,

গ্রাম নগর পীঠস্থান দেবস্থান প্রভৃতির বিবরণ, দেবস্থানীয় ইতিহাসের টুকরা, কিংবদন্তীর ভগ্নাংশ, যাহা কিছু দুই চোখে দেখিতে পান, দুই হাতে কুড়াইয়া পান, পরিষদের কার্য্যালয় লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকুন। পরিষৎ ভিক্ষুক, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বেতন দিবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁহারা দয়া করিয়া পরিষৎকে ভিক্ষা দিন। ভারতীর আশীর্ব্বাণী তাঁহাদের পুরস্কার হইবে।

উপসংহারে একবার ক্ষণেকের মত সম্পাদকীয় সাজ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীকে বঙ্গসাহিত্যের-সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি—নিতান্ত সম্পাদকোচিত ভাষায় তাঁহাকে জানাইতেছি যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যস্থান ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তত্র উপবিষ্ট সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩১২)

আজকালকার পব্লিক্ উদ্যোগগুলির সঙ্গে

প্রাকৃতসাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?

শিক্ষিত সমাজের আন্দোলন অধিকাংশই রাজনীতি-ঘটিত। ইহার সহিত অশিক্ষিত জনসাধারণের সম্পর্ক ঘটান এখন সহজ বোধ হয় না। বিবিধ খবরের কাগজ আজকাল এই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিতেছে। কিন্তু যাহারা নিজে পড়িতে জানে না, অপরের পড়া শুনে মাত্র, তাহাদের নিকট ছাপা কাগজের বাক্য দৈববাণী-স্বরূপ। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শোনে, সব কথা বুঝিতে পারে না এবং নিজের যে কোন কর্ত্তব্য আছে, সে কথা তাহাদের মনেই উঠে না। ফলকথা, ভারতবর্ষ বলিয়া একটা বৃহৎ দেশ আছে, তাহা আমাদের দেশ; সেই বৃহৎ দেশে যে যেখানে বাস করে, সে আমাদের জাতিভাই, তাহার সুখদুঃখে আমাদের বেদনা দেখান আবশ্যক, এই বৃহৎ দেশের ভাগ্যবিধান যে রাজার হাতে, তাহাকে কোনরূপে ধরা পাকড়া করা উচিত, এ জ্ঞানটাই জনসাধারণের মধ্যে এখনও জন্মায় নাই। শিক্ষিতের মধ্যেই যে জন্মিয়াছে, ইহা ষোল আনা সত্য নহে। এই জ্ঞানটা যত দিন না হইতেছে—সঙ্কীর্ণতা, গ্রামিকতা

ও সামাজিকতা ছাড়িয়া একটা বৃহৎ দেশের ও বৃহৎ জাতির সহিত সম্পর্ক-জ্ঞান যত দিন না জন্মিতেছে, তত দিন শিক্ষিতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অশিক্ষিতে যোগ দিবে না ও শিক্ষিতের ভাষাও অশিক্ষিতে বুঝিবে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে ঝিকারগাছায় এক বৃহৎ মেলা ডাকিয়া শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিতের যোগ-ঘটনার চেষ্টা হইয়াছিল। ঐরূপ মেলার সহিত নানারূপ তামাসা যোগ করিলে অনেক লোক জুটিতে পারে এবং উহা দ্বারা লোকশিক্ষার নানা কাজ হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা চলিবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, বৃহৎ জনসভার মধ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হইবার সম্ভব; তাহা হইলে অচিরে উহার মূলোচ্ছেদের আশঙ্কা। দ্বিতীয়তঃ, রাজনীতির তত্ত্ব জনসাধারণকে তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বুঝাইতে গেলে অনেক বড় কথাকে ছোট করিতে হইবে, ছোট কথাকে বড় করিতে হইবে, আসল কথাকে বিকৃত—যা নয়, তা বলিতে হইবে ও অমূলক অস্বাভাবিক আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইবে। উহা রাজা প্রজা, উভয়েরই পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

আমার বিবেচনায় এখন সাহিত্যের দিক্ দিয়া সমাজের উপরের ও নীচের স্তরে যোগের চেষ্টা আবশ্যক, এবং অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া শিক্ষিতের মুখের বড় বড় কথা অশিক্ষিতের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। আধুনিক সাহিত্য কেবল শিক্ষিতের জন্য, অশিক্ষিত উহার ভাষাও বুঝে না, উহার ভাবও হৃদ্গত করিতে পারে না। এমন সাহিত্য চাই, যাহা দ্বারা জাতীয় ভাব ও রাষ্ট্রীয় ভাব অশিক্ষিতের মধ্যে জন্মাইতে হইবে।

প্রাচীন সাহিত্য কেবল পৌরাণিক কথায়, রামকথায় ও কৃষ্ণকথায় আবদ্ধ ছিল। আধুনিক সাহিত্য রামকথা ও কৃষ্ণকথা বর্জ্জন করিয়াছে—কাজটা খুব ভাল হয় নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছে, তাহাতে শিক্ষিতের তৃপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিতের প্রবেশ নিষেধ। অশিক্ষিতের উপর এখনও প্রাচীনপন্থী গায়ক ও কথক, যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, কীর্ত্তনিয়া ও ভিখারীর দলের একাধিপত্য—ছাপাখানার আধিপত্য তাহার নিকট কিছুই নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেদের কথা ও পুরাণের কথা, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার সঙ্গে রামানুজ

শঙ্করাচার্য্যের কথা, কুরুপাণ্ডবের সঙ্গে অশোক হর্ষবর্দ্ধনের কথা, রাজপুতের, মারাঠার ও শিখের কথা, চীন জাপান ও ফরাসী জর্ম্মানির কথা, এই সকল সেই প্রাচীনপন্থী নায়ক ও কথক, যাত্রাওয়ালা ও কীর্ত্তনিয়া প্রভৃতির সাহায্যে মৃদঙ্গ, করতাল ও গোপীযন্ত্রের সহকারে জনসাধারণ-মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে না কি ?

এই একটা নূতন পথ আছে। এই পথে বঙ্গবাসী কৃষককে ক্রমশঃ বুঝান যাইতে পারে যে, পঞ্জাবের, রাজপুতনার, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ সিংহ, জয়চন্দ্র ও লক্ষ্মণসেন, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত, কালিদাস ও দিঙ্‌নাগ কোন্ কালে কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, পল্লীগ্রামের গৃহস্থ কৃষক ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র তাহার ফলভোগ করিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ বৃহৎ জাতীয় ভাব ও রাষ্ট্রীয় ভাবের ভিত্তি পত্তন হইতে পারে।

কিন্তু এই সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে প্রতিভা চাই। ইংরেজিশিক্ষিত ভিন্ন অন্যে ইহার সৃষ্টি করিতে পারিবে না, কিন্তু ইংরেজিনবীশকে এখনকার চলিত সাহিত্যের ভাষা ছাড়িয়া নূতন ভাষা গড়িতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শিক্ষিতের জন্য নূতন পথ সৃষ্টি করিয়াছে। অশিক্ষিতের জন্য এই নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে কে ? এই সাহিত্য যে-দিন জনসমাজে প্রচারিত হইবে ও জনসমাজ আগ্রহ করিয়া এই সাহিত্যের রস আস্বাদনে ছুটিবে; সেই দিন তাহাদিগকে রাষ্ট্রনীতি বুঝান কঠিন হইবে না, তখন তাহারা নিজেই দল পাকাইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখন পদ্মিনীর উপাখ্যানের* আদর নাই কেন ? পুরু-বিক্রম ও সরোজিনীর† শ্রেণীর নাটক লিখিত বা অভিনীত হয় না কেন ? ('ভাণ্ডার,' বৈশাখ ১৩১২)

---

* রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।—সম্পাদক।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।—সম্পাদক।

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ

এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল, কি মন্দ ?

শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন হওয়া উচিত, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি যতই উঁচুতে থাকেন, সমাজের ততই লাভ। শত মূর্খের অপেক্ষা এক পণ্ডিত পুত্র বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা করুক, ইহাই চাণক্য পণ্ডিতের সহিত আমরাও প্রার্থনা করি। এ বিষয়ে আবার বিবাদ কি ?

যেখানে বিবাদ, সেখানে অন্য পক্ষ নিরুত্তর। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জননীই কেবল পণ্ডিত প্রসব করেন না, এ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হয় না ; জননী প্রসববিষয়ে ঠিক কর্ত্তা নহেন, অনেকটা অধিকরণস্থানীয়।

একশটা সন্তানের মধ্যে নব্বইটা গণ্ডমূর্খ, নয়টা না পণ্ডিত না মূর্খ ও একটা পণ্ডিত জন্মে। বিশ্ববিদ্যালয় দুরূহ শিক্ষা ও কঠিন পরীক্ষায় পণ্ডিতকে বাছিয়া সর্ব্বজনমান্য করুন ; মূর্খগুলা প্রাইমারি স্কুলে কাগজে কলমে চাষ শিখুক ; কিন্তু মধ্যশ্রেণীর উপায় কি হইবে ? তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত ও কৃষিবিদ্যায় অনধিকারী। তাহাদের জন্য কি কেবল B class ও C classএর ব্যবস্থা ও চরম স্থান কেরাণীর ডেস্ক ? অন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এই মধ্যশ্রেণীর জন্য বহু বিদ্যার আলয় আছে। এ দেশে এই পঙ্গপালের আশ্রয়স্থান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাইয়া তাহারা তবু ভদ্রসমাজে স্থান পাইত। বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে তাহারা যায় কোথায় ? বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে উপাধি না দেন, একটা জীবনধারণের অনুমতি বা লাইসেন্স আপাততঃ দিতে এত আপত্তি কেন ?

তার পর আর একটা কথা—শিক্ষার আদর্শ দুরূহ হওয়া উচিত, পরীক্ষাও কঠিন হওয়া উচিত, কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতিটা সঙ্গে সঙ্গে তোলাইবার চেষ্টা উচিত নয় কি ? আগে ভাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিয়া কোন পরীক্ষা কঠিন করিলে কি ফল হইবে ? কিন্তু শিক্ষাদানের উন্নতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় না কেন ?

জর্ম্মনিতে, আমেরিকায়, জাপানে যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানে সে ব্যবস্থা করিবে কে? গবর্ণমেণ্ট কিছু বলেন না, দেশের লোকেও কিছু বলে না, পরস্পর মুখ চাহিয়া আছে মাত্র।

উচ্চশিক্ষা যত উচ্চ হয়, ততই ভাল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চ-শিক্ষকের প্রয়োজন, সে শিক্ষক কোথায়?

এ কালের উচ্চশিক্ষার সরঞ্জামে খরচ চাই—এখন ধান দিয়া লেখাপড়া হইবে না—দু লাখ দশ লাখের কাজ নয়, এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দু কোটি দশ কোটি আবশ্যক। মার্কিনের দেশে, জর্ম্মনিতে ও জাপানে সেইরূপ ব্যবস্থা। আগে সেইরূপ ব্যবস্থা কর, তার পর সেই সকল দেশের সঙ্গে এক তুলাদণ্ডে শিক্ষার তুলনা করিও।

নূতন আইনে ত বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ের কি করেন, দেখিতে চাই।

দেশের বড়লোকের কাছে হাত পাতিয়া বিশেষ ফল হইবে না। এ কালের বিদ্যাদান তাহাতে হয় না। অন্য দেশে গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষায় কি খরচ করেন, সেটা একবার দেখা আবশ্যক।

বাগানে ভাল ভাল গাছ থাকিলেই বাগানের শোভা, কিন্তু মালী যদি কেবল আগাছা উপড়াইবার জন্যই ব্যস্ত থাকে, তাহাতে ভাল গাছ ত জন্মায় না, আগাছা উপড়াইয়াও অত পাওয়া যায় না। ভাল গাছের চারা পুঁতিয়া উচিতমত সার গোবরের বন্দোবস্ত আবশ্যক।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। সকল বিষয়েরই দেশকালপাত্র-বিবেচনা আছে। ঐ বিবেচনাদির নাম কাণ্ডজ্ঞান।

কাণ্ডজ্ঞানটা বর্জ্জন করা ঠিক নহে। যিনি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যালেণ্ডারের পাতায় লম্বাচৌড়া Syllabus ছাপাইয়া দেশ উদ্ধার করিতে চাহেন, তিনি নিতান্তই "উৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি।"
('ভাণ্ডার,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)

প্রশ্ন

১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের Revenue হইতে অংশ লইতেন কি না? কত লইতেন? এ দেশের খরচ-খরচা বাদে যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত, তাহা কোম্পানির নিকট যাইত কি না?

২। কোম্পানির বাণিজ্যক্ষমতালোপের পর অংশীদারেরা কোথা হইতে কত লাভ পাইতেন?

৩। কোন্ তারিখ হইতে কোম্পানির দেওয়ানি রাজত্বে পরিণত হইল?

৪। বাদশাহের মোহর ও টাকা কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানির মিণ্টে তৈয়ার হইত ও এ দেশে চলিত ছিল? তত দিন পর্য্যন্ত এ দেশের Sovereign কে ছিল—বাদশাহ বা কোম্পানি না ইংলণ্ডের রাজা?

৫। কোম্পানি ভারতবর্ষের কোন দেশ জয় বা অধিকার করিয়া বাদশাহের নিকট পৃথক্ সনন্দ লইতেন কি না? [মনে হইতেছে, কোথায় পড়িয়াছি—সিপাহী হাঙ্গামা পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রথা ছিল।]

৬। ইংলণ্ডের রাজা আমাদের রাজা হইলেন কোন্ তারিখে ও কোন্ আইনে? Regulating Act, না Pitt's India Bill, না Charter বদলের সময়, না কোম্পানির জীবনান্তে?

৭। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধ, কে কাহার নিকট ঋণী? কে আগে, কে পরে?

৮। বৌদ্ধ মার—খৃষ্টানী শয়তান—হিন্দু কে? [নির্ঋতি? কন্দর্প? কলি?] হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধের পূর্ব্বে মারের উল্লেখ আছে কি না?

৯। ভৈরবীচক্র ও পঞ্চ মকারের উৎপত্তি কবে ও কিরূপে? তান্ত্রিকের মদ্যমাংস ব্যবহারের সহিত খৃষ্টানী Eucharist-এর কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক আছে কি? ('ভাণ্ডার,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, কি নাই, এই বিচারে দুই দলের দুই রকম কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক দল বলেন, ভারতবর্ষের পুরাতন রাজাদের কোন ধারাবাহিক বিবরণ রাজতরঙ্গিণী ও দুই একখানা গ্রন্থ ব্যতীত কোথাও লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। রাজবংশের উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির কোন সংবাদই কোন গ্রন্থে যখন নাই, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই। অপর পক্ষ বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস মূলতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসই নহে; উহা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস মাত্র; অতএব ইউরোপে যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহা না থাকিলেও ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, এ কথা ভিত্তিহীন।

আমার বিবেচনায় উভয় পক্ষের কথাতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস মূলতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাস নহে, উহা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস। ইউরোপে রাজার বা রাষ্ট্রনায়কের সহিত সমাজের যে সম্পর্ক, ভারতবর্ষে সে সম্পর্ক কখনও ছিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসী রাষ্ট্রনেতার মুখের অপেক্ষা না করিয়াই অনেকটা স্বাধীন ভাবে আপনার সমাজতন্ত্র চালনা করিয়াছে; অতএব ইউরোপের ইতিহাস যেরূপ, ভারতবর্ষের ইতিহাস সেরূপ হইতেই পারে না। ইহা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রের ইতিহাসই বা কোথায়? বৈদিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ কোথায়? সেই পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের জন্য যে ধারাবাহিক বিবরণ আবশ্যক, সেই বিবরণ কোথায়?

বলা বাহুল্য, ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য-নিরূপণ না হইলে, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধনিরূপণ চলে না। আগে কি ছিল, পরে কি হইল, কত আগে এইরূপ ছিল, কত পরে এইরূপ হইল, ইহা না জানিলে কার্য্যকারণসম্বন্ধের নির্ণয় কিরূপে হইবে? কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণের উপায় নাই; অন্ততঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরুষেরা সেই উপায় রাখিয়া যান নাই। অতীত কাল বর্ত্তমানের পশ্চাতে আপনার কায়

প্রসার করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেই অতীতের কোন্ স্থানে সমাজের কোন্ চিত্রপটখানি দেখিতে পাইতেছি, তাহা স্পষ্টভাবে নিরূপণের কোন উপায় নাই।

ভারতবর্ষের যে প্রাচীন সাহিত্য রহিয়াছে, তাহার সহিত পরিমাণে বা গৌরবে অন্য কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যের তুলনা হয় না। হয় ত এই সাহিত্যরাশির মধ্যে ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার প্রচুর উপাদান রক্ষিত আছে। অনুসন্ধান দ্বারা এই উপাদান-সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সাজাইয়া গোছাইয়া আমাদের সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। হইতে পারে মাত্র, কিন্তু এখনও হয় নাই। হয় ত চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তিতে এখনও বিলম্ব আছে।

আবার রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসকে একবারে উপেক্ষা করিলে ভারতবর্ষেও চলিবে না। উদাহরণস্বরূপ মৌর্য্যবংশের উত্থানের সহিত বৌদ্ধ পন্থার বিস্তারের ও গুপ্তবংশের উত্থানের সহিত বৈদিক পন্থার পুনরভ্যুদয়ের সম্পর্কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বুদ্ধপন্থা আশ্রয় না করিলে ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র কোন্ পথে চলিত, বলা কঠিন। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতেই পারে না।

যে শক্তির দ্বারা সমাজতন্ত্রের রক্ষা ও পরিচালনা ঘটে, আমাদের শাস্ত্রে তাহার পারিভাষিক নাম ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের সংস্থাপন-কর্ত্তা রাজা নহেন; যাঁহারা এই ধর্ম্মের সূত্রগুলির আবিষ্কার করিতেন ও দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হন নাই। এই সনাতন বস্তুর মূল কোথায়, তাহার ঠাহর না পাইয়া, তাঁহারা ইহাকে অনাদি বলিয়াই স্থির করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে রাজা ধর্ম্মের সংস্থাপকও নহেন, ব্যবস্থাপকও নহেন; কিন্তু রাজা ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; ইহা শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। রাজা সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইয়া ধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম পলায়ন করেন, ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে; অতএব রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রকে একবারে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

সম্প্রতি বিদেশী লোক আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মের একাঙ্গে ব্যবস্থাপকের পদ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা নিজের ইচ্ছামত আমাদের আইন তৈয়ার করেন। ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধ; প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতার এই ক্ষমতা ছিল না। আবার ধর্ম্মের অপরাঙ্গে হস্তক্ষেপে এই বিদেশী রাজা সাহসী হন না; আমাদের religion ও আচার ব্যবহারকে ইহারা আইনের আমলে আনেন না। ভালই করেন; কিন্তু ধর্ম্মের এই অঙ্গের রক্ষার ভার, যাহা রাজার উপরে শাস্ত্রমতে অর্পিত আছে, সেই রক্ষার ভারও তাঁহারা লন নাই; আমরাও তাঁহাদিগকে দিতে সম্মত হইব না; অতএব ধর্ম্মের এই অঙ্গ সম্প্রতি অরক্ষিত। বিধর্ম্মী রাজা আমাদের ধর্ম্মের একাঙ্গে ব্যবস্থাপকের কাজ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য অঙ্গের রক্ষার ভার গ্রহণেও সাহসী হন নাই। এই দুই কারণে বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মবিপ্লব। আমরা যাহা চাহি না, রাজা জোর করিয়া তাহা আমাদিগকে দিয়া থাকেন; আমরা যাহা চাই, রাজার তাহা দিবার শক্তি নাই ও সাহস নাই, কাজেই ধর্ম্মবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থা ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা নহে। এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি।

রাষ্ট্রতন্ত্রের সহিত যখন সমাজতন্ত্রের এইরূপ সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিপ্লব—বিশেষতঃ যে রাষ্ট্রবিপ্লব বিদেশীকে ও বিধর্ম্মীকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষমতা দেয়, সেই রাষ্ট্রবিপ্লব—ধর্ম্মবিপ্লব ডাকিয়া আনে; সমাজতন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করে। কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাস না থাকিলে, সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাস নাই; অতএব সমাজতন্ত্রের ইতিহাসও খণ্ডিত, অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ না হইয়া উপায় নাই। রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্রেরই একটা অঙ্গ। রাষ্ট্রতন্ত্রের ফ্রেমের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পট বাঁধিতে হইবে; ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না।

আমাদের পৌরাণিক সমাজতন্ত্রে রঘুকুল, কুরুকুল, যদুকুলের কি স্থান ছিল, কে নির্ণয় করিবে? তাঁহারা সম্প্রতি নামমাত্রাবশেষ; বিস্মৃতির জলে, আমরা যতটা পারি, তাঁহাদিগের নিদর্শন ধুইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ চিত্র, আর আমরা আঁকিতে পারিব কি? অন্য জাতির সহিত এইখানে আমাদের ধাতুগত প্রভেদ।

অতীতের প্রতি আমাদের কোন মমতা নাই। যাহা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। মহাকাল যাহাকে কুক্ষিগত করিয়াছেন, তাহার ছায়া ধরিয়া রাখিয়া কি হইবে?

অন্য জাতির ধাতু অন্যরূপ। অতীতের যতটুকু পার, রক্ষা কর। সবলে আটকাইয়া আঁকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা কর। কাজটা অসাধ্য-সাধন; যে গত, সে আর থাকিবে কি করিয়া? তথাপি তাহার চিহ্নগুলি, তাহার নিদর্শনগুলি ধরিয়া রাখ। যতটুকু পার, তাহার বিকৃত অস্পষ্ট ছায়াটাকে কোনরূপে ফটোগ্রাফ্ করিয়া ধরিয়া রাখ। যতটুকু নিদর্শন থাকে, তাহাই লাভ।

আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের গতপ্রাণ দেহ গঙ্গাতীরে ভস্মসাৎ করিয়া থাকি; অস্থি কয়খানির ভস্মটুকুও গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া থাকি। চিতানলের হু হু শব্দটুকু কেবল সারাজীবন ধরিয়া কানে বাজে। অন্য দেশের লোক, তাহাদের প্রেত-প্রীতিপাত্রের অবশেষটুকুকে তেল মাখাইয়া, মশলা মাখাইয়া রক্ষা করে; তাহার উপর পাথরের স্তূপ গাঁথে, পিরামিড্ তোলে, তাজমহল নির্ম্মাণ করে; যাহা পৃথিবীর ধূলি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর ধূলির স্তূপ তুলিয়া তাহাকে ফুলের মালা দিয়া সাজায় ও সন্ধ্যাদীপে আলোকিত করিয়া তাহাকে আঁধারের শূন্যতা হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা পায়।

কেন উভয়ের মধ্যে এই ধাতুগত বিভেদ, এই প্রশ্নের সমাধানের ভার পাঠকগণের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। ('ভাণ্ডার,' শ্রাবণ ১৩১২)

স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়

[স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও কাল্পনিক পদার্থ। নিম্নোক্ত কথাগুলি পড়িবার সময় বর্ত্তমান বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ-কল্পনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।]

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিম্নশিক্ষা (Primary education) সম্পূর্ণভাবে গবর্মেণ্টের হাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক মাত্র নাই। মধ্যশিক্ষার সহিতও বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিশেষ সম্পর্ক নাই; কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা কোন্ বিষয়ে কতটুকু অভিজ্ঞতা থাকিলে কালেজে উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার পাইবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই দেখেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী কালেজ আছে; উহাতে পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দেশ করিয়া ও পরীক্ষাতে উপাধি প্রদান দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্র মাত্র; শিক্ষাদান তাহার কাজ নহে। ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে মাত্র।

উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রতি বিশেষ কিছু নাই; সরকার কয়েকটি Postgraduate research scholarship দিয়া থাকেন, আর প্রেমচাঁদ-বৃত্তি আছে; এতদ্দ্বারা কালেজ ছাড়ার পর কয়েক বৎসর যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চ্চা চলে মাত্র।

ফলে নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। বাংলা পাঠশালায় নিম্নশিক্ষা পাইয়া যাহারা ইংরাজি স্কুলে মধ্যশিক্ষার জন্য প্রবেশ করে, তাহাদিগকে নূতন করিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হয়। পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যা বড় কাজে লাগে না। কিছু দিন হইল, গবর্মেণ্ট নিম্নশিক্ষার সহিত মধ্যশিক্ষার মিশাইবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা সকলে গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিলেও উহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। আবার মধ্যশিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকায় যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কালেজে প্রবেশ করে, তাহারা কালেজে প্রবেশের উপযুক্ত হয় না। ছাত্রেরা এফ্. এ. পরীক্ষাটা একরকমে উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু বি. এ. পরীক্ষায় গিয়া ধরা পড়ে। শতকরা বিশ জন উত্তীর্ণ হইলেই যথেষ্ট হয়।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান; কাজেই বি. এ. পরীক্ষান্তে এম্. এ. হইবার জন্য অধিক লোক অপেক্ষা করে না; বি. এ. পরীক্ষাতেই শিক্ষার সমাপ্তি হয়।

এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং, এই তিন ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীর এ স্থলে একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবিকাসংস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনধীন কতিপয় টেক্‌নিকাল্ স্কুল আছে; সঙ্কল্পিত কৃষিকালেজ এখনও কাল্পনিক বস্তু।

অন্য কোন ব্যবসায়শিক্ষার কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। অতএব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ—

(১) নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা পরস্পর অসম্বদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন; এতদ্দ্বারা শক্তির ও সময়ের অপচয় ঘটে।

(২) উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।

(৩) বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক শিক্ষার আবশ্যকমত ব্যবস্থা নাই।

(৪) পাণ্ডিত্য লাভের জন্য অল্প লোকেই শিক্ষার্থী হয়; যাঁহারা পাণ্ডিত্য লাভের ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদেরও অর্জ্জিত বিদ্যা তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

(৫) সমুদয় শিক্ষাপ্রণালী বিদেশের আমদানি; জাতীয় প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যের অভাবে শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ হয়।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দোষগুলি পরিহারের চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জীবিকার্থীর জন্য ও দেশের ধনাগমের জন্য শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষা যাহাতে জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া ফলপ্রসূ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ স্থলে শিক্ষার ফল অর্থে জ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানবর্দ্ধন ও জ্ঞানপ্রচার।

নিম্নশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে একটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করিবেন, উহার নিম্নের শ্রেণীতে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চতর শ্রেণীতে মধ্যশিক্ষা প্রদত্ত হইবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ রহিবে না। মোটামুটি পাঁচ হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শ স্কুলের পাঠ্য নির্দ্দেশ করিবেন ও শিক্ষক নিয়োগাদি দ্বারা স্কুলে আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এই বিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় বহন করিবেন।

সহর ও মফস্বলের যে সকল স্কুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে এই আদর্শ বিদ্যালয়ের অনুসরণ করিবেন। এইরূপ স্কুল দেশ ছড়াইয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ আদর্শ স্কুল পরিচালনায় অত্যধিক ব্যয়ের আশঙ্কা নাই। তবে সহর মফস্বলের অন্যান্য স্কুলগুলি আদর্শানুরূপ চালিত হইতেছে কি না, তাহার পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে পরিদর্শক নিয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। তাহাও ভবিষ্যতে।

এই সকল স্কুলে শিক্ষান্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কালেজে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শ কালেজ স্থাপনের আবশ্যকতা এখন নাই। সহর মফস্বলের বেসরকারী তৈয়ারি কালেজগুলির মধ্যে যদি কেহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহারাই সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কালেজ চালাইবার ব্যয়ভার হইতে আপাতত নিষ্কৃতি পাইবেন। পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণান্তে প্রশংসাপত্র দান ও আবশ্যকমত কালেজগুলির পরিদর্শন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্যমধ্যে থাকিবে। পরীক্ষার্থীদের প্রদত্ত ফী দ্বারা ব্যয়ের অধিকাংশ চলিতে পারে। এখানেও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পরীক্ষাযন্ত্র হইবে মাত্র। কিন্তু এই বন্দোবস্ত এখন কিছু দিনের জন্য।

নিজ রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে পাঠ্য বিষয়-নির্ব্বাচনে ছাত্রদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃষ্ট হইলে ও প্রবেশিকার standard উচ্চ থাকিলে এখনকার কালেজে চারি বৎসরের অধ্যয়নের ফল তিন বৎসরে পাওয়া যাইতে পারে। কালেজে অধ্যয়নসমাপ্তির পর যাঁহারা বাহির হইবেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা বর্ত্তমান বি. এ. উপাধিধারীর অনুরূপ হইতে পারে। যদি কোন বেসরকারী কালেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অবশ্য অন্যরূপ বন্দোবস্তের দরকার হইবে।

অধিকাংশ ছাত্রই এই স্থলে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যবসায় ও শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারে অথবা গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা ও বিদ্যার্জ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইবে না।

উচ্চতর শিক্ষা

এই অল্পসংখ্যক জ্ঞানার্থী ছাত্রের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে ও তজ্জন্য যথোচিত ব্যয়ভার স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংখ্যায় অল্প হইলেও, এই সকল জ্ঞানার্থী ছাত্রই দেশের শিরোভূষণ হইয়া জাতীয় প্রকৃতি গঠনে ও জাতির উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবেন।

ইঁহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যয়ে laboratory, museum, library-সমন্বিত পাঠশালা স্থাপন আবশ্যক এবং সেইখানে স্বদেশী ও আবশ্যক হইলে বিদেশ হইতে আনীত জ্ঞানিসমাজে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে। ইঁহারা অধ্যাপনা করিবেন ও ছাত্রদিগের জ্ঞানার্জ্জনে ও নূতন সত্যাবিষ্কারে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করিবেন। অধ্যাপকেরা স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জনে ও জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত থাকিবেন। এই পাঠাগারে শিক্ষার দুইটা স্তর হইতে পারে।

(১) প্রথম দুই বৎসর ছাত্রেরা অধ্যাপকের অধীন থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন। দুই বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইঁহাদের মর্য্যাদা বর্ত্তমান M. A.গণের অনুরূপ হইবে, কিন্তু শিক্ষার standard উচ্চতর হওয়া উচিত।

(২) যে কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা ও অবসর পাইবেন। তাঁহাদের জীবিকার জন্য যথোচিত বৃত্তি বা বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এক এক ব্যক্তি কেবল এক এক বিষয় লইয়া নিযুক্ত থাকিবেন। বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি ইঁহাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। এই পাঠাগারের ব্যবস্থা এরূপ হইবে, যাহাতে দেশে

বর্ত্তমান টোল এবং মাদ্রাসা প্রভৃতির কৃতবিদ্য ছাত্রগণ বা অধ্যাপকগণও এখানে আসিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ পাইতে পারেন।

ব্যাবহারিক শিক্ষা

(১) দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত করা আবশ্যক। (২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরকারী চাকরির বা সরকারী আদালতে ওকালতি প্রভৃতির আশা রাখিবেন না; অতএব তাঁহাদের জীবিকার সংস্থান আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী।

বৈষয়িক শিক্ষা।—জমিদারী বা মহাজনী কার্য্যের জন্য বৈষয়িক শিক্ষার প্রয়োজন। সম্প্রতি কর্ম্ম পাইবার ঐ একটা প্রধান পথ হইবে। ইহাতে আইনের জ্ঞান হইতে জরিপ-পরিমিতির জ্ঞান পর্য্যন্ত আবশ্যক। হিসাব রাখা হইতে shorthand ও typewriting পর্য্যন্ত দরকার।

আইনশিক্ষা।—ওকালতির পথ রুদ্ধ; অতএব আইনশিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে না। তবে Jurisprudence ও law of the land যেটুকু জানা আবশ্যক, তজ্জন্য ব্যবস্থা liberal educationএর অঙ্গীভূত করিয়া সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই ফেলা চলিবে।

চিকিৎসা।—বেসরকারী চিকিৎসাবিদ্যালয় যাহা আছে বা স্থাপিত হইবে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আনিয়া তদ্দ্বারা চালান যাইতে পারে।

অন্যান্য ব্যবসায়।—এ স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য দুইটা কিংবা তিনটা স্তরনির্দ্দেশ আবশ্যক।

নিম্ন স্তরে কৃষি ও দেশে প্রচলিত ব্যবসায়গুলির (তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতির) উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। সহরে ও মফস্বলে ছোট ছোট স্কুল সাধারণের খরচে স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ কয়েকটি স্কুল এখনও বর্ত্তমান আছে।

উচ্চ স্তরে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান (mechanics, physics, chemistry, political economy, geography) প্রভৃতির ভিত্তির উপর বিবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে। এ স্থলেও বিদেশ হইতে আনীত

অথবা বিদেশে শিক্ষিত শিক্ষক আবশ্যক। দেশে যে সকল শিল্প নাই, তাহার প্রবর্ত্তনা ও যাহা আছে, তাহার উন্নতি মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

অন্যান্য

ব্যায়াম।—শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিলে ছাত্রদিগকে কেবল পুঁথির উপর সমস্ত সময় দিতে হইবে না, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার তাহারা যথেষ্ট অবসর পাইবে। অল্প ব্যয়ে সাধ্য দেশের উপযোগী ব্যায়ামচর্চ্চার অবসর দেওয়া উচিত।

ধর্ম্ম।—আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা উচিত। ছাত্রদিগকে আপন ধর্ম্মচর্চ্চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।

নীতি।—পুঁথিদ্বারা নীতিশিক্ষা হয় না। গুরুশিষ্যের মধ্যে দেশের পুরাতন সম্বন্ধ স্থাপন আবশ্যক। উহাই প্রশস্ত পথ। ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকের অনুচরত্বে বা ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। পুঁথিতে স্বদেশের ও বিদেশের মহাপুরুষদের উন্নত চরিত্রের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

স্বদেশী ভাব।—বিদ্যারম্ভ হইতেই অল্পে অল্পে ছাত্রদিগকে সাধ্যমত স্বজাতিসেবায় নিযুক্ত করা আবশ্যক। সেবাকর্ম্ম দ্বারা স্বদেশী ভাবে জাগ্রত করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য

(১) নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্য আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনা ও পরিচালনা। ঐ আদর্শে পরিচালিত সহরের ও মফস্বলের অন্যান্য স্কুলের পরিদর্শনের ব্যবস্থা। এই কার্য্যের জন্য ব্যয় আবশ্যক।

(২) উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শ কালেজ স্থাপনা সম্প্রতি আবশ্যক নাই। যে সকল বেসরকারী কালেজ ইচ্ছাপূর্ব্বক বা কোন কারণে বাধ্য হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তাঁহারাই উচ্চশিক্ষার ভার লইতে পারেন। তাঁহাদের জন্য পাঠ্যনির্দ্দেশ ও পরীক্ষা গ্রহণাদির ব্যবস্থা করিতে অল্পই ব্যয় হইবে।

যদি কোন বেসরকারী কালেজ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া না আসিতে চাহেন, তাহা হইলেও সম্প্রতি কালেজ

স্থাপনের আবশ্যকতা দেখি না। তবে যদি অধিক ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও ছাত্রদত্ত বেতনে কালেজের ব্যয়নির্ব্বাহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কালেজ প্রতিষ্ঠা বিবেচনাধীন হইবে। স্বদেশী স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। উহাদের কিয়দংশ technical school বা collegeএ যাইবে। অপর অংশ বেসরকারী কালেজে ex-studentরূপে ভর্ত্তি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে। তাহাদের স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে মাত্র।

(৩) উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠাগার ও তৎসংসৃষ্ট library, laboratory, museum প্রভৃতির স্থাপনা। তজ্জন্য অধ্যাপক নিয়োগ ও জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা। এই কর্ম্ম বহু ব্যয়সাধ্য। আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যমধ্যে রাখিতে হইবে।

(৪) নিম্ন ও উচ্চ স্তরের ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা। ইহার জন্যও প্রচুর ব্যয় আবশ্যক। এখানেও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব (১), (৩) ও (৪)এর জন্য আপাতত ব্যয় আবশ্যক। যেরূপ অর্থসংগ্রহের আশা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই তিন কার্য্যই আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শেষ কথা

সম্প্রতি তিনটা বৃহৎ ব্যাপার আমরা হাতে লইয়াছি। (১) শিল্পশিক্ষা ও শিল্পের উন্নতির জন্য National Fund; (২) Federation Hall; (৩) National University। তিনটা বৃহৎ কার্য্য এক বৃহত্তর কার্য্যের অঙ্গ করিয়া লইতে পারিলে ব্যয়সংক্ষেপ ও শক্তির অপচয়নাশ ঘটিতে পারে।

National Fundএর সংগৃহীত অর্থ জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যাবহারিক শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয়ে বাধা দেখি না। উভয় Fundএর কর্ত্তৃপক্ষ পরামর্শ করিয়া ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন।

Liberal ও technical শিক্ষার জন্য যে পাঠাগার, library, museum, laboratory, workshop প্রভৃতি হইবে, তাহা Federation Hall এর কিয়দংশে স্থান পাইতে পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ আবশ্যক না হইতেও পারে।

এই তিন কাজকে এক কাজের অঙ্গ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ('বঙ্গদর্শন,' অগ্রহায়ণ ১৩১২)

গ্রামদেবতা

এই প্রবন্ধে জেমোকান্দি নামক গ্রামের প্রধান গ্রাম্য দেবতার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তৎপূর্ব্বে জেমোকান্দির সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক। মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ—ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে বীরভূমির সীমানা পর্য্যন্ত কান্দি মহকুমা। কান্দি মহকুমার উত্তরাংশে দ্বারকা ও মধ্যভাগে ময়ুরাক্ষী নদী বীরভুম জেলা হইতে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদয় নদী মিলিত হইয়া বাবলা নাম ধরিয়া ভাগীরথীর সমান্তর প্রবাহে কিছু দূর গিয়া কাঁটোয়ার উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

গত সেনসাস্ তালিকার মতে কান্দি মহকুমার বিবরণ এইরূপ—কান্দি সবডিবিশন—আয়তন ৫১২ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা—৮৮৪, গৃহসংখ্যা—৭১১৯৮, লোকসংখ্যা—৩,৩৪,০৫৩; থানা অনুসারে লোকসংখ্যা—(১) কান্দি—৩১৯২৪, বরোঁয়া—৬৯,৮০৬, খড়গাঁ—৬৩,৭৭২, ভরতপুর—১,২১,৯৪৭, গোকর্ণ—৪৬,৬০৪। মহকুমায় হিন্দু—২,১৯,৯৭৩, মুসলমান—১,১২,১১৪, প্রেতোপাসক (animist)—১৯১৬।

ময়ুরাক্ষী নদীর পূর্ব্বতীরে কান্দি বা জেমোকান্দি, মিউনিসিপালিটির অধীন নগর—লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০; পাঁচ ওয়ার্ডে বিভক্ত—কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া, ছাতিনাকান্দি।

কান্দি ও ভরতপুর থানার সমুদয় ও বরোঁয়া ও গোকর্ণের কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা। স্থানীয় কিংবদন্তী যে, আকবর বাদশাহের আমলে ফতেসিংহ নামক হাড়ি রাজার অধিকারে থাকায় পরগণার ঐ

নাম হয়। রাজা মানসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠান দমনে আসেন, সেই সময়ে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী বুন্দেলখণ্ডবাসী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করিয়া ঐ পরগণা দিল্লীর অধীন করেন ও মানসিংহের কৃপায় ফতেসিংহের জমিদারী পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সবিতার বংশধরেরা তদবধি ফতেসিংহের অধিকারী আছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলে জমিদারি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এক খণ্ডের অধিকারীরা বর্ত্তমান জেমোর রাজা ও অন্য খণ্ডের অধিকারীরা বাঘডাঙ্গার রাজা নামে ফতেসিংহে পরিচিত। বাঘডাঙ্গার অধিকৃত ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কান্দির উত্তরে খড়গ্রাম থানার অন্তঃপাতী সেরপুর আতাই গ্রামে মানসিংহ ওসমানের অধীন পাঠানসেনা ধ্বংস করেন।

কান্দি মহকুমা উত্তর-রাঢ়প্রদেশের উত্তরাংশ—কান্দি গ্রাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কেন্দ্র। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্দি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন; সেখান হইতে তাঁহাদের বংশীয়েরা বাঙ্গলা ও বিহারে বিস্তৃতি লাভ করেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান কান্দি—ঐ অঞ্চলে তাঁহার বংশধরেরা কান্দির রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ—কলিকাতায় তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজপরিবার নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালে কান্দির এণ্ট্রান্স স্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি যাহা কিছু সৌষ্ঠব, সমস্তই লালাবাবুর বংশের প্রসাদে অনুষ্ঠিত।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে উত্তররাঢ় একটু বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ফতেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঙামাটি গ্রাম—যাহাকে অনেক পণ্ডিতে হুয়েংচ্যাং-বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানীর অবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। ঐ স্থান বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী, কান্দি বহরমপুর হইতে অষ্টক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে।

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যূন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫।১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের অবস্থিতি এইরূপ দেওয়া আছে—

১। অট্টহাস—দেবী ফুল্লরা—লুপলাইন আমেদপুর ষ্টেশনের নিকট।
২। কিরীট—দেবী বিমলা—বহরমপুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত।
৩। নলহাটী—দেবী কালিকা—লুপলাইনে নলহাটি ষ্টেশন।
৪। বহুলা—দেবী বহুলা—কাঁটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রাম।
৫। ক্ষীরগ্রাম—দেবী যুগাদ্যা—কাঁটোয়ার সন্নিহিত।
৬। বক্রেশ্বর—দেবী মহিষমর্দ্দিনী—বীরভূম সিউড়ির নিকট।
৭। নন্দিপুর—দেবী নন্দিনী—লুপলাইন সাঁইথা ষ্টেশন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির বাসহেতু কান্দির সমীপবর্ত্তী কতকগুলি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। যথা—(১) ভরতপুর—গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতা হৃদয়ানন্দের বাসস্থান। তাঁহার বংশধরদের গৃহে চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর-চিহ্নিত যে গীতাগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার ফটোগ্রাফ ভারত-শিল্পপ্রদর্শনীতে সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। (২) মালিহাটি—শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের বাসস্থান। (৩) টেঁয়া—দ্বিজ হরিদাস এবং বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের বাসভূমি। (৪) ঝামটপুর—কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি। (৫) উদ্ধারণপুর—উদ্ধারণ দত্তের নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

এই প্রবন্ধে কান্দির প্রধান গ্রামদেবতার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। দেবতার নাম রুদ্রদেব—কান্দি ও পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অধিবাসী ইঁহার ভক্ত উপাসক। রুদ্রদেবের বর্ত্তমান মন্দির কান্দির অন্তর্গত জেমো গ্রামে অবস্থিত; ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদার জেমো ও বাঘডাঙ্গার রাজারা তাঁহার সেবাইত। Journal of the Asiatic Society, Part III (Anthropological Part), No I, 1898, গ্রন্থে এই দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল; প্রবন্ধের নাম "On a Rain Ceremony from the District of Murshidabad," লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিলে মন্দিরস্থ দেববিগ্রহকে কলসী কলসী জল তুলিয়া একবারে জলমগ্ন করিতে পারিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন; মন্দিরের দ্বার ও ছিদ্রাদি বন্ধ করিতে আপত্তি নাই; নতুবা ঘরের ভিতর জল দাঁড়াইতে পারিবে না। রুদ্রদেবের মানস করিয়া লোকে শূল প্রভৃতি ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ

করে। রুদ্রদেবের পাণ্ডারা কুকুরদংশনের ও সর্পদংশনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

দেবতার ইতিহাস এই,—সিংহোপাধিক উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের মূল-পুরুষ অনাদিবর সিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধর বনমালী সিংহ ময়ুরাক্ষীতীরে বন কাটিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন ও তদবধি কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালীর বংশধর রুদ্রকণ্ঠের সময়ে কামদেব ব্রহ্মচারী নামক সিদ্ধ সন্ন্যাসী বৃক্ষারোহণে আকাশপথে কামরূপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, তিনি ময়ুরাক্ষীতীরে অবতীর্ণ হইয়া কান্দিতে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার নিকট দুইটি দেববিগ্রহ ছিল; উভয়কেই তিনি কালাগ্নিরুদ্রমূর্ত্তি বোধে উপাসনা করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য আদি গোঁসাই; রুদ্রকণ্ঠ সিংহও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রুদ্রকণ্ঠকে বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করিয়া পূজার ভার দিয়া যান। পরবর্ত্তী কালে ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা রুদ্রকণ্ঠের বংশধরের নিকট বিগ্রহদ্বয় কাড়িয়া লন। তদবধি বিগ্রহদ্বয় ফতেসিংহের জমিদারের নিকট গৃহদেবতা ও সর্ব্বসাধারণের নিকট গ্রামদেবতারূপে পূজিত হইতে থাকেন।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বে "দাদুরঘাটা" উপলক্ষ্যে বিগ্রহদ্বয় সমারোহে গঙ্গাতীরে স্নানার্থ নীত হইত। গঙ্গা কান্দির চারি ক্রোশ পূর্ব্বে। একবার স্নানের সময় বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর বিগ্রহ অন্তর্হিত হন ও গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুর গ্রামে প্রকাশ হন। তদবধি তিনি উদ্ধারণপুর গ্রামে অবস্থান করিয়া তত্রত্য জনসাধারণের পূজা পাইতেছেন; এবং জেমোর দেবতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জেমো ও উদ্ধারণপুর, উভয় স্থলেই পূজা ও অনুষ্ঠানের প্রণালী একরূপ; চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বে গাজনের পূজা উদ্ধারণপুরে এক দিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ পরে বুঝান যাইবে।

উক্ত কিংবদন্তী হইতে কামদেব ব্রহ্মচারীর আনুমানিক কালনির্ণয় হইতে পারে। ফতেসিংহের বর্ত্তমান জমিদারেরা সবিতাচাঁদ দীক্ষিতের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ; আর পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর রুদ্রকণ্ঠ সিংহ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ। সবিতাচাঁদ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা মানসিংহের সহিত এ দেশে আসিয়া-

ছিলেন, অতএব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামদেব গোস্বামী ও রুদ্রকণ্ঠ সিংহ বর্ত্তমান ছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে রুদ্রদেবের গাজন বা বার্ষিক উৎসব। ১৯শে চৈত্র উৎসবের আরম্ভ; তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবতা বেশভূষা করিয়া "বার" বা 'দরবারে' বসেন। পরিচারক ভক্ত ও দর্শকেরা ঢাকের বাদ্য সহ মন্দিরে উপস্থিত হন। বেতনভোগী পূজক ও পরিচারক ব্যতীত অবৈতনিক কর্ম্মচারী ও পরিচারক অনেকগুলি আছেন; সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকে পুরুষানুক্রমে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্মান বোধ করেন। কর্ম্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ যথা—

১। পূজক ও পরিচারক ব্রাহ্মণ—ইঁহারা ভূমিসম্পত্তি বা বেতন ভোগ করেন।

২। দেয়াশীল ৩। বিষয়া ৪। মঢ়ানা ৫। মলমতি ৬। স্বর্ণমতি	ইঁহারা নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; দেবতার শয্যা, অলঙ্কার, পরিচ্ছদাদি ইঁহাদের জিম্মা।
৭। কোতোয়াল ৮। থানাদার ৯। চৌকিদার ১০। নকিবদার	ইঁহারা শান্তিরক্ষাদি কর্ম্মে নিযুক্ত
১১। ছড়িদার ১২। আশাবরদার ১৩। শোটাবরদার ১৪। আড়ানিবরদার ১৫। নিশানবরদার ১৬। চামরবরদার	ইঁহারা বারের সময় দেবতার পার্শ্বে সসজ্জ হইয়া উপস্থিত থাকেন ও মিছিলের সময় সঙ্গে যান।

১৭। মের্দ্ধা—সংখ্যায় চল্লিশ জন, ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী চল্লিশখানি গ্রামের প্রতিনিধি। গ্রামস্থ লোক রুদ্রদেবের প্রজা; মের্দ্ধাগণ প্রজামধ্যে মণ্ডলস্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন যাহারা গাজনের সময় ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের নাম 'ভক্ত'। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল বাউড়ি পর্য্যন্ত সকলেই ব্রতগ্রহণে অধিকারী; শ্রেণীভেদে তিন দিন হইতে পোনের দিন পর্য্যন্ত ব্রতগ্রহণের নিয়ম। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের ব্যবস্থা উপবাস, সন্ধ্যার পর ফল মূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন—স্কন্ধে "উত্তরী" ও হস্তে "বেত্রদণ্ড"; উত্তরী রেশমে বা কার্পাসসূত্রে নির্ম্মিত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভক্তেরা অপরাহ্নে গ্রামস্থ নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান করেন ও পরস্পরের গলায় "উত্তরীয়" পরাইয়া ব্রত গ্রহণ করেন। এইরূপে সহস্রাধিক লোকে ব্রতগ্রহণ করেন; নিম্নশ্রেণীর লোকই অধিক।

সন্ন্যাসীদের শ্রেণীভেদে উপাধিভেদ ও কর্ম্মভেদ আছে। যথা—

১। কালিকার পাতা—ইহারা পিশাচবেশে মৃত নরদেহ লইয়া নৃত্য করে, অনুষ্ঠানের নাম "মড়া খেলা"।

২। মায়ের পাতা—ইহারা ডাকিনী সাজিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পরিচ্ছদ রাঙা কাপড়, গলায় ফুলের মালা, গায়ে রূপার গহনা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে আবিরের প্রলেপ, হাতে বেত্রদণ্ড, মুখে চীৎকার ইহাদের লক্ষণ।

৩। চামুণ্ডার পাতা—ইহাদের সাজসজ্জাও ঐরূপ বিকট; উপরন্তু মুখে মুখোস পরিয়া ইহারা নাচে, অনুষ্ঠান "মুখোস খেলা" বা "মোস খেলা"।

৪। লাউসেনের পাতা—ইহারা লাউ, কুমড়া প্রভৃতি হাতে লইয়া নাচে।

৫। ধূলসেনের পাতা—ইহারা ধূলি ছড়ায়।

৬। ব্রহ্মার পাতা—ইহারা হোমাগ্নি বহন করে।

৭। জলকুমরির পাতা—ইহারা খেচুরি ভোগ জলে ডুবায়।

ঐ সকল সন্ন্যাসীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; তদ্ব্যতীত সাধারণ ভক্তের সংখ্যার কোন নির্দ্দেশ নাই; এবং সাধারণ ভক্তের সংখ্যাই অধিক।

১৯শে চৈত্র বার বা উৎসবের আরম্ভ। ঐ প্রথম দিনের সায়ংকালে অনুষ্ঠান "কাঁটা ভাঙা,"—এ দিন সন্ন্যাসীরা কাঁটাগাছের ডালে শয্যা রচনা করিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দেয়। তৃতীয় দিন পুনরায় কাঁটা ভাঙা। ষষ্ঠ দিনে সন্ধ্যার পর "সিদ্ধি ভাঙা"—সে দিন সকলে সিদ্ধি খায়। নবম

রাত্রিতে "চোরা জাগরণ,"—সে দিনও কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। দশম রাত্রি "জাগরণ"—এই দিন সমারোহ-ঘটনা। সহস্র সন্ন্যাসী ও সহস্রাধিক দর্শকে মন্দির ও পার্শ্বস্থ স্থান পূর্ণ হয়; সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাদ্য ও জনকোলাহল; প্রত্যেক গ্রাম হইতে ভক্তের দল মের্দ্ধার অধীনতায় ঢাকের সহিত মন্দিরে উপস্থিত হয়। মায়ের পাতা, চামুণ্ডার পাতা প্রভৃতি সকলে আসিয়া নাচিতে থাকে। গভীর রাত্রে "শাঁখ চুরি"—পূজার দ্রব্যমধ্য হইতে একটা শঙ্খ হঠাৎ অদৃশ্য হয়, কোতোয়াল চৌকিদার প্রভৃতি চোর ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করে, শেষে দর্শকমধ্য হইতে চোর ধরা পড়ে, তাহার বিচারশেষে দণ্ড হয় এক মুদ্রা। বলা উচিত, একই ব্যক্তি প্রতি বৎসর শাঁখ চুরির জন্য ধরা পড়িতেছে, এবং সে পুরুষানুক্রমে শাঁখচোর। শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান "মড়া খেলা"—বীভৎস ব্যাপার। "কালিকার পাতা"রা আস্ত মড়া—মনুষ্যের শবদেহ,—অনেক সময় গলিত শব আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধুঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্ব্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা মাথা। শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্য্যত্বে সংশয় নাই। কান্দি মহকুমায় গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা উপলক্ষ্যেও এই বীভৎস অনুষ্ঠান চলিত আছে; ১২৮৮ সাল হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বাস্থ্যরক্ষার অছিলায় কান্দির মিউনিসিপালিটির এলাকার মধ্যে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তদবধি মড়াখেলা বন্ধ হইয়াছে, এখন কালিকার পাতারা কেবল নাচে, কখনও বা নারিকেলফলে নরমুণ্ডের অনুকল্প করে।

ওয়াডেল সাহেব তাঁহার Lamaism or Buddhism in Tibet নামক গ্রন্থে লামাদের অনুষ্ঠিত যে সকল পৈশাচিক অভিনয়ের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পড়িলে বোধ হয়, তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত অনুষ্ঠানের সহিত এই "মড়াখেলা" অনুষ্ঠানের কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকিতে পারে।

সূর্য্যোদয়ের পর দেবতাকে পালকিতে চাপাইয়া ময়ূরাক্ষীতীরে, যেখানে কামদেব ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে, সেইখানে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামের ভদ্রলোক পালকি বহন করেন; আপামর সাধারণ সমারোহে

কোলাহল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। নদীতীরে উপস্থিতির পর অহোরাত্রের অনুষ্ঠান যথা :—

১। অভিষেক—অর্থাৎ যথাবিধি স্নান।

২। পূজা, হোম, বলিদান ;—পূজান্তে পায়সান্ন ভোগ।

৩। "দাতুর ঘাটা"—রুদ্রকণ্ঠ সিংহের কোন বংশধরের আনীত তেল মাখাইয়া দেবতাকে নদীর জলে স্নান করান হয়। পূর্ব্বে এই দাতুরঘাটার জন্য দেবতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। দ্বিতীয় বিগ্রহের অন্তর্দ্ধানাবধি উহা বন্ধ হইয়াছে।

৪। সমাগত উপাসক ও দর্শকদিগের প্রদত্ত পূজা, ভোগ, প্রণামী।

৫। রাত্রিকৃত্য,—উদ্ধারণপুরে দাতুরঘাটা পূর্ব্বদিনে সম্পাদিত হয় এবং এই দিন সেখানকার মন্দির বন্ধ থাকে। সেখানকার দেবতা অদ্যাপি কামদেব ব্রহ্মচারীকে ভুলেন নাই। অদ্য রাত্রিতে তিনি ময়ূরাক্ষীতীরে ব্রহ্মচারীর সমাধির উপর বসিবার জন্য অদৃশ্য ভাবে উপস্থিত হন। পূজক ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত পদ্ধতিক্রমে উভয় দেবতার একসঙ্গে পূজা করেন। নিদাঘকালে তান্ত্রিক আচারে পূজা হয়। পূজার নিয়ম, সাধারণের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। পূজার পর মৎস্যসহ খেচুরি ভোগ। ভোগের যাবতীয় উপকরণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়। জমিদারের পক্ষের গোমস্তা ভিক্ষার দ্রব্য লইয়া আগে হইতে উপস্থিত থাকেন। ভোগের পর জলকুমরির পাতা সেই অন্ন নদীজলে অর্পণ করে। ইহাতে নানা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে—কোমরে কাছি বাঁধিয়া জলকুমরিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; নদীতীরে লোকে দড়ি ধরিয়া দাঁড়ায়। তিনি অন্নের হাঁড়ি মাথায় লইয়া জলে ডুব দেন ও তখনই অচেতন হইয়া পড়েন। অচেতন হইতেই হইবে। তীরবর্ত্তী লোকে দড়ি টানিয়া তাঁহাকে উপরে তোলে ও চৈতন্য সম্পাদন করে।

পরদিন পুনরায় পালকি চাপিয়া সমারোহ সহকারে মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। এই দিন চৈত্রসংক্রান্তি। মন্দিরে আসিয়া পুনরায় স্নান পূজা হয় ; সাধারণে পূজা দেয় ও বহু ছাগশিশুর বলিদান হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা আপন গ্রামের নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করিয়া উত্তরী ত্যাগ করিয়া ব্রত সমাপন করেন। পূর্ব্বে এই দিন চড়ক হইত ; এখন তাহা নিষিদ্ধ।

অপর পৃষ্ঠায় [আর্ট প্লেটে] জেমো ও উদ্ধারণপুর, উভয় স্থানের দেবমূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। গত অগ্রহায়ণ মাসে [১৩১৩] সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়কে ফটো-গ্রাফার সমেত ঐ প্রদেশের স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহারাই এই ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উভয় প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছিল। তিনি নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"জেমোর রুদ্রদেবের মূর্ত্তি বস্তুতঃ শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। শাক্যমুনি পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট :—পার্শ্বে বোধিসত্ত্বগণ ও দেবগণ বর্ত্তমান—পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা অবস্থিত। উপরে পালঙ্কের উপরে মহাপরিনির্ব্বাণোন্মুখ বুদ্ধদেব শয্যাশায়ী। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি। গলদেশে যজ্ঞসূত্র ব্যতীত নাগোপবীতের চিহ্ন রহিয়াছে—সমাধিমগ্ন বুদ্ধদেবও নাগবেষ্টিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ললাটে তৃতীয় লোচনের চিহ্ন আছে। এই তৃতীয় লোচনও সম্ভবতঃ নাগোপবীতবৎ উত্তরকালে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বুদ্ধমূর্ত্তি বহু স্থানে মহাদেবের মূর্ত্তিতে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

উদ্ধারণপুরের বিগ্রহ ভৈরবমূর্ত্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহার নাম বজ্রভৈরব, হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রচূড় বা রুদ্রভৈরব। তাঁহার চারি হাত; তিন চক্ষু, গলে নরমুণ্ডমালা; এক হাতে বজ্র ধরিয়া ডাকিনী পিশাচী প্রভৃতিকে শাসন করিতেছেন। অন্য হাতে পদ্মদল; উর্দ্ধে সর্পফণা। উভয় পার্শ্বে ভৈরবের শক্তি নারীমূর্ত্তি। ভৈরবকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা কম্পিতকলেবরে অবস্থিত।"

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত রুদ্রদেব সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"জেমোর রুদ্রদেবের মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম; সেই সময় আমার সন্দেহ হয় যে, ইহা বুদ্ধমূর্ত্তি। আমি, এই মূর্ত্তি যে বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছি। এই প্রমাণ কলিকাতা মিউজিয়ামের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মূর্ত্তিটি একটি বৃহৎ পদ্মের উপরিস্থিত সিংহাসনে আসীন। প্রকাশিত চিত্র দেখিলে বোধ হইবে যে, নিম্নলিখিত সাধনা এই মূর্ত্তিরই ধ্যান। মূর্ত্তির মস্তকের উপর একটি বৃক্ষের

দুই একটি শাখা দেখা যায়, ইহা মহাবোধিদ্রুম। বৃক্ষশাখার উপরে পর্য্যঙ্কে শয়ান অপর একটি মূর্ত্তি আছে। ইহা মৃত্যু বা মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র। মূর্ত্তির মস্তকের দুই পার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট ধর্ম্মচক্র মুদ্রাস্থিত দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। স্কন্ধের দুই পার্শ্বে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান অপর দুইটি মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন। ইহা বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভকালের মূর্ত্তি। এই সময়ে তিনি বোধিদ্রুমতলে বজ্রাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত Auguste Foucher (অগস্ত ফুসে) নেপাল হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুথির মধ্যে বজ্রাসনস্থ বুদ্ধের সাধনা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই—

অথ বজ্রাসনসাধনা।

"শ্রীমদ্‌বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারকম্‌ আত্মানং ঝটিতি নিষ্পাদয়েৎ। দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্ম্মারসংঘটিতমহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিতবামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধুক-রাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং (সেবনকবিগ্রহং) বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্মধাতুস্বভাবাত্মকোঽহং ইত্যদ্বয়াহঙ্কারং কুর্য্যাৎ।

তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্ত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজং জটা-মুকুটধারিণং গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লবধরবামকরং। তথা বামে লোকেশ্বরং বোধিসত্ত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধারিদক্ষিণভুজং কমলধারিবামকরং এতদ্‌দ্বয়ং ভগবন্মুখং অভিবীক্ষ্যমানং পশ্যেৎ।"*

জেমোর রুদ্রদেবের মন্দিরের উঠানে বাঁধান বেদির নীচে এক চণ্ডালীর মুণ্ড সমাহিত আছে। এককালে ঐ মুণ্ডের ভয়ে গ্রামের লোকে বিব্রত হইয়াছিল। রাস্তায় পথিক দেখিলেই ঐ মুণ্ড লাফ দিয়া কামড়াইতে যাইত। কিছুতেই উহা শাসন মানে নাই। অবশেষে কালিকার পাতরা উহাকে ধরিয়া রুদ্রদেবের নিকট খেলাইলে উহা শান্ত হয়।

---

* সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয়ের নিম্নে তারার ও বাম পার্শ্বে লোকেশ্বরের নিম্নে সুধনকুমারের মূর্ত্তি আছে।—Foucher, Etude sur L'iconographie Bouddhique De L' Inde, Denxieme Partie p. 16 and fig. 1.

তৎপরে উহাকে সমাহিত করা হইয়াছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে আরও কতকগুলি নরমুণ্ড সমাহিত আছে।

এই প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কান্দি মহকুমার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায়, ক্বচিৎ বা জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মের মন্দির কোথাও মাটির কুটীর, কোথাও বা তাহারও অভাব ;—অশ্বথাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া বৎসরান্তে পূজা দেয়—গ্রামের লোকেই উদ্যোগকারী—জমিদারের নামে পূজার সঙ্কল্প হয়—জমিদার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পূজার সাহায্য করেন। প্রকৃত-পক্ষেই ধর্ম্ম গ্রামদেবতা ; গ্রামের যাবতীয় লোকে সেই পূজার নির্ব্বাহের জন্য দায়ী। ধর্ম্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের খাজনা আদায়কারীর কাছারিতে, কোথাও বা গ্রামের টাউন হলে পরিণত।

পূর্ণিমার গাজনে নিম্নশ্রেণীর লোকেই ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। ঢাকের বাদ্য ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথাও বা হোমের ও বলিদানের ঘটা আছে।

পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রি 'জাগরণ' ; তৎপূর্ব্বরাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন 'বাণ গোঁসাই' গ্রাম্য বালকের মাথায় চাপিয়া ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গোঁসাই দীর্ঘাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড—কাষ্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে। গৃহস্থ স্ত্রীরা বাণ গোঁসাইকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া চাউল ভিক্ষা দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তণ্ডুলে ধর্ম্মরাজের পূজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা। মাঝে মাঝে "বোলান" গীত। শেষ রাত্রিতে "মুখোস" খেলা ; বিকট মুখোস পরিয়া ভক্তেরা নৃত্য করে। রাত্রিশেষে "মড়াখেলা"—রুদ্রদেবের মড়াখেলার অনুরূপ।

মড়াখেলার সময় কালিকার পাতারা ডাকিনীর বেশে শবের চারি দিকে উপবেশন করে—শবের গায়ে আবির মাখায়—শবকে লইয়া নানাবিধ সোহাগ করে—মন্ত্র তন্ত্র পড়ে—চারি দিকে বেষ্টন করিয়া গান গায় ও ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে। গানের দুই চারিটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

১। ওরে সাজ্‌লে—

ধূল ধূল ধূল, সাজলে, ধূল ধূল ধূল।
প'ড়েছে মায়ের পাতা উদম করে চুল॥ [উদম = মুক্ত]

২। ওরে সাজ্‌লে—

শ্মশানে গিয়েছিলাম মশানে গিয়েছিলেম, সঙ্গে গিয়েছিল কে?
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই সঙ্গে সেজেছে॥

৩। ওরে সাজ্‌লে—

কা'ল বাছা খেয়েছিলে টুকুইভরা মুড়ি।
আজ বাছার মুণ্ড যায় ধূলায় গড়াগড়ি॥
[টুকুই = তালপাতায় নির্ম্মিত মুড়ি খাইবার ক্ষুদ্র পাত্র]

৪। ওরে সাজ্‌লে—

সোণার আঁচির সোণার পাঁচির সোণার সিংহাসন।
তার উপর ব'সে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥ [পাঁচির = প্রাচীর]

৫। ওরে সাজ্‌লে—

কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বা'ল।
আজ, পুত্রশোকে আকুল হলেম, কেবা দিলে গা'ল॥
[বা'ল = বাইল = শাখা ; গা'ল = গালি]

৬। ওরে সাজ্‌লে—

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ তামার বাটি।
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ ঢাকের কাঠি॥

৭। ওরে সাজ্‌লে—

তুই ত মেরা ভাই, সাজ্‌লে, তুই ত মেরা ভাই।
তোর সঙ্গে গেলে, সাজ্‌লে, শিব দরশন্ পাই॥
[মেরা = আমার]

৮। ওরে সাজ্‌লে—

ভাল বাজালি ঢেকো ভেয়ে তোর মা আমার মাসী।
এনোদ্ ক'রে বাজা সাজ্‌লে বেনোদ্ ক'রে নাচি॥

[ঢেকো = ঢাকবাদক ; ভেয়ে = ভাইয়া = ভাই ; এনোদ্ = আনন্দ ; বেনোদ্ = বিনোদ]

মধ্যাহ্নে "ভাড়ার আনা"—ভক্তেরা দূরের কোন জলাশয় হইতে কলসী ভরিয়া জল তোলে ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাচিবার সময় মূর্চ্ছার অভিনয় হয়—দেবতা মূর্চ্ছাগ্রস্তে "ভর" দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্তকথা, নানা ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া ফেলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নের রৌদ্রে নাচ—তাহাতে সর্ব্বত্র মূর্চ্ছা-অভিনয় না হইতেও পারে। তৎপরে পূজা, হোম, বলিদান। সন্ধ্যার সময় 'দাত্বর ঘাটা'; ধর্ম্মঠাকুর—এক বা একাধিক সিন্দূরমণ্ডিত শিলাখণ্ড পূজারির মাথায় চাপিয়া স্নান করিতে যান ও স্নানান্তে মণ্ডপে মিছিল সহ ফিরিয়া আসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ "বাণ ফোঁড়া"; একদল লোক পেটের দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিন্ধাইয়া কাঁটার দুই অগ্রভাগ একত্র করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায়; নেকড়ায় তেল দিয়া আগুন জ্বালে ও আগুনের উপর ধুনা ছিটাইলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাই বাণফোঁড়া। ইহার সহিত "শঙ" থাকে ও বাদ্যভাণ্ডের অনুষ্ঠান থাকে। রাত্রিকালে যাত্রা প্রভৃতি কবিগানের অনুষ্ঠানে উৎসব সমাপন। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩১৪ সাল)

ব্যাধি ও প্রতিকার

শ্রাবণের [১৩১৪] 'প্রবাসী'তে রবিবাবুর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া যে কয়টা কথা মনে হইল, তাহাই লিখিতেছি। বলা বাহুল্য যে, প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে।

দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রুকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ কর।

আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু

পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই রবিবাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন; এবং বঙ্গবিভাগের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল। অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক্কা পাইয়া বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল—না, আমরা আর ইংরেজের কাছে ঘেঁষিব না, উহাদের ছায়া স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিব না। আমরা এখন বুঝিলাম যে, ইংরেজ তোষামোদের কেহ নয়; কেহ ভাবিলেন, ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া বরং কিছু আদায় হইতে পারে; অন্যে বলিলেন, ভয় দেখানর প্রয়োজন নাই; যেটুকু পার, নিজে কর, ইংরেজের নিকট কাঙালের মত হাত পাতিও না। এইরূপে একরকমেরই কথা আমরা পাঁচ জনে পাঁচ রকমে ঘোরাইয়া সাজাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল আস্ফালন বেশী, কাহারও ছিল ডিপ্লোমাসি বেশী। আমরা দল বাঁধিয়া “স্বদেশী” হইয়া পড়িলাম। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে আমাদের সমুদয় চেষ্টা ছিল ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অভিমুখে, পরে চেষ্টা দাঁড়াইল পরাঙ্মুখে।

স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আস্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজ রাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্য্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি লাফালাফির কর্ম্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।

কাজ করিতে হইবে—এই কথাটা নূতন নহে। আমাদের আস্ফালনের ও চীৎকারের মাত্রা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখনও এক দল—যাঁহারা বিজ্ঞের দল বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কেবলই বলিতেছিলেন—চীৎকার ছাড়, কাজ কর। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাও "কাজ কর," "কাজ কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া কেবল চীৎকারের পরিমাণই বাড়াইতেছিলেন, উপদেশের পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্বয়ং কিঞ্চিৎ কাজ করিলে আমরা একটা কর্ত্তব্যের আদর্শ দেখিতে পাইতাম, দেশও উপকৃত হইত।

এ পক্ষ হইতে বলা হইতেছিল, কেন—আমরা কি কেবলই চেঁচাইতেছি? কাজ কি কিছুই করিতেছি না? শ্রাবণের 'প্রবাসী'রই "কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য" প্রবন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, আমরা এক বৎসরে ভারতে আমদানি কাপড়ের মূল্য (৩৯) কোটি টাকা হইতে ৩৭ কোটি টাকায় নামাইয়াছি, ইহা কি কাজ নহে? আর এই যে বঙ্গলক্ষ্মী মিল, শিক্ষা-পরিষৎ, টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটুট ইত্যাদি, এ সকল কি কাজ নহে? দুই বৎসরের চেষ্টার পক্ষে ইহা কি একেবারেই নগণ্য? রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই এ সকলকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন না; বরং উহাদিগকে গণ্য করিয়াই আরও একটু ভিতরে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, কেবল বড় বড় কাজ কেন, আরও ছোট ছোট কাজ আমাদের অনেক আছে; যে যেমন ব্যক্তি, সে তেমনই ভাবে আপনার ক্ষমতার অনুযায়ী কাজ হাতে লইয়া লাগিয়া যাও; দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা, কৃষি, শিল্প, অন্নদান, বিচার ইত্যাদি সহস্র ছোট বড় কাজ আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে, উহাতে যে যেমনে পার, লাগিয়া যাও। অর্থাৎ গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য কেমন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, সেইরূপ কাজ—শিল্প-শিক্ষা-সভা যেমন চাঁদা তুলিয়া ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইতেছেন, তেমনি কাজ—নিম্নশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা বিস্তারের জন্য যেমন বঙ্গের নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ কাজ,—জেলায় জেলায় কনফারেন্স বসিয়া যে সকল কাজের জন্য রেজোলিউশন করা হইতেছে, রেজোলিউশনের পরিবর্ত্তে সেই সকল কাজ,—স্বদেশী ভলন্‌টীয়ারেরা শান্তিরক্ষা ও স্বদেশী প্রচারের জন্য যেমন হাটে মাঠে ঘুরিতেছেন, মাথার পাগ্‌ড়ি ও হাতের লাঠি কতকটা সংবরণ করিয়া সেইরূপ কাজ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজের জন্য সর্ব্বসাধারণকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সাড়া

পাইতেছেন না, সেইরূপ কাজ—এই ধরনের এবং আরও নানান ধরনের কাজ আমাদিগকে হাতে লইতে হইবে। এবং এইরূপ কাজ হাতে লইয়া, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিলে গায়ের বল বাড়িবে, নিজের আভ্যন্তরিক শক্তির সহিত সবিশেষ পরিচয় ঘটিবে এবং দেশের লোকের সহিত কর্ম্মসূত্রের অথবা কর্ম্মরজ্জুর বন্ধনযোগে "স্বদেশ" নামক কাল্পনিক বস্তুটার কাল্পনিকত্ব ঘুচিবে এবং স্বদেশের সহিত মর্ম্মগত সম্বন্ধ ও তৎসহকারে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ স্থাপিত হইবে। দল পাকাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে, ভাল; দল পাকাইতে না পার, আপনার চেষ্টায় যে যা পার, হাতে লও; তাহাতেই স্বদেশের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, স্বদেশকে অন্তরঙ্গভাবে আত্মীয়ভাবে চিনিতে পারিবে, স্বজাতি একটা জীবন্ত রক্তমাংসে গঠিত পদার্থ বলিয়া জানিতে পারিবে। রবিবাবুর উপদেশের তাৎপর্য্য আমি ইহাই বুঝিয়াছি।

আরও বুঝিয়াছি যে, রবিবাবু কেবল 'কাজ কর', 'কাজ কর' বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন না, বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার দুই একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।

আজ রবীন্দ্রবাবু যাহা বলিতেছেন, বহু বৎসর হইল, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঠিক সেইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি ও সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় এই উপদেশ স্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। ইংরেজকে তিনি বেশ করিয়া চিনিতেন—রবিবাবুও যেমন চেনেন, তিনিও তেমনি চিনিতেন। তবে তাঁহার ভাষায় সেরূপ তীব্রতা বা উত্তেজনা ছিল না, তিনি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া রোগীকে নাচাইতেন না—কিন্তু তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আমাদের কোন্ পথে চলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে বন্দনা করিতে বলিয়াছেন, ভূদেবও সেই মাকেই আমাদের আরাধ্যাস্বরূপে দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—শক্তিসঞ্চয় ভিন্ন আমরা সেই জননীর পূজায় সফল হইব না। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে—"আমাদিগকে কূর্ম্মনীতি অবলম্বন করিতে হইবে"—যত দিন আমরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তত দিন আমাদের পিঠ কাছিমের খোলার মত শক্ত করিয়া, সেই খোলার

আড়ালে লুকাইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। শক্তি জন্মাইবার পূর্ব্বে গলা বাড়াইয়া দাঁত দেখাইলে মরণ ধ্রুব।

'প্রবাসী'র প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশকে আমি ভূদেববাবুর সেই পুরাতন উপদেশ হইতে অভিন্ন মনে করি; এবং অস্বাভাবিক আস্ফালনে বলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এই পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত নহি।

গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব বটে, কিন্তু সেই পথেও কাঁটা আছে কি না, ভাবিবার বিষয়। বাস্তবিকই আমরা সেই পথেও বিনা বাধায় চলিতে পাইব কি না, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

যাঁহারা বলেন, রাজনীতির চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যান্য উপায়ে স্বহস্তে স্বদেশের হিতকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁহাদের উপদেশও বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ অনেকেই বলিতেছেন, "স্বদেশী"কে রাজনীতির সহিত জড়ান একবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের "অনেষ্ট্ স্বদেশী" থাকাই কর্ত্তব্য। এই শেষ কথাটা আমি একেবারেই বুঝিতে পারি না। দেশের শিল্পের উন্নতিই "অনেষ্ট্ স্বদেশী"র একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন আমাদের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, আমরা যে পরিমাণে নিজের তৈয়ারি জিনিস ব্যবহার করিব, বিলাতের তৈয়ারি জিনিসের আমদানি ঠিক সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তখন এই "অনেষ্ট্ স্বদেশী"ই বা কিরূপে মাথা তুলিবে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পীর কোষে অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মজুরেরা অন্নাভাবে মনিবের জানালা ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের শাসননীতি নিদ্রামগ্ন হইয়া নাক ডাকাইবে, ইহা কি বিশ্বাস্য? যত দিন ইংরাজের বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে, তত দিন অনেষ্ট্ স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু? বলা বাহুল্য, বাইবেলের ইংলণ্ডীয় রাজসংস্করণমধ্যে বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে বেয়নেট ধরিতে কোথাও নিষেধ নাই।

শুধু শিল্প বাণিজ্য কেন, আজ যদি ইংরেজ বলেন, তোমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে রাজভক্তি শিখাইবার সম্যক্ ব্যবস্থা নাই, উহা উঠাইয়া

দেওয়া হউক ; তখন এক অর্ডিনান্সের ধাক্কায় কলিকাতার শিক্ষা-পরিষৎ ও টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটুট হইতে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পর্য্যন্ত সমস্তই লীলাসংবরণে বাধ্য হইবে। আর যাঁহারা আজকাল জাহাজে চাপিয়া জাপান, মার্কিন প্রভৃতি মুলুকে শিল্প শিক্ষা করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা যে জাহাজে চাপেন, স্বদেশী কোম্পানী সে জাহাজের পরিচালক নহেন, তাহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য ; বিদেশে যাইয়া এ দেশের ছেলেরা নীতিভ্রষ্ট হইতেছে, এই হেতুবাদে বিংশ শতাব্দীর শাস্ত্রেও যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা কে বলিবে ? ফলে, চীৎকার না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা ; কিন্তু কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি ? এবং এখনও যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবে কি ?

যাঁহারা বলেন, আমরা কেবল চীৎকারেই পটু, কাজ করিতে আমাদের কোন পুরুষেই জানে না, তাঁহাদের কথা বিচার্য্য। দেড় শত বৎসর আগে যখন উমিচাঁদের দলীলে ক্লাইভের শ্রীহস্ত পড়ে নাই, তখন এ দেশের কাজ কে করিত ? তখন কি এ দেশে কোন কাজ হইত না ? সকলেই যোগে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিত ? হিন্দু মুসলমানের দেশ তখন ত হিন্দু মুসলমানেই চালাইয়াছে। এবং বলা বাহুল্য, রাজার কর্ত্তব্য তখন অতি অল্পই ছিল, দেশের প্রায় যাবতীয় কাজ দেশের লোকেই চালাইত। রাজা ও রাজপুরুষেরা অতি অল্প কাজই করিতেন ; তাঁহারা পরের সহিত লড়াই করিতেন, বাহিরে শত্রু না থাকিলে পরস্পর ঝগড়া করিয়া সময় কাটাইতেন, ছোট বড় বিদ্রোহ দমন করিতেন, ফৌজদার ও কাজি রাখিয়া শান্তিরক্ষা ও বিচার আচার কিছু কিছু চালাইতেন ; রাজার দরবারে যে অর্থী প্রবেশ লাভ করিত, তাহার প্রার্থনা শুনিতেন এবং মাঝে মিশালে বড় বড় রাজপথ বাঁধিয়া দিতেন বা তাহার আশে পাশে সরাই খুলিয়া, পুকুর কাটাইয়া, গাছ লাগাইয়া পথিকের উপকার করিতেন। কখনও বা নিষ্কর জমি পুরস্কার দিয়া, গুণী লোকের ও পণ্ডিত লোকের সম্মান করিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মের ও বিদ্যাচর্চ্চার ও গুণগরিমার সাহায্য করিতেন। আর দেশের বাকি সমুদয় কাজ ত দেশের লোকেই চালাইত। দেশের জমিদারেরা ছোটখাট রাজার মত শান্তিরক্ষা, বিচার আচার, বিদ্যাচর্চ্চাদির ব্যবস্থা করিতেন ; গৃহস্থ লোকে পুকুর কাটিয়া, গাছ পুঁতিয়া সাধারণের উপকার

করিত ; ভট্টাচার্য্যেরা টোলে বসিয়া তাৎকালিক উচ্চশিক্ষার ও গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া নিম্নশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, কথকেরা ও যাত্রাওয়ালারা কাব্যামোদের সহিত নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিত। গাঁয়ের "দশে" মিলিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিত, "পঞ্চায়েত" মিলিয়া সামাজিক দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দিয়া তাহার প্রতিবিধান করিত ইত্যাদি। আজকাল যে সকল কাজ সরকারের হাতে অথবা সরকারের অধীন বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির হাতে, সে কালে সেই সকল কাজ দেশের লোকেই সম্পাদন করিত। কেহ বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে, কেহ বা বাহবা লইবার জন্য করিত, কেহ বা দায়ে পড়িয়া করিত। কিন্তু দেশের কাজ ত চলিয়া যাইত। আর আজকাল যেমন সরকারের নিয়োজিত নানা দল আছে, তখনও এই সকল সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য নানা দল আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া গ্রামের কাজ চালাইত, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের লোক আপন আপন সমাজ শাসন করিতেন; কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি শিল্পীর দলে আপন আপন 'জাতি' ব্যবসায়ের রক্ষার ব্যবস্থা করিত ও আপন আপন শিল্পিসমাজের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করিত। এ সকল ত সর্ব্বজনপরিচিত কথা। হইতে পারে, এ-কালের মত ঢাক ঢোল ছিল না, এত রিপোর্ট লেখালেখি হইত না, এত কালি কলম, লাল ফিতার খরচ হইত না; হইতে পারে, এত শৃঙ্খলা ও এত শাসন ছিল না, এত বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত না; রেলওয়ে ছিল না, ডাকঘর ছিল না, এত আদালত ইস্কুল পুলিস ইত্যাদি ছিল না। নাই বা থাকিল? এক শ বৎসর আগে পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা রেলওয়ে, ডাকঘর ছিল, কালি কলম, লাল ফিতার এত খরচ ছিল? বরং লোকে কানাকানি করে, তখন এত দুর্ভিক্ষ ছিল না, ম্যালেরিয়া ছিল না, কলেরা ছিল না ইত্যাদি।

যাক, এত বড় একটা বিশাল দেশের কাজকর্ম্ম স্তূপাকার করিলে বিশালই হয় এবং সেই বিশাল কাজকর্ম্ম যত ছোট আকারেই হউক, সে কালে চলিয়া যাইত এবং রাজার সম্যক্ সাহায্য ব্যতীতও দেশটা বর্ত্তমান ছিল; দেশ জুড়িয়া এই জনসঙ্ঘও বর্ত্তমান ছিল। রাজশাসনের অভাবে বঙ্গদেশ বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায় নাই। বঙ্গদেশ ছিল বলিয়া ইংরেজ আজ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। পুরাতন চৌদ্দ পুরুষে

কোন রকমে কায়ক্লেশে দেশটাকে এত দিন ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ আজ এখানে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন।

যাহারা এত কাল ধরিয়া এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র জনসঙ্ঘের যাবতীয় কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই অধস্তন পুরুষেরা এই কয় বৎসর মধ্যে কাজ করিবার শক্তি এককালেই হারাইয়া বসিল, এ কিরূপ? এখন লোকে কাজ করিতে পারে না, কেবলই চীৎকার করে; যে কাজ করিতে বলে, সেও কেবল চীৎকারই বাড়ায়। ইংরেজ-রাজত্বের আগে দেশের সমস্ত কাজ আমরাই চালাইতাম, কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা আজকাল কাজ করি না, ইংরেজ সরকারের হাতে কাজ করিবার অধিকার অর্পণ করিয়াছি এবং তাঁহারা যে কাজটুকু আমাদের হাতে দিতেছেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধীন, অনুগত হইয়া সেইটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতেছি। ভগবান্ আমাদিগকে কর্ম্মে অধিকার দিয়াছিলেন, ফলের অধিকার দেন নাই; আমরা কিন্তু কর্ম্মের অধিকারটা ইংরেজ রাজার হাতে দিয়াছি এবং তাহার ফলে অধিকারী হইবার আশায় সন্তুষ্ট আছি। এ কালে যাহাকে Self Government বলে বা স্বায়ত্তশাসন বলে, তাহার অর্থ কি? আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ ইংরেজ রাজার আয়ত্ত শাসন। বড় জোর তাঁহার অনুমতি ও অনুগ্রহক্রমে তাঁহার অনুগত থাকিয়া যে শাসনক্ষমতাটুকু আমরা পাই, তাহাই আমাদের স্বায়ত্তশাসন। ইংরেজের স্থাপিত বা তাহার নিয়ন্ত্রিত ছোট বড় শাসন-যন্ত্র আমাদিগকে উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা দিতেছে, আমাদের শান্তিরক্ষা হইতে দুর্ভিক্ষে অন্নদান পর্য্যন্ত করিতেছে, আমাদের পথ ঘাট তৈয়ার করা হইতে নর্দ্দমা পরিষ্কার পর্য্যন্ত করিতেছে, আমাদের চিকিৎসা করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ আর কিছু দিন পরে আমাদের রন্ধনশালায় ও বাসরঘরে প্রবেশলাভ করিবে। আমরা পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি ও ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র হইয়া পড়িব। আমাদের সমুদয় কাজ রাজার হাতে দিয়া আমরা অতুল শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছি, ইহা সত্য কথা; কিন্তু ইহা প্রতিরোধের উপায় কি?

ইহার উত্তর হইবে,—কেন তোমরা পরের হাতে এ সকল দিতেছ? ঐ সকল কাজ রাজার হাতে না দিয়া নিজের হাতে গ্রহণ কেন করিতেছ

না? রবীন্দ্রবাবু বলিয়া আসিতেছেন, রাজার হাতে কাজের ভার দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কর্ম্মভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ এবং আজিকার স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত শিক্ষাই ইহাই। আমি এইখানে প্রশ্ন তুলিব, বাস্তবিকই আমরা কর্ম্মে অধিকার ইংরেজের হাতে আপনা হইতে তুলিয়া দিতেছি, না—ইংরেজ উহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়াই, আমাদের অনুমতির বা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই, আপনা হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন? আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের "মা বাপ" সরকার নিতান্তই আমাদের হিতচিকীর্ষা-প্রণোদিত হইয়া আমাদের হাত হইতে সকল কাজই ক্রমশঃ স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের ইচ্ছার বা অনুমতির কোন অপেক্ষাই করিতেছেন না। ইংরেজ-শাসনের ইতিহাসই ইহাই। ইংরেজকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি সত্য, কিন্তু আমরা নিজে হইতে ইংরেজকে কোন কার্য্যভার দিই নাই, ইংরেজ নিজ হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা তাহাতে আপত্তি করি নাই বা আপত্তি করিবার আমাদের কোন ক্ষমতাই দেখি নাই। যাঁহার হাতে এখন রাষ্ট্রশক্তি—বেয়নেট সমেত রাষ্ট্রশক্তি নিহিত আছে, তিনিই একে একে আমাদিগকে কর্ম্মে অব্যাহতি দিয়া স্বহস্তে সকল অধিকার গ্রাস করিতেছেন। আমরা কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিব? ইংরেজের এই হিতচিকীর্ষায় বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার আমাদের কোন শক্তি আছে কি?

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। সম্প্রতি একটা কথা উঠিয়াছে, গবর্মেণ্ট বিনা বেতনে দেশের মধ্যে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; এবং চাই কি, দেশের যাবতীয় বালককে সেই শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবেন। গবর্মেণ্টের আজকাল আর্থিক অবস্থা সচ্ছল; বিনা বেতনে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের পক্ষে অসাধ্য নহে; দেশশুদ্ধ বালককে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা আপাততঃ সাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু কখনই যে হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। Free education ও compulsory education এর প্রসঙ্গ শুনিয়াই আমাদের স্বদেশীদের মধ্যে অনেকে আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন; আমাদের মত ভুক্তভোগী, যাহারা সরকারী নিম্নশিক্ষার রস আস্বাদন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কিন্তু হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। যে শিশুদের স্কন্ধের উপর এই শিক্ষার ভার চাপিবে,

তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা আকুল হইতেছি। সে কথা যাক। গবর্মেণ্ট যদি আমাদের হিতার্থী হইয়া এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার শিশুকে সরকারের অধীন বা সরকারের অনুমোদিত পাঠশালায় প্রেরণে বাধ্য করেন, তাহা হইলে আমরা উহা ঠেকাইব কিরূপে? নিম্নশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট নূতন ট্যাক্‌স্ দেওয়া ব্যতীত আমাদের অন্য কার্য্য কি থাকিবে? সেদিনকার এক জেলা-কনফারেন্সে রেজলিউশন হইয়াছে দেখিলাম যে, এই শিক্ষাবিধানে যেন দেশের লোকের কর্ত্তৃত্ব থাকে। গবর্মেণ্ট দয়া করিয়া দেশের লোককে কিছু কর্ত্তৃত্ব দিতে পারেন। কিন্তু এখনও উচ্চ ও মধ্যশিক্ষার জন্য যাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্কুল কালেজ স্থাপনা ও পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদেরও আপনার স্থাপিত স্কুল কালেজের উপর কিছু কর্ত্তৃত্ব না আছে, এমন নহে। কিন্তু সে কর্ত্তৃত্বের মূল্য কি? রিজলি সার্কুলারেই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ। গবর্মেণ্টের বিনা অনুমতিতে বা অনুমোদনে যদি কেহ ছেলেদিগকে ক, খ, শিখাইবার জন্য পাঠশালা খুলিতে না পায় তাহা হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি থাকিবে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

গবর্মেণ্টের সর্ব্বগ্রাসী শক্তি সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়া নগরে, গ্রামে, গৃহকোণে, সর্ব্বত্র, যেখানে আমাদের যাহা কিছু স্বাধিকার ছিল, সমস্তই করতলগ্রস্ত করিতেছে ও করিতে থাকিবে, আমরা গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের অনুমোদিত প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের স্বাতন্ত্র্য পাইব মাত্র। ইহাই বর্ত্তমান কালের ভয়াবহ সত্য। কথা হইতেছে, এ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বর্ত্তমান কালে আমাদের যে, কোন কাজ নাই, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে; এখনও অনেক কাজ আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেখানে সরকারী হস্ত এখনও প্রসারিত হয় নাই। সে সকল কাজ আমরা এখনও কিছু দিন স্বাধীনভাবে করিতে পারি। আর বাস্তবিকই আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াও কিছুই যে করিতেছি না, এমনও নহে। দেশের বিশালতায় দৃষ্টি করিলে এখনও বোধ হয় প্রতিপন্ন হইবে যে, গবর্মেণ্ট আমাদের বৃহৎ সমাজতন্ত্রের যতটুকু কাজ চালাইতেছেন, দেশের লোকের সমবেত শক্তি তার চেয়ে বহুগুণ কাজ চালাইতেছে। কিন্তু

প্রত্যেক গ্রামে যেরূপ ভাবে চৌকিদার, দফাদার ও পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্টের পাহারা বসিতে চলিল, তাহাতে এই কর্ম্মক্ষমতাটুকু আর কত দিন থাকিবে, তাহা চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস দারোগার সঙ্গে ইস্কুলের দারোগা যখন প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরের উপর প্রভুত্ব চালাইবে, তখন আমাদের কি গতি হইবে, তাহাই চিন্তনীয়। বলা বাহুল্য যে, ভবিষ্যতের ভাবনায় আজি হইতে জড়ত্ব ও নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিতে আমি বলিতেছি না। কিন্তু যে প্রসঙ্গ আজ বিচারাধীন, তাহাতে ভবিষ্যতের ভাবনা একবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। আজ না হয়, আমাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে এবং আজিও আমরা তৎপর হইয়া, কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া অনেক কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু দুই দিন পরে যখন গবর্মেণ্টের বৃত্তি ও প্রসাদের লোভে আমাদের স্বদেশীরাই প্রত্যেক কাজে আমাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবেন ও তাঁহাদের পশ্চাতে পিউনিটিব পুলিস ও গুর্খা সৈন্য লাঠি ও সঙ্গীন উচাইয়া দাঁড়াইবে, তখন আমরা কি করিব? দয়াময় সরকার বাহাদুরের এই অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ আমরা থামাইব কিরূপে?

আমাদের ব্যাধি যাহা, তাহা নির্ণীত হইয়াছে; সকলে বুঝিতে না পারেন, অনেকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রতিকারের উপায় এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। এক এক সময় শেষ ভাবিয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

আমার কিন্তু মনে হয় যে, সম্পূর্ণ হতাশ না হইলেও চলে। আমাদের নামে নানা অপবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের মধ্যে যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বজাতির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য কলম ধরেন, তিনিই স্বজাতির ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং চরিত্রহীনতার উল্লেখ করিয়া এক পশলা গালি-বৃষ্টি করিয়া আরম্ভ করেন; যেন তাঁহারা স্বয়ং ঐ সকল দোষ হইতে একবারে বিমুক্ত। এই সকল নিষ্কলঙ্ক তারাপতির আলোকবিতরণ হইতে বিধাতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্য দেশের লোকের তুলনায় আমরা যে একবারেই হীন ও মনুষ্যত্বরহিত, ইহা স্বীকারে আমি কুণ্ঠিত। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, হিতকারিতা, এমন কি, স্বার্থত্যাগে আমরা যে অন্য দেশের লোকের তুলনায় অধম, তাহারও নিঃসংশয় প্রমাণ আমি পাই নাই। পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, আত্মীয়

বন্ধুর প্রতি, কুটুম্বের প্রতি, অতিথির প্রতি, মনুষ্যের প্রতি, কর্ত্তব্য সাধনে এ দেশের লোক যে অন্য দেশের লোকের তুলনায় হীন, ইহা এখনও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মোটের উপর এ দেশের লোকেরা ধর্ম্মবলে অন্য দেশের লোকের তুলনায় হীন, তাহাও স্বীকার করিতে পারিতেছি না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তথাপি আমাদের এই দশা কেন?

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি, আমাদের একটা গোড়ার জিনিসের অভাব আছে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, মনুষ্যসাধারণ, এ সকলের প্রতিই আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে ও সেই কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা আছে; কিন্তু আমাদের আপন আপন সঙ্কীর্ণ সমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ, সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া যে সমাজ বিস্তৃত, সেই সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। হুগলী জেলার লোক দিনাজপুরের লোককে কুটুম্ববোধে বা স্বজাতিবোধে (সবর্ণবোধে) বা স্বধর্ম্মীবোধে আদর সম্মান করিতে পারে, তাহার সহিত এরূপ কোন সম্পর্ক বা পরিচয় না থাকিলেও মনুষ্যবোধে তাহার সম্মান করিতে পারে; কিন্তু স্বদেশীবোধে যে বিশেষ সম্মান ও বিশেষ সমবেদনা আবশ্যক, তাহা দেখাইতে জানে না। আমাদের সমাজের মধ্যে ছোট বড় নানা দল আছে; প্রত্যেক দল আপন দলের স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে; কিন্তু গোটা দেশব্যাপী জনসঙ্ঘের স্বার্থরক্ষার জন্য গোটা দেশব্যাপী কোন দল নাই। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেই এই কথা; বৃহত্তর ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। রাজপুত রাজপুতের, শিখ শিখের, মরাঠা মরাঠার সহিত দল বাঁধিতে পারে ও অনেক সময় বাঁধিয়াছে। কিন্তু রাজপুত শিখ মরাঠা একীভূত হইয়া সাধারণ স্বার্থ মিলাইয়া ভারতব্যাপী দলের সৃষ্টি করে নাই, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া ভারতব্যাপী 'নেশন' উৎপন্ন হয় নাই। বাঙ্গালী গৃহস্থ পাঞ্জাবী অতিথিকে সম্মান করিতে পারেন, পাঞ্জাবীর বিপদে সমবেদনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবীর প্রতিও যেমন পারেন, জর্ম্মান ফরাসী ইংরেজের প্রতিও সেইরূপই পারেন। পাঞ্জাবী মনুষ্য—এমন কি—তিনি হিন্দু—এই বলিয়া বাঙ্গালী মানুষ তাঁহার প্রতি সমবেদনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবী যে ভারতবাসী, অতএব বাঙ্গালীর নিকট আত্মীয়, এই জ্ঞানটুকু তাঁহার নাই। এইখানেই আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব রহিয়া গিয়াছে এবং একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র

রহিয়াছে; এবং এই ছিদ্রেই প্রবেশ করিয়া, পরে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে ও আমাদিগের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছে।

যে সকল ঐতিহাসিক কারণে আমাদের এই অভাবটুকু রহিয়া গিয়াছে, স্থানান্তরে* তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম, এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অভাব যে আছে এবং উহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব, ইহা স্বীকার্য্য। ইংরেজ রাজপুরুষও ইহা জানেন; তাঁহারাও কথায় কথায় বলেন, ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক নাম মাত্র, ভারতবর্ষে নেশন নাই। এবং যত দিন ভারতবর্ষে নেশন না জন্মিবে, তত দিন তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে স্বেচ্ছাচার করিবেন; তাহাতে আমরা বাধা দিতে পারিব না।

আমাদের বালকেরা আজ 'বন্দে মাতরম্' গাহিয়া রাজপুরুষের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই মাতা কোন্ মাতা, তাহা আদৌ জানে না। তাহাদের কর্ত্তব্য আপনার গৃহ, গ্রাম, গোত্র, কুল, জাতি (Caste) ও ধর্ম্ম (Religion), এই সকলের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ আছে এবং এই সকল সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে আসিয়া, একবারে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া অখণ্ড মানবের উপরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর একটা মাঝামাঝি ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের সীমা স্বদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সীমার সহিত অভিন্ন, সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসারিত ও বিশেষভাবে আবদ্ধ হয় নাই। ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের অধিকাংশ লোকই জানে না যে তাহারা ভারতবাসী।

আমাদের এই যে অভাব, ইহা চরিত্রগত অভাব নহে, ইহা জ্ঞানগত অভাব। আমাদের ঐ জ্ঞানটাই নাই। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জ্ঞানটা বৈদেশিকের ইতিহাস ও বৈদেশিকের সাহিত্য হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এখনও জনসঙ্ঘমধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই, জনসঙ্ঘ এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশ হইতে এই জ্ঞানটা সঞ্চয় করিয়া একটা ভারতব্যাপী নেশন তৈয়ারের জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের দেশব্যাপী শাসনের সহিত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও

* "রাষ্ট্র ও নেশন"—'নানা কথা,' 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড।—সম্পাদক

খবরের কাগজ এই বিষয়ে তাঁহাদের সহায় হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে দেশের মধ্যে কংগ্রেস প্রভৃতি নেশন নির্ম্মাণের যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে কিছু চেষ্টা, তাঁহাদের আপনার সম্প্রদায়-মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের প্রতি তাঁহারা করুণ দৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রাণের বেদনা লইয়া প্রবেশ করেন নাই। বরং তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার উৎকট অভিমান তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতের স্পর্শ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে রাখিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাচাল শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাকে মূক অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের বিশ্বস্ত ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব কল্পনার কোন অধিকার তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত ছিল না। রাজপুরুষেরাও তাঁহাদিগকে 'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছেন। গাঁয়ের লোকেও সেই আপনি-মোড়লের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন খোঁজ খবর রাখিত না। অন্ততঃ সেই মোড়লদের ভাষা তাহাদের বোধগম্য ছিল না, তাঁহাদের ব্যবহার তাহাদের প্রীতিপ্রদ ছিল না এবং তাঁহাদের সমবেদনার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় এ পর্য্যন্ত তাহাদের বুদ্ধিগম্য-ভাবে তাহারা পায় নাই। এক পুকুর জলের উপর এক ফোঁটা তেল যেমন ছড়াইয়া পড়িয়া ভাসিয়া বেড়ায় মাত্র, তাঁহারাও এই বিশাল জনসমুদ্রের উপরে নিঃসম্পর্কভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেন মাত্র।

বর্ত্তমান আন্দোলনের একটা শুভ লক্ষণ এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মূক জনসঙ্ঘের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে, রাজদ্বারে মাথা না ভাঙিয়া এই জনসঙ্ঘের দুয়ারে গিয়া বসিতে হইবে। জনকতক শিক্ষিত লোকে বসিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারকে বয়কট করা চলিবে না, পাড়াগাঁয়ের চাষার হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাকে বিলাতী কাপড়ের অন্বেষণে নিষেধ করিতে হইবে। যাহা আমাদের বক্তব্য, তাহা রাজাকে না জানাইয়া এই জনসঙ্ঘকে জানাইতে হইবে; যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা এই জনসঙ্ঘের প্রতি সম্পাদন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এইটুকু বুঝিয়াছেন বলিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের যা একটু সফলতা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন ভাষায় কথা কহিতে হইয়াছে, যাহা জনসাধারণে বুঝিতে পারে; তাঁহাদিগকে এমন দুই একটা

কাজ করিতে হইয়াছে, যাহাতে জনসাধারণ মনে করিতে পারে, ইহারা স্বর্গের দেবতা নহেন, আমাদেরই ঘরের লোক।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট যখন ঘোষণা করা হইল, আমরা গৃহস্থালীর জিনিসের জন্য ইংরেজ দোকানদারের দ্বারস্থ হইব না, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই প্রতিজ্ঞা বুড়া মানুষের ছেলেখেলার মত উপহাস্য না হইয়া তাহার বেশী কিছু হইবে। কিন্তু দেশের প্রতি চাহিয়া দেশের লোককে ডাক দিবা মাত্র দেশের লোক এমন ভাবে সাড়া দিল, যাহা বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। দেশ হইতে তার পরে সাগর-গর্জ্জনের মত যে জনকোলাহল উঠিয়াছিল, আজিকার অবসাদের দিনেও তাহা আমাদের কানে বাজিতেছে এবং শীতল রক্তকে আবার একটু বেগে বহাইতেছে। আমাদের নেতৃবর্গ, তখন যাঁহারা জনমণ্ডলীকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পশ্চাতে হঠিয়াছেন; তাঁহাদের পরাঙ্মুখতা দেখিয়া জনসাধারণ খানিকটা কোলাহল করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে কিছু রাজনিগ্রহ সহ্য করিয়া এখন নীরব হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এই দুই বৎসরের ইতিহাসে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, অনুরাগের সহিত ডাকিতে পারিলে দেশের জনমণ্ডলী সাড়া দিতে পারে এবং যদিও বঙ্গমাতার কোলে বসিয়াও দেশের সন্তানমণ্ডলী মাকে কখনও দেখে নাই, তথাপি মায়ের নাম ধরিয়া ডাক দিলে তাহাদের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা বেগে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ অধ্যাপক সীলির ভাষায়, যদিও ভারতবর্ষে নেশন নাই, তথাপি এমন বীজ আছে, যাহা হইতে নেশন জন্মিতে পারে। সেই বীজে যে প্রাণশক্তি নিহিত আছে, তাহা সুযোগ পাইলে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু অঙ্কুরিত করিতে হইলে সেই বীজে শ্রদ্ধার সহিত অবহিত হইয়া জলসেক করিতে হইবে। এই জলসেকের কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে। বীজ এখন আপনার অস্তিত্ব আপনি অবগত নহে। তাহার প্রাণ আছে, কিন্তু চেতনা নাই; যে চেতনা থাকিলে আপনার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, সে চেতনা নাই। বীজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ও বাড়াইতে হইবে; কালে সে চেতাইয়া উঠিবে ও জানিবে যে, ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির আবাসভূমি; হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী, ধনী দরিদ্র সেই মহাজাতির অন্তর্গত; আমিই হিন্দু, আমিই

মুসলমান, আমিই বাঙ্গালী, আমিই পাঞ্জাবী, আমিই সেই ভারতবাসী মহাজাতি।

বলা বাহুল্য, সেই বীজটির প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে সহস্র বজ্র উদ্যত হইয়া আছে। সাবধানে সঙ্গোপনে সেই অল্পপ্রাণ বীজকে এখন রক্ষা করা আবশ্যক। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই বজ্র নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিষ্যতের ভরসা থাকিবে না। ইহারই নাম 'কূর্ম্মবৃত্তি' অবলম্বনে নীরবে বলসঞ্চয়—আস্থানিক ও অস্বাভাবিক আস্ফালনেও যেরূপ ইহার প্রাণহানির শঙ্কা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠার অভাব, অনুরাগের অভাব, যাহা বিজ্ঞের দল দেখাইতেছেন—সেই অভাবেও তাহা শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত নিরলস হইয়া সেই বীজে জলসেক করাই আমাদের প্রধান কাজ এবং যত দিন আমাদের কাজের পথ বন্ধ না হয়, তত দিন যে কাজটুকু আমাদের সাধ্য, তাহার সম্পাদনেই সেই জলসেক হইবে, ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চাই কি, কাজের পথ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বীজ অঙ্কুরে পরিণত হইতে পারে এবং অঙ্কুর একবার গজাইয়া উঠিলে তাহার ধ্বংসসাধন হয় ত প্রতিকূল শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্য হইবে না। কাজেই রবীন্দ্রবাবুর সহিত মানিয়া লইলাম, হাতের কাছে যাহার যে কাজ আছে, তাহাকে সেই কাজেই লাগিতে হইবে। ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমানে যাহা সাধ্য, তাহা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

কিন্তু এই কাজ করিবে কে? দেশের লোক যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে ত উপদেশের কোন দরকারই হইত না। কিন্তু চোখের উপর দেখিতেছি, দেশের লোক আপনার করায়ত্ত কাজ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত নহে। প্রস্তুত নহে বলিয়াই কাজ কর, কাজ কর বলিয়া অবিরত চীৎকার করিতে হইতেছে। কিন্তু যে কাজে অলস, কাজের পরিশ্রম স্বীকারে যে অনিচ্ছুক, কাজের অনভ্যাসে যার কর্ম্মেন্দ্রিয় জড়ত্বগ্রস্ত, উপদেশের দ্বারা তাহাকে কাজে লাগান যায় না। ভবিষ্যতের অনিষ্টের আশঙ্কাও এরূপ অলসকে ও অক্ষমকে কর্ত্তব্য কাজে নিযুক্ত করিতে পারে না। এখানে উপদেশের বিশেষ কার্য্যকারিতা নাই। কর্ম্মে প্রেরক জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে; কর্ম্মে প্রেরণ করে ভাব। ভাবের প্রবাহে মানুষ কর্ম্মে প্রেরিত হয় ও অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলে।

মনুষ্যজাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৃহৎ জনসঙ্ঘে সময়ে অসময়ে যে ভাবের স্রোত বহিয়া যায়, তখন সেই স্রোতের বেগে বাধা বিঘ্ন ভাসিয়া যায়, তখন মূক বাচাল হইয়া উঠে, পঙ্গু তখন গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়। যাহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, সহসা স্নায়বিক উত্তেজনা পাইয়া সেই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। জ্ঞানের অভাবে হয় ত কাজ পায় না, বুদ্ধির অভাবে হয় ত বিপথে প্রেরিত হয়, বিচারশক্তির অভাবে হয় ত উল্টা কাজ করিয়া বসে, কিন্তু ভাবের তাড়নায় কাজের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ভাবের তাড়নায় উত্তেজিত হইবার শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ থাকে না। যদি ভাবের উত্তেজনাও স্নায়ুযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে না পারে, যদি স্নায়বিক পক্ষাঘাতে শরীর অবশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিন্তু কোন আশাই থাকে না।

গত আন্দোলনে যে দেশের মধ্যে একটা ভাবের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। উহা হয় ত আন্দোলন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অথবা কতকগুলা অকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে ; নেতার অভাবে, বিচারশক্তির অভাবে, অভ্যাসের ও জ্ঞানের অভাবে, কি কাজ করিবে, কোন্ কাজে হাত দিবে, তাহার ঠাহর পায় নাই। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর নির্জীব নহে। এবং ভাবের প্রবাহটা যখন বঙ্গদেশ হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত পরিধি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে ও ব্রিটিশ-সিংহও তাহার কেশ সামলাইতে না পারিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন ও দন্তবিকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন এই ভাবপ্রবাহকে কোন ভাবুকের ভাব্‌কামি বা বালচাপল্য বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে 'নেশন' নাই বটে,—থাকিলে ভারতের প্রতি সাধু মর্লির ব্যবহার অন্যরূপ হইত—কিন্তু নেশনের বীজ আছে ; যদি তাহা প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ রক্ষা করিয়া, ভূমি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিবে।

কাজেই এই দুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুও প্রস্তুত নহেন—কেন না, এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে যে কয় জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি

তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘমধ্যে ভাবের প্রবাহ পরিচালনার প্রধান অধিকার—সাহিত্যিকের। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নূতন নূতন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, সময় সময় তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তরণী ছাড়িয়া দিয়া আজ যদি তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিরপরাধ আরোহী-দিগের উপর ষোল আনা না চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ করিবেন।

ফলে স্বদেশী আন্দোলনে আর কোন কাজ না হউক—কোন কাজই হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেছি না—কোন বড় কাজ না হউক, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা আশা জাগাইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয় যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন প্রমাণ, কোন লক্ষণই ছিল না। এত দিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁহাদের শিক্ষালব্ধ জাতীয় ভাবের একটা অভিনয় করিতেন মাত্র; জনসঙ্ঘ কেবল অভিনয় দেখিত মাত্র, অথবা তাহাও দেখিত না। দেখিলেও এই অভিনয়ের সহিত তাহাদের যে কোন সম্পর্ক আছে, তাহা আদৌ জানিত না। এখন দেশব্যাপী জনসঙ্ঘ না হউক, সেই জনসঙ্ঘের কিয়দংশ সেই ভাবের প্রবাহে ডুব দিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা আঘাত অনুভব করিয়াছে, তাহাদের আত্মার মধ্যে একটা নবোদ্গত অপরিচিতপূর্ব্ব অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা পাইয়া আপনাতে নব মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য বিহ্বলতার ও আত্মবিস্মৃতির আনন্দ আস্বাদন করিয়াছে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে আমরা এক দিনের জন্য বিচার বিতর্ক পরিহার করিয়া যে উন্মাদনার জাহ্নবীপ্রবাহে সাঁতার দিয়া লইয়াছি, তাহাতে আমাদের সারা জীবনের সঞ্চিত ক্লেদ অনেকটা ধুইয়া গিয়াছে, এবং ইহার ফল আমরা আজীবন ভোগ করিব। ভারতের ভাগ্যে বিধাতা যাহাই লিখুন, সে দিনকার ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটা মাসের উপার্জ্জিত নূতন ভাবাবেগ আমাদের জীবনে একবারে নিষ্ফল হইবে না।

যাঁহারা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই মহাভাবের উচ্ছলিত প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিজ্ঞতার প্রশংসা করিব, কিন্তু তাঁহাদের আত্মপ্রবঞ্চনার ভাগ লইতে যাইব না।

মোটের উপর আমি বলিতে চাহি যে, পরের উপর কর্ম্মের ভার অর্পণ করায়, অথবা পরে আমাদিগকে কর্ম্মভার হইতে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা যে কেবল কর্ম্মক্ষমতা ও কর্ম্মপটুতা হারাইয়াছি, এমন নহে ; আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক পেশীগুলিই যে কেবল জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন নহে ; আমাদের স্নায়ুযন্ত্র পর্য্যন্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে ভাবের বৈদ্যুতী প্রয়োগে সেই পক্ষাঘাত দূর করা আবশ্যক ; এবং ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, তখন আমরা একবারে ভরসা হারাই নাই। উত্তেজনাবলে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া থাকেন, আমরা বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে দল না বাঁধিলে ভারতব্যাপী নেশন গঠিত হইবে না, ইহা সকলেই বুঝেন ; এবং ইংরেজও ইহা খুব ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়াই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ধূমাইতে দেখিয়া এতটা খুসী আছেন ; মন্দ লোকে বলে, আগুনে কুলার বাতাস দিতেও তিনি ত্রুটি করিতেছেন না। উভয়ের মিলনের পথে যে একটা স্বাভাবিক অন্তরায় আছে, তাহা বলাও বাহুল্য মাত্র। উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ও সাহজিক বিদ্বেষভাব আছে, তাহাও অস্বীকার করি না। এবং যাহা বিদ্বেষ, তাহা পাপ, ইহাও বলা বাহুল্য। হিন্দু বহু দেবতার পূজা করেন ; এমন কি, মাটির প্রতিমা পূজা করেন, ইহা মুসলমানের পক্ষে অসহ্য ; এবং মুসলমান গোহত্যা করেন, ইহাও হিন্দুর পক্ষে অসহ্য। বিদ্বেষের মূল এইখানে ; এবং এই মূল উৎপাটিত হইবার যখন কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না, তখন এই স্বাভাবিক বিদ্বেষ যে কোনও কালে যাইবে, তাহারও উপায় দেখি না।

"বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে এক আসনে হিন্দু মুসলমান বসে না, ঘরে মুসলমান আসিলে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, ইহার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়" ইত্যাদি যে কয়টি কারণের উল্লেখ রবিবাবুর প্রবন্ধমধ্যে দেখিলাম, সে কারণগুলিকে ততটা ভয়াবহ মনে করি না।

হিন্দুর শাস্ত্রে এরূপ বিধান থাক আর নাই থাক, মুসলমানেরা ইহা জানেন যে, হিন্দু জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, উহা শাস্ত্রবিধানবৎই মানিয়া থাকেন। আজকাল রাগের মাথায় হিন্দুর বিরুদ্ধে অছিলা খুঁজিতে গিয়া মুসলমানেরা যদি ঐ সকল কথার উল্লেখ করিয়াও থাকেন, তথাপি ইহা সত্য যে, বহুকালের একত্র বাসে বাঙ্গলা দেশের মুসলমান হিন্দুর ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং হিন্দুর ঐ ব্যবহার যে মুসলমানের প্রতি ঘৃণার ব্যঞ্জক নহে, কেবল হিন্দুর শাস্ত্র-ভক্তি বা লোকাচারভক্তিরই ফল মাত্র, তাহাও মানিয়া লইয়াছেন। ঐ ব্যবহারের আমি কোনরূপ সমর্থন করিতেছি না এবং ঐ ব্যবহারের মূলে যে ঘৃণা নাই, তাহাও বলিতেছি না। মূলে ঘৃণা থাকিলেও উহা এখন সামাজিক প্রথা বা convention মাত্রে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু যেমন পুতুল পূজা করে, সেইরূপ পান, আহার, উপবেশন প্রভৃতি বিষয়েও কতকগুলি অদ্ভুত নিয়মের বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করে,—মুসলমান সমাজ ইহা বহু বৎসরের একত্র বাসে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং একত্র সদ্ভাবে বাস করিতে হইলে এ বিষয়ে হিন্দুকে ক্ষমা করিয়া চলিতে হইবে, ইহাও মুসলমান সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমান সমাজ দেখিতেছেন ও জানেন, পানাহারাদি বিষয়ে এই সকল অদ্ভুত খুঁটিনাটি যে কেবল মুসলমানের প্রতি ব্যবহারেই আছে, তাহা নহে; হিন্দুসমাজের ভিতরে বিবিধ স্তরের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার মধ্যেও আছে। হিন্দুসমাজের মধ্যে তিন টাকা বেতনের ব্রাহ্মণ দরোয়ান বা ব্রাহ্মণ পাচক তাহার শূদ্র মনিব লক্ষপতি হইলেও তাহার হস্তের অন্ন জল গ্রহণ করে না; এই ব্যবহারের মূলে লক্ষপতির পূর্ব্বপুরুষের প্রতি তাঁহার ভৃত্যের পূর্ব্বপুরুষের ঘৃণা বর্ত্তমান থাকিলেও এ কালে উহা আর ঘৃণার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় না; শূদ্র মনিব তাঁহার ব্রাহ্মণ চাকরের ঐ ব্যবহারকে কখনই বেয়াদবি বলিয়া গ্রহণ করেন না, উহা তিনি সহিয়া যাইতে শিখিয়াছেন। মুসলমান সমাজও সেইরূপ হিন্দুর এই ব্যবহার সহিয়া লইতে শিখিয়াছেন। শিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, এ পর্য্যন্ত হিন্দুর ঐ ব্যবহারে কোন মুসলমানকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায় নাই। হিন্দু-মুসলমানে এক কালে যতই কাটাকাটি মারামারি চলুক না; বহু শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করিয়াছেন; হিন্দু-মুসলমানে বন্ধুত্ব ও সামাজিক কুটুম্বিতা

যত দূর সম্ভব, তাহাও চলিয়াছে; হিন্দুর ঘরে মুসলমান ও মুসলমানের ঘরে হিন্দু বিশ্বাসের সহিত চাকরি করিয়াছেন ও করিতেছেন; অথচ উভয়ের ধর্ম্মগত বা আচারগত ব্যবহার লইয়া উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদের কথা এত দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। 'ধর্ম্মের ও আচারের এরূপ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

অন্নপানাদিগত আচার দূরের কথা,—হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষের যাহা মূলগত কারণ—একের পক্ষে প্রতিমাপূজা ও অন্যের পক্ষে গোহত্যা—এই মূলগত কারণ বর্ত্তমান থাকিতেও উভয় সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া একত্র সদ্ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে এই কারণে বিবাদ-বিসংবাদ, কি দাঙ্গা-হাঙ্গামা না ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু এত বড় সমাজের মধ্যে উহা নগণ্য। ভারতবর্ষের হাওয়ার গুণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের এই মূলগত সাংঘাতিক কারণ সত্ত্বেও পরস্পরকে ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের তপোবনে বাঘে হরিণে একত্র সঞ্চরণ করিত। ভারতবর্ষের মাহাত্ম্যে হিন্দুর চোখে যিনি ম্লেচ্ছ, এবং মুসলমানের চোখে যিনি কাফের, তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া নির্ব্বিরোধে বাস করিতে শিখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই ইহাতে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সংযম হইতেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন।

মুসলমান যখন আরবের মরুভূমি হইতে অসিহস্তে ইসলাম প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ধরাতলে বিধর্ম্মীর অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহাদের দুর্দ্দম প্রতাপে যে সকল রাজ্য ও সাম্রাজ্য তাঁহাদের করতলগত হইয়াছিল, তাহার কুত্রাপি তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের অবশেষ মাত্র রাখেন নাই। প্রবলপ্রতাপ পারস্য সাম্রাজ্য সমস্ত এবং রোম সাম্রাজ্যের অধিকাংশই অচিরে তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল এবং আজি পর্য্যন্ত সেই বিশাল মহাদেশের মধ্যে ইসলামের সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য অব্যাহত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি বদলাইয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও তাঁহারা ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের কিয়দংশ মাত্র অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন, সমুদয়

ভারতবর্ষ ইসলামের অধিকৃত হইল না। ভারতবর্ষের বার আনার অধিকও হিন্দু থাকিয়া গেল। মুসলমান হিন্দুর পার্শ্বে বাস করিয়া ভারতবাসী হইলেন এবং ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে উৎকট বিদ্বেষের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও হিন্দুকে ক্ষমা করিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমান হিন্দুকে কেবল ক্ষমা করেন নাই, কেবল সহিয়া লন নাই, তিনি হিন্দুকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, বিশেষতঃ মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইহার সাক্ষী। এই ক্ষমা ও শ্রদ্ধার বীজ তাঁহার ধর্ম্মের মূলমধ্যে বর্ত্তমান ছিল, নতুবা বাগদাদের খলিফাগণের রাজসভায় আমরা গ্রীক ও হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইতে দেখিতাম না। এইখানে খ্রীষ্টানে ও মুসলমানে আকাশ পাতাল ভেদ। খ্রীষ্টান রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব হাতে পাইবামাত্র গ্রীক জাতির অতুল্য প্রতিভার্জ্জিত বিদ্যাসম্পত্তিকে ধ্বংসমুখে প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিল; ক্ষুদ্র গ্রীস ও বৃহৎ গ্রীসের যেখানে যেখানে গ্রীকবিদ্যার আলোচনা হইত, সেই সমুদয় বিদ্যামন্দির ধ্বংস করিয়া ইউরোপ হইতে জ্ঞানের আলোক একবারে নিবাইয়া দিয়াছিল। আর মুসলমান তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের তিরোভাবের পর শত বৎসর যাইতে না যাইতে খ্রীষ্টানের নির্ম্মিত সমাধির অভ্যন্তর হইতে সেই প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের অস্থি-কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া, তাহাতে ইসলামের সোনার কাঠি ঠেকাইয়া, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রীকবিদ্যাকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাই আজিকার খ্রীষ্টানেরা গ্রীকসভ্যতার ভিত্তির উপর আপন সভ্যতা গঠনের অবকাশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

ধর্ম্মগত ও আচারগত উৎকট পার্থক্য ও পরস্পর বিদ্বেষের হেতু বর্ত্তমান সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করিতে জানেন এবং সেই জন্য ভারতবর্ষে উভয়ের প্রীতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে। ইংরেজ কথায় কথায় বড়াই করিয়া থাকেন, আমরা চলিয়া গেলেই ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাঁহাদের এ বড়াই আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না।

দক্ষিণ দেশে হায়দ্রাবাদে নিজাম মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন, আর উত্তর দেশে কাশ্মীরে জম্বুপতি মুখ্যতঃ মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন; কিন্তু কোথাও ত হিন্দু-মুসলমানে ছুরি

চালাচালি শুনিতে পাই না। ইংরেজের প্রভুশক্তি গ্রহণের পূর্ব্বে শত বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোথাও হিন্দু মুসলমানের পরস্পর ছুরি চালাচালির কথা শুনি না; পাঞ্জাবেও যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষ কারণে।

ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পরকে যেমন আপন করিতে জানে, তেমন পৃথিবীর আর কোন জাতি জানে না; অন্ততঃ কোন খ্রীষ্টান জাতি জানে না। হিন্দু মুসলমান ত এত কাল ধরিয়া এক গ্রামে—এমন কি, এক ঘরের মধ্যে, এক ছাদের নীচে বাস করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু খ্রীষ্টান কোথায় মুসলমানের সান্নিধ্য সহিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। হিস্পানি দেশে মুসলমান, বিদ্যার এবং জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া খ্রীষ্টান ইউরোপের বর্ব্বরতার অন্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর খ্রীষ্টান সেই হিস্পানি দেশে লব্ধপ্রবেশ হইয়া কি অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা মূর জাতিকে আটলান্টিক পার করিয়া দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা বর্ণিত আছে। গ্রানাডা ও কর্ডোবার স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি হিস্পানি দেশ পাষাণ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু খ্রীষ্টানের রাজ্যমধ্যে মূর জাতির বংশধর কেহ বাস করে না—যাহারা আলহাম্ব্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যাহারা খ্রীষ্টানকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইয়াছিল, যাহারা রসায়নবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, শিল্পকলা শিখাইয়াছিল, যাহারা অঙ্ক রাখিতে শিখাইয়াছিল, খ্রীষ্টানাধিকৃত ইউরোপের কোন অংশে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তুরস্কের সুলতান আজিও রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জার পাশে মসজিদ রক্ষা করিতেছেন বটে; কিন্তু তিনিও খ্রীষ্টান ইউরোপের দেহে কণ্টক মাত্র। খ্রীষ্টান ইউরোপে তাঁহার বসতি নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

মুসলমানের কথা দূরে যাক্, যে ইহুদী জাতির নিকট খ্রীষ্টানেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রচারক পাইয়াছে, সেই ইহুদী জাতির প্রতিবেশিত্ব যাহারা সহ্য করিতে পারে নাই, তাহাদের মুখে ঐ সকল উদ্ধত বাক্য শোভা পায় না। খ্রীষ্টান-ইউরোপ স্বদেশচ্যুত, ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত, আশ্রয়-ভিখারী ইহুদীর উপর কিরূপ পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছে, ইহুদীর শোণিত-রঞ্জিত খ্রীষ্টান-ইউরোপের ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান-রুশিয়ার রাজপথকে নিরীহ ইহুদীর রক্তস্রোত কিরূপে কর্দ্দমাক্ত করিতেছে, তাহা আমরা দিনের পর দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া শিহরিতেছি; কিন্তু খ্রীষ্টান-ইউরোপের দয়াবৃত্তি তাহাতে উত্তেজিত হয় না। অলমতিবিস্তরেণ।

ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিদ্বেষের উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার তেমন কারণ দেখি না। মুসলমান যে কারণেই হউক, ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া, হিন্দু প্রতিবাসী ও হিন্দু ভ্রাতার মনে দারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, কিন্তু কালে তাঁহারা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ করি না এবং যে হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে এই বিপথে চালাইয়াছেন, সেই হৃষীকেশের চরণে প্রণিপাত করিয়া আপনার সাহজিক বুদ্ধির প্রেরণায় পুনরায় চলিবেন, ইহা স্বীকার করি। তিনি বুঝিবেন যে, হৃষীকেশ তাঁহারও নহেন, হিন্দুরও নহেন, হৃষীকেশ কেবল আপনারই। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে; বিশেষতঃ, যে জাতি দুর্ব্বল, দরিদ্র ও সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, তাহার বুদ্ধির উন্মেষ হইলেও তদনুসারে কর্ম্মসাধনে আরও বিলম্ব ঘটিতে পারে। কিন্তু "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—তন্মধ্যে মানবসমাজের জীবনেতিহাসের চক্র শত সহস্র বৎসর ধরিয়া আবর্ত্তন করিবে—হিন্দুর এই ক্ষণেকের জন্য অস্বাভাবিক আস্ফালন দেখিয়াও যেমন আমরা চিন্তিত নহি, মুসলমানের এই ক্ষণেকের জন্য মতিভ্রমেও আমরা চিন্তিত হইবার সম্যক্ হেতু দেখি না। ('প্রবাসী,' আশ্বিন ১৩১৪)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন*

রাজসাহীনিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ!

আপনারা দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এ বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যসেবকগণের পরিচর্য্যার গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং রাজসাহীর রাজোচিত আতিথ্যভারের উপর আর একটা গুরু ভার চাপাইতে সাহসী হইতেছি; তাহা এই:—

* ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৮ মাঘ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত।—সম্পাদক।

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব নিরূপণের জন্য উত্তর বঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থপ্রচার আবশ্যক—এতদর্থে রাজসাহীকে অনুরোধ করা হউক এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত করা হউক।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই নূতন আর একটা বোঝাকে আপনারা নিতান্তই শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কি না জানি না, কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ লঙ্ঘনে আমার ক্ষমতা নাই। আজ যাঁহাকে আপনারা সভাপতির পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী অনুচরমধ্যে গণ্য করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহার আদেশেই আমাকে বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতাটুকুও বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং আলোকবর্ত্তিকা হাতে লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অজ্ঞানাচ্ছাদিত যে পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আমিও অতি দূরে থাকিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করি; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিয়া দুইটা কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহসা তিনি আমাকে এমন পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চার ধৃষ্টতা আসিয়া পড়ে। কাজেই আমি অতি সভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার সামান্য একটু অধিকার আছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কতিপয় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহিত আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা এক্ষণে আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। এই রাজসাহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে, এবং আপনাদেরই মান্য ব্যক্তিগণ সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন। সেই সাহিত্য-পরিষদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী

জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন স্থাপন দ্বারা জাতীয় ঐক্য স্থাপন। আমরা আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত আত্মীয়ভাবে জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পদ্ কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান। আমরা কে, আমরা কি, আমরা কোথা হইতে কিরূপে কোন্ সময়ে কি জন্য আসিয়াছি, এই জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা সেই জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য বুঝিয়া, আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া, জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই গোড়ার তত্ত্ব-নিরূপণকেই তন্মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্য আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গভূমির জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি এবং এ বৎসর আপনাদের দ্বারদেশে আঘাত করিয়া আপনাদের শান্তিভঙ্গ করিতেছি। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমরা যে দেশের পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক, সেই মহাদেশের—সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের—আমরা যে জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই মহাজাতির—সেই হিন্দু মুসলমান মহাজাতির—সম্যক্ পরিচয় জানি না,—আমাদের কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে, আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা জানি না—পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় পুরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি না। আমরা কোথা হইতে এ দেশে আসিলাম, আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাঁহারা কবে, কোথায়, কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা আমরা জানি না—আমাদের নিজের পরিচয় জানিবার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিকের মুখের দিকে চাহিতে হয়—হাণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল গ্রন্থ খুঁজিতে হয়—বিদেশী রাজপুরুষের সংগৃহীত সেন্‌সাসের খাতার পাতা উল্টাইতে হয়।

ইহা পরিতাপের বিষয়—ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব। নতুবা আমাদের জাতীয়তার স্পর্দ্ধা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্য আস্ফালন মাত্র হইবে। আমরা স্বদেশের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বদেশের ভাবের অভিনয় করিলে—বাহিরের জগৎ আমাদের অভিনয় দেখিয়া হাসিবে ও করতালি দিবে।

রাজসাহীর নিকট আমরা কি প্রার্থনা করিতেছি, একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। আমার পরম স্নেহভাজন, আপনাদের আদরের পাত্র শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় আজ প্রাতে আপনাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই রাজসাহী সেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের এক খণ্ড মাত্র।

স্থূলতঃ এখন বরেন্দ্রভূমি বলিলে যাহা বুঝি, এক কালে তাহা পৌণ্ড্রভূমি ছিল। সেই পৌণ্ড্ররাজের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল, কি মহাস্থানে ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা বিতণ্ডা করিতেছেন; কিন্তু এই দেশ যে এক কালে পুণ্ড্রজাতির দেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই পুণ্ড্রজাতি এখন কোথায়? আধুনিক পুঁড়ো, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ কি তাঁহাদেরই বংশধর? পুণ্ড্রজাতি এখন লুপ্ত হইয়াছেন, অথবা এই বরেন্দ্র জনপদ এখনও পৌণ্ড্রজাতিরই ভূমি রহিয়াছে, কি পৌণ্ড্রক রীতি নীতি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা না জানিলে আমরা বরেন্দ্রভূমি ও বরেন্দ্রসমাজ চিনিব কিরূপে?

এখনকার রাজসাহী মুসলমানপ্রধান বা হিন্দুপ্রধান—তাহা লইয়া তর্ক করিয়া আপাততঃ লাভ নাই। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া রাজসাহীকে হিন্দু-মুসলমানপ্রধান বলিয়াই দেখিব এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে হিন্দু-মুসলমানের অন্যতম সম্মিলনোপায় বলিয়াই জানিব। কিন্তু এমন দিন ছিল, তখন রাজসাহীতে মুসলমান ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না। সে বহু দিনের কথা; তখন এই ভূমি অনার্য্যভূমি ছিল—অনার্য্যভূমিতে আর্য্যাধিকার প্রসারের পরে ইহা হিন্দুর দেশ এবং

আরও পরে হিন্দু-মুসলমানের দেশ হইয়াছে। কিন্তু সেই অনার্য্য আদিম নিবাসী এখনকার হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন?—এই হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে কতটুকু অনার্য্যত্ব কতটুকু আর্য্যত্ব মিশ্রিত আছে? এক কালে যে পুণ্ড্রজাতির এখানে অবিসংবাদী অধিকার ছিল, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন, কি আর্য্য ছিলেন?

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ও সমাজতাত্ত্বিকগণের সকল মত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তকে উপহাসে উড়াইতে সম্প্রতি আমাদের অধিকার নাই। অন্ততঃ যত দিন হাণ্টারের গেজেটিয়ার ও রিজ্‌লির সেন্‌সাস্ বহির পাতাই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের একমাত্র অবলম্বন থাকিবে, তত দিন সেইরূপ উপহাসে আমাদিগের অধিকার নাই। ইংরেজ লেখকেরা বলিতে চাহেন, বঙ্গদেশের সমাজ মুখ্যতঃ অনার্য্য সমাজ—বাঙ্গালীর শোণিতের চৌদ্দ আনা অনার্য্যরক্ত। এমন কি, অনেকে ইহাও বলিতে চাহেন যে, আধুনিক বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহেন, সে ভাষা সংস্কৃত আর্য্যভাষার পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিলেও উহা মূলে অনার্য্যভাষা; উহার অস্থি মাংস আর্য্য উপকরণে গঠিত হইলেও উহার মজ্জামধ্যে অনার্য্যত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। বিদেশী পণ্ডিতদের এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের রুচিকর হয় না। অথচ এই সকল সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ জন্য যে প্রমাণের প্রয়োজন, অবশ্য সে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, আমরা সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। প্রাচীন পৌণ্ড্রজাতিই অনার্য্য ছিল, কি আর্য্য ছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। অতি প্রাচীন কালে আমরা পৌণ্ড্রকজাতির আধিপত্যের নিদর্শন পাই। বৈদিক সাহিত্যে এই জাতির উল্লেখ আছে; মহাভারতে, পুরাণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক নরপতি বাসুদেব, ভগবান্ দ্বারকাপতি বাসুদেবের রাজচিহ্ন ধারণে সাহসী হইয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্দ্ধা করিতেন, এই কাহিনী পুরাণমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে জাতির এক সময়ে এইরূপ প্রভাব ছিল, তাঁহারা আর্য্য, না অনার্য্য? আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের সভ্যতার অধিকার পাইয়াছি, না বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিজস্ব অপহরণ করিয়াছি, এই মূল তথ্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসনের পর পূর্ব্বদেশে

উপনিবিষ্ট হইয়া দস্যুর সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন এই আখ্যায়িকার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? আর্য্যবংশীয়েরা আর্য্যজাতির মধ্যদেশের আর্য্য-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া, শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপহেতু নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই উক্তির মধ্যেই বা কতটুকু সত্য আছে? ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা হয় ত একবাক্যে বলিবেন, পৌণ্ড্রজাতি অনার্য্য জাতি, কিন্তু আমরা এই সকল প্রাচীন কিংবদন্তীকে একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সাহিত্য-সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক সভাপতি মহাশয় আমাকে সমর্থন করিবেন যে, বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি কোন পণ্ডিতেরই বাক্যকে অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে—সেই পণ্ডিতের গায়ের চামড়া কালোই হউক, আর ধলাই হউক।

আমরা রাজসাহীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসার পথ একটু প্রশস্ত করিয়া দিন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় কিমিয়া বিদ্যাকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে শিখাইতেছেন, কিরূপে উৎকট যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন মূল উপকরণগুলি বাহির করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবল কিমিয়া বিদ্যার একচেটিয়া নহে। ঐতিহাসিকেরাও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া আমাদের এই যৌগিক সমাজকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্গত মূল উপাদানগুলি আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধিস্বরূপে এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইবেন, কিরূপে পদ্মা মহানদীর তীরদেশের মাটি খুঁড়িয়া প্রচ্ছন্ন জীবাস্থির বা উদ্ভিজ্জদেহের আবিষ্কার দ্বারা দেখান যাইতে পারে, পদ্মাদেবী কিরূপে এবং কত বৎসরে হিমালয়ের বুক চিরিয়া, হিমাদ্রি পাষাণকে দ্রবীভূত করিয়া, সেই দ্রবীভূত পাষাণের স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া, এই সুজলা সুফলা বরেন্দ্রভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোন ইতিহাসলেখক এই পদ্মাদেবীর এই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার ভূতত্ত্ববিৎ বন্ধু পদ্মাদেবীর

কত লক্ষ বৎসরের ইতিবৃত্ত এক নিশ্বাসে আপনাদিগকে শুনাইয়া দিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। সেইরূপ আমি বলিতে চাহি, আপনাদের বর্ত্তমান এই বরেন্দ্রসমাজের অভ্যন্তরে প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, গ্রাম্য গীত ও লৌকিক বচন, উপকথা ও ব্রতকথা, ছেলেভুলান ছড়া ও দিদিমায়ের রূপকথামধ্যে যে সকল প্রাচীন নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, তাহার আবিষ্কার দ্বারা শত শতাব্দ ধরিয়া স্তরের উপর স্তর গাঁথিয়া যে মানব-সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের আশা দুরাশা নহে।

এই ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমরা অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যেথায়, যে জেলায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুল কায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। এক বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যদি শত বৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই শত বৎসর পরে আমাদের প্রপৌত্রগণ এই রাজসাহী নগরে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্যের আংশিক সফলতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আমরা সেই কার্য্যের আরম্ভ করিয়া যাইতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এবং বঙ্গদেশের সাহিত্যিক সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা যে কয় জন আপনাদের সাদর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের বোঝার উপর এই শাকের আটি চাপাইতে বসিয়াছি, তাঁহারাও কৃতার্থম্মন্য হইবেন। ('বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ', ২য় বর্ষ, ১৩১৫)

রমেশ-ভবন*

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাদর আহ্বানে আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে [১৩১৪] যখন কাশিমবাজারে সমবেত হইয়াছিলাম, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন আমাদের আশার ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুমাত্র ছিল; সেই আশা পূর্ণ ও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইবে কি না, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। আজ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কামরূপকে ডাক পড়িয়াছে, আমরা সেই আহ্বান শুনিয়া এখানে সম্মিলিত হইয়াছি; এবং এই সাংবৎসরিক সম্মিলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদের সংশয় কতকটা অপনোদিত দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকগণ যাঁহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর পরিচিত হইবেন, ভাব-বিনিময়ের ও চিন্তা-বিনিময়ের অবসর পাইবেন, এবং যাঁহারা এক পথের পথিক, তাঁহারা পরস্পর দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার পরামর্শ করিবেন, এই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের অন্তরালে আরও একটা গুরুতর ও গভীরতর অভিসন্ধি রহিয়াছে, সে কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আমরা যে কেবল পরস্পর পরিচয় লাভ করিতে চাহি, এমন নহে; আমরা আমাদের বঙ্গভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাঁহার অঙ্কে আমাদের সূতিকাগৃহ ও যাঁহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, যাঁহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুতই কি বঙ্গভূমির সহিত আমাদের সম্যক্ পরিচয় আছে? আমরা উৎকট শিক্ষাভিমানের গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালার জলের ভিতর কোন্ রত্ন নিহিত আছে, বাঙ্গালার মাটির অভ্যন্তরে কোন্ নিধি সঞ্চিত আছে, তাহা জানিবার জন্য পদে পদে আমাদিগকে রাজার জাতির মুখের দিকে তাকাইতে হয়। বাঙ্গালার হাটে কি বেচা কেনা হয় ও বাঙ্গালার ঘাটে বসিয়া কে কি তপ্তশ্বাস ফেলে, আমরা কয় জনে তাহার তত্ত্ব লই? আমার যে স্বজাতি আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে ঊর্দ্ধমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই স্বজাতির মধ্যে কতটুকু বল আছে,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে (ভাগলপুর, ১৩১৬) পঠিত। —সম্পাদক।

কতটুকু দৌর্ব্বল্য আছে, সে বিষয়ে আমরা কতটুকু সংবাদ লইয়া থাকি? যে স্বজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে, একাত্মভাবে পরিচয় ব্যতীত আমাদের জাতীয়তা বুদ্বুদের ন্যায় অলীক পদার্থে পরিণত হইবে, সেই স্বজাতির সম্বন্ধে, সেই স্বজাতির ঘরের কথা ও বাহিরের কথা সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি?

সন্ধান রাখি না, কিন্তু এখন হইতে সেই সন্ধান রাখিতে হইবে। আমার বিবেচনায় সেই সন্ধানের জন্যই আমরা দল বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য ভগীরথকে যেমন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস-সন্ধানের জন্য তেমনই কঠোর তপস্যার সময় আসিয়াছে; যুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও পাপপঙ্ক যদি ধুইয়া ফেলিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; বঙ্গদেশের শ্মশানক্ষেত্রে যে ভগ্নাস্থি ও দগ্ধ কঙ্কালের ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদি পুনর্জীবন সঞ্চার করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে ভগীরথের মত তপস্যা করিয়াই শঙ্করের জটাকলাপের অন্তরাল হইতে ভগবতী নবগঙ্গাকে আবিষ্কার করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার ধারাপ্রবাহ বহাইতে হইবে।

এই অভিসন্ধি লইয়া আমরা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানীর সমীপে আজ আমাদের শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছি। পৌরাণিকী কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা যে দিন এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই দিন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামধেয় তাঁহার পুত্রগণ এই দেশে আর্য্য-সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। সে কোন্ কালের কথা, ঠিক জানি না; কিন্তু অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ আজ পর্য্যন্ত সেই বীজ হইতে উৎপন্ন তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্প ফল উপভোগ করিতেছে। এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার জন্যই আমাদের এই অধ্যবসায়। আমরা বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানকার জল ও মাটি, বন ও জঙ্গল, হাট ও ঘাট, সেখানকার তরু লতা, পশু পাখী, সকলেরই অনুসন্ধান করিতে চাহি; গ্রাম্য ও নাগরিক সকলের সহিত আলাপ করিয়া তাহারা কি খায়, কি পরে, তাহা জানিতে চাহি। সেখানকার জমিতে কি ফসল জন্মে, সেখানকার হাটে কি পণ্যদ্রব্যের

বেচাকেনা হয়, গাছে কি ফল ফলে, পুকুরে কি মাছ থাকে, ডালে কোন্ পাখী ডাকে ও বনে কোন্ জন্তু বিচরণ করে, তাহার সন্ধান লইতে চাহি। সেখানকার কৃষকে কি গান গায়, পণ্ডিতে কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চা করে, পুরাঙ্গনা কোন্ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা আমরা জানিতে চাহি। ভাঙ্গা বাড়ী দেখিলে আমরা তাহার ফটো তুলিব, উঁচু ডাঙ্গা দেখিলে তাহা খনন করিব, এবং সহস্রমুখী কিংবদন্তী, উপকথা ও ইতিহাসকে একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যে গ্রাম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিব। ঘাটে মাঠে যে শিলাখণ্ড বা তাম্রপত্র অস্পষ্ট অক্ষরে অতীত কালের ইতিবৃত্তের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বহন করিতেছে, তাহা আমরা কুড়াইয়া আনিব, তরুতলে যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ননাস ও ভগ্নপদ হইয়া অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহা তুলিয়া আনিব; আর গৃহস্থের ঘরে ঘরে যে ছেঁড়া তালপাতা চন্দনচর্চ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে পূজা গ্রহণ করিতেছে, তাহা নকল করিয়া লইব। ইটের টুক্‌রা বা কলসীর কাণা ঘষা পয়সা বা ছেঁড়া কাগজ, যাহা সকলের অবজ্ঞাত, আমরা তাহার কিছুই অগ্রাহ্য করিব না। বৎসর বৎসর আমরা এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিব এবং আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে যাঁহাদের হাতে এই ভাণ্ডারের চাবি থাকিবে, তাঁহারাই বঙ্গমাতার পূজাকর্ম্মে পুরোহিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যখন কাশিমবাজারে আহূত হয়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্যসেবকগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। পরদিন আমাদের পরম-সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে এই উদ্দেশ্যের অনুকূল একটি সারস্বত ভবনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বঙ্গের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় যিনি আমাদের অগ্রণী, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষার উদ্দীপনা এই প্রস্তাবের গুরুত্বের উপযোগী হইয়াছিল; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানকর্ত্তা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, যাঁহার অকৃত্রিম ভক্তিসহকৃত পুষ্পাঞ্জলিলাভে বঙ্গভারতী কখনও বঞ্চিত হন না, যাঁহার বদান্যতার অজস্র ধারাবর্ষণে বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র উর্ব্বর হইতে চলিয়াছে, সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাঁহার উপস্থিতি অদ্য আমাদের হৃদয়ে নূতন বল ও

নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তিনি এই প্রস্তাবে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার পর দুই বৎসর গত হইল, কিন্তু আমাদের সেই মানস স্বপ্ন, বঙ্গের সেই সারস্বত ভবন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই সারস্বত ভবনের যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এবং বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থিত শাখা, সেই সংগ্রহকর্ম্মে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; ভাগলপুরের এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনী-গৃহেও আপনারা সেই চেষ্টার ব্যাপকতার কতক পরিচয় পাইতেছেন। বঙ্গের নানা স্থানে অনেক লোক এই সঙ্কলনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বহু বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বঙ্গসাহিত্যের তদানীন্তন নেতা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গের সাহিত্যসেবীকে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি বিষয়ে তথ্য নিরূপণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ত্ত দেহে দিব্য দৃষ্টি সংস্থিত ছিল; তিনি দৈব প্রেরণায় বঙ্গের ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছিলেন; স্বর্গে বসিয়াও তাঁহার অঙ্গুলিপ্রেরণায় তাঁহার স্বদেশবাসীকে তিনি অদ্যাপি গন্তব্যপথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ম্মিত মন্দিরে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের নির্ম্মাতাদিগের আলেখ্যসমূহের মধ্যভাগে সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের যে পটচিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার অভ্যন্তর হইতে দিব্য জ্যোতির স্ফুরণ আমরা ভক্তের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করি, এবং সেই দিব্য জ্যোতির প্রেরণায় আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইয়াছি। কোদালি হাতে ও বাজরা মাথায় আমরা মজুরি করিতে উপস্থিত হইয়াছি; ধাতু, পাথর ও মাটির টুকরায় আমরা স্তূপনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্ব্বেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগবৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাত্ম্যে আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে; এবং প্রত্নতত্ত্বেও বিভীষিকা আমাদের কাব্যকলাকুতূহলী বন্ধুগণের হৃদয়ে আতঙ্কসঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।

বিধাতা জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন; কিন্তু বাহিরের দিকে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে আপনার দিকে

নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন। আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতির কবে কি ছিল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া উঠিয়াছে, এই আত্মদর্শন তাহার অনুকূল। এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গালা দেশের অতিতের পর্য্যালোচনা করিব, বর্ত্তমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে ধ্যান করিব ও স্বপ্ন দেখিব। যে স্থানে বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন; এই সরস্বতীমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্রগণের দ্বারদেশে যদি হত্যা দিতে হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, দ্বারবানের অর্দ্ধচন্দ্রের আশঙ্কা করিলে চলিবে না। গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আমরা সরস্বতীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিব। দরিদ্র বঙ্গদেশ; এবং দরিদ্র দেশের সাহিত্যসেবী আমরা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে না পারি, আপাততঃ একখানা ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিব। এবং এই কুটীর নির্ম্মাণের প্রস্তাব লইয়াই আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

ভাগলপুরে সমবেত সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সবিনয়ে এই প্রার্থনা উপস্থিত করিতেছেন। কাশিমবাজার সম্মিলনে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, আপনারা সেই সঙ্কল্পসমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-নিদর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন। দুরন্ত কাল রমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐহিক সম্পর্ক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ বা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্মৃতি

হইতে রমেশচন্দ্রের নাম কস্মিন্ কালেও লুপ্ত হইবে না। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, রমেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার স্মরণ-নিদর্শনে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি বিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত ভবন অপেক্ষা যোগ্যতর স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালার সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সাহিত্যচর্চ্চা হইতে রাষ্ট্রশাসন পর্য্যন্ত বিবিধ কার্য্যে যাঁহার শক্তি অব্যাহতভাবে প্রেরিত হইত, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালার সমুদয় রাষ্ট্রীকগণের নিকটও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। রমেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; তিনি কেবল বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের সুসন্তান ছিলেন। আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয় অধিবাসীর নিকট প্রার্থী হইতেছি। আপনারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত বঙ্গদেশের সাহিত্য-সেবকগণ, বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থিত করুন। রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন—সেই রমাভবন, এই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। অট্টালিকানির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীরনির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীরসঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না।

('সাহিত্য,' চৈত্র ১৩১৬)

লোকশিক্ষা

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহাশয় ভারতবর্ষে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারত গবর্মেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এখন কিছু দিনের জন্য তাকে তোলা রহিল। ইহাতে দুঃখিত হইব কি না, সেই চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে।

বড় দেশের বড় নজির দেখাইয়া অক্লেশে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, আজিকার দিনে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার বিস্তার না ঘটিলে বিংশ শতাব্দীর জীবন-সমরে টিকিয়া থাকিবার উপায়ান্তর নাই। প্রস্তাব-কর্ত্তা স্বয়ং রাশি রাশি নজির উপস্থিত করিয়াছিলেন, পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই।

শিক্ষা যখন মানুষের গায়ে বল দেয়, অশিক্ষিত যখন দুর্ব্বল এবং জীবসমাজে যখন দুর্ব্বলের স্থান নাই, তখন শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহাতে কোনরূপ বাক্‌চাতুরীর অবসর নাই।

বড় বড় দেশে সকলেই এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিয়া লইয়া আপামর সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া জীবনযুদ্ধে বলীয়ান্ করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে; রাষ্ট্রভাণ্ডারে অর্থাভাব বা অন্য কোন অভাব এই চেষ্টার প্রতিকূলতা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। কাজেই গোখলে মহাশয়ের প্রস্তাবের সদ্‌গতি দেখিয়া বিস্মিত হইবার সম্যক্ হেতু নাই।

প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়াতে বিস্ময় নাই বটে; কিন্তু কি জানি, যদি নূতন ব্যবস্থাপক সভা প্রস্তাবটা গ্রহণ করিয়াই বসেন এবং ভারত গবর্মেণ্টও তদনুসারে দেশের ছেলেগুলাকে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পাঠশালায় পূরিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কা একটু না ছিল, এমন বলিতে পারি না। বিশেষতঃ দেশের সমুদয় খবরের কাগজ যখন সমস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারত জুড়িয়া শিশু-কারাগার স্থাপন ভারত-উদ্ধারের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমার কর্ত্তব্য এই যে, লোকশিক্ষার আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিয়া লইলেও পাঠাগারের নামে কারাগার স্থাপনকে অত্যাবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ সংকোচ হইতে পারে এবং দেশে বর্ত্তমান কাল যে

নিম্নশিক্ষার প্রণালী বর্ত্তমান আছে, তাহাতে পাঠশালার সহিত কারাগারের ভেদকল্পনায় কিছু অতিরিক্ত বুদ্ধি খরচ করিতে হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাণ্ড একখানি বহি লেখা যাইতে পারে, অথবা বহি লিখিয়া একটা লাইব্রেরি করা যাইতে পারে; কিন্তু লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে। সে বিষয়ে বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক।

মনুষ্যজন্মলাভ মনুষ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, যখন নিতান্তই বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন যত দূর পারা যায়, জন্মকে সার্থক করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বড় মতভেদ নাই। কিরূপে উহা সার্থক হইবে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে বটে। সৎপথে থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্যগুলা যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেই হাজারের মধ্যে ন শ নিরানব্বই জনের পক্ষে যথেষ্ট। যথেষ্ট—কেন না, এই কর্ত্তব্য সাধনের পথেও নানা বিঘ্ন, নানা অন্তরায়। তার্কিক এইখানে তর্ক তুলিতে পারেন, জীবনের কর্ত্তব্য কি, তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দাও; কেন না তাহাতেও পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ রহিয়াছে।

তর্কের মধ্যে এই কর্ত্তব্য যেরূপই নির্দ্ধারিত হউক না, সেই কর্ত্তব্য যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি সাধিত হইলেই জীবন সফল হইল, স্থূল কথা। ইহাতে কেহ তর্ক তুলিবেন না।

'যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি' এই দুইটা কথাতেই শিক্ষার সমস্যা নিহিত আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞানের বর্দ্ধন ও শক্তির বর্দ্ধন। জ্ঞান ও শক্তি যাহার যতটা, তাহার কর্ত্তব্যসাধনে সফলতাও ততটা।

বিধাতা সকলকে সমান পরিমাণে জ্ঞান ও শক্তি দিয়া জগতে প্রেরণ করেন নাই। তবে তাঁহার অনুগ্রহ এই যে, অধিকাংশকে একবার বঞ্চিত করেন নাই। তিনি কিছু দিয়াছেন, এবং বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, চেষ্টা দ্বারা আমরা তাহা বাড়াইয়া লই কি না।

বস্তুতঃ আমার চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান ও শক্তি, উভয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া লইতে পারি, এবং সেই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

নানাবিধ জ্ঞানের মধ্যে নিজের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান একটু বিশেষ আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে শক্তি নিগূঢ় ভাবে সঞ্চিত আছে, তাহা আমরা অনেক সময় জানিতে পারি না ; এই জ্ঞানটাকে ফুটাইয়া তোলা শিক্ষার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির হিতের জন্য, সমাজের হিতের জন্য এইরূপ জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ ও শক্তি বর্দ্ধনার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা কোথাও সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় যে, কল্পিত শিক্ষাপ্রণালী ব্যবস্থাদোষে অনেক সময় উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য না করিয়া, বরং বিঘ্ন উপস্থিত করে।

লেখা, পড়া ও খড়ি পাতা, মানবজাতির শিক্ষাঘটিত ইতিহাসে এই তিনটা অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা। জ্ঞানবৃদ্ধির ও শক্তিবৃদ্ধির এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর উদ্ভাবিত হয় নাই। যে লিখিতে পড়িতে ও খড়ি পাতিতে শিখিয়াছে, সে যেন একটা নূতন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে। বিধাতা যে কয়টা ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, ইহা তাহার উপর অতিরিক্ত লাভ। এই কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনুষ্যের বল কতটা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই কৃত্রিম ইন্দ্রিয়লাভে কাহাকেও বঞ্চিত রাখা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। প্রত্যেক বালক বালিকা যাহাতে এই নূতন সামর্থ্য লাভের সুযোগ পায়, তজ্জন্য সমাজের সমবেত চেষ্টার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। লোকশিক্ষা ন্যূনকল্পে এই ত্রিবিধ বিদ্যাতে—লেখা পড়া ও খড়ি পাতাতে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

কিন্তু ন্যূনকল্পে যাহা আবশ্যক, তাহারও সুব্যবস্থার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত কোন দেশে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র সমুচিত চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

অল্প দিন হইল, কয়েকটা দেশে—যেখানে রাষ্ট্রশক্তি অত্যন্ত সুব্যবস্থ ও বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে—সেইরূপ কয়েকটা দেশে, আপামর সাধারণকে নিম্নশিক্ষালাভে বাধ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে ; এবং সেই নজির দেখিয়া আমাদেরও চোখ ফুটিয়াছে, এবং দেশের রাষ্ট্রশক্তি যাঁহাদের

করায়ত্ত, তাঁহাদের দ্বারে নিম্নশিক্ষা বিস্তারের ব্যবহার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে আমরাও উদ্যত হইয়াছি।

বলা উচিত, হালের নিম্নশিক্ষা কেবল লেখা পড়া ও খড়ি পাতাতেই আবদ্ধ নাই। এখন উহাকে আর একটু উচ্চ স্তরে তুলিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। পাঠশালার ছাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিবা মাত্র তাহাকে পুঁথির সাহায্যে বা শিক্ষকের সাহায্যে খানিকটা অতিরিক্ত জ্ঞানদানের চেষ্টা করা হয়। যতটুকু দান করা যায়, জীবনের পথে চলিবার সময় তাহাতে ততটুকুই সাহায্য ঘটিবে, এই উদ্দেশ্য।

বাহ্য জগতের সঙ্গে কারবারের জন্য আপনার শরীরটা সুস্থ ও সবল রাখা অত্যন্ত আবশ্যক; কাজেই জীবনতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই দশটা মোটা কথা জানিলেই লাভ। সামাজিক জীবকে সমাজের সঙ্গে কারবার করিতে হইবে, অতএব নিজের দেশের সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে, রাষ্ট্রের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই লাভ; আর নিজের দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাহিরে যে অন্য দেশ, অন্য সমাজ ও অন্য রাষ্ট্র বর্ত্তমান আছে, তাহার সম্বন্ধেও যতটা স্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহাও লাভ। সেই সঙ্গে সমাজের সহিত মানুষের যে দেনা-পাওনা আছে, অর্থাৎ কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলে সমাজ প্রত্যেকের উপর যতটুকু দাবি রাখিবে, এবং সমাজের নিকট প্রত্যেকে যেটুকু প্রত্যাশা করিবে, সেটুকু কিছু পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখিলেও মন্দ হয় না। লাভ আছে বলিয়াই আজকাল নিম্নশিক্ষার মধ্যে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা উত্তম কথা।

আধুনিক নিম্নশিক্ষার প্রণালী এইরূপে নানা শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-দানের চেষ্টা করে; পরন্তু তার চেয়েও একটু অধিক কাজ করিতে চায়। উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা দেশের বালক-বালিকাকে কিছু না কিছু জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু লোকাভাব, ধনাভাব, সময়াভাব প্রভৃতি নানা অভাবে এইরূপে উপদিষ্ট জ্ঞানের মাত্রা বড় অধিক হয় না। এমন কি, বালকেরা যে বিদ্যাটুকু উপার্জ্জন করে, ব্যবহারকালে তাহা প্রয়োগ করিতে পারে না। তাই আজকাল বুদ্ধিমান্ লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জ্ঞানদানের চেষ্টা অপেক্ষা জ্ঞানাহরণে ক্ষমতা সঞ্চারের চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

ফলে চাষার ছেলে,—সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে যে রাজমন্ত্রী হইবার কোনও অবসর পাইবে না বা যে কালিদাসের মত কবি বা নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক হইবার সুযোগ পাইবে না—যাহাকে লাঙ্গল ধরিয়া জমি হইতে ফসল তুলিতে হইবে,—তাহাকে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ইস্কুলে পুরিয়া সমগুণশ্রেঢ়ী ও সম্ভূয় সমুত্থান, যবক্ষার জান ও ক্লোমরস, ইব্রাহিম লোদি ও জুসপ ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণ মুখস্থ করাইবার অদ্ভুত চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভয়াবহ। ইহাতে তাহার কোন লাভ হয় না; প্রত্যুত ক্লোমরসের আলোচনায় পিত্তরসে বিকার জন্মে, এবং সম্ভূয় সমুত্থান ও ইব্রাহিম লোদির বিভীষিকাজাত দুঃস্বপ্নে অনিদ্রারোগ উপস্থিত হয়। শিক্ষার্থী বালকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে এইরূপ শিক্ষার প্রণালী তাহার নৈসর্গিক শক্তিকে সঙ্কুচিত করে, ও জীবনের পথে দক্ষতার পরিবর্ত্তে শোচনীয় অক্ষমতা আনিয়া দেয়। যদি কোন কৃষকসন্তানে বিস্মার্কের বা কালিদাসের বা নিউটনের অঙ্কুর গজাইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই অঙ্কুরকে টিপিয়া মারিবার এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। এইরূপ শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষা ইহার কবল হইতে শিক্ষার্থীকে রক্ষা করাই সামাজিকের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

প্রকৃতি ঠাকুরাণী, যিনি মানবশিশুকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সংসারের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, মানবসমাজ সেই শিশুর শক্তিবৃদ্ধি ও সামর্থ্য লাভ পক্ষে কতটা ব্যবস্থা করিবে না করিবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন নাই। এ বিষয়ে মানবশিশুর প্রতি তাঁহার মমত্বের পরিচয় নানারূপে পাওয়া যায়। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই বাহ্য জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভে স্বভাবের প্রেরণাতেই প্রবৃত্ত হয়; এবং প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিকের মত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য্যে—observation ও experiment কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দিবানিশি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও আনন্দের সহিত এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে; ইহার জন্য প্রলোভন বা শাসন কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। মাস্টারের বেতেরও দরকার হয় না; রাঙা ফিতায় বাঁধা প্রাইজের বহিও দিতে হয় না। তাহার এই জ্ঞান-তৃষ্ণার নিকট অতিবড় পণ্ডিতেও হারি মানেন; লর্ড কেলবিনকেও জ্ঞানসংগ্রহপ্রবৃত্তিতে এই শিশু বৈজ্ঞানিকের নিকট হারি মানিতে হয়।

যাহা আমরা সর্ব্বদা চোখের উপর দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে চাষার ছেলে অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়াই যে গুরুর নিকট বিদ্যালাভে প্রেরিত হয়, তাঁহার মত সদ্‌গুরু জগতে নাই। নিসর্গ-দেবতা স্বয়ং গুরুগিরিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। রাতি পোহানর সঙ্গে যখন পাখী সব কলরব করিয়া উঠে ও কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, বাঙ্গালার প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে তখন বালগোপাল রাখালবেশে সাজিয়া গরুর পাল সঙ্গে মাঠে বাহির হইয়া থাকে, এবং এই গোপাললীলার অবসরে সে যাহা অর্জ্জন করে, তাহার সহিত—সদাশয় বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের স্থাপিত কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালী-মার্জ্জিত গুরুমহাশয়ের পরিচালিত কোন প্রাইমারি স্কুলে টেক্‌ষ্টবুক কমিটির অনুমোদিত গ্রন্থরাশির গলাধঃকরণে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয়, তাহার তুলনা চলে না। খোলা মাঠের মুক্ত হাওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, গাছের ডালে বসিয়া ঝুলনবাজি, এ-ডাল হইতে ও-ডালে লাফ, নদী নালার এ-পার হইতে ও-পারে সাঁতার, ক্রীড়া-কৌতুক, মারামারি, হাস্যকলরব স্মরণে আনিয়া এই বৃদ্ধ লেখকেরও হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে জড় জগতের সহিত যেরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভ ঘটে, কোন বোধোদয় বা বিজ্ঞানপাঠের সাহায্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। আকস্মিক ঝড় বৃষ্টি, বান তুফান হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা—সেই চেষ্টা সফল দেখিয়া যে শক্তিবৃদ্ধি, সম্মানবৃদ্ধি, মর্য্যাদাবৃদ্ধি ঘটে, ভূগোলবিবরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিলেও তাহার তুল্য হয় না। আট বৎসরের বালক—যাহার উপর কৃষক-পরিবারের সর্ব্বস্বধন গাভীগুলির রক্ষা-কার্য্য সমর্পিত আছে, সেই গাভীগুলিকে খোলা মাঠে ছাড়িয়া দিয়া, গাছের ডগার উপর হইতে তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়া, তাহাদের গায়ের রং ও গলার ডাকের সহিত পরিচিত হইয়া, ঝড় জল ও বাঘের মুখের উপস্থিত বিপদ্ হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়া দিনান্তে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া আসা—এই বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, এই বৃহৎ দায়িত্বের ভার দিনের পর দিন বহন করিয়া, তাহার মনুষ্যত্বে যে বলাধান হয়, তাহার আত্মমর্য্যাদা যেমন ফুটিয়া উঠে, তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি যেরূপ জাগ্রত হইয়া উঠে, কোন্ পাঠশালার কোন্ শিক্ষা তাহার নিকট পৌঁছাইতে পারে।

বর্ত্তমান কালের প্রাইমারি ইস্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া বামন কায়েতের ছেলে, সঙ্গতি থাকিলে ইংরেজি পড়িতে যায় ও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকের একটা সদ্‌গতি হয়। কিন্তু চাষার ছেলে, তাঁতীর ছেলে, মুদির ছেলে, যাহাদের জন্য মুখ্যতঃ এই লোকশিক্ষা, তাঁহাদের পরিণামটা একবার চিন্তনীয়। প্রাইমারি ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া অর্থাভাবে তাহারা ইংরাজি ইস্কুলে প্রবেশ করিতে পারে না; এ দিকে চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরিতে, তাঁতীর ছেলে তাঁতে বসিতে ও মুদির ছেলে তুলদাঁড়ি হাতে লইতে লজ্জা বোধ করে। এগ্‌জামিন পাস করিয়া তাহারা ভদ্রলোকে পরিণত হইয়াছে; জুতা, জামা, ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া "ইতর" কাজে হাত দিতে পারে না। অগত্যা তাহারা উকিল মহাশয়ের মুহুরি বা আদালতের পেয়াদা হইয়া জামা, জুতা, ছাতার কড়ি যোগাইবার জন্য ঘুষ খায় এবং ঘুষের পয়সায় মদ খাইতে ধরে। যাহাদের এই কর্ম্মও না জুটে, সে নিতান্ত অকর্ম্মা হইয়া যাত্রার দল করে ও গাঁজা খায়। অধিকাংশ ছেলের প্রাইমারি ইস্কুলে অর্জ্জিত বিদ্যার এই পরিণাম।

ফলে, শিক্ষার সহিত আমার বিরোধ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমার বিরোধ; শিক্ষাবিড়ম্বনার সহিত আমার বিরোধ। অন্য দেশের কথা উপস্থিত করিবার দরকার নাই; আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে যে শিক্ষা-বিড়ম্বনা বর্ত্তমান আছে, তৎসম্বন্ধেই আমি এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছি। যত দিন এই শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্করণ না হইতেছে, তত দিন আমি এই শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাবে কিছু আতঙ্ক অনুভব করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে এ দেশের খাঁটি স্বদেশী পাঠশালায় নিম্নশিক্ষার যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, শিশুবোধকের চাণক্যশ্লোকে ও দাতা কর্ণের উপাখ্যানেই যাহার সমাপ্তি ঘটিত, শিশুজনভয়াকর গুরুমহাশয় যে শিক্ষা-প্রণালীর পরিচালনে সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব নিয়োগ করিতেন, সেই প্রণালীতে নানা দোষ বর্ত্তমান ছিল, সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর মধ্যে এ দেশের লোকশিক্ষা একবারে গবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে; বড় বড় মনীষী পণ্ডিতের ধীশক্তি এই বিষয়ে নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় গুরুতর কি না, তাহা বিচারের সময় আসিয়াছে। এই শিক্ষাপ্রণালী দোষযুক্ত, তাহা গবর্মেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন; সংস্কারেরও প্রচুর চেষ্টা

হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, সংস্কারচেষ্টা এখনও কোন ফল লাভ করে নাই। ইনস্পেক্টরের সংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িলেও কোন ফলই এখনও পাওয়া যায় নাই; বহু স্থলে সংস্কারচেষ্টা হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র।

যত দিন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত থাকিবে, তত দিন কোন বালককে এই শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা উচিত কি না, তাহারই বিচারের জন্য আমি এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। লোকশিক্ষার বিচার আবশ্যক, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; এ সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্যই নাই। কিন্তু শিক্ষার নামে অপশিক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, তাহাই বিচার্য্য। পাঠাগারের নামে কারাগারে বালকগণকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জীবন-শক্তির ধ্বংস-সাধনে উদ্যোগ উচিত কি না, তাহারই আমি মীমাংসা চাহিতেছি। ('প্রবাসী,' বৈশাখ ১৩১৭)

যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী

আমি নিজে শোণপুরের মেলা দেখি নাই, কিন্তু আমার কোন মান্য বন্ধুর নিকট মেলার গল্প শুনিয়াছি। মেলার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কে কবে ঐ দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি নাই। মেলার জন্য কেহ কোন বিজ্ঞাপন বাহির করে না, পূর্ব্ব হইতে কোন আয়োজন করে না। যথাসময়ে মেলার ক্ষেত্রে লোকজন জিনিসপত্র আসিতে আরম্ভ হয়। বহু কাল হইতে যে জিনিসের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থানে সেই জিনিস আসিয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে। স্থানের জন্য কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হয় না। হাতীর স্থানে হাতী, ঘোড়ার স্থানে ঘোড়া, গরুর স্থানে গরু—গণ্ডায় গণ্ডায়, দশে দশে বা শতে শতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দিগ্‌দিগন্ত হইতে ব্যবসায়ী ক্রেতারা আসে, হাজার হাজার টাকার দ্রব্য দিন দিন বিক্রয় হয়, কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হয় না, কোনরূপ গণ্ডগোল হয় না, আবার দিন অতিক্রান্ত হইলে যে যাহার আপন দেশে চলিয়া যায়। মেলা কেহ ডাকে নাই, মেলা ভাঙ্গিতেও কাহারও আদেশ দিতে হয় না। আর কয়েক দিনের মধ্যে বিনা উদ্যোগে, বিনা আয়োজনে, বিনা বিজ্ঞাপনে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিয়া যায়।

এইরূপ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া আসিতেছে,—কত কাল হইতে চলিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এ হইল এ দেশের পুরাতন নিয়ম। হালের নিয়মে সেবার কলিকাতায় শিল্পমেলা হইয়া গেল, এবার এলাহাবাদে মেলা হইবে। এই মেলার ব্যবস্থা অন্যরূপ। মেলার ছয় মাস আগে হইতে খবরের কাগজে লেখালেখি—জেনারল কমিটি, অধ্যক্ষ কমিটি,—সব কমিটি, চাঁদা তোলা—দেশ বিদেশের ব্যবসায়ীদিগকে নিমন্ত্রণ—স্থান নিরূপণ—কাঁচা পাকা ঘর নির্ম্মাণ—স্থানের বিভাগ—কে আধ কাঠা জায়গা পাইবে, কে পৌনে দুই কাঠা জায়গা পাইবে, কে চল্লিশ বর্গফুটে সন্তুষ্ট হইবে, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক—আলো জল হাওয়ার বন্দোবস্ত—আগুন নিবাইবার বন্দোবস্ত—অফিসার, কেরাণী, ভলন্টিয়ার—চেয়ার টেবিল বেঞ্চি—রীম রীম কাগজ—বস্তা দরুনে লাল ফিতা—হাজার টাকার ডাক টিকিট—পাঁচ হাজার টাকার ছাপাখানার বিল—তদুপরি নাচ, গান, বাজি, কৌতুক, তামাশা—চায়ের সরঞ্জাম—তকমাপরা পিয়ন—খবরের কাগজে বহ্বারম্ভ বিবরণ ও বিজ্ঞাপন—শেষ পর্য্যন্ত উদ্যোগীরা ক্লান্ত হইয়া পড়েন—আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা অধিক হইয়া যায়—রিপোর্ট ছাপিবার খরচ কুলায় না ও আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হয় না।

ফলে, একটা মেলার মত বৃহৎ আয়োজন সফল করিতে হইলে একটা বৃহৎ যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হয়। সেই বৃহৎ যন্ত্রের ভিতর বিস্তর ছোট বড় চাকা থাকে, যন্ত্র চালাইতে বিস্তর ইন্ধন ব্যয় করিতে হয়। চাকায় চাকায় আটকাইয়া যাইবার আশঙ্কায় প্রচুর তেল খরচ করিতে হয়; এবং যন্ত্র যখন সবেগে চলিতে থাকে, তাহার ঘর্ষণে সমস্ত দেশে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার শব্দে দেশের লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বুঝিয়া লইতে হইবে, শব্দের যত বাহুল্য, আয়োজনের তত সাফল্য।

দেশের পুরাতন মেলাগুলিতে এত শব্দ নাই, এত ঘর্ষণ নাই, এ রকম একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেও হয় না। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সমুদয় দেশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উহা যথাকালে আপনা হইতে জমাট বাঁধিয়া উঠে, আবার যথাসময়ে আপনা হইতে লীন হইয়া যায়।

অথচ ইহা বলা চলে না, মেলার বা প্রদর্শনীর যে সফলতা, তাহা এইরূপ যন্ত্রবদ্ধ চেষ্টায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, আর যে চেষ্টা যন্ত্রবদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা সেরূপ সফলতা পাওয়া যাইতেছে না।

এ কালের যন্ত্রচালিত প্রদর্শনীতে চাক্‌চিক্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অধিক থাকে, লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য নানা প্রলোভন সংগ্রহ করিতে হয়, যে যেখানে যত চিকণ জিনিস তৈয়ার করে, সে তাহা লইয়া উপস্থিত হয় এবং চিকণ জিনিসে যাহাদের চোখ ঝলসায়, তাহারা বহুপরিমাণে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। আর সে কালের প্রদর্শনীতে মোটা মোটা হাতী আসে, বড় বড় বলদ আসে, মোটা কম্বল আর সতরঞ্চ আর গালিচার স্তূপ উঠে—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রলোভন বিশেষ একটা থাকে না—বড়লোকে বা শিক্ষিত লোকে সেখানে কলেরা ব্যাসিলাসের ভয়ে পদার্পণে কুণ্ঠিত হন, আর দূরে রহিয়া দূরবীন লাগাইয়া কৌতুক দেখেন ;—কিন্তু সমস্ত দেশের বৃহৎ হৃদয়ের সহিত ও রক্তবহা নাড়ীর সহিত এই চেষ্টাহীন উদ্যমের যে চিরন্তন সংযোগ আছে, এ কালের বহুচেষ্টাজাত বৃহৎ আয়োজনের সহিত সেরূপ সংযোগ কুত্রাপি দেখা যায় না।

গোড়াতেই একটা পার্থক্য এই যে, এ কালের "বিরাট্" শিল্পপ্রদর্শনী বা কারুকার্য্যপ্রদর্শনী—যাহার পূর্ব্বে ন্যাশনাল বা জাতীয় বা ভারতীয়, এইরূপ একটা কিছু বিশেষণ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়—তাহাতে প্রবেশলাভের জন্য অন্ততঃ চারি আনা দর্শনী দেওয়া অত্যাবশ্যক। চারি আনার টিকিট খরিদ করিতে যে হতভাগ্য অসমর্থ—জাতীয় প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার তাহার জন্য অর্গলরুদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার দ্বারদেশে পুলিশ অথবা ভলণ্টিয়ার অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া উপবিষ্ট থাকে। আর সে কালে মেলার আয়তন যত ক্ষুদ্র হউক, অথবা বিপুল হউক,—বিধাতার নীল চন্দ্রাতপের নিম্নে যাহার স্থান,—ধনী দরিদ্র, অন্ধ খঞ্জ, সকলেরই জন্য তাহা সর্ব্বদা মুক্ত আছে, কোনরূপ প্রাচীরের বেষ্টনী দিয়া তাহাকে ঘেরিয়া রাখিতে কেহ কখনও কল্পনায়ও আনে না।

চারি আনা হাতে লইয়া না গেলে যেখানে দরিদ্র ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পাইবে না, প্রত্যুত তাহাকে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে, সেখানে যেমনই প্রলোভন ও যেমনই আকর্ষণ থাক না কেন, মানব-সমাজের হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হইয়া সেখানে রক্তধারা পাঠায় না বা সেখান

হইতে শোণিতধারা বাহির হইয়া সমস্ত সমাজের স্নায়ুকে স্পন্দিত বা পেশীকে পুষ্ট করিতে পারে না।

কাজেই আকস্মিক ঢক্কানিনাদে ও চক্রঘর্ঘরধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে যতই আঘাত লাগুক, স্থায়ী ফল তুলনা করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আসিয়া দাঁড়ায়।

যন্ত্রযোগে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না বা সম্পন্ন হইতে পারে না, এমন কথা যদি আমি বলিতে যাই, তাহা হইলে পাঠকেরা আমাকে গণ্ডমূর্খের দলে ফেলিবেন। ঐ বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে আদৌ ইচ্ছা করি না। যন্ত্র জিনিসটা কৃত্রিম, উহাকে চেষ্টাপূর্ব্বক গড়িতে হয় ও অনবরত সচেষ্ট থাকিয়া চালাইতে হয়; চেষ্টার কোন একটা ত্রুটি হইলে যন্ত্র বিকল হয়, ভাঙ্গিয়া যায়; এমন কি, বিপদ্ পর্য্যন্ত টানিয়া আনে। যন্ত্র চালাইতে হইলে বাহির হইতে ব্যয়সাধ্য ইন্ধনের জোগাড় করিতে হয়, সহসা ইন্ধনের অভাব ঘটিলে সমুদয় যন্ত্র অচল হইয়া পড়ে। এই সমস্ত দোষ থাকিলেও এই বিংশ শতাব্দীতে—যন্ত্রের যুগে—যন্ত্রের শক্তি অপলাপ করিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহি।

অন্য দেশের ব্যবস্থা অন্যরূপ, কিন্তু এ দেশে যন্ত্রবদ্ধ উদ্যম সবে আরম্ভ হইয়াছে; আশা করি, এই উদ্যম ক্রমে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং এই উদ্যমের ফলে দেশেরও শক্তি-সামর্থ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই যন্ত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন এ দেশের প্রাচীন উদ্যম অনুষ্ঠানগুলি,—যাহা কেহ চালায় না, যাহা আপনা হইতে চলে, যাহার পরিচালনের জন্য কেহ এক কড়া কড়ি ব্যয় করে না বা পাঁচ মিনিট মাথা ঘামায় না—যাহা কোন্ বীজ হইতে উৎপন্ন, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বৎসরের পর বৎসর ও শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল সমান ভাবে চলিতেছে—যাহা বটবৃক্ষের মত বহু পুরুষের পতন উত্থান দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহা চারি দিকে শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যাহার শাখাপ্রশাখা হইতে অধোমুখে মূল বিলম্বিত হইয়া দেশের ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে—সেই পুরাতন উদ্যম অনুষ্ঠানগুলিকে অবজ্ঞা না করি।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। সম্প্রতি এ দেশে শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটা সচেষ্ট আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে।

বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাচীন শিল্পগুলি ক্রমেই উৎসন্ন যাইতেছে, কাজেই এখন নূতন প্রণালীতে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বিদেশের শিক্ষাপ্রণালীও অবলম্বন করিতে হইবে। বিদেশে,—অর্থাৎ বিলাতে, জর্ম্মনিতে, আমেরিকায় শিল্প-শিক্ষার জন্য চেষ্টা যন্ত্রবদ্ধ হইয়াছে। সে আবার কি প্রকার যন্ত্র। আধুনিক কালের উপযোগী একটা শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে, আরম্ভেই দু ক্রোর, দশ ক্রোর টাকা লইয়া বসিতে হয়। মার্কিন দেশের এক একজন কোটিপতি বা অযুতপতি এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনে উপার্জ্জিত সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেছেন। প্রথমেই বড় বড় অট্টালিকা গাঁথিতে হয়—তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পাগার, বৃহৎ পরীক্ষাগার, বৃহৎ যন্ত্রাগার,—লাইব্রেরি, লেবরেটরি, কারখানা। বড় বড় ডাইনামো, বড় বড় মোটর—বড় বড় এঞ্জিন—উনান, চিমনি, ষ্টীম হ্যামার—সর্ব্বত্র বিশাল ও বিপুল সরঞ্জাম,—বড় বড় অধ্যাপক ও শিক্ষক, কেহ শিক্ষাগারে উপদেশ দেন, কেহ পরীক্ষাগারে পরীক্ষাকর্ম্মে সাহায্য করেন, কেহ কারখানা-ঘরে হাতে-কলমে কাজ শেখান। এখানে পর্য্যবেক্ষণ, ওখানে পরীক্ষা, ওখানে লেকচার—সর্ব্বত্র একটা হৈ-হৈ ব্যাপার। অথচ সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার সহিত সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং যাহারা শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহারা সেই উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে ধরাপৃষ্ঠে দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া বেড়াইতেছে।

বিদেশের এই প্রকাণ্ড উদ্যমের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ঐরূপই প্রকাণ্ড উদ্যম আবশ্যক—ঐরূপ প্রকাণ্ড শিক্ষাযন্ত্র স্থাপন করা আবশ্যক। সচেষ্ট উদ্যমের সহিত লড়াই করিতে হইলে সচেষ্ট উদ্যমই আবশ্যক—এখানে ধীরভাবে বসিয়া, সমাজের ধীর গতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের যে সকল পুরাতন আয়োজন আছে, তাহাতে কুলাইবে না। এই চিন্তা আমাদের মনে জাগিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে, লোকাভাবে, সামর্থ্যাভাবে আমরা যে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ। এখানে সেখানে দুই চারিটা শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থানাভাবে কারখানা হইতেছে না, অর্থাভাবে যন্ত্র আসিতেছে না, লোকাভাবে শিক্ষক জুটিতেছে না।

পরন্তু কি উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কোন্ বিদ্যা শিখাইতে হইবে, কোন্ বিদ্যায় কি প্রয়োজন সাধিত হইবে, কোন্ বিদ্যা শিখিয়া কি কাজে লাগাইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে শিক্ষাযন্ত্র-চালকগণের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নাই। ফলে শিক্ষা-যন্ত্রগুলি যদি কিছু দিন ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া, শেষে তৈলাভাবে মরিচা ধরিয়া অচল হয়, এবং যাঁহারা শিক্ষা পাইয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহারা নিষ্ফলা বিদ্যার বোঝা কাঁধে করিয়া অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের কারণ হইবে না। আমাদের যেরূপ সামর্থ্য, দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই সকল উদ্যমগুলি যদি ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তাহাতে ব্যর্থ উদ্যমের নৈরাশ্য আসিয়া দেশে আবার জড়তা আনিবে কি না, তাহা চিন্তিবার বিষয়।

দেশের শিল্প-শিক্ষার যে পুরাতন প্রণালী ছিল, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালীর মত যন্ত্রবদ্ধ ছিল না, এবং তাহার সহিত প্রতিযোগিতাতেও সমর্থ ছিল না বটে ; কিন্তু তাহার কতকগুলি গুণ ছিল, তাহা সে কালের সমাজের পক্ষে উপযোগী ছিল। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে লোকের যে যে অভাব ছিল, সে কালের শিক্ষা-প্রণালী সেই সেই অভাব মোচনের উপযোগী ছিল। এবং সেই শিক্ষা-প্রণালী এমন নিঃশব্দে কাজ করিত যে, উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় ত সকলে জানিতে পারিত না।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অন্য যতই দোষ থাকুক, উহা দেশ ব্যাপিয়া শিল্পশিক্ষার অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। এবং সেই উপায় এই দেশের অবস্থার উপযোগী। অন্যান্য দেশের বৃহদ্ব্যাপার ছাড়িয়া এ দেশে ক্ষুদ্রাকারে শিল্পবিদ্যার যে সকল ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। যে বিদ্যালয়ে আধুনিক প্রণালীতে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে নানারূপ শিক্ষাসরঞ্জাম আবশ্যক হয়—ব্যয় করিয়া সেই সকল সরঞ্জামের সংগ্রহ করিতে হয়—মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে যন্ত্রাদি কিনিতে হয়, আনিতে হয়, চালাইতে হয় ; ইহা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তার পর বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়—উচ্চ বেতনে পরিচালক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হয়। এই সকল কারণে এই শিক্ষাও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার কিছু সঙ্গতি আছে, সে-ই এই বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে; দরিদ্রের পক্ষে অর্থাৎ আমাদের দেশের

সাড়ে পোনের আনার পক্ষে ইহার দ্বার রুদ্ধ। যাঁহারা শিক্ষা পাইয়া বাহিরে আসিয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। স্বাধীন ভাবে শিল্পীর জীবন আরম্ভ করিতে হইলে যে সকল যন্ত্র সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে, যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যে মুটে মজুর নিযুক্ত করিতে হইবে, তার জন্যও প্রচুর মূলধন আবশ্যক। বিশেষ সঙ্গতি না থাকিলে কোন ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিয়াও অর্জ্জিত বিদ্যা ফলাইতে পারিবেন না। কাজেই দরিদ্রের পক্ষে এই শিক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা আছে।

এ দেশের প্রাচীন প্রণালীতে জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদের ব্যবস্থা থাকায় শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত অতি সহজ হইয়া আছে। পিতা যে শিল্পে অভিজ্ঞ, পুত্রকেও সেই শিল্প শিখিতে হয়। তাহার নিজের ঘরই তাহার বিদ্যালয়, নিজের বাপ খুড়াই তাহার শিক্ষক। ঘরের ভাত খাইয়া সে বিদ্যালাভ করে—হোটেল ভাড়া দিতে হয় না, বোর্ডিং খরচ দিতে হয় না। পয়সা খরচ করিয়া যন্ত্র কিনিতে হয় না, এক পয়সা বেতন পর্য্যন্ত দিতে হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন তাহার সুবিধা, যখন তাহার বাপ খুড়ার সুবিধা, তখনই শিক্ষালাভ করিতে পায় এবং বাপ খুড়ার যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহা যথাকালে দখল করিয়া লয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজে যখন স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, তখনও মূলধন সংগ্রহ করিতে হয় না; হাতিয়ার সরঞ্জাম যাহা কিছু দরকারী, পিতার নিকট উত্তরাধিকার-সূত্রে এক কড়া মূল্য না দিয়া পাইয়া থাকে। সকলের উপর দ্রষ্টব্য এই, শিক্ষকের উপর পরিদর্শক রাখিতে হয় না—শিক্ষক এখানে ছাত্রকে ফাঁকি দেয় না—শিক্ষকের যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহার এক ক্রান্তি সে হাতে রাখে না—ষোল আনা যত্নের ও শ্রদ্ধার সহিত তাহা শিক্ষার্থীকে অর্পণ করে; কেন না, এখানে শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর স্বার্থ একবারে অভিন্ন।

বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সমস্ত দেশের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রণালী চলিয়া আসিতেছে, এবং এই প্রণালীর কল্যাণে এ পর্য্যন্ত দেশের যাবতীয় অভাব পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য প্রণালীর সহিত ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না ও পারিবে না, তাহা সত্য কথা; কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রণালীকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। সে দিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষাপ্রণালী বিশ কোটি লোকের বস্ত্র যোগাইয়াছে; এখন পর্য্যন্ত এই

প্রণালীই ত্রিশ কোটি লোকের অন্ন যোগাইতেছে। যাঁহারা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ উঠাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিদেশের প্রতিযোগিতায় তাঁতীর ব্যবসায় গিয়াছে বা যাইতেছে; কিন্তু কামার, কুমার, ছুতারের ব্যবসায় আজিও উঠে নাই। কামার, কুমার, ছুতারের বিদ্যা এ-কালের প্রণালীমতে অথচ সহজে ও সস্তায় শিখাইবার ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, তত দিন জাতিভেদের সহিত লড়াই করিলে ফল পাওয়া যাইবে কি?

অথচ দেশের মধ্যে এই যে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান আছে, ইহাকে যন্ত্রবদ্ধ প্রণালী বলা যায় না। এই দেশজোড়া শিল্পশিক্ষার উন্নতির জন্য কোথাও কোন একটা সমিতি নাই, কেহ ইহার আয়-ব্যয়ের হিসাব করে না, কেহ ইহার বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে না, ইহার সম্পর্কে ডাকঘরের এক পয়সা আয় বৃদ্ধি হয় না; ছাপাখানা হইতে কেহ একখানা বিল পাঠায় না। কোন্ ব্যক্তি কোন্ তারিখে এই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে, কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, অথচ এই প্রণালী সমস্ত দেশ জুড়িয়া আপনা হইতে চলিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের জমিতে যেমন যথাসময়ে ঘাস গজায়, কেহ তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করে না, সেইরূপ ভারতবর্ষ জুড়িয়া কামার, কুমার, ছুতারের যথাকালে উৎপত্তি হইতেছে। কস্মিন্ কালে তাহার অভাব বোধ হয় নাই। ইহাকে যন্ত্র বলা চলে না। যন্ত্রের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট যন্ত্র কলুর ঘানিও ঘুরিবার সময় কট্ কট্ ধ্বনি করে; কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালী নিঃশব্দে চলিয়া আসিতেছে।

আর একটা গুরু গম্ভীর দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এবার শিল্প-শিক্ষার দৃষ্টান্ত নহে; এবার খাঁটি বিদ্যাশিক্ষার দৃষ্টান্ত; যে বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার সম্পর্ক আছে কি না, জানি না; কিন্তু যাহার সহিত মা সরস্বতীর সম্পর্ক আছে।

আধুনিক প্রণালী-সম্মত বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রের নাম ইস্কুল বা কালেজ; এখন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল ও নগরে নগরে কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক একটি ইস্কুল বা কালেজ এক একটি যন্ত্র। অথবা সমুদয় ইস্কুলগুলি বা কালেজগুলি লইয়া একটা "বিরাট্ যন্ত্র"—যে যন্ত্র চালাইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বয়ং গবর্মেণ্ট। এক একটা ইস্কুল

কালেজকে ঐ বিরাট্ যন্ত্রের এক একখানা চাকা মনে করিলেও করিতে পারি।

হাল আইনে একটা নূতন কালেজ খুলিতে হইলেই উদ্যোগকারীকে কিছু অর্থ—যাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে—লইয়া বসিতে হয়। একখানা পাকা বাড়ী চাই—তাহার এতগুলা কুঠরি দরকার—প্রত্যেক কুঠরি দীর্ঘ এত, প্রস্থ এত, খাড়াই এত—তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এত ঘনফুট হাওয়া আবশ্যক—এত বাতির সমান আলো চাই। কর্তৃপক্ষ বাড়ী মঞ্জুর করিলে, তার পর বেঞ্চি, ডেস্ক, টেবিল, কেদারা, আলমারি, টানাপাখা, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি সরঞ্জাম আবশ্যক—তার পর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক—ইঁহার বেতন এত টাকা, ইনি হপ্তায় এত ঘণ্টার অধিক কাজ করিবেন না—ইনি এত ঘণ্টা পড়াইবেন, এতগুলি কাগজ দেখিবেন, এত ক্ষণ বিশ্রাম করিবেন—সমস্ত কাঁটায় কাঁটায় বন্দোবস্ত। তার পর কেরানী, উপকেরানী, দপ্তরী, দরোয়ান, পিয়ন ইত্যাদি। তদুপরি লাইব্রেরি, লেবরেটারি ইত্যাদি ত আছেই। সকল বিষয়েই কর্তৃপক্ষ খুঁটিনাটি আইন বাঁধিয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয় ত হইল—তার পর বিদ্যালয় পরিচালন করিবে কে? যিনি উদ্যোগকারী, যিনি মূলধনী—যিনি ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিদ্যালয় খুলিতে বসিয়াছেন, তিনি বিদ্যালয়কে বিদ্যাবিপণিতে পরিণত করিয়া ফেলিবেন, এই আশঙ্কা থাকে; তাঁহার মূলধন হইতে চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে কুসীদ আদায় করিয়া লইবেন, এই আশঙ্কা থাকে। তাই কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের পরিচালনার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব তাঁহার উপর দিতে চাহেন না—পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ লোক লইয়া কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি মাসে মাসে অধিষ্ঠান করেন, খরচপত্রের ব্যবস্থা করেন, শিক্ষক হইতে পিয়ন পর্যন্ত বাহাল বরতরফ করেন, কোন শিক্ষক মায়ের শ্রাদ্ধে তিন দিনের উপর পাঁচ দিন কামাই করিলে তাঁহার মাহিনা কাটেন, কোন্ শিক্ষক ক্লাসে গিয়া কয় মিনিট ঘুমাইয়া থাকেন, তাহার আলোচনা করেন—এবং কমিটির যিনি সেক্রেটারি, তিনি গুরুগম্ভীর ভাবে এই সকল বিরাট্ মীমাংসা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। এবং সেক্রেটারি কোন বানান ভুল করিলেন কি না, তাহা দেখিয়া সভাপতি সেই লিপি মঞ্জুর করেন।

বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে দরোয়ানকে অতিক্রম করিয়া আপিস,—সেখানে কেরানীবর্গে বেষ্টিত হইয়া আপিসের অধ্যক্ষ অধিষ্ঠিত।

বিদ্যালাভার্থী ছাত্রগণ সভয়ে, স্পন্দিতহৃদয়ে আপিস-ঘরের দুয়ারে, বারাণ্ডায় কাতার দিয়া দণ্ডায়মান এবং প্রবেশ করি, কি না করি, এই সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান। কেন না, আপিসের যিনি কর্ত্তা, তাঁহার মুখ গম্ভীর; যাঁহারা তাঁহার অধীন, তাঁহাদের মুখ আরও গম্ভীর—এবং সকলেরই মুণ্ড সম্মুখে রক্ষিত খাতার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি। খাতার কাছে খাতা, খাতার উপরে খাতা, মেঝের উপর, টেবিলের উপর, ছাদের নীচে, সর্ব্বত্রই খাতা,—সমচতুর্ভুজ, সমচতুরস্র, দীর্ঘচতুরস্র, বহুবিধ খাতা। এহেন খাতা-প্রাকাররক্ষিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া দুইটা মিষ্ট-বাক্য উপহার না পাইয়া যদি কোন ছাত্র প্রবেশিকা জমা দিয়া খাতার মধ্যে নাম লেখাইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, তাহার ছাত্রজীবন ধন্য।

প্রবেশান্তে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা। কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন্ শাস্ত্রের কতটুকু অধ্যয়ন করিতে হইবে, কোন্ শাস্ত্র সম্পর্কে কয়খানি বহি পড়িতে হইবে, কোন্ বহির কোন্ পাতাটা বর্জ্জন করিতে হইবে, কোন্ শাস্ত্র সম্পর্কে কত ঘণ্টা লেক্চার হইবে, ঘণ্টার অর্থ ষাট মিনিট, কি ছত্রিশ মিনিট, কতগুলি লেক্চার শুনিতে হইবে এবং কতগুলি ফাঁকি দেওয়া চলিবে—লেক্চার শুনিতে শুনিতে কত মিনিট কাল ঘুমাইয়া পড়িলে সেই শ্রবণক্রিয়া অগ্রাহ্য হইবে ইত্যাদি—অতএব এ সকল বিষয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী, কাহারও কোন দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেক্চার অনেক সময়ে এ-কানে ঢুকিয়া ও-কান দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং কোন শিক্ষকই ইহা নিবারণ করিতে পারেন না; কাজেই মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে পরখ করিয়া বাজাইয়া লওয়া দরকার হয়; সপ্তাহে পরীক্ষা, মাসান্তে পরীক্ষা, বৎসরান্তে পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষাপরম্পরায় যে বিদ্যার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্দ্ধারিত হয়, তাহার নগদ মূল্য প্রতি মাসে চারি মুদ্রা, এবং মাসের পোনেরই তারিখে বিদ্যালয়ের আপিসে জমা দিতে না পারিলে অতিরিক্ত দেয় জরিমানা চারি আনা।

বিদ্যাদানের এই যন্ত্রের মধ্যে নানাবিধ মহার্ঘ সামগ্রী আছে—দারোয়ান, চাপরাসী, সেক্রেটারি, দপ্তরী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেঞ্চি, টেবেল, লাইব্রেরি, হষ্টেল, ডিপ্লোমা, উপাধি, জরিমানা, রসিদ, ডাকটিকিট এবং অনেক চামড়া-বাঁধা খাতা—কিন্তু কেবল হৃদয় নাই। শিক্ষক ও

ছাত্রের মধ্যে কোনরূপ নাড়ীর টান নাই, কোনরূপ প্রীতিসম্পর্ক নাই। শিক্ষক ছাত্রের নাম জানেন না, মুখ চেনেন না; ঘণ্টা বাজিলে আপন কর্ত্তব্য সারিয়া মাসান্তে বেতন গ্রহণ করেন; চুক্তিমতে আঠারর জায়গায় উনিশ ঘণ্টা কোন সপ্তাহে কাজ করিতে বলিলে কপালে চোখ তোলেন, আর অধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া দারিদ্র্যাপরাধী ছাত্র, বেতন দিতে দেরি করিলে, তাহার জলখাবারের পয়সা হইতে জরিমানা করেন ও কেরানীরা মুখ ভেঙচায়।

এ পর্য্যন্তও সহ্য হয়; কিন্তু ইহার ভিতরে একটা মস্ত ফাঁকি আছে, সেটা প্রায় অসহ্য। ছাত্রেরা দিনের পর দিন পলিটিক্যাল ইকনমিশাস্ত্রে লেক্‌চার শুনিতেছে, কিন্তু পলিটিক্যাল ইকনমির সমুদয় সিদ্ধান্ত যদি মিথ্যা হয়, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের হেতু নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেবরেটরিতে দাঁড়াইয়া তাহারা কষ্টিক লোশনমধ্যে রূপার আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু রূপা না থাকিয়া যদি সীসা থাকিত, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক আছে কি না, এই লইয়া তাহারা অনেক বিচার-বিতর্ক মুখস্থ করিতেছে; কিন্তু ভূকেন্দ্রে চুম্বক না থাকিয়া একটা ভল্লুক থাকিলেও তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইত না। তাহারা চায় কেবল একখানা ডিপ্লোমা—যাহার বলে ভবিষ্যতে মুন্‌সেফী বা কেরানিত্ব ঘটিবে, যেখানে চুম্বক বা ভল্লুক, উভয়েরই সমান মর্য্যাদা; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহিত পলিটিক্যাল ইকনমির লেক্‌চার শোনার অত্যাচার সহ্য করিতেছে।

অথচ এই শূন্যগর্ভ ফক্কিকা এবং হৃদয়হীন দোকানদারি আশ্রয় করিয়া আমাদের শিক্ষাযন্ত্র বিকট শব্দ করিয়া অহরহ ঘূর্ণিত হইতেছে।

এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর পার্শ্বে দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করা যাইতে পারে। চতুষ্পাঠীতে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সহিত আধুনিক বিদ্যামন্দিরে দত্ত শিক্ষার বিষয়ের তুলনা করা আবশ্যক নাই। শিক্ষার বিষয় লইয়া এখানে আলোচনা হইতেছে না, শিক্ষার প্রণালী লইয়া আলোচনা।

টোলের প্রণালীর মুখ্য লক্ষণ এই যে, ইহার ভিত্তিতে ফাঁকি নাই। কেন না, এই বিদ্যা গোড়াতেই অর্থকরী বিদ্যা নহে। যাঁহারা এই বিদ্যা-লাভে উৎসুক, তাঁহাদের অর্থলাভের প্রলোভন নাই। টোলের বিদ্যায়

হাকিমি বা দারোগাগিরি বা কেরানিগিরি জুটিবার সম্ভাবনা নাই। কালেজে যে কেমিস্ট্রী পড়ে, আদালতের নাজির হইবার তাহার অধিকার জন্মে; কিন্তু মুগ্ধবোধ বা অমরকোষ সটীক কণ্ঠস্থ থাকিলেও পেয়াদার চাপরাস পাইবারও অধিকার জন্মে না। টুলো ছাত্রের যে অর্থাসক্তি নাই, এমন নহে; তাহারও জীবিকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে টোল খোলা ভিন্ন তাহার অন্য দুরাকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং টোল খুলিয়া সময়ে সময়ে শ্রাদ্ধের বিদায় ও বড়লোকের বাড়ী কিঞ্চিৎ বৃত্তি ভিন্ন লাভের আশা নাই; তার জন্য আবার সারা বৎসর কতকগুলি ছাত্র পুষিতে হয়। কাজেই টোলের যে ছাত্র অমরকোষ মুখস্থ করিতেছে, সে সেই অমরকোষেরই খাতিরে; যে স্মৃতির ব্যবস্থা কণ্ঠস্থ করিতেছে, ব্যবস্থাপত্র দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলেও মোটের উপর সে স্মার্ত্ত বলিয়া নাম জাহির করিতে চাহে, সেই প্রলোভনে। যে, যে শাস্ত্র শিখিতে আসিয়াছে, সে সেই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিবে, সেই প্রত্যাশায়।

জন্মস্থান হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া যে ছাত্র তাঁহার নিকট ন্যায়ের ফাঁকি শিখিতে যায়, সে নিতান্ত স্বেচ্ছাক্রমেই যায়—কেহ তাহাকে জোর করিয়া পাঠায় না, কেহ তাহাকে স্কলারশিপের প্রলোভন দিয়া ডাকেও না। সে নিতান্তই ন্যায়ের ফাঁকি শিখিতেই যায়—অন্য কোন ফাঁকি দিতে বা শিখিতে যায় না। এখানে উভয় পক্ষে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। তাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহার সাহায্যে যতটুকু পারে, তাহা শিখিবার জন্য যায় এবং অধ্যাপক যখন তাহাকে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার যতটুকু বিদ্যা আছে, তাহা দানের জন্যই গ্রহণ করেন। উভয়ের সম্পর্ক এইরূপে স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই সম্পর্কে উভয় পক্ষে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে, কোনরূপ আইনকানুনের বাধ্যবাধকতা থাকে না; প্রতিনিধি দ্বারা হাজিরা বহিতে হাজিরা লিখাইবার দরকারই হয় না। ছাত্র যাহা পড়িতে চায়, তাহাই পড়ে; শিক্ষক যাহা পড়াইতে পারেন, তাহাই পড়ান। কোথাও কোন দরোয়ান থাকে না, কেরানী থাকে না, রেজিষ্টারির খাতা থাকে না, জরিমানা থাকে না, লেক্‌চারের ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ থাকে না। অথচ শিক্ষকের সহিত ছাত্রের যে প্রীতি-বন্ধন না থাকিলে শিক্ষা মাত্রই অপশিক্ষায় পরিণত হয়, তাহা বর্ত্তমান

থাকে। ছাত্রকে বেতন দিতে হয় না, হোষ্টেল ভাড়া ও বোর্ডিং খরচাও দিতে হয় না; উপরন্তু শিক্ষকের গৃহে বাস করিয়া, শিক্ষকের অন্নে পালিত হইয়া, শিক্ষকের পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে ছাত্র শিক্ষকের কাঠ চেলায়, ভাত রাঁধে, তলপী বহে, এবং—এবং—বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণ হও—সময়ে অসময়ে অধ্যাপকের ফাটা পায়ে তেল মালিস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল গর্হিত ভদ্রানুচিত কর্ম্মে ঘৃণা বোধ না করিয়া শ্লাঘা বোধ করাই সেখানে রীতি।

এই যে বিনা বেতনে বিদ্যাদান—যাহা ভারতবর্ষের চিরদিনের অভ্যস্ত—বৈদেশিকেরা এই ব্যাপারের পূর্ণ মাহাত্ম্য কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের ধাতুর সহিত ইহা মিলিবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য নিয়ম হইতেছে—লেনা-দেনার ব্যাপার; তুমি যখন আমার নিকট উপকার পাইতেছ, তখন তাহার মূল্য আমাকে দিবে না কেন? এক পক্ষে দান, অন্য পক্ষে প্রতিদান, এ কালের হিসাবে এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক। ইহার বিপরীত ব্যবস্থা—অর্থাৎ এক পক্ষে দান, অন্য পক্ষে গ্রহণ মাত্র—ইহা অস্বাভাবিক—এই ব্যবস্থার ভিত্তির উপর কোনরূপ সামাজিক অনুষ্ঠান স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই ব্যবস্থার পক্ষে বলিবার আছে। যাহা গ্রহণ করিব, তাহা মূল্য দিয়া লইব, কাহারও অনুগ্রহের উপর লইব না, সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্যের এই মূল ভিত্তি। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা, পরানুগ্রহে নির্ভর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অনুকূল হইতে পারে না এবং শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক স্বার্থেরও প্রতিকূল হয়। ইহাই পাশ্চাত্য সমাজের নীতি এবং এক হিসাবে ইহা সন্নীতি, সন্দেহ নাই। এই নীতি মানিয়া লইলে আপনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দানধর্ম্ম সর্ব্বত্র ধর্ম্ম নহে। বিখ্যাত দার্শনিক হার্বর্ট স্পেন্সার—যিনি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন ,তিনি আপন গবর্ণ্মেণ্টের নিকটও দান গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাষ্ট্রের স্বার্থ যখন প্রজার স্বার্থ হইতে অভিন্ন, তখন প্রজা মাত্রকেই সরকারী ব্যয়ে বিদ্যাদান করিয়া রাষ্ট্রহিতে সমর্থ করিয়া তুলিতে পারিলে রাষ্ট্রেরই লাভ; অতএব রাষ্ট্রের ব্যয়ে প্রজামাত্রেরই বিদ্যাশিক্ষাব্যবস্থা উচিত,—এই নীতি আজকাল পাশ্চাত্য দেশে গৃহীত হইতেছে বটে। কিন্তু স্পেন্সারের মত পণ্ডিতগণের ইহাতেও ঘোর আপত্তি। যে বিদ্যালাভ করিতে চায়, সে বিদ্যালাভের ব্যয় বহন করুক; রাষ্ট্রের অর্থ—যাহা

তাহার নিজস্ব অর্থ নহে, যাহা প্রজাসাধারণের অর্থ—তাহাতে ভাগ বসাইবার তাহার অধিকার নাই। পরের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাইবার জন্য অন্য পাঁচ জনে ত্যাগ স্বীকার করিবে, এরূপ ব্যবস্থা অনুচিত; ইহা অস্বাভাবিক। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া পরতন্ত্রতার প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রেরই—সমাজেরই স্বার্থহানি অবশ্যম্ভাবী। বলা উচিত, স্বাতন্ত্র্যানুকূল বিনিময় ব্যাপারে অভ্যস্ত হইয়াও স্বাতন্ত্র্যবাদের এই চরম পরিণতি আধুনিক স্বাতন্ত্র্যবাদী ইউরোপও পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সে যাহাই হউক, যে লাভ চায়, সে তাহার মূল্য দিবে, এই নীতি স্থূলতঃ পাশ্চাত্য সমাজ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের নীতি ইহার বিপরীত। এই নীতির অনুষ্ঠানে যে লেনা-দেনা, বিনিময়, দোকানদারির ভাব আসে, তাহা ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত মিলে না। ভারতবর্ষীয় নীতির সমর্থন করিবার এ স্থান নহে। সে সময় বা সে প্রবৃত্তি আমার নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ এই দোকানদারিতে চিরকাল কুণ্ঠিত; ভারতবর্ষের ইহাই স্বভাব। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের ইহা একটা মূল সূত্র। ইহা মানিয়া না লইলে ভারতবর্ষের অনেক সামাজিক প্রথার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সমাজের মধ্যে বণিগ্‌বৃত্তির অস্তিত্ব থাকিবেই; সকল সমাজেই থাকিবে। ভারতবর্ষের সমাজেও ইহা আছে; কিন্তু ভারতবর্ষ এই বণিগ্‌বৃত্তির প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে সঙ্কুচিত। এ দেশে ধনীর গৃহে কোন উৎসব সমারোহের অনুষ্ঠান হইলে সেখানে ইতর সাধারণের জন্য দ্বার অবারিত থাকে, কাহাকেও দ্বারদেশে টিকিট দেখাইতে হয় না—পাড়ার লোকে চাঁদা করিয়া বারোয়ারির যাত্রা দিলেও সেখানে টিকিটের ব্যবস্থা হয় না। এ দেশে মেলা বসিলে, দর্শনী দিয়া তাহা দেখিতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ী ভোজ হইলে অনাহূত ও রবাহূত সমান আদরে আহূতগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনে বসে। এ দেশে যে বস্তু যত আদরের, সেই বস্তুর দানে ততই গৌরব এবং সেই বস্তুর জন্য মূল্য প্রার্থনা ততই অগৌরবের বিষয়।

একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। এ দেশের শাস্ত্রে চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রতি কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ আছে; সমাজের শীর্ষে অবস্থিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে এ দেশে সাহসী হন নাই। শাস্ত্রকে

নিন্দা করিবার এখানে একটা প্রচুর অবসর হইয়াছে। সে দিন এক মাসিক পত্রিকায় এ জন্য হিন্দু সমাজের নিন্দাও দেখিলাম। ব্যাধিতের ব্যাধি মোচন—মনুষ্যের প্রাণদান যে ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ব্যবসায়ের অবজ্ঞা—ইহাই যে দেশে ব্যবস্থা, সে দেশের কল্যাণ কিসে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—যেহেতু মনুষ্যের প্রাণদানের ন্যায় মহৎ দান আর হইতে পারে না—ব্যাধিতের ব্যাধি মোচনের ন্যায় মহৎ কার্য্য আর কিছু হইতে পারে না—ঠিক সেই হেতু এই মহৎ দানকে জীবিকার্জ্জনে বিনিয়োগ ভারতবর্ষের ভাল লাগে না। মনুষ্যের প্রাণদানকে যিনি ব্যবসায় করিয়াছেন—যিনি উহাকে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইয়াছেন,—তিনি জীবিকার জন্য প্রাণদানের বিনিময়ে তুচ্ছ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হন, ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ইহা সম্পূর্ণ মিলে না। অথচ ব্যবসায়ী চিকিৎসক না থাকিলে কোন সমাজই চলে না। তিনি থাকুন—কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহাকে ষোল আনা সম্মান দিতে অসমর্থ।

জ্যোতির্বিদ্যার মত মহতী বিদ্যাকেও যাঁহারা জীবিকার উপায় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ঠিক এই কারণে ভারতবর্ষ সমুচিত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। অর্থ বিনিময়ে প্রাণদানের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ অগত্যা সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু অর্থ বিনিময়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ আদৌ সম্মত হইতে পারেন নাই। কেন না, ভারতবর্ষের হিসাবে প্রাণের অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অধিক।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যাহা আছে, তাহার আলোচনাতে ইহাই দেখা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজে বেদ ও বিদ্যা সমার্থক ছিল। তৎকালে যে বিদ্যা ছিল তাহার সমষ্টির নামই বেদ। এই বেদকে বেদপন্থী সমাজ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবিতেন—বেদ শব্দরাশি এবং শব্দই ব্রহ্ম। তিনি বলেন—শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা অনাদি—ব্যক্ত চরাচরের পূর্ব্বেই ইহা বিদ্যমান ছিল। এই শব্দ হইতেই—এই বেদ হইতেই চরাচরের অভিব্যক্তি হইয়াছে। বেদ অপৌরুষেয়; কোন পুরুষে ইহার প্রণয়ন বা রচনা করেন নাই; স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও পুরুষমাত্র, তিনিও ইহার সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। এই অনাদি বাণী তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল মাত্র—আর যাঁহারা ভাগ্যবান্, যাঁহারা ক্ষমতাবান্, যাঁহাদের দেখিবার শক্তি ছিল,

তাঁহারা সেই বিধাতৃমুখনির্গত মূর্ত্তিমতী বাণী দেখিয়াছিলেন মাত্র, যাঁহাদের শুনিবার শক্তি ছিল, তাঁহারা তাহা শুনিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা ঋষি, তাঁহারা দ্রষ্টা,—তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই ইতর সাধারণকে বলিয়াছেন, অতএব তাঁহারা প্রবক্তা মাত্র। ইহা একবারে কবিকল্পনা নহে, ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। হালের ভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে এইরূপে সর্ব্বসাধারণকে বুঝান যাইতে পারে। ধর, উইলিয়াম সেকস্‌পীয়ার নামক কবি ম্যাক্‌বেথ নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। লোকে জানে, ম্যাক্‌বেথ কাব্যের রচনাকারী উইলিয়াম সেক্‌সপীয়ার। এই ম্যাকবেথ লোকটা বড় মন্দ ছিল না, তোমার আমার মত ভদ্রলোক সাজিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহার চিত্ত দুর্ব্বল ছিল এবং সেই দৌর্ব্বল্যের ছল পাইয়া মনুষ্যের প্রবল শত্রু শয়তান তাহার উপর অধিকার স্থাপন করিল। সংসারের পথ পিচ্ছিল; যেখানে পিচ্ছিলতা একটু অধিক, সেইখানেই উহাকে এক একটা ধাক্কা দিয়া ক্রমে তাহাকে এমন পঙ্কে ডুবাইয়াছিল, যেখান হইতে হতভাগ্যের আর উদ্ধারের আশা থাকিল না। মনুষ্যের আদি দম্পতি যে দিন ধরাধামে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই শয়তানের এই শয়তানী আরম্ভ, ইহা হইতেই সংসারে পাপ ও মৃত্যু। বস্তুতঃ সংসারে এই পাপ পুণ্যের অধিকার আরম্ভ মনুষ্যের আবির্ভাবের সময় হইতে হইয়াছে বলিলে সত্যকে অকারণে সঙ্কীর্ণ করা হয়। যে মায়া হইতে এই বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি, যে মায়ার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান, মানবের অন্তর্দেহে প্রভুত্বপ্রার্থী এই পাপপুরুষ তাহারই মূর্ত্তিভেদ মাত্র। মানবের উপর তাহার এই দৌরাত্ম্য, বর্ত্তমান জগৎ-প্রণালীরই একটা অঙ্গ মাত্র। এই যে সত্য, ইহা চিরন্তন সত্য, ইহা অনাদি সত্য, ইহা চিরকাল আছে, ইহার একটা দিক্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সেক্সপীয়ারের সমীপে প্রতিভাত হইয়াছিল; ইহা শব্দরূপে, ছন্দোবদ্ধ বাক্যরূপে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল। কাজেই সে কালের ভাষায় বলিতে পারি, সেক্সপীয়ার কেবল কবি নহেন, তিনি এই ছন্দোময় বাক্যের দ্রষ্টা,—তিনি ঋষি।

অথবা ধর, সার্ আইজাক নিউটন। আপেল ফল চিরদিনই ভূকেন্দ্রের অভিমুখে পতনোন্মুখ। চন্দ্র যেমন ভূকেন্দ্রের মুখে পতনোন্মুখ—গ্রহগণ

যেমন সূর্য্যের মুখে পতনোন্মুখ, সেইরূপ পতনোন্মুখ ;—এই পতনোন্মুখতা চিরদিনই আছে। নীহারিকা অথবা উল্কামালা জমাট বাঁধিয়া সৌর জগৎ অথবা তদ্বিধ নানা জগৎকে অভিব্যক্ত করিয়াছে ; তাহার প্রত্যেক কণিকাতে এই পতনোন্মুখতা বর্ত্তমান ছিল ; কবে হইতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা কে জানে ? ইহা সনাতন সত্য—প্রত্যেক মনুষ্যের চোখের সামনে এই সত্য উপস্থিত ছিল। সকলের সাধনা সমান নহে, ইতর মনুষ্য চক্ষুঃ সত্ত্বে অন্ধ। নিউটন চক্ষুষ্মান্ ছিলেন—তাঁহার সমীপে এই অশরীরী সত্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দিল, তাঁহার কর্ণে ইহা ধ্বনিত হইল—তিনি যাহা দেখিলেন এবং শুনিলেন, ইতর সাধারণকে তাহা জানাইলেন। মাধ্যাকর্ষণঘটিত মন্ত্রের তিনি ঋষি।

যাক্, প্রাচীন বেদপন্থী আর্য্যসমাজে আবহমান কাল হইতে যে বিদ্যা পুঞ্জীভূত হইয়া সনাতন বাণী বলিয়া গৃহীত হইত, তাহার রক্ষাকর্ম্ম প্রত্যেক সামাজিকের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত। এখানে কোনরূপ বিচার বিতর্ক, কোন সুবিধা অসুবিধা বিবেচনার অবসর মাত্র ছিল না। কোনরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠিবারই অবসর ছিল না। বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য কি, ইহার উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন, কি পরার্থসাধন, ইহার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, জীবন-সংগ্রামে সামর্থ্যলাভ বা রাষ্ট্রীয় বলবিধান, এই সকল প্রশ্ন উঠিবার কোনই অবসর ছিল না। প্রত্যেক সামাজিককে এই বিদ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা তাহার মানব জন্ম সম্পূর্ণ হইবে না বা সার্থক হইবে না। এই বিদ্যা যে গ্রহণ করে, তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয় ; এই দ্বিতীয় জন্ম, গৌরবে প্রাকৃতিক জন্মের তুলনায় হীন নহে।

এ কালে যাহাকে নিম্নশিক্ষা বলে, জীবন-সংগ্রামে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য লাভের জন্য তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনেক দেশে রাজদণ্ড-প্রয়োগে ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রহণ করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ; এ দেশেও কথাটার কল্পনা জল্পনা হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবার কল্পনা কোন দেশেই হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহা উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা গ্রহণ করিতে প্রত্যেকেই বাধ্য ছিল, কিন্তু এই বাধ্যতা স্থাপনের জন্য কোনরূপ রাজ-ব্যবস্থার, কোনরূপ রাজদণ্ড প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই। এই ব্যবস্থাকে

যন্ত্রবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যথাকালে আচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতেই হইবে, ইহা সকলেই যেন একবাক্যে মানিয়া লইয়াছিল। সনাতনী বাণী, সমুদায় সমাজতন্ত্র যাঁহার প্রভুত্বের অধীন, তাঁহাকে যথাশক্তি রক্ষা করিতেই হইবে, নতুবা প্রত্যবায় হইবে, ইহা প্রত্যেক সামাজিক নির্ব্বিবাদে, বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এ বিষয়ে দ্বিজাতি মাত্রেরই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রত্যেক বর্ণেরই অর্থাৎ তাৎকালিক আর্য্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমান অধিকার—সে বিষয় কোনরূপ মতদ্বৈধ ছিল না।

কেন না, ইহা একটা ঋণ ; মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র এই ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মানুষের নানা ঋণ আছে। দেবতা-গণের নিকট ঋণ আছে ; মনুষ্যের শুভাশুভ, অথবা শুভাশুভের যে অংশ আপনার আয়ত্ত নহে, দেবতারা তাহার নিয়ন্তৃত্ব করেন ; অতএব দেবতা-গণের নিকট ঋণ আছে। পিতৃগণের নিকট ঋণ আছে ; কেন না, মানুষের যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহা পিতৃপুণ্যে অর্জ্জিত, পিতৃপুরুষপরম্পরার নিকট হইতে তাহা সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে ; অতএব পিতৃগণের নিকট ঋণ আছে। মনুষ্যগণের নিকট ঋণ আছে ; কেন না, মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ, যখন একের হাত ধরিয়া অন্যকে চলিতে হয়, তখন প্রত্যেক মনুষ্য অপর মনুষ্যের ঋণী। যাবতীয় ভূতগণের নিকট ঋণ আছে ; কেন না, পশু পক্ষী, তরু লতা, নদী পর্ব্বত, সকলেই মানবজীবনের কল্যাণে কিছু না কিছু আনুকূল্য করে। কিন্তু সকল ঋণের উপর ঋষিগণের নিকট ঋণ ; কেন না, যে সত্যের উপর বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত, যে সত্যের বলে বিশ্বজগৎ চলিতেছে, সেই সত্যের মূর্ত্তি তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সত্যকে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সত্যকে তাঁহারা সনাতনী বাণী দ্বারা প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন ; সেই সনাতনী বাণী মনুষ্যের নিকট অভয় ঘোষণা করিতেছে, সেই বাণী মর্ত্ত্য জগতে অমরত্বের ভরসা আনিতেছে ; আর সমুদয় তুচ্ছ—সেই বাণীই পরম পদার্থ। সেই বাণীকে পূজা করিতেই হইবে। ঋষিগণ মুক্তহস্তে যে অভয়বাণী বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। এই ঋষিগণের নিকট এই কারণে সকলেই ঋণী। এই ঋণমোচনে সকলের সমান অধিকার, এই ঋণমোচনের অবসর পাইলে মানবজীবন ধন্য হয়, পূর্ণ হয়—ইহাতে

বিচার বিতর্কের অবসর নাই। মাথা পাতিয়া এই ঋণ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে হইবেই। ঋষিগণ অন্য প্রতিদান চাহেন না; তাঁহারা চাহেন এই যে, তাঁহাদের দত্ত দান সাদরে গৃহীত হউক, রক্ষিত হউক, পূজিত হউক।

এই ঋণমোচনের অধিকার দ্বিজাতিসমাজে প্রত্যেকেই অকুণ্ঠিতভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথাকালে আচার্য্যগৃহে উপনীত হইয়া যথাশক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মিত। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও যাবজ্জীবন ব্রহ্ম অভ্যাস করিতে হইত—কেন না, ব্রহ্ম অভ্যাস মহাযজ্ঞ, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহার অনুষ্ঠানে কোন স্বার্থসিদ্ধির আশা নাই, ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে। অতএব যে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাভ্যাসে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে যাবজ্জীবন এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। গৃহীর অনুষ্ঠেয় সর্ব্বমহাযজ্ঞের মধ্যে এই যজ্ঞের স্থান সকলের উপর। দেবোদ্দেশে দ্রব্য-ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের দেবতা সত্য; এই যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্ম। গৃহস্থের জীবন এখানে সেই দ্রব্য, ফলকামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাহা সেই দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্র্যের কথা উঠে না। ইহাতে কি লাভ হইবে, তাহা জানার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত হিত হইবে বা রাষ্ট্রগত হিত হইবে, সে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই। জীবন-সংগ্রামে জয় হইবে বা পরাজয় হইবে, সে তুচ্ছ কথার আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজে বিদ্যাদান সম্বন্ধে এই থিওরি উদ্ভাবিত ও ঐকমত্যে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এই থিওরি কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য কোনরূপ বিশেষ আয়োজন উদ্যোগ করিতে হয় নাই। কোন ইস্কুল, কালেজ—মায় সেক্রেটারি, দরোয়ান, দপ্তরী, আপিস, খাতা,—কোন যন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমিতে যেমন যথাকালে তৃণ গুল্ম উৎপন্ন হইত, তেমনি বিদ্যান্বেষী যথাকালে বিদ্যাদাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা গ্রহণ করিত; কখনও বিদ্যান্বেষীরও অভাব হয় নাই, বিদ্যাদাতারও কখনও অভাব হয় নাই। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই নিয়ম ছিল। আর যিনি বিশেষতঃ জ্ঞানপিপাসু, তিনি আপনার পিপাসার তৃপ্তির জন্য, কোন্ গোমুখী হইতে জাহ্নবীধারা নিঃসৃত হইতেছে, তাহা

অন্বেষণ করিয়া লইতেন, এবং বিনীত ভাবে, বিনীত বেশে, সমিৎহস্তে বাঞ্ছাকল্পতরু আচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া জ্ঞানপিপাসা মিটাইয়া লইতেন।

যন্ত্রবদ্ধ প্রণালীতে বিদ্যাদান-প্রণালী ভারতবর্ষে যে একবারে অপরিচিত, তাহা নহে। দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা হইয়াছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের বিহারে ও সঙ্ঘারামে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী বিদ্যালাভার্থ সমবেত হইত। এই সকল বিহারের ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠার্থ কোটিপতি আপনার অর্থকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, রাজা আপনার রাজ্যের অংশ ছাড়িয়া দিতেন, গৃহস্থ আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেন। নানা দিগ্দেশ হইতে বিদ্যার্থী সেখানে সমাগত হইত, কাব্যকলা মুখরিত হইত, বিচার-বিতণ্ডার ফোয়ারা ছুটিত, বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির ঘাত-প্রতিঘাতে জ্ঞানাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিত। স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যবিদ্যা সৌধে, অট্টালিকায়, প্রাচীরে, বাতায়নে, গৃহদ্বারে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিত। শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক—এমন কি, প্রহরী, দপ্তরী কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এই যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী স্থায়ী হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত বোধ করি, ইহার সামঞ্জস্য হয় নাই; ইহার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তাহা বোধ করি, ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত মিশিতে পারে নাই। অথবা ইহার অভ্যন্তরে সেই প্রাণশক্তির অভাব ছিল, যাহা সত্য হইতে বল সঞ্চয় করে, সত্যের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালীকে আমি সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর জীর্ণ শীর্ণ, রুগ্ন ভগ্ন, বিকলাঙ্গ সন্ততি স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করি। ইহাতে একটা বৃহৎ আদর্শের ছায়া দেখিতে পাই। ইহাতে একটা প্রাচীন মহৎ আদর্শের জীর্ণ পরিণাম দেখিতে পাই; ইহার দোষ অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে আদর্শের ইহা ধ্বংসাবশেষ মাত্র, সেই আদর্শ আমার চক্ষুতে অত্যন্ত মহীয়ান্; আমার চিত্তপটে সেই আদর্শের ছায়াপাত মাত্রে আমি আত্মসংবরণে অসমর্থ হই। বর্ত্তমান কালের আদর্শকে তাহার পার্শ্বে উপস্থিত করিতে আমার কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ হয়। বর্ত্তমান কালে যে প্রাচীন আদর্শের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহাতে পুনরায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করা সম্ভবপর কি না, তাহা

জানি না। হয় ত এ কালের প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত যন্ত্রবদ্ধ প্রণালীই একালের উপযোগী, কিন্তু এই প্রণালী যত দিন যন্ত্রমাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যত দিন ইহার অভ্যন্তরে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত না হইবে, তত দিন কেবল অট্টালিকা এবং লাইব্রেরি ও লেবরেটারির ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়া জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিতে অধিক ফল পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে আমার সংশয় আছে। অট্টালিকা এবং লাইব্রেরি ও লেবরেটারি অর্থ-সাপেক্ষ ; অর্থ থাকিলে ঐ সকল সম্পত্তি বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রাণশক্তি, যাহার বলে দেহমধ্যে অঙ্গের সহিত অঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হয়, যাহাতে স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের শোণিতধারা সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত করিয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজীব ও সুন্দর রাখে, তাহা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। আইনের বলেও তাহার সৃষ্টি হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, শিক্ষাপ্রণালীই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, শিক্ষার বিষয় লইয়া কোন কথা উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক। সহস্র বা চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের জ্ঞানের পরিসর যত দূর বিস্তৃত ছিল, বর্ত্তমান কালের পরিসরের সহিত উহার তুলনা হয় না। মানব জাতির সৌভাগ্যবলে মানবেতিহাসে ঋষির অভাব কোন যুগেই ঘটে নাই। পুরাতন ঋষিগণের আবিষ্কৃত বিদ্যার সহিত আধুনিক ঋষিগণের আবিষ্কৃত বিদ্যার সংযোগ হইয়াছে। জ্ঞানের প্রবাহ এখন শতমুখে সহস্রমুখে ধাবিত হইতেছে ; শতমুখী জাহ্নবীর প্রবাহের ন্যায় এই জ্ঞানের প্রবাহ মানবের মনোভূমিকে আর্দ্র, সিক্ত ও উর্ব্বর করিতেছে। শিক্ষাদানের যে প্রণালীই অবলম্বিত হউক না, এই জ্ঞান-তরঙ্গিণীর এই সহস্র ধারাকে তাহার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে কাহারও কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তবে কোন্ প্রণালী অবলম্বিত হইলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতে পারিবে, অস্মদ্দেশে সুধীগণের ও মনীষিগণের পক্ষে এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ('মানসী,' আশ্বিন ১৩১৭)

অভিনন্দন*

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণকিরণ-পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর! পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে

* কবি-[রবীন্দ্রনাথ]-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে [১৪ই মাঘ ১৩১৮] টাউন হলের সভায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে লেখক পরিষৎসম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর। শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন। ('বঙ্গদর্শন,' মাঘ ১৩১৮)

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে নিবেদন*

মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে যখন কাশিমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয়, তখন উপস্থিত সাহিত্যসেবিগণের অনুরোধে ও অনুমতিক্রমে এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমার বিশেষ আনন্দ এই যে, মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই কয় বৎসর এই সাহিত্য-সম্মিলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছেন এবং আমিও সেই উদ্দেশ্য অনুসারে এই সম্মিলনের গঠন ও পরিচালনকার্য্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি যথাসাধ্য অর্পণ করিয়া আসিয়াছি। আজ শারীরিক অবসাদ আমাকে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিতে দিল না এবং চট্টগ্রামে সমবেত সাহিত্যসেবিগণের সঙ্গলাভে অসমর্থ করিল। ঘটনাক্রমে বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত এবং সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও অদ্যকার সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং সম্মিলনের গঠন পরিচালনা কার্য্যে যিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেই ব্যোমকেশ মুস্তফীও আজ আমারই মত ভগ্নদেহ লইয়া আপনাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

জগন্মাতার ছিন্নাঙ্গ সম্পর্কে যে চট্টগ্রাম প্রদেশ সমস্ত ভারতবাসীর মহাপীঠ, দেবদেব চন্দ্রশেখরের অপ্রসাদ ব্যতীত সেই তীর্থের রজঃ শিরে ধরিবার সুযোগলাভে বঞ্চিত হওয়ার আর কি হেতু থাকিতে পারে?

* ১৩১৯, ৯-১০ চৈত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত।—সম্পাদক।

বিধাতৃবিধানের উপর পরিতাপে কাহারও অধিকার নাই; দৈব অপ্রসাদকে মহাপ্রসাদরূপে শিরোধার্য্য করিয়াই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানব সান্ত্বনালাভে বাধ্য আছে। কিন্তু কতিপয় কারণে আমার ক্ষোভের মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ভারতের মহাকবি বলিয়াছেন—"যদধ্যাসিতমর্হস্তি তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে।" মহৎ লোকের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা আমার গুরুস্থানীয় এবং যাঁহারা আমার সহায় ও সহকারী মিত্রস্থানীয়, সেই মহাশয়গণের পদার্পণে চট্টগ্রাম এই কয় দিনের জন্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। যে সকল কবি ও মনীষী পূর্ব্বে বা পরে চট্টগ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নাম উচ্চারণ আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্তু একটি নাম উচ্চারণের স্পৃহা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। স্বর্গগত কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্কলাভে চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সাহিত্য-ভক্তদিগের সকলের পক্ষেই তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। আজিকার এই শুভ যোগ উপলক্ষ্যে যাঁহারা চট্টগ্রামে তীর্থযাত্রী, তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভে বঞ্চিত হইয়া আমি ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত। আমার ক্ষোভের আর একটা প্রবল হেতু আছে। গত বৎসর হুগলী নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যিনি হুগলীর পক্ষ হইতে বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের এই ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি আমাকে তাঁহার সাহিত্যশিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া সভাস্থলে প্রকাশ্যভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আছে কি না জানি না, কিন্তু এই স্থলে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন ইতিহাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই প্রকাশিত 'নবজীবন' পত্রিকায় বাঙ্গালী সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি হইয়াছিল। আমার তখন পঠদ্দশা। ছাপার হরপে নিজের রচনা প্রকাশিত দেখিবার প্রবল চাপল্য আমি দমন করিতে পারি নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্ত মাসে মাসে যে পত্রিকার জন্য অলঙ্কার রচনা করিত, সেই

পত্রিকায় নিজের মসীঅঙ্কিত নাম জাহির করিতে চপল বালক যার পর নাই শঙ্কা বোধ করিয়াছিল। 'নবজীবনে' আমার প্রথম রচনা ও পরবর্ত্তী আরও কয়টি রচনা আমি বেনামীতে পাঠাইয়াছিলাম। আমার প্রথম রচনা 'নবজীবনে' বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকাশের পর দেখিতে পাইলাম যে, 'নবজীবনে'র সম্পাদক প্রবন্ধটিকে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া উহার স্ফীত কলেবর শীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মনে বুঝিলাম যে, সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে আমার পৃষ্ঠদেশ নিশ্চিতই আমার সাহিত্যগুরুর নিকট বেত্রাঘাতের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক, সেই হাতে খড়ির দিনে গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক পরোক্ষপ্রেরিত বেত্রাঘাত আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবনে সংযমসাধনায় সাহায্য করিয়াছে। সে দিনের সেই সংযমশিক্ষা না ঘটিলে, আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিত, ইহা আমি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়া থাকি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তাঁহাকে উপস্থিত না দেখিয়া আমার হৃদয়ের বেদনা মৎপঠিত প্রবন্ধমধ্যে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। আজি তিনি চট্টগ্রাম সম্মিলনে বঙ্গসাহিত্যের গুরুর আসনে সমাসীন হইয়া এক হস্তে বেত্রসঞ্চালন ও অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। আমি চিরানুগত শিষ্যরূপে তাঁহার অনুগমনের অবকাশ পাইলাম না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ধ্বজবাহক কিঙ্কররূপে আমি এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ধুরবহনকার্য্য আমার অপেক্ষা সহস্রশঃ যোগ্যতর ব্যক্তির বৃষস্কন্ধে আরোপণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি। সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া পরিষদের প্রীতি-সম্ভাষণ বিজ্ঞাপন করিবেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত সাহিত্য-পরিষদের প্রীতি-সম্পর্ক যাহাতে চিরস্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ হয়, এইরূপ আশ্বাস ও সাহস পাইয়াছি। আমি এবার সম্মিলনের পরিচর্য্যাকর্ম্মে অংশভাগী হইতে পারিলাম না; তজ্জন্য বিনীতভাবে আপনাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এই ভিক্ষার সহিতই আমি সাহিত্য-সম্মিলনের নিকট এ বৎসরের জন্য—অথবা ভবিতব্য বিধানে হয় ত চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। ('মানসী,' চৈত্র ১৩১৯)

অভিভাষণ*

গত বর্ষে চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, আচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারি নাই। বোধ করি আমার এই অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুগণ বর্ত্তমান বর্ষে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্বের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। এই বিষয়ে তাঁহারা আমার মতামতের অপেক্ষা মাত্র রাখেন নাই। যোগ্যতা বিচার দূরে থাকুক, যেরূপ দৈহিক অবস্থা না হইলে এইরূপ সভার নেতৃত্বগ্রহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, দুই বৎসর হইতে আমার সেই অবস্থাই নাই। যোগ্যতা এবং ক্ষমতা, উভয়ের অভাব সত্ত্বেও সভার পরিচালন কিরূপে সাধ্য হইবে, সে বিষয়ে আমি তাঁহাদের উপদেশপ্রার্থী হইলেও তাঁহারা আমাকে সে উপদেশটুকু দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সভাপতিত্বের গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ যখন আমার নিকট পৌঁছিল, তখন শুনিলাম, এই ভার অস্বীকারেও আমার স্বাধীনতা নাই। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সদ্য যে আসন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই আসন গ্রহণে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মনে মনে একটু শ্লাঘা এবং আনন্দ পাই নাই, এই কথা বলিলে মিথ্যা উক্তি হইবে। হয় ত সেই শ্লাঘার বশীভূত হইয়াই এ বিষয় লইয়া আর গণ্ডগোল করি নাই; কিন্তু সম্প্রতি ঘটনাক্রমে আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র এরূপ আহত ও অবসন্ন হইয়াছে, যাহাতে এই গুরুভার গ্রহণে নিতান্ত অহম্মুখতার পরিচয় হইবে, ইহা বুঝিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম, এবং তৎসঙ্গে কোন যোগ্যতর পাত্রে এই ভার ন্যস্ত হয়, এইরূপ বিনীত নিবেদনও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার করুণ কাহিনী তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র করিল না। বিজ্ঞানসভার নেতৃত্বকার্য্যে যোগ্যতা বা ক্ষমতা কিছুরই

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতিরূপে পঠিত।

[এই সভা ১৩২০ সালে ২৭-২৯ চৈত্র কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। —সম্পাদক।]

প্রয়োজন নাই, সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ কিরূপে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমার নিকট উৎকট সমস্যা থাকিয়া গেল। কিন্তু বঙ্গদেশের এই কেন্দ্রস্থলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর পুরোভাগে আসীন হইয়া হংসমধ্যে বকের স্থায় কিরূপ শোভমান হইব, ইহা মনে করিয়া আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র কিরূপে কম্পিত হইতেছে, আমি স্বয়ংই তাহার ভুক্তভোগী। যাহা হউক, অধ্যক্ষগণ আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই মহতী সভার পুরোভাগে না দাঁড়াইলেও আমার চলিতে পারে। সে কালে নিয়ম ছিল, এবং এ কালেও হয় ত বহু স্থলে প্রথা আছে যে, রাজদরবারে বা গুণিগণের সভায় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে নকিব ফুক্‌রায়, অর্থাৎ একটা লোক, যাহার মূর্ত্তি এবং বেশভূষা সভাস্থ জনগণের হাস্য উৎপাদনে সমর্থ, সে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রায় অবোধ্য ভাষায় সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিয়া দেয়। বুঝিলাম, বর্ত্তমান সভায় সেই নকিবের কার্য্য করিলেই আমি অব্যাহতি পাইব এবং আমার বন্ধুগণ আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় নকিবের উচ্চকণ্ঠ আমার নাই, তবে বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য আপনাদের মত বিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর সম্মুখে কয়েক মিনিটের মত গলা জাহির করিয়া কার্য্যারম্ভের ঘোষণা করিয়া দিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া আপনাদের অন্তরে যদি হাস্যরসের সঞ্চার হয়, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইব না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবং তৎসম্পৃক্ত বিজ্ঞান-শাখা যদি দেশের স্থায়ী অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায় এবং এতদ্দ্বারা দেশের যদি কোন স্থায়ী হিত সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে কোন ভবিষ্যৎকালে এই অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের প্রয়োজন হইতে পারে। আজিকার বিজ্ঞান-সভায় আমি আর কোন কার্য্য করিতে না পারি, ভবিষ্যতের সেই ইতিহাসলেখকের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া যাইতে পারি। এ কাজটাও নকিবের কাজের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা গ্রহণের পর একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের

সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথা-সম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও পুরাতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষৎও সেই পথে চলিতে পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই আলোচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে ঐরূপ বিজ্ঞানসভা গঠিত হইবার এখনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের সকল বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ন্যায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণ শক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহু রাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষ ভাগে হঠাৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রায় একসঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহূত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায়

সম্মিলনচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর-বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিষ্ফল হয়। তার পর-বৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ কোন সুবিধাই ঘটে নাই। পর-বৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান—এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ আসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল। শশধর বাবু এককালে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিমজ্জা বৈজ্ঞানিকের ধাতুতে নির্ম্মিত। নানা মাসিকপত্রে মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে আনন্দজনক ও অন্য শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। Eugenics বা মানবজাতির উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেশমধ্যে লোকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের যে সব ছাপান তালিকা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার গৃহস্থগণও সম্ভবতঃ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহস্থের জীবনের খুঁটিনাটি তত্ত্ববার্ত্তা সম্বন্ধে Life Assurance Companyদের ছাপান তালিকা ইহার নিকট হারি মানে। রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে বার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর সূত্রচালনায় রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনঘটা হইয়াছিল। পর-বৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপর-বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ। পৃথিবীর যে-কোন

বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে উহা সাদরে গৃহীত হইতে পারিত। তদ্ব্যতীত এই উপলক্ষ্যে সান্ধ্য সম্মিলনে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্বসকল সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেন। পর-বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন তখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পর-বৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া যে কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। শশধর বাবু এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর-বৎসর চট্টগ্রামে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; কিন্তু যে কয়েক জন বিজ্ঞানসেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের এই বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস—এই চারি শাখায় সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভক্ত করিবার কল্পনা হইয়াছে, এবং আমার উপর বিজ্ঞান-সভার নকিবির ভার অর্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ শাখা-বিভাগ সর্ব্বত্র সাধ্য হইবে কি না, বলা দুষ্কর। কলিকাতার পক্ষে যাহা সাধ্য—স্থানাভাব, কালাভাব এবং লোকাভাবে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র নগরগুলির পক্ষে তাহা সাধ্য না হইতে পারে। অন্য শাখার কথা বলিতে পারি না, বিজ্ঞান-শাখা এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যে স্বাতন্ত্র্যটুকু অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে সহজে প্রস্তুত হইবেন কি না সন্দেহ।

এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাখার একটু বিশেষ আদরের কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোঝেন, জনসাধারণের তাহা বোধ্য নহে। তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের চিন্তার প্রণালী, তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী কতকটা অদ্ভুত গোছের। তাঁহারা যে পথে, যে প্রণালীতে, যে মন্ত্রের সাধনা করিতেছেন, তাহা অধিকারী ভিন্ন অন্যের পক্ষে সুগম নয়। তাঁহাদের সাধনাক্ষেত্রে দীক্ষিত ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। তাঁহারা পরস্পর কথা কহিবার সময় যে সকল সঙ্কেতের, যে সকল

ইঙ্গিতের প্রয়োগ করেন, সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি মাত্র। সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে যে না পারা যায়, এমন নয়; তবে তাঁহারা নিজের সাধনায় এত ব্যস্ত যে, সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া তাহার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিবার অবকাশ তাঁহাদের একেবারে নাই। সে প্রবৃত্তিও সকলের নাই। এ জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সাধনার পথ সর্ব্বত্রই দুর্গম এবং সাধকেরা সর্ব্বত্রই আত্মগোপনে অভ্যস্ত এবং দূরে থাকিতে উৎসুক।

বাঙ্গালা দেশে ইহার মধ্যে যে একটা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বা বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে হয় ত অত্যুক্তি হইবে। এ দেশে যাঁহারা স্বাধীনভাবে বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এখনও অঙ্গুলি সংখ্যায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এত কাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। দূরদেশে কে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব থাকিতাম; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম এবং শুনিতাম, তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহাই আমরা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি, এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, এশিয়াটিক সোসাইটির তাৎকালিক সভাপতি Sir Alexander Pedler কতকটা ক্ষোভের এবং কতকটা তিরস্কারের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটির কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ দেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে, কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির এখনকার সভাপতি বোধ হয়, সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কোচ

বোধ করিবেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্ত্য দেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্‌ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত নাই। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে এই সভা প্রদীপ্ত হইতেছে। সভাস্থলে আর যে সকল নমস্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে সমবেত দেখিতেছি, তাহাতে কেবল এই সাহিত্য-সম্মিলনী যে দীপ্তি লাভ করিয়াছে, এমন নয়, বঙ্গদেশের এই সাহিত্যকেন্দ্র হইতে যে আলোকের বিকিরণ আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া দেশ-বিদেশে প্রতিফলিত হইবে, তাহা মনে করিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের এই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকের উপরে মঙ্গল পুষ্পের ন্যায় বর্ষিত হউক। যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছি, তাহা আমার জীবনের এই অপরাহ্নকালে ভগ্নদেহে সামর্থ্য দান করিবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া, গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মান হইবেন, এই আশা অন্তিম দিনে আমার বলাধান করিবে।

বলা বাহুল্য, জগতের বিজ্ঞান-মন্দিরে আমরা এখনও শিক্ষার্থী এবং আরও বহুদিন ধরিয়া আমাদিগকে শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে। যে সকল বৈদেশিক আচার্য্যগণের পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা পার্থিব জীবনের ধূলি ঝাড়িয়া জীবনকে মধুময় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরদিন প্রণত থাকিব। জাগতিক বিধানে সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা অপিহিত ও আচ্ছাদিত রহিয়াছে, প্রতিভাবলে এবং সাধনাবলে যাঁহারা সেই জ্যোতির্ম্ময় আবরণ ভিন্ন করিয়া সত্যের কোন না কোন দেশ দেখিতে পান, যে দেশেই বা যে জাতিমধ্যেই তাঁহাদের জন্ম হউক, তাঁহারাই ঋষি। এ দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরাই বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আর্য্যে এবং ম্লেচ্ছে কোনরূপ লক্ষণ-ভেদ নাই। যেখানেই আমরা আলোক দেখিব, সেইখানেই আমাদিগকে পতঙ্গবৃত্তি হইয়া দৌড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতে পতঙ্গের মত জীবনের নাশ না হইয়া জীবনের বর্দ্ধন হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানমন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কামধর্ম্ম। কর্ম্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতই ঋষি, যাঁহাদের দিব্যচক্ষু সত্য-নিরীক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাণের তৃষ্ণায় বাহিরে আসিয়া আপামর সাধারণকে সেই সত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আমি জানি, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এমন অনেক মহাজন আছেন, যাঁহারা নির্জ্জন-সাধনা ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না। জ্ঞান অর্জ্জন তাঁহাদের কার্য্য; জ্ঞানের প্রচারও কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সর্ব্বত্রই যেরূপ, এখানেও সেইরূপ শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন। আহরণ ও বিতরণ, উভয় কর্ম্মই একজনে গ্রহণ করিলে কোনটাই হয় ত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। আহরণের শক্তি ও বিতরণের শক্তি ঠিক একজাতীয় নহে। যিনি অর্জ্জনে নিপুণ, বিতরণে তাঁহার নৈপুণ্য না থাকিতেও পারে। নিতান্ত অনধিকারীর নিকট বিতরণ করিতে গিয়া বিদ্যার মাহাত্ম্যকেও খর্ব্ব করিবার কতকটা আশঙ্কা থাকে। ভূমি যেখানে নিতান্ত অনুর্ব্বর, সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিলেও দেখিতে পাই, সত্যের অন্বেষণে যাঁহারা উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া পুরোগামী হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার আপনাদের মেরুদণ্ড ক্ষণেকের জন্য অবনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে নামিয়া আসিয়া, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারে

আনন্দ লাভ করিতেছেন। বিজ্ঞানবিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এরূপ চেষ্টায় কোন লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে scienceকে popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও Lord Kelvin, অথবা P. G. Tait, Hermann Helmholtz, William Kingdom Clifford প্রভৃতির মত ভাস্করদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞানতিমির অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি, আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।

বাঙ্গালা দেশে যে সকল মনস্বী পণ্ডিত এবং তাঁহাদের উৎসাহী ছাত্র বিবিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের আহরণে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারা একত্র উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণকেও একেবারে বিস্মৃত হইবেন না; এই প্রার্থনাও এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সাধারণের সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাদের নিজের ভাষা ছাড়িয়া, সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা সম্ভব, এ দেশে এখনও তাহা সম্ভব নহে। এখনও বহুদিন ধরিয়া আমাদের যত্নার্জ্জিত জ্ঞান বিদেশী ভাষার সাহায্যে বৈদেশিক বুধমণ্ডলীর নিকট স্থাপিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য যে নিকষ পাষাণের প্রয়োজন, এ দেশে তাহা বর্ত্তমান নাই। বিদেশের অগ্নিকুণ্ডে গলাইয়া ঢালাইয়া তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞানপ্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কালেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙ্গালার ব্যবহার বেয়াদপি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্ব্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না, জানি না। ক্লাশে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙ্গালার ব্যবহার বোধ হয়, এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞানবিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই জন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না। হয় ত ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির মূল কারণ। বাল্যকালে বেইন সাহেবের Higher English Grammar, মায় তাহার Companion যথাশক্তি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং মুখস্থ বিদ্যা উদ্‌গিরণ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাহবা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজিও কোথায় shall এবং কোথায় will বসাইব, এই দুশ্চিন্তা আসিয়া ইংরেজী লেখাই বন্ধ হয়, কলমটাও অচল হইয়া পড়ে। ইংরেজী ইডিয়ম ও বানান সম্বন্ধে আমার সহস্র অপরাধ দিন দিন চিত্রগুপ্তের ব্লাক-বহিতে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কারণ যাহাই হউক, আমি এই পাপের বোঝা চিরজীবন ধরিয়া মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জন্য অধ্যাপনাকার্য্যে কখনও যে ব্যাঘাত অনুভব করিয়াছি, তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পদার্থবিদ্যায় বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি। অধ্যাপনার সময়ে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজী রাখিয়াই এবং সাঙ্কেতিক

চিহ্নগুলি ইংরেজী রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না, এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এইরূপে যে খেচুরী ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা সাধু সাহিত্যকর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনাকার্য্যে ঐ ভাষা ব্যবহারে শিক্ষক বা ছাত্র কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। পদার্থবিদ্যার যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদিগের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদিগের বুদ্ধিগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Maxwell, Hertz, অথবা Thomsonএর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া Electro-magnetic Fieldএর,—অর্থাৎ যে দেশে তাড়িত এবং চুম্বক-শক্তি যুগপৎ কাজ করে, সেই দেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য black boardএর কালা পিঠে চাখড়ির ধলা আঁচড় কাটিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় যখন বড় বড় equationগুলা লেখা যায়, তখন সেই অঙ্কগুলার বিকট মূর্ত্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি, সহজ বাঙ্গালায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রগণের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়; এমন কি, তাহাদের মনের ভিতর একটা আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাজেই আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাহার উপর ভর করিয়া আমি বলিতে বাধ্য যে, বাঙ্গালা ভাষা জনসাধারণের সম্মুখে পদার্থবিজ্ঞানের প্রচারকার্য্যে একেবারে অসমর্থ নহে। রসায়নশাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক এবং যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাহাদের গঠনবিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজী রাখিব, কি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ সেই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না; কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজী ভাষায় যাহাদের দখল নাই, তাহারা রসায়নবিদ্যার রসাস্বাদনে যে একেবারে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা, বিবিধ উদ্ভিদ্ জাতির এবং প্রাণিজাতির নামকরণে লাটিন ভাষার আশ্রয় লন; সেই উৎকট নামগুলি কোন কালে বাঙ্গালা ভাষার ধাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু

যেমনেই হউক—লাটিন নামগুলি বজায় রাখিয়াই হউক, অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বকে এবং প্রাণিতত্ত্বকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীর কোমল বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণে ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। যাঁহারা করাত এবং হাতুড়ি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়ান, তাঁহাদের দেহ ও মন আগেটের ও কোরণ্ডমের কাঠিন্য পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের এই কোমলতা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইবে, এরূপ আশা করি না; কিন্তু ঐ নাম-গুলাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটুকু মোলায়েম করিয়া লইলেই যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণকে একটু করুণরসার্দ্র করিতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজ্ঞানবিভাগ যে নিতান্ত দরিদ্র, এই আক্ষেপোক্তি সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের সম্যক্ ব্যবস্থা হয় নাই। শুনিতে পাই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এ বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে উপেক্ষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের ধারাবাহিক আলোচনার জন্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ পরিষদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহারা উভয়েই সাহিত্য-পরিষদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু; কিন্তু তাঁহাদের নিকটেও পরিষৎ যেটুকু পাইয়াছেন, তাহা তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে প্রচুর নহে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পুষ্ট করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি আমি পরিষদের সেবাকার্য্যে অশক্ত, তথাপি পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এ বিষয়ে সাহায্য ভিক্ষায় অধিকারী। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার এই জাগরণের দিনে সাহিত্য-পরিষদের এই

প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ইহাই আমার আশা। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগের দারিদ্র্যমোচন আপনারাই করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দরূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে একটা সূক্ত রহিয়াছে, অন্তঃশরীরের গুহামধ্যে, চিত্তের নিভৃত প্রদেশে যে অশরীরী ভাবরাশি প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্ত আছে, তাহা অকস্মাৎ শরীর গ্রহণ করিয়া শব্দরূপে এবং নামরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ঋষি বৃহস্পতি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইতেছেন। বাস্তবিকই যখনই আপনারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া আপনাদের ভাবরাশিকে প্রকাশ দিতে চাহিবেন, ভাবরাশি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তখনই শব্দরূপে প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা। পরিভাষা সঙ্কলনের অপেক্ষায় কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে নাই। বিজ্ঞানও যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের পরিভাষাও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভাব যেখানে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহা শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া ঊর্দ্ধমুখে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করুন। ইহা আপনাদিগের কর্ম্ম; ইহা আপনাদিগের ধর্ম্ম। সাধ্য সত্ত্বে এ বিষয়ে কুণ্ঠিত হইলে আপনাদিগের প্রত্যবায় হইবে।

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের যে উদ্যম ছিল, সম্প্রতি তাহা যেন দেখিতে পাই না। পশ্চিম দেশ হইতে নবাগত জ্ঞানালোকের ছটায় যাঁহাদের চক্ষু তখন ঝলসিয়াছিল, তাঁহারা সেই আলোক দেশমধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেশের আঁধার নিবাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া দেখিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রেণীর যতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমান কালে সেই শ্রেণীর তত গ্রন্থ যেন প্রকাশিত হয় না। তখনকার তুলনায় এখন

লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, দেশে জ্ঞানলাভের স্পৃহা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞানবিতরণে সমর্থ, শিক্ষাদানে সমর্থ পণ্ডিতের সংখ্যা প্রচুরতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় কমিয়াছে, গ্রন্থপ্রচারের সুযোগ বাড়িয়াছে, অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন এই অবনতি, তাহা আপনাদের চিন্তার বিষয়। সে কালে যাঁহারা বঙ্গের সুধীসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই জনসাধারণমধ্যে এই জ্ঞান-প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করিতে পারি। ইঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত, যেরূপ অনুরাগের সহিত, যেরূপ যত্নের সহিত বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানালোক বিতরণ করিতে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তিগণকে সেরূপ করিতে দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? সে কালের রহস্যসন্দর্ভ, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিকে যে জ্ঞানপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, এ কালের কোন বাঙ্গালা পত্রিকার সেরূপ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না কেন? হইতে পারে, উল্লিখিত মনীষিগণ এবং উল্লিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেন, তাহার অধিকাংশ এখন বালকোচিত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্য হইলেও এ কালের উপযোগী বয়স্কোচিত কর্ম্মে কয় জন লোক এবং কয়খানি পত্রিকা নিযুক্ত আছে? আমার বাল্যকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রণীত প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত খগোলবিবরণ প্রভৃতি কয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। হয় ত এগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু এ কালেও যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ঐ কয়খানির তুলনায় নিম্ন পদই পাইবে। স্কুলপাঠ্য নহে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত, এরূপ গ্রন্থেরই বা এ কালে প্রাচুর্য্য কোথায়? বাঙ্গালা সাহিত্যের চারি দিকে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ বিজ্ঞানাঙ্গের এরূপ অধোগতির কারণ কি? আমি যে কারণ অনুমান করি, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে এই সভায় উপস্থিত বিদ্বজ্জনের বিশেষ শ্লাঘার হেতু হইবে না। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বকালের তুলনায় আজিকার দিনে আমাদের দেশে

মনীষী পণ্ডিতের অভাব নাই, অভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই, রচনাপটু দক্ষ লেখকের অভাব নাই, তবে কিসের অভাব? আমি অনুমান করি, ইহার মুখ্য কারণ—শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা পাঁচ জনের সঙ্গে বাঁটিয়া লইব, আমি যাহা অর্জ্জন করিতেছি, দেশবাসীকে তাহা বিতরণ করিব, আমি যে রসের অধিকারী হইয়াছি, দীনদরিদ্রনির্ব্বিশেষে আমার ভাই ভগিনীকে সেই অমৃতরসের আস্বাদনের ভাগ না দিলে, দুই হাতে তাহা বিলাইতে না পাইলে, আমার প্রাণের পিয়াস মিটিবে না। যে প্রেম হইতে এই মহাভাবের উৎপত্তি হয়, সেই মহাভাবের অসদ্ভাবই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া আমি অনুমান করি। কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল। ভূদেব ও অক্ষয়কুমার। তোমরা প্রীতির ধারা বিলাইয়া তোমাদের পার্থিব জীবনের লীলাভূমিকে উর্ব্বর করিয়া গিয়াছিলে; তোমাদের পরবর্ত্তী আমরা সেই ভূমির সম্পদ অধিকার করিতেছি, কিন্তু তোমাদের তর্পণকর্ম্মে আমাদের অধিকার নাই।

অদ্যকার সভায় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এই লজ্জাবিমোচনের জন্য আমার বিনীত অনুরোধ জানাইয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী, আপনারা যশস্বী, আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নবজাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্ত্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের করুণাপ্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী; আপনাদের সম্মুখে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এক্ষণে আপনারা অবতরণ করুন।

জ্ঞান বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশবিশেষের বা জাতি-বিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিদ্যা বা জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা, জীবনবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কোন বিদ্যাতেই ভারতবর্ষের, কিংবা বঙ্গদেশের কোন বিশিষ্ট স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে না। যাঁহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাঁহাদের সকলেরই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালা

দেশের সহিত কোন কোন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আমাদের এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্গীয় সুধীগণ কর্ত্তৃক সেই সকল বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার জলবায়ুতে, বাঙ্গালার আবহাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশিষ্ট আলোচনায় বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা দেশের বাতাবর্ত্ত বা cyclone অন্তরীক্ষ বিদ্যায় বা materiologyতে একটা নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে আরও কি কোন নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা হইবে না? বঙ্গের সমতলভূমিতে একখানা কঠিন পাষাণ পাওয়া যায় না। যে অতি পুরাতন মালভূমির ক্ষুদ্র অংশ আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলসীমার ঊর্দ্ধে থাকিয়া ভারতোপদ্বীপের দাক্ষিণাত্য অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহ যাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় প্রবহমান, সেই মালভূমিতে না কি একখানা পুরাতন জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে এদেশের সমতলভূমি এ পর্য্যন্ত ভূবিদ্যাবিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গাপ্রবাহ নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশি কতকালে কিরূপে আমাদের বঙ্গভূমিকে নির্ম্মিত করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন বা কাব্য লেখেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, এই নিম্নবঙ্গ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে মগ্ন ছিল; কিন্তু এই কলিকাতা সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাহা তখন সাগরবক্ষের বহু নিম্নে অবস্থিত ছিল, এই তথ্যটা তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক নহে কি? ভাগীরথীর পশ্চিমে বীরভূমে যে অনুর্ব্বর রাঙ্গামাটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহের জঙ্গলে যে রাঙ্গামাটি পুনরায় মাথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটির সহিত তদুপরি নিক্ষিপ্ত গঙ্গা-মৃত্তিকা নির্ম্মিত নিম্নবঙ্গের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? যাঁহারা ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট এই সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্ত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা করে। বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে, যে সকল পশুপাখী সাপব্যাঙ মশামাছি পোকা আহার বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহার বিহারের প্রথা জানিবার জন্য,

আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই থাকিব? Asiatic Societyর পত্রিকার এবং Indian Museumএর প্রকাশিত monographগুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ভিন্ন আমাদের মত অনভিজ্ঞের পক্ষে স্বদেশের তত্ত্ব জানিবার কোন গত্যন্তর থাকিবে না? বাঙ্গালা দেশের জীবজন্তু আপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিরূপে পরস্পরকে জীবন-দ্বন্দ্বে হঠাইতে চাহে, কিরূপে বেড়ায় এবং কি খায়, কিরূপে আততায়ীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে, কিরূপে আকারে এবং আচারে অন্য জীবের, এমন কি আততায়ীর, অনুকরণ করিয়া নানা ছদ্মবেশের আবিষ্কার করিয়া, আততায়ীকে ঠকাইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, কিরূপে তাহারা সহস্র শত্রুর সন্নিধানে আপন বংশধারা রক্ষা করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে, এই সকল তথ্য জানিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবে না? বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার বায়ুমধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতলে, খাদ্যের ভিতর, দেহের ভিতর, যে সকল জীবাণু অলক্ষিতে বাস করিয়া রক্তবীজের মত বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কখনও বা আমাদের দেহরক্ষায় সৈনিকের কার্য্য করিতেছে, কখনও বা মহামারী উৎপাদন করিয়া লোকক্ষয় করিতেছে, তাহাদের আবিষ্কারের জন্য, তাহাদের বিবরণের জন্য, কি আমরা চিরকালই হকারাদিনামা এবং রকারাদিনামা বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিব? আশা করি, আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা বর্ষে বর্ষে সম্মিলিত হইয়া এই সকল তত্ত্বের পরস্পর মধ্যে আলোচনা করিবেন এবং আপনাদের আলোচনার ফল, অনুসন্ধানের ফল, গবেষণার ফল আমাদের মত অজ্ঞজনকে উপদেশ দিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকা আপনাদের অনুসন্ধান-ফল প্রচারের সুযোগ পাইলে গৌরবান্বিত হইবে। আর আমার বক্তব্য নাই। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বুধমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য উপদেশের ধৃষ্টতা আমার নাই। সে জন্য আমি আপনাদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা জানাইতে, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমার শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য

আপনাদের দর্শনলাভে, আপনাদের সহযোগিতা লাভে, আপনাদের উপদেশ লাভে আমাকে সমর্থ করিবে কি না, এখনও আমি তাহা জানি না। নিতান্তই বন্ধুজনের আগ্রহাতিশয়ে আমি আপনাদের সময়ের অপব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা যদি আপনাদের উন্নত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতসাধনে অবনত করে, তাহা হইলেই আমার এই চপলতা সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্ত-লেখক কর্ত্তৃক মার্জ্জিত হইবে।
('মানসী,' বৈশাখ ১৩২১)

বাঙ্গালায় কর্ত্তৃক*

বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকের ব্যবহার কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহা আমি বলিতে পারিব না। সম্ভবতঃ উহা ইংরেজী তর্জমার খাতিরে হালের আমদানী। ইংরেজী edited by, printed by প্রভৃতি তর্জমা করিবার জন্য ইহার ব্যবহার আসিয়া থাকিতে পারে। সংস্কৃতে যতগুলি বিভক্তি আছে, ইংরেজী বা বাঙ্গালার মত চলিত ভাষায় ততগুলি বিভক্তি নাই। বিভক্তির কাজ পৃথক্ শব্দ দ্বারা চালাইতে হয়। ইংরেজীতে এজন্য preposition এবং বাঙ্গালাতে post-position ব্যবহার হয়। বাঙ্গালা post-position কথাগুলির ইতিহাস হয় ত আবিষ্কার করা যাইতে পারে। হইতে, চাইতে, দিয়ে প্রভৃতি এখন post-positionরূপে ব্যবহৃত হয়। গোড়ায় হয় ত ইহারা অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল। বহুকাল হইতে উহারা ভাষার সহিত মিশ খাইয়া গিয়াছে। আধুনিক কালের সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা গড়িতে গিয়া হেতু, জন্য, নিমিত্ত প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সাধুভাষায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছে। এই শব্দগুলিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে post-position-এর কাজ করে। দ্বারা এবং

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক মহাশয় আমাদিগকে বাঙ্গালার "কর্ত্তৃক" শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে গুটিকত প্রশ্ন করেন। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার প্রশ্নের একাংশের উত্তর-স্বরূপ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত প্রকাশ করিলাম।—'মর্ম্মবাণী'-সম্পাদক।

কর্ত্তৃক শব্দ ঐরূপে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালা সাধুভাষা-গঠন-কার্য্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে পড়ায় এইরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে। "Written by Jogendra" ইহার বাঙ্গালা তর্জ্জমা দরকার হইলে "যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত" এইরূপ বাক্যবিন্যাসই চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত গোড়ায় মিল রাখিবার চেষ্টা ছিল। লেখন—এই ক্রিয়ার কর্ত্তা যোগেন্দ্র ; অতএব যোগেন্দ্র কর্ত্তা যে ক্রিয়ার, সেই ক্রিয়া, যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক ক্রিয়ার। এইরূপে যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া দাঁড়ায়।

উক্ত দৃষ্টান্তে লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণ যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক। সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উহাকে ক্রিয়ার বিশেষণই বলিতে হয়। আজকাল অবশ্য "কর্ত্তৃক" একটা স্বতন্ত্র শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা, হইতে, চেয়ে প্রভৃতির মতন post-positionএর কাজ চালাইতেছে। ইংরেজী Grammarএর হিসাবে parse করিতে হইলে বোধ হয় বলিতে হইবে, যোগেন্দ্র is an objective case governed by the post-position কর্ত্তৃক। ইংরেজীতে এইরূপ শব্দগুলি আগে বসে বলিয়াই উহাদের নাম preposition, বাঙ্গালায় আগে না বসিয়া পরে বসাই রীতি। সেই জন্য post-position বলাই উচিত। যে সকল পণ্ডিতেরা প্রথমে এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক'কে একটা সমস্ত বা সমাসবদ্ধ পদ বিবেচনা করিতেন এবং তদনুসারে উহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ধাতু সমাসবদ্ধ পদের বড় একটা প্রশ্রয় দেয় না। এখানে বরং বাঙ্গালার সহিত ইংরেজীর মিল অধিক আছে। এখন 'কর্ত্তৃক'কে একটা স্বতন্ত্র অব্যয়রূপে গণ্য করিলে বোধ হয় বিশেষ হানি হইবে না। দ্বারা শব্দটিও সংস্কৃত হইতে আসিয়া উহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত সমাসবদ্ধ হইত। আজকাল উহা instrumental case বা করণকারকসূচক post-positionএর কার্য্য করিতেছে। এ কালের লেখকেরা কর্ত্তৃক এবং দ্বারা, এই দুই পদের ব্যবহারে বড় একটা ভেদ রাখেন না ; এটা আমার অনুচিত বোধ হয়। আমার বিবেচনায়, ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব বুঝাইবার জন্য কর্ত্তৃক এবং করণত্ব বুঝাইবার জন্য দ্বারা ব্যবহার করা উচিত। "যোগেন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত" না লিখিয়া "যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত" লিখিলেই ভাল হয়। যোগেন্দ্রের মতন জীয়ন্ত মানুষটা করণকারকে পরিণত না হইয়া উহার কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহাতেই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। ('মর্ম্মবাণী,' ১৩ শ্রাবণ ১৩২২)

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান; বেশ কথা। আমরা কেহই একদিন থাকিব না, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান থাকিবে; ইহা আমি প্রার্থনা করি; আপনারাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্যোমকেশহীন সাহিত্য-পরিষৎকে আমি দাঁড়াইয়া দেখিব, পরিষৎ-মন্দিরে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের মরণসংবাদ আমাকে ঘোষণা করিতে হইবে, ইহা আমি মনে করি নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি পীড়িত হইয়া পরিষদের কর্ম্মভার ত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন বরং ইহার বিপরীতই আমার মনে ছিল। যাহা মনে করি নাই, তাহা কাজে করিতে হইল, ইহা নিয়তি। নিয়তির জয় হউক।

সাহিত্য-পরিষৎ আর ব্যোমকেশ যে অভিন্ন ছিল, তাহা আপনাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে না। যাহা অভিন্ন থাকে, তাহাও ভিন্ন হয়। সর্ব্বশক্তিমানের ইহা খেলা, ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না।

সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল,—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা-মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। আমিও দেখিয়াছি, আপনারাও দেখিয়াছেন—ইহার প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

সূতিকাগৃহে যাঁহারা পরিষদের ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আজ উপস্থিত আছেন। ব্যোমকেশ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। প্রথম দুই বৎসর ব্যোমকেশকে পরিষদে দেখিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে নাই। পরিষৎ সেই শৈশব কালে হামাগুড়ি দিতেছিলেন, তখনও পরিষদের মুখ ফোটে নাই, পরিষৎ তখন আধ আধ ভাষায় কথা কহিতেছিলেন মাত্র। কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহাও স্থির ছিল না। ব্যোমকেশ তখন পরিষদে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না।

পরিষদের তৃতীয় বর্ষে এক দিন 'কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল' নামে একটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। প্রবন্ধপাঠক ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। প্রবন্ধটি

আমি অবহিত হইয়া শুনিয়াছিলাম। প্রবন্ধ শুনিয়াই আমার বোধ হইল, পরিষদের এইবার কথা ফুটিয়াছে; পরিষদের এইবার কাজ জুটিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার করিতে হইবে,—ইহা পরিষদের একটা প্রধান কাজ। কাহারও কাহারও মনে এই কথাটা অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল; ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ তাহা স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিল। আমি বুঝিলাম, পরিষদের কাজ জুটিয়াছে, একজন কর্ম্মীও জুটিয়াছে।

পরিষদের ষষ্ঠ বৎসরে ব্যোমকেশ সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন; সেই বৎসরই 'পরিষৎ-পত্রিকা' সম্পাদনের ভার আমার উপর পড়ে। সেই অবধি তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়। পাঁচ বৎসর কাল পত্রিকা সম্পাদনের পর আমি পরিষদের সম্পাদকের কর্ম্মভার পাইয়াছিলাম; সেই সূত্রে ব্যোমকেশের চরিত্রের অন্তস্তলটা পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার যতটা সুযোগ ঘটিয়াছিল, এতটা বোধ করি, আর কাহারও ঘটে নাই। ব্যোমকেশের সমস্ত ভিতরটা আমি দেখিয়াছিলাম; দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্তব্ধ হইয়াছিলাম।

একটি লোকের আমি সন্ধান পাইলাম, যে সাহিত্য-পরিষৎকে ইষ্টদেবতাস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি, দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—শয়নে স্বপনে জাগরণে, অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা, সাহিত্য-পরিষদের ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে। বাস্তবিকই এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে—সর্ব্বতোভাবে—ইষ্টদেবতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—ইহার তুলনা নাই।

আত্মসমর্পণের বড় বড় দৃষ্টান্ত পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম, ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম—জীবনে অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ মুস্তফী সামান্য ব্যক্তি, নগণ্য ব্যক্তি, অতি দরিদ্র গৃহস্থ; ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।

পরিষৎকে আপনারা ভালবাসেন, আমিও ভালবাসি। আমরা অধিকাংশই 'অবসরমত' ভালবাসি। জীবনে অন্যান্য কাজ সমাপন করিয়া অবসরমত ভালবাসি। তাহাতে আমাদের দোষ নাই। আমাদের অনেককেই সংসারচিন্তা করিতে হয়, অন্নচিন্তা করিতে হয়, সংসারের সহিত লড়াই করিতে হয়। সেগুলাও আমাদের কর্ত্তব্যমধ্যে। সেই

কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যখন অবসর পাই, তখন পরিষৎকে আমরা ভালবাসি। ব্যোমকেশের ভালবাসার বিশিষ্টতা এই যে, ব্যোমকেশ পরিষৎকে অবসরমত ভালবাসিত না। ব্যোমকেশকেও সংসারের সহিত লড়াই করিতে হইত; সে বড় নিদারুণ লড়াই—একতরফা লড়াই। সংসার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, কিন্তু সে আত্মরক্ষায় অবসর পায় নাই। তাহার সমস্ত জীবনটা পরিষদের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; পরিষদের কাজ করিতেই,—পরিষৎকে ভালবাসিতেই তাহার সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গেল; অন্য চিন্তার সে অবসর পাইল না—জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার তাহার অবসর ঘটিল না।

কত বার তাহাকে বলিয়াছি,—নিজের জন্য একটু চিন্তা কর, আপনার পোষ্যবর্গের জন্য একটু চিন্তা কর; বলিয়াছি—এমন কি, সাধ্যসাধনা করিয়াছি। জোর করিয়া প্রতিশ্রুতি লইয়াছি—এইবার নিজের জন্য কিছু করিব—অবসর পাইলেই করিব। কিন্তু সেই অবসর ঘটিল না। আমার অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার সীমানামধ্যে এমন আর আমি দেখি নাই। অথচ জীবনযুদ্ধে ব্যোমকেশের ক্ষমতার অভাব ছিল না। দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু অন্য দিকে বিশেষ অভাব ছিল না; সামাজিক প্রতিপত্তির অভাব ছিল না—আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। সে বিষয়ে অভাব হইবার উপায়ই ছিল না;—সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ, সেই অকপট হৃদয় লইয়া ব্যোমকেশ একবার যাঁহার নিকট গিয়াছে, তিনিই তাহার প্রীতির বন্ধনে পড়িয়াছেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী,—কলিকাতার শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে সর্ব্বত্রচারী, সর্ব্বত্রবিহারী, সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার,—ব্যোমকেশ মুস্তফীকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্মান না করিলে কাহারও উপায় ছিল না। তাহার উপরে ব্যোমকেশের সাহিত্যসাধনা ছিল; ব্যোমকেশ সাহিত্যরসে রসজ্ঞ ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতেন—সরস রচনাদ্বারা অন্যকে সে রসের আস্বাদন দিতে পারিতেন। এমন কি, "রোগাতুর শর্ম্মা"র প্রলাপবাক্যেও সেই রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরিচয় কেবল রসজ্ঞতায় কেন, ব্যোমকেশের চিন্তাশীলতা ছিল, গভীরতা ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সকলের উপরে বৈজ্ঞানিকতা ছিল—পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালা ব্যাকরণের আলোচনায় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফলে, সাহিত্যব্যবসায়ীরূপে সাহিত্য-

চর্চ্চা করিলে, জীবনযুদ্ধে তাহার সফলতা হইতে পারিত; সাহিত্য-সেবিরূপে সাহিত্যচর্চ্চা করিলে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর যশ থাকিতে পারিত; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। কোন কাজেই ব্যোমকেশের অবসর ঘটিল না। কেন না, ব্যোমকেশ অন্য দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এই আত্মসমর্পণই যজ্ঞ। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ব্যোমকেশ সেই যজ্ঞে যজমান হইতে পারে নাই; যজ্ঞীয় পশুর মত আত্মদান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যজ্ঞার্থ সে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; যজ্ঞেই সে নিহত হইল। আপনারা প্রার্থনা করুন, সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ—আপনারা প্রার্থনা করুন, তাহার রক্তপাতে সাহিত্য-পরিষদের বৃদ্ধি হইবে, তাহার আলম্ভনে সাহিত্য-পরিষদের নবজীবন লাভ হইবে। মনুষ্য থাকে না; তাহার কর্ম্ম থাকিয়া যায়। ব্যোমকেশের কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া সাহিত্য-পরিষদে বর্ত্তমান থাকিবে।

সাহিত্য-পরিষৎ খাঁটি স্বদেশী জিনিস নয়—ইহা বিলাতী জিনিসের অনুকরণে গঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ একটা যন্ত্র; সর্ব্ববিধ সাহিত্যের উপকরণ ঘানিতে পীড়িয়া রস নিষ্কাশনের জন্য ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সমুদয় ধুরন্ধরদিগকে ইহার যুগবহনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক যন্ত্র চালাইতে অনভ্যস্ত; যন্ত্রচালনা আমাদের ধাতুর সহিত মেলে না। ভারতবর্ষের লোক স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্নে পরিতৃপ্ত হইতে চায়;—বসুন্ধরা আপনা হইতে যাহা দেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে চায়। ভারতবর্ষে আপনা হইতে যাহা জন্মে, তাহাই থাকিয়া যায়, টিকিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমাজে আপনা হইতে যাহার উৎপত্তি হয় ও বৃদ্ধি হয়, সামাজিকেরা তাহাই গ্রহণ করে; তাহাই তাহাদের রক্তমাংসমজ্জার সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। অন্য দেশে বসুন্ধরা এমন উর্ব্বরা নহেন; মানুষ সেখানে যন্ত্রপ্রয়োগে বসুন্ধরার নিকট আদায় করিতে বাধ্য হয়। অন্য দেশের অনুকরণে আমরা সাহিত্য-পরিষদের যন্ত্র গড়িয়াছি—যন্ত্র দ্বারা কাজও পাইতেছি; কিন্তু যন্ত্রপ্রয়োগে অভ্যাস না থাকায় চাকায় মরিচা ধরিতেছে, সময়মত আমরা তেল যোগাইতে পারিতেছি না; চাকার ঘরঘরানিতে কাজের

অপেক্ষা কর্ণপীড়া অধিক হইতেছে। যন্ত্রের কাজ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী; পঞ্চাশটা ঘোড়ায় যে কাজ করে, একটা ছোট যন্ত্রে তাহার চেয়ে অধিক কাজ করিতে পারে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যানবাহী ঘোড়ার ভিতরে এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা কোন যন্ত্রের ভিতরে নাই, সেই পদার্থটার নাম প্রাণ। যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে আমাদের বশে চলে; চালক যখন যে দিকে চালাইতে ইচ্ছা করেন, যন্ত্র তখনই সেই দিকে চলে। কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ টাট্টু ঘোড়াকেও সর্ব্বদা ইচ্ছামত চালাইতে পারা যায় না,—সে সর্ব্বদা বাগ মানে না—সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হয়। পরিষদ্-যন্ত্রের যানবাহী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ভিতর এইরূপ একটা প্রাণ ছিল। ব্যোমকেশের সহিত যাঁহারা একত্র কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানেন। ব্যোমকেশ সর্ব্বদা যন্ত্রমধ্যে ধরা দিতে চাহিত না। আপনারা হৃদয় নামে একটা অবয়বের কথা শুনিয়াছেন। অভিধানে এই শব্দটি না থাকিলে আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্য বোধ করি অচল হইত। ব্যোমকেশের ভিতরে এই হৃদয়টা অত্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। ব্যোমকেশের ক্ষয়রোগশীর্ণ বক্ষের ভিতরে একটা বৃহৎ হৃৎপিণ্ড ছিল—সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উষ্ণ রক্ত বিদ্যমান ছিল; মাঝে মাঝে তাহা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। বাহিরে তাহার কোন উপদ্রব, কোন উৎপাত দেখা যাইত না; কিন্তু যাঁহারা ব্যোমকেশের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই উষ্ণ রক্তধারা সময়ে সময়ে কিরূপ বেগে প্রবাহিত হইত। এই কারণে ব্যোমকেশকে যন্ত্রমধ্যে আটকাইতে পারা যাইত না। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সকলেই ইহার সাক্ষী। সাহিত্য-পরিষদের কমিটি, সব-কমিটি, আইনকানুন, নিয়মাবলী, বিধিনিষেধ, কিছুতেই ব্যোমকেশকে শাসনে আনিতে পারে নাই। ব্যোমকেশের একটা গোঁ ছিল,—পরিষদের হিতার্থ নিজে যাহা ভাল বুঝিবে, ব্যোমকেশ তাহা করিবেই—আইনকানুনে, বিধিনিষেধে ব্যোমকেশকে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যোমকেশের কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল—কিসে সাহিত্য-পরিষৎ বড় হইবে, কিসে ইহার কাজের প্রসার হইবে, কিসে ইহার প্রতিপত্তি বাড়িবে, ব্যোমকেশের মগজের মধ্যে দিবানিশি তদ্বিষয়ে কল্পনার খেলা চলিত। অধিকাংশ কল্পনাই খেলা মাত্র; সেই খেলা কাজে

পরিণত করিতে হইলে কত বিঘ্নবিপত্তি আছে, ব্যোমকেশ সে দিকে দৃষ্টিপাতই করিত না। কেজো লোকে সে বিষয়ে আপত্তি করিতে গেলে ব্যোমকেশকে আঘাত লাগিত,—ব্যোমকেশের হৃদয়ে বেদনা লাগিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কোন কাজে কেন যে অক্ষম হইবে, ব্যোমকেশ তাহা মনে করিতেই পারিত না। এই জন্য ব্যোমকেশের সহিত পরিষদের যন্ত্রচালক অন্যান্য সহকারীদের সর্ব্বদা ঠোকাঠুকি ঘটিত, বাদ-বিসংবাদের অভাব থাকিত না। তাঁহারা পরিষদের যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালাইতে চাহিতেন, ব্যোমকেশের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদা বনিত না—আমার সহিতও সর্ব্বদা বনিত না। আকাশবিহারী পাখীর মত ব্যোমকেশের কল্পনা সর্ব্বদাই উধাও হইয়া ঊর্দ্ধে উড়িতে চাহিত;—আমরা স্থলচর জীব, তাহাকে কখনও খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে পারি নাই। ব্যোমকেশকে খাঁচায় পুরিতে পারি নাই; কিন্তু বুঝিয়াছি যে, ব্যোমকেশের মত হৃদয়বান্ পুরুষকে যন্ত্রাঙ্গরূপে গণ্য করিলে চলিবে না। বুঝিয়াছি এবং তাহার মহাপ্রাণতার সম্মুখে প্রণত হইয়াছি।

ব্যোমকেশ যন্ত্রমধ্যে আপনাকে ধরা দেয় নাই বটে, কিন্তু যন্ত্রে যেখানে কুলায় না, যেখানে প্রাণের আবশ্যকতা, সেখানে ব্যোমকেশ নহিলে পরিষদের চলিত না। যেখানে রাত্রি জাগিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে ধনীর দরজায় দ্বারবানকে অতিক্রম করিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে আপিস কামাই করিয়া আপিসের অধ্যক্ষের বিরক্তিভাজন হইতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ। ব্যাধিক্লিষ্ট, অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ দেহ লইয়া, সদাপ্রফুল্ল, হাস্যপূর্ণ মুখ লইয়া, ব্যোমকেশ মুস্তফী সর্ব্বদা অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত—সর্ব্বদা অসাধ্য সাধনে সমর্থ। ইহা যন্ত্রে কুলায় না, ইহার জন্য প্রাণের টান চাই; ইহার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে হয়।

পরিষদের সেরেস্তায় দুইখানি খাতা ছিল। একখানি আমার, একখানি ব্যোমকেশের। এই খাতা দুইখানি আশ্রয় করিয়া ব্যোমকেশের সহিত আমার কথাবার্ত্তা, তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ চলিত। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভাষার ব্যবহার হইত, তাহা ছোট বড় কোন পার্লেমেণ্টে, এমন কি, কোন ভদ্রসমাজে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য নহে।

ব্যোমকেশের প্রতি আমি যেরূপ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতাম, তাহা অন্য কেহ হয় ত সহিত না—এক রামকমল ভিন্ন অন্য কেহ বোধ করি, এখনও সহিবে না। ব্যোমকেশ তাহা অবলীলাক্রমে সহিয়া যাইত; সে এত সহজে সহিয়া যাইত যে, আমার পক্ষে ঐ ভাষাপ্রয়োগ একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি ঐ ভাষাপ্রয়োগে কখনও সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হই নাই। ইহা বোধ হয়, আমার কাপুরুষতা—কিন্তু আমার এই কাপুরুষতার জন্য ব্যোমকেশ আমাকে কখনও দৈন্য অনুভব করিতে দেয় নাই বা লজ্জা অনুভব করিতে দেয় নাই। আমার তিরস্কারের উপহার ব্যোমকেশের নিকট জয়মাল্য হইত, ব্যোমকেশ তাহা সাদরে ধারণ করিত। খাতা দুইখানি এখনও বোধ করি, কার্য্যালয় খুঁজিলে মিলিতে পারে;—উহা রাখিয়া দাও বা পোড়াইয়া ফেল, এখন তাহাতে ক্ষতি নাই। আমাদের দত্ত তিরস্কারের জয়মাল্য সে সাদরে গ্রহণ করিত; সে আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছে, তাহা রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন।

"দিয়ে যায় যত যাহা, রাখ তাহা ফেল তাহা,
যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচা-কেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না,
জন্ম-উপহার।"

কেন আমার সঙ্কোচ বোধ হইত না? ব্যোমকেশের সহিত আমার সম্পর্ক আপিসের সম্পর্ক ছিল না—আপিসের সম্পর্কে ভদ্রলোকের মধ্যে ওরূপ ব্যবহার চলে না। ব্যোমকেশ আমাকে অগ্রজের মত দেখিতে শিখিয়াছিল,—আমার গুণে নয়, নিজের গুণে। ব্যোমকেশ আমাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। এটা ব্যোমকেশের বিশিষ্টতা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যোমকেশের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও জানেন, ব্যোমকেশের নিকট কিরূপ একটা পরশপাথর ছিল,—তাহার স্পর্শমাত্রে আপিসের সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্কে দাঁড়াইত।

আজি ব্যোমকেশ নাই, কিন্তু ব্যোমকেশের সাহিত্য-পরিষৎ আছে। ব্যোমকেশের সাহিত্য-পরিষৎ ব্যোমকেশের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন—হয় ত একখানা চিত্রপট বা আর কিছু স্থাপন করিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাহা করুন; আমি তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল নহি। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক নথিতে, প্রত্যেক লাল ফিতায় ব্যোমকেশের

স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ যে প্রাণের ধারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাই সঞ্জীবনী সুধারূপে সাহিত্য-পরিষৎকে সঞ্জীবিত রাখিবে ও সাহিত্য-পরিষৎকে জীবিত রাখিয়া ব্যোমকেশের স্মৃতি রক্ষা করিবে। আমি ব্যোমকেশকে পরিষদের সহকারী সম্পাদক-রূপে দেখিতে চাহি না। আমি তাহাকে আপনার স্বজনরূপে দেখিতে চাহি। আপনাদিগকেও ব্যোমকেশকে স্বজনরূপে দেখিবার জন্য আজ আমি অনুরোধ করিতেছি। আপনাদের স্বজনবিয়োগ হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে যে আপনার লোক মনে করিত, সেই প্রিয়বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।

"আর পরিচিত মুখে, তোমাদের দুখে সুখে,
আসিবে না ফিরে।
তবে তার কথা থাক্, যে গেছে সে চলে যাক্,
বিস্মৃতির তীরে॥"

ব্যোমকেশ গিয়াছে; কিন্তু তাহার বৃদ্ধা জননীকে, অনাথা পত্নীকে, নিঃসহায় পুত্রগণকে আপনাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ, স্বজনগণ, বন্ধুগণ! ব্যোমকেশ জীবিত থাকিতে তাহার সাংসারিক দুঃখের লাঘবার্থ আমরা কিছুই করি নাই;—আমরা কিছুই করি নাই। এখন আমাদের সময় উপস্থিত। সাহিত্য-পরিষৎ আজ তাহার দুঃস্থ পরিজনবর্গের জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া আপনাদের দ্বারস্থ। সেই ভিক্ষাপাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দিবার জন্য আপনাদিগকে আমি সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি; ইহাতে সঙ্কুচিত হইবেন না, তর্কবিতর্ক করিবেন না; সমস্ত সঙ্কীর্ণ বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই ভিক্ষাপাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দান করুন। পরকে ভালবাসিতে গিয়া ব্যোমকেশ আপনার পরিজনকে ভালবাসিবার অবসর পায় নাই। তাহার কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আমি চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রেত আত্মা লোকান্তরে শান্তি পাইতেছে না। আপনারা তাহার প্রেত আত্মার কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করুন।

"সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বল শান্তি, বল শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই॥"*

('মানসী ও মর্ম্মবাণী', বৈশাখ ১৩২৩)

অম্ল-মধুর

প্রবীণা 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে কিছু বলিবার জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক এই অক্ষম ভারতী-সেবককে আহ্বান করিয়াছেন। 'ভারতী' এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ঋণী আছি। বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় সেই ঋণ পরিশোধে আমার সামর্থ্য নাই। দুই চারিটা কথা বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করিব মাত্র।

শৈশবেই বাঙ্গালা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না। বিষবৃক্ষের অধ্যায়ের হেডিংগুলা,—নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন, পদ্মপলাশলোচনে, তুমি কে?—ইত্যাদি হেডিংগুলা কিরূপে মনের উপর একটা চমক দিত। তখন বিষবৃক্ষের রস আস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায় নাই—অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।

ক্রমে আর্য্যদর্শন বাহির হইল। তাহাতেই প্রথম জানিলাম যে, আমরা আর্য্যজাতি; জানিয়া একটা অহমিকা জন্মিয়াছিল, তাহা মনে আছে। পরে বান্ধব বাহির হইল। বয়স্কদের মুখে প্রভাত-চিন্তার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলার প্রশংসা শুনিতাম, কিন্তু পড়িয়া আয়ত্ত করিতে

* ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৯এ চৈত্র ১৩২২ শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় পরলোক গমন করেন। পরবর্ত্তী ২৬এ চৈত্র শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।—সম্পাদক।

পারিতাম না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, যখন এগার বৎসর বয়স, তখন আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা পড়িয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে চারি পয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানা 'পলাশীর যুদ্ধ' কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনাই।

আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাণ বান্ধবের পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ পড়িতাম; পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত। "ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান।"—"তোমার মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ, আমি মনুষ্যের নয়নবিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই।"—"অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্"—প্রভৃতি বাক্যাবলির ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের মোহ এখনও আমাকে অভিভূত করে।

বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হইল। অল্পজীবী মাসিক সাহিত্যের প্রতি রাগ হইতে লাগিল।

যখন কলিকাতায় আসিয়া কালেজে পড়িতেছি, তখন ঢাক বাজাইয়া 'নবজীবন' বাহির হইল। সংবাদপত্রে ঘোষণা বাহির হইবা মাত্র, দেহে নবজীবন সঞ্চারের স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম; ঘোষণা মাত্র ৫১নং মির্জা[মৃজা—সম্পাদক।]পুর ষ্ট্রীটে কার্য্যালয়ে গিয়া মূল্য দাখিল করিয়া গ্রাহক হইয়া আসিলাম। মাসের পয়লা তারিখে 'নবজীবনে'র প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিতাম; সূর্য্য অস্ত যাইত, রাত্রি নয়টা বাজিত, পত্রিকা না পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা কেবলই অসময়ে পত্রিকা বাহির করিবেন, ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইত, মনে মনে গালি পাড়িতাম; ঘরে বসিয়া আমার নিষ্ফল ক্রোধ তাঁহাদের গায়ে লাগিত না; তাঁহাদের সহিষ্ণুতা টলাইত না।

'নবজীবনে'র প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার

সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামীতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল।* সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

তার পর 'নবজীবনে' আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি,—কতক স্বনামী, কতক বেনামী। এইরূপে আমার সাহিত্য-সেবার সূত্রপাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসরের পর বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। 'নবজীবন'ও চারি বৎসরেই [পাঁচ বৎসর।—সম্পাদক।] অন্তর্দ্ধান করিল। সাময়িক পত্রিকার উপর আমারও রাগ বাড়িল। কয়েক বৎসর গোসা করিয়া বাঙ্গালা মাসিক পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন্ কাগজ পড়িব? বাঙ্গালা মাসিকের তুলনায় 'ভারতী' তখন বয়ঃস্থা হইয়া পড়িয়াছে; হয় ত উহা হঠাৎ ফাঁকি হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে না। অতএব 'ভারতী'র গ্রাহক হইলাম। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সম্পাদিকা। 'ভারতী'তে হেঁয়ালি-নাট্য তখনও বোধ করি বাহির হইতেছে। 'ভারতী'তেই আমি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রথম পরিচয় পাইলাম—ইহা একটা পরম লাভ মনে করিয়াছিলাম।

তখন কংগ্রেসের নূতন অভ্যুদয়—আমি তখন ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেসওয়ালা। কংগ্রেসের খবর পাইবার জন্য মন আন্‌চান্ করিত। 'ভারতী'তে কংগ্রেসের আলোচনা থাকিত;—ভারতীর প্রতি আকর্ষণের ইহাও একটা প্রধান কারণ।

নূতন বেশ-ভূষায় 'সাধনা' বাহির হইল। 'সাধনা'য় আমার নূতন করিয়া হাতে-খড়ি হইল। তখন আমি রিপণ কালেজে আসিয়াছি—

* এই উক্তি ভুল। ১ম বৎসর 'নবজীবনে' পৌষ, ১২৯১ রামেন্দ্রসুন্দরের "মহাশক্তি" বাহির হয়, কিন্তু লেখার সঙ্গে বা লেখক-তালিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের নাম ছিল না। —সম্পাদক।

সম্পাদকের দল আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক আমাকে একবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। 'ভারতী'-সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আশা করি, এত দিন পরে এ কথা শুনিয়া অন্যে রাগ করিবেন না।

তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'র সাধ্যমত সেবা করিয়াছি। যখন যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি, 'ভারতী'তে তাহা স্থান পাইয়াছে—লোকে পড়িয়াছে কি না, জানি না; পড়িবার যোগ্য হইয়াছে কি না, তাহাও জানি না। 'ভারতী' শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্থান দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি অদ্যাপি 'ভারতী'র নিকট ঋণী।

চারি বৎসর বয়সে 'সাধনা'ও লুপ্ত হইল—ইহাতেও নৈরাশ্য আসিয়াছিল। 'ভারতী' অনেক চারি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ;—এখন দশ চারি অতিক্রম করিতে চলিলেন, ইহাতে আমি সুখী। 'ভারতী' এখন প্রৌঢ়া—'ভারতী' আয়ুষ্মতী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন—ইহা প্রার্থনা করি। প্রৌঢ়া 'ভারতী'র প্রৌঢ়া সম্পাদিকা সম্প্রতি ভারতীর কর্ণধার-কর্ম্মে বিদায় লইয়াছেন—তিনিও আয়ুষ্মতী হইয়া অন্তরালে থাকিয়া 'ভারতী'র নূতন সম্পাদকের* কোমল কর্ণ ধরিয়া থাকুন, ইহা প্রার্থনা করি। নূতন সম্পাদক ভারতীর এই অতি পুরাতন ভৃত্যকে আজ স্মরণ করিয়াছেন, এ জন্য আমি আহ্লাদিত। নূতনের সহিত পুরাতনের এই "অম্লমধুর" সম্পর্কে নূতন 'ভারতী'-সম্পাদক সৌভাগ্যবান্, আমিও সেই সৌভাগ্য দর্শনে পুলক অনুভব করিতেছি। আশা করি, আমার ঝাঁঝাল জীবনের বাকি কয়টা দিন ভারতীর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সাহিত্যের "অম্ল-মধুর" রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারিব। ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৩)

* সম্পাদক-দ্বয়—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। —সম্পাদক।

বেদ-কথা

[স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ* প্রকাশ করেন, সেই সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞগুলির তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া মূল গ্রন্থকে স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। ভূমিকা লেখাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যত দূর লেখা হইয়াছিল, তাহাতে বেদ এবং তদন্তর্গত যাগযজ্ঞগুলির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ভূমিকার কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে পুনর্লিখিত হইয়া সেনেট হলে পঠিত হয় এবং আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর 'যজ্ঞকথা' নাম দিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকার অবশিষ্টাংশ এত দিন পাওয়া যায় নাই। অল্প দিন হইল, তাঁহার লাইব্রেরির অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি খাতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত কতকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ আছে। অনুমান হয়, ঐ প্রবন্ধগুলিই সেই ভূমিকার অবশিষ্টাংশ। এইরূপ মূল্যবান্ প্রবন্ধগুলি কালে কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় "বেদ-কথা" নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে সেগুলি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় তাহাদের স্থানে স্থানে সামান্য অসঙ্গতি ও পুনরুক্তি-দোষ লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য, সংশোধনেরও উপায় দেখি না। বিশেষজ্ঞ সুধীমণ্ডলীকে এ বিষয়ে মনোযোগী দেখিলে সুখী হইব। —শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।]

* রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড।—সম্পাদক।

বেদ-কথা

১। বেদের বিভাগ

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভেদে বেদবাক্য দ্বিবিধ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেওয়া কিছু কঠিন। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে, দেবতার স্তুতিকর বাক্যের নাম মন্ত্র; এবং যে বাক্যে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ, তাৎপর্য্য বা প্রশংসা বলা হয়, তাহাই ব্রাহ্মণ।

"ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু।
অথে মবস্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরং॥
—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১।২।৩।৩।

এই একটি মন্ত্র; সোমনামক দেবতা উহার উদ্দিষ্ট। ঐ মন্ত্রে সোমকে বলা হইতেছে, "অহে সোম, তুমি ভদ্র (অর্থাৎ মঙ্গলময়), এই স্থান হইতে শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) অবস্থানে প্রয়াণ কর, বৃহস্পতি তোমার পুরোগামী হউন, তখন পৃথিবীর মধ্যে বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) স্থানে তোমার অবস্থিতি ঘটিবে; তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বীর, তুমি (সেইখানে থাকিয়া) শত্রুগণকে দূরে অপসারিত কর।" এই মন্ত্রটি ঋক্‌মন্ত্র হইলেও ঋগ্‌বেদসংহিতায় যে শাকলশাখা এখন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইহার স্থান নাই। পরন্তু যজুর্ব্বেদসংহিতার তৈত্তিরীয় শাখামধ্যে এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সোমদেবতাকে স্তুতি করা হইতেছে ও তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

এখন দেখিতে হইবে, এই মন্ত্রটি কোন্ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে কিরূপে বিনিযুক্ত হয় এবং কেনই বা সেই অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হয়।

অগ্নিষ্টোম নামক সোমযজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোমরসের আহুতি দিতে হয়। তজ্জন্য সোমলতা ক্রয় করিয়া, শকটে চাপাইয়া, সমারোহের সহিত যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইতে হয়। সোমলতাকে শকটে চাপাইয়া লইয়া যাইবার সময় হোতা নামে ঋত্বিক্ কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করেন। "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি" ইত্যাদি মন্ত্রটি তন্মধ্যে প্রথম। এ বিষয়ে ঐতরেয় নামক ঋষি বলিতেছেন—

"সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্যমানায় অনুব্রূহি ইত্যাহ অধ্বর্য্যুঃ।"
—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড।

অর্থাৎ সোম ক্রয় করিয়া যখন শকটে বহন করা হয়, তখন সেই সোমের উদ্দেশে বহনক্রিয়ার অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিক্ হোতানামক ঋত্বিক্‌কে এই আদেশ দিবেন। তৎপরে ঐতরেয় বলিতেছেন—"ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি" "ইত্যন্বাহ" (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর আদেশ পাইয়া) হোতা "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি" ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। ঐ মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন—"অয়ং বাব লোকো ভদ্রস্তস্মাদসাবেব লোকঃ শ্রেয়ান্, স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি।"

ঐ মন্ত্রে যে 'ভদ্র' এই বিশেষণপদটি আছে, উহাতে এই লোককে অর্থাৎ এই ভূলোককেই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলময় বলা হইতেছে। আর ঐ যে 'শ্রেয়ঃ' পদ আছে—উহা স্বর্গলোকের বিশেষণ। স্বর্গলোককেই শ্রেয়ান্ বলা হইতেছে। অর্থাৎ ভূলোক ত ভদ্র বটে, স্বর্গলোক তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ—অহে সোম, তুমি এই ভূলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে চল। সোমলতা—সোমদেবতা যাহাতে বর্ত্তমান, সেই সোমলতা এতক্ষণ যজ্ঞভূমির বাহিরে ছিল, সেই স্থান ভূলোকের সদৃশ। এখন সোমকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, ঐ যজ্ঞভূমি স্বর্গের সদৃশ। সোমকে যেন প্রার্থনা করা হইতেছে, তুমি এতক্ষণ ভূলোকে ছিলে, এখন স্বর্গলোকে চল। এই মন্ত্রের এই অংশের ঐ তাৎপর্য্য। অতএব সোমকে শকটে চাপাইয়া যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইবার সময় ঐ মন্ত্রের সার্থকতা। বস্তুতই মন্ত্রটি এই অনুষ্ঠানে বিনিয়োগের উপযুক্ত। এই অনুষ্ঠানে ঐ মন্ত্রটি বিনিয়োগের ফল কি? "স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি"—ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন, সোমকে এই সময় ঐ মন্ত্রদ্বারা এইরূপে প্রার্থনা করিলে যজমানকেই স্বর্গলোকে লইয়া যাওয়া হয়। উহার ফল যজমানের স্বর্গলাভ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে আছে—"বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু"—বৃহস্পতি তোমার (অর্থাৎ সোমের) পুরোগামী হউন। এই মন্ত্রাংশ সম্বন্ধে ঐতরেয় বলিতেছেন যে, "ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মৈব আত্মা এতৎ পুরোগবমকঃ ন বৈ ব্রহ্মন্বৎ রিষ্যতি"—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি—

বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয়। বৃহস্পতি সোমের পুরোগামী হইলে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকেই শকটবাহিত সোমের পুরোগামী করা হয় এবং যে অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ সহায় থাকেন, সে অনুষ্ঠানে কোন রিষ্ট [অনিষ্ট] জন্মে না। কাজেই বৃহস্পতিকেই সোমের পুরোগামী হইতে প্রার্থনার সার্থকতা।

ঐ মন্ত্রের তৃতীয় চরণ সম্বন্ধে ঐতরেয় বলেন, "অথেমবস্ব বর আ পৃথিব্যা ইতি দেবযজনং বৈ বরং পৃথিব্যৈ দেবযজন এব এনং তদবসায়য়তি" অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবযজনই (যজ্ঞভূমিই) শ্রেষ্ঠ স্থান। মন্ত্রের এই অংশ পাঠে সোমকে দেবযজনেই স্থাপন করা হয়।

চতুর্থ চরণ সম্বন্ধে বলেন, "আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরং ইতি দ্বিষন্তমেব অস্মৈ তৎপাপন্নানং ভ্রাতৃব্যং অপবাধতে"—ঐ চরণ পাঠে যজমানের দ্বেষ্টা পাপকারী শত্রুকে পরাস্ত করা হয়।

উক্ত দৃষ্টান্ত হইতেই মন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক বুঝা যাইবে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদবাক্য। মন্ত্রদ্বারা দেবতার স্তুতি হয়, দেবতাকে প্রার্থনা জানান হয়। সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, কোন্ অনুষ্ঠানে উহা প্রযোজ্য, কেন উহা সেই অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য, উহার প্রয়োগের ফল কি, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বুঝাইয়া দেন।

ব্রাহ্মণের আবার দুই অংশ—বিধি এবং অর্থবাদ। "সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্যমানায় অনুব্রূহি ইত্যাহ অধ্বর্য্যুঃ।" সোম ক্রয়ের পর বহনকালে তদনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—এই মর্ম্মে অধ্বর্য্যু [হোতাকে] অনুজ্ঞা দিবেন। ইহা বিধি। আবার "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি ইত্যন্বাহ"—ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি ইত্যাদি মন্ত্র হোতা পাঠ করিবেন, ইহাও বিধি। ব্রাহ্মণের তৎপরবর্ত্তী অংশ—যাহাতে ঐ বিধির সার্থকতা ও উদ্দেশ্য বুঝান হইতেছে, "অয়ং বাব লোকো ভদ্রস্তস্মাদসাবেব লোকঃ শ্রেয়ান্ স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি" ইত্যাদি অংশ ঐ বিধি সম্পর্কে অর্থবাদ।

যদ্দারা মনন করা যায়—দেবতার উদ্দেশে মনন করা যায়—তাহাই মন্ত্র। কোন্ সময়ে কোন্ উপলক্ষ্যে সেই মন্ত্রটি বিনিয়োগ করিতে হইবে, তাহা না জানিলে কেবল মন্ত্রটি জানিয়া লাভ নাই। ব্রাহ্মণ সেই সময় ও সেই উপলক্ষ্য বিধিবাক্য দ্বারা বলিয়া দেন। কর্ম্মকাণ্ড মতে মন্ত্রের ইহা ভিন্ন অন্য প্রয়োজন নাই। সেই জন্য কল্পসূত্রকারেরা

বলিয়াছেন, মন্ত্র কর্ম্মকরণ মাত্র। যাহার সাহায্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই মন্ত্র।

বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্যের নাম ব্রাহ্মণ হইল কেন, স্থির উত্তর দেওয়া কঠিন। উত্তরকালে ব্রহ্ম শব্দে জগৎকারণ আত্মা বুঝাইত। বেদান্তমধ্যে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আত্মা—যাহা বৃহৎ, তাহা ব্রহ্ম। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা জ্ঞানকাণ্ডের কথা। কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্য মাত্র বুঝায়। বেদবাক্যই ব্রহ্ম। যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'ব্রহ্মবাদী' এই উপাধিটি নাই, কিন্তু তাঁহাদের মতামতের সমালোচনা বহু স্থানে আছে। যে সকল ঋত্বিক্ বা যাজক যজমানের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদসম্পৃক্ত অনুষ্ঠান করিতেন, অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদসম্পৃক্ত কর্ম্ম করিতেন, উদ্গাতা সামগান করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে ইঁহাদের সকলেরই উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইত। সকলকেই অনুজ্ঞা দিতেন, সকলেরই ভ্রম সংশোধন করিতেন। সকল বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকিত। ব্রহ্মবাক্যের যথাযথ তাৎপর্য্য তিনিই বুঝিতেন। এই জন্যই তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হইতে পারে, অতি প্রাচীন কালে চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রহ্মানামক ঋত্বিকেরা যে সকল বেদবাক্য কহিয়াছিলেন, তাহাই ব্রাহ্মণ।

অতি প্রাচীন কালেই বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই বর্ণত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল। উপরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে অর্থবাদবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে। তাহাতে আছে—"ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মৈব আত্মা এতৎ পুরোগবমকঃ"—ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এ স্থলে ব্রহ্ম শব্দে ব্রাহ্মণ বর্ণ বুঝিয়াছেন। বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ (বর্ণের দেবতা) ছিলেন, (তাঁহার নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি)। ঐ মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণকে [ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তিকে] সোমের পুরোগামী করা হয়। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়াই ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্রাহ্মণ নাম পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

কর্ম্মকাণ্ড মতে বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্র ছাড়িয়া অবশিষ্ট বেদবাক্য সমস্তই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ—বিধি ও অর্থবাদ। বিধি আবার

দ্বিবিধ। কোন বিধির উদ্দেশ্য—অপ্রকৃত প্রবর্ত্তন, কাহারও উদ্দেশ্য অজ্ঞাত জ্ঞাপন।

"অগ্ন্যা বৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপতি দীক্ষণীয়ায়াম্"—দীক্ষণীয়া ইষ্টিযাগে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ নির্বপণ করিবে ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডগত বিধিবাক্য অপ্রকৃতপ্রবর্ত্তক। "আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি জ্ঞানকাণ্ডগত বিধিবাক্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপক।

২। মন্ত্র

বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক্, যজুঃ ও সাম। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এই ত্রিবিধ মন্ত্রের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন:—যাহার অক্ষর, চরণ ও অবসান নিয়মবদ্ধ, তাহাই ঋক্। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্য, এ কালে যাহাকে পদ্য বলে, তাহাই ঋক্। যথা—

"আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো
ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাং।
সংক্রন্দহোঽনিমিষ একবীরঃ
শতং সেনা অজয়ৎ সাকামন্দ্রঃ॥ (১০।১০৩।১)

এই মন্ত্রটি ঋক্, ইহার ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্, উহার চারি চরণ, প্রত্যেক চরণে এগার অক্ষর।

যে মন্ত্রের অক্ষর, চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোনই নিয়ম নাই, তাহা যজুঃ। অর্থাৎ এ কালে যাহাকে গদ্য বলে, তাহাই যজুঃ। যথা—

"ব্রহ্ম সন্ধত্তং তন্মে জিন্বতং।"
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১ কাণ্ড, ১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক।

ইহার অক্ষর বা চরণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।

"দেবস্যাহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনা বাজজিতা বাজং জেষম্।"
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৩।৬।

এই আর একটি যজুর্মন্ত্র। ইহাও ঐরূপ গদ্য।

যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায়, তাহাই সাম। ঋক্‌মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলেই উহা সামে পরিণত হয়। যথা:—

"অভি ত্বা শূর নোনুমো঻দুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥"

ইহা একটি ঋক্, ইহার ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদসংহিতার ৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের মধ্যে ২২ সংখ্যক মন্ত্র এইটি। গান করিবার সময় ইহাতে মাঝে মাঝে অক্ষর বসাইতে হয়, অনেক অক্ষর বিকৃত হয়, তখন উহা সামমন্ত্রে পরিণত হয়। যথা, এই ঋক্‌টি রথন্তরনামক সামে গীত হইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রস্তাব। হুম্। অভি ত্বা শূর নোনুমো বা।

উদ্গীথ। ওমা দুগ্ধা ইব ধেনব ঈশানমস্য জগতঃ সুবা ঈশাং॥

প্রতীহার। আ ঈশান মা ইন্দ্রা।

উপদ্রব। সুস্থুষা ওবা হা হুবা।

নিধন। অস্।

গানটির পাঁচ অংশ—উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা নামক তিন জন ঋত্বিক্ ইহা গান করেন। প্রস্তোতার অংশ প্রস্তাব, উদ্গাতার অংশ উদ্গীথ, প্রতিহর্ত্তার অংশ প্রতীহার। উপদ্রব উদ্গাতার গেয়, আর নিধনাংশ তিন জনে মিলিয়া গান করেন।

এই সামটির নাম রথন্তর। এ কালে যাহাকে রাগ-রাগিণী বলে, সাম তাহারই তুল্য।

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন আর এক রকম মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম নিগদ মন্ত্র বা প্রৈষ মন্ত্র। ঋত্বিক্‌রা পরস্পর সম্বোধনকালে বা পরস্পর অনুজ্ঞা আদেশ দিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বেদের ব্রাহ্মণাংশে এইরূপ প্রৈষ মন্ত্র অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"অগ্নয়ে মথ্যমানায় অনুব্রূহি" ইত্যাহ অধ্বর্য্যুঃ। অগ্নিমন্থনের সময় অধ্বর্য্যু হোতাকে অনুজ্ঞা দিবেন—মথ্যমান অগ্নির অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—"অগ্নয়ে মথ্যমানায় অনুব্রূহি" এই অনুজ্ঞাটি একটি প্রৈষ মন্ত্র, অতএব ইহা যজুর্মন্ত্রেরই অন্তর্গত। সাধারণ যজুঃ হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগকালে উপাংশু (অনুচ্চে) উচ্চারণ করিতে হয়, আর প্রৈষ মন্ত্রের উদ্দেশ্যই যখন আদেশ দেওয়া, তখন প্রৈষ মন্ত্র উচ্চস্বরে বলিতে হয়। সাধারণ যজুর্মন্ত্রসকল সংহিতামধ্যে নিবদ্ধ আছে, প্রৈষ মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাওয়া যায়। ফলে ঋক্ যজুঃ সাম, পদ্য গদ্য ও গান। এই তিন প্রকারের ভিন্ন চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র হইতে পারে না।

এই ঋক্-যজু-সামময়ী বেদবিদ্যার নাম ত্রয়ী বিদ্যা। মন্ত্র ত্রিবিধ ভিন্ন চতুর্ব্বিধ হইতে পারে না, কাজেই ত্রয়ী নামের সার্থকতা।

বৈদিকসমাজে এই ত্রিবিধ মন্ত্র যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদী ঋত্বিকেরা ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে প্রশংসা করিতেন, দেবতাকে আবাহন করিতেন; যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্ যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশে হব্য দান করিতেন বা বিবিধ কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেন। সামগ ঋত্বিকেরা সামগান করিয়া দেবতার স্তুতি করিতেন।

এই সকল মন্ত্র ঋত্বিক্‌সমাজে মুখে মুখে প্রচারিত হইত। বেদশাস্ত্র লিখিত হইত না, সম্ভবতঃ লেখনপ্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদমন্ত্র মুখে মুখেই রক্ষিত হইত। কালক্রমে ঐ মন্ত্রসকলের একত্র সঙ্কলন আবশ্যক হইয়া উঠিল। একত্র সঙ্কলন না করিলে মন্ত্রগুলি লোপের আশঙ্কা ছিল। অনেক সময়ে অনেক বেদ লোপ পাইয়াছে, এইরূপ স্মৃতি আছে। প্রসিদ্ধি আছে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই মন্ত্রসকল সঙ্কলন ও বিভাগ করিয়া সংহিতাকারে নিবদ্ধ করেন। পৌরাণিক মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপনার চারি জন শিষ্যকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ বিভাগ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহারা আপনাদের শিষ্যগণকে ঐ আপন আপন বেদ শিক্ষা দেন। কালে কালে ঐ সকল বেদ শিষ্যপরম্পরাক্রমে বহু শাখায় ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

এই পুরাণ কথার মূলে যে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী আছে, তাহার কতটুকু প্রামাণিক, তাহা নিরূপণের কোন উপায় নাই। বেদের অধ্যাপকগণ বহু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেদ তাঁহারা মুখে মুখে রাখিতেন ও তাঁহাদের শিষ্যেরাও অধীত বেদ মুখে মুখেই প্রচারিত করিতেন। দেশভেদে ও কালভেদে এইরূপে বেদের নানা পাঠভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। এই পাঠভেদে বিবিধ শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

পুরাণে এইরূপ পাঠভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়মধ্যে প্রচারিত বিবিধ শাখার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণাদিতে কিরূপে বেদের শাখাভেদ উৎপন্ন হইল, তাহার সবিস্তর বিবরণ দেওয়া আছে। ঐ সকল ইতিহাস কত দূর প্রামাণিক, তাহা বিতর্কের বিষয়। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে, ঋগ্বেদের মোটের উপর ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০০ শাখা,

সামবেদের ১০০০ শাখা ও অথর্ব্ববেদের ৯ শাখা। বস্তুতঃ এতগুলি শাখা কোনও কালে ছিল কি না, এখন প্রতিপন্ন করা কঠিন।

চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের কেবল পাঁচটি শাখার নাম আছে—শাকল, বাষ্কল, অশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মাণ্ডুকায়ন। চরণব্যূহ (কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয়) যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, সামবেদের ১২ শাখার ও অথর্ব্ববেদের ৯ শাখার নাম দিয়াছেন। চরণব্যূহকারের সময়েই অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে এককালে ২১ শাখা বর্ত্তমান ছিল, তাহা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শাকল্য (শাকল মুনির শত শিষ্যের মধ্যে পাঁচ জন—শিশির, বাষ্কল, সাঙ্খ্য, বাৎস্য ও অশ্বলায়ন) ঋগ্বেদের শাখাভেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে শাকল-শিষ্যদিগের নাম মুদ্গল, গোখলু (গালব), বাৎস্য, শালীয়, শিশির। বায়ুপুরাণে নাম মুদ্‌গল, গেলক (গালক?), খালীয়, মাৎস্য, শৈশিরেয়। শাকলপ্রতিহার নামক টীকাগ্রন্থে নাম—মুদ্গল, গেকুন (গোখুন?), বাৎস্য, শৈশির, শিশির (শারীর?)। বলা বাহুল্য, লিপিকরপ্রমাদ বহু স্থানে নামপ্রভেদের কারণ।

৩। ঋগ্বেদসংহিতা

ঋক্‌মন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালে ঋক্‌সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল। সকল ঋক্ সকলের জানিবার সম্ভাবনা থাকিল না, অনেক ঋক্ লুপ্ত হইতে চলিল, এমন সময় তৎকালপ্রচলিত ঋক্‌গুলি সঙ্কলন করিয়া ও শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদসংহিতা।

গ্রন্থ বলিলে লিখিত গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল না, আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। সঙ্কলিত হইলে পর এই সংহিতাও অধ্যাপকেরা ও অধ্যয়নকর্ত্তারা মুখেই রাখিতেন। কালভেদে ও স্থানভেদে এই সংগ্রহের মধ্যে পাঠাদি ভেদ জন্মিয়া শাখাভেদ উৎপন্ন হয়। এক কালে

হয় ত এইরূপ একুশখানি শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শাখাসমূহের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? বাঙ্গালার রামায়ণের সহিত যেমন বোম্বাই-সংস্করণ রামায়ণের প্রভেদ, কতকটা সেইরূপ।

চরণব্যূহের সময় পাঁচখানি মাত্র শাখা অবশিষ্ট ছিল। এখন কেবল একখানি মাত্র আছে, তাহাই শাকলশাখা। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র সম্ভবতঃ উহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, সায়ণাচার্য্য উহারই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সায়নভাষ্যসমেত এই শাকল শাখা মুদ্রিত করিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলর যশস্বী হইয়াছেন। অন্যান্য শাখার নাম মাত্র বা স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সেই সকল শাখা যে বর্ত্তমান শাকল-শাখা হইতে অধিক ভিন্ন ছিল, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। হয় ত কতিপয় মন্ত্র অন্য শাখাতে ছিল, যাহা শাকলশাখায় নাই, অথবা তাহাতে ছিল না, শাকল শাখায় আছে। হয় ত অন্য শাখার মন্ত্রগুলি ও সূক্তগুলি যেরূপ পর পর সজ্জিত ছিল, শাকল শাখায় ঠিক সেরূপ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই কতিপয় মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, শাকল-শাখায় তাহা পাওয়া যায় না। বুঝিতে হইবে, সেই মন্ত্রগুলি অন্য কোন শাখায় বর্ত্তমান ছিল।

প্রচলিত ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রগুলি কিরূপে সাজান হইয়াছে? কতকগুলি মন্ত্র একত্র করিয়া একটি সূক্ত। কতকগুলি সূক্ত একত্র করিয়া একটি মণ্ডল। এইরূপ দশটি মণ্ডলে শাকলশাখার ঋগ্বেদ-সংহিতা সমাপ্ত হইয়াছে। অন্যরূপ বিভাগও আছে। সমুদয় সংহিতা যেমন দশ মণ্ডলে বিভক্ত, সেইরূপ আটটি অষ্টকে বিভক্ত। কোন এক সূক্তের মন্ত্রগুলি একজন ঋষির দৃষ্ট, কোন এক ছন্দে গ্রথিত ও কোন এক দেবতার উদ্দিষ্ট। কোন্ দেবতার উদ্দিষ্ট, তাহা সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ও অর্থ বিচার করিলেই প্রায় বুঝিতে পারা যায়। যথা, প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত প্রথম সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে। ঐ ঋক্‌গুলি সমস্তই গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত, উহাদের ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, উহাদের উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি। "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রেই বুঝা যায়, উহা অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট।

ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু এই নিয়মের বহু স্থলে ব্যতিক্রম আছে। একই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি একাধিক ঋষির দৃষ্ট, একাধিক দেবতার

উদ্দিষ্ট, একাধিক ছন্দে গ্রথিত, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। যথা, তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ২৮ সূক্তের ছয়টি মন্ত্রেরই ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা অগ্নি; কিন্তু ১, ২, ৬, এই তিন মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী, ৩ মন্ত্রের ছন্দ উষ্ণিক্, ৪ মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, ৫ মন্ত্রের ছন্দ জগতী। ঐ মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১, ২, ৩ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রাবরুণ, ৪, ৫, ৬ মন্ত্রের দেবতা বৃহস্পতি, ৭, ৮, ৯ মন্ত্রের দেবতা পুষা, ১০, ১১, ১২ মন্ত্রের দেবতা সবিতা, ১৩, ১৪, ১৫ মন্ত্রের দেবতা সোম, ১৬, ১৭, ১৮ মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ।

প্রথম মণ্ডলে অনেকগুলি ঋষির প্রণীত মন্ত্র বা সূক্ত স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ঋষি শতাধিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহাদের নাম শতর্চ্চী। ২ হইতে ৬ পর্য্যন্ত মণ্ডলের প্রত্যেক মণ্ডল কোন একজন ঋষি বা তাঁহার বংশীয় ঋষির দৃষ্ট। যথা—তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্ত বিশ্বামিত্র দৃষ্ট; অবশিষ্ট তাঁহার পিতা গাথী বা তাঁহার পুত্র "কত" ইত্যাদি ঋষির দৃষ্ট।

প্রথম মণ্ডলের সূক্তগুলির ঋষির মধ্যে যাঁহারা শতাধিক মন্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শতর্চ্চী। শতর্চ্চী ঋষি যোল জন:— মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, হিরণ্যস্তূপ, কণ্ব, প্রস্কণ্ঠ, সব্য, নোধাঃ, পরাশর, গোতম, কুৎস্য, কশ্যপ, কক্ষীবান্, পরুচ্ছেপ, দীর্ঘতমা ও অগস্ত্য। তদ্ভিন্ন জেতাদি ঋষির মন্ত্রও প্রথম মণ্ডলে আছে, তাঁহারা শতর্চ্চী নহেন।

দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্য্যন্ত ছয় মণ্ডলের নাম মধ্যম মণ্ডল, ঐ ঋষিদের নাম মধ্যম ঋষি।

দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের ঋষি শৌনক গৃৎসমদ।

তৃতীয় মণ্ডলের	"	"	"	গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র।
চতুর্থ মণ্ডলের	"	"	"	গৌতম বামদেব।
পঞ্চম মণ্ডলের	"	"	"	ভৌম অত্রি।
ষষ্ঠ মণ্ডলের	"	"	"	বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ।
সপ্তম মণ্ডলের	"	"	"	মিত্রাবরুণপুত্র বশিষ্ঠ।
অষ্টম মণ্ডলের	"	"	"	কণ্ববংশীয় ঋষিগণ।

নবম মণ্ডলের ঋষি অনেক, কিন্তু সকল সূক্তেরই দেবতা সোম পবমান, অর্থাৎ ঐ দেবতার উদ্দিষ্ট ঋক্‌গুলি এই মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের বহু ঋষি ও বহু দেবতা।

কালক্রমে বেদের শাখাভেদ ঘটায় বেদের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজন লক্ষিত হইয়াছিল। এই বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ বেদের অনুক্রমণী রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শৌনক ঋষির প্রণীত অনুক্রমণী অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদসংহিতার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দোঽনুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, আর্ষানুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, অনুবাকানুক্রমণীতে দশটি মণ্ডলের অন্তর্গত ৮৫ অনুবাকের প্রত্যেকের প্রতীক (প্রথম চরণ বা চরণাংশ) ও প্রত্যেক অনুবাকে সূক্তসংখ্যা দেখান হইয়াছে। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে নানা উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। শৌনক শাকল শাখা ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রসংখ্যা, সূক্তসংখ্যা, পদসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এই গণনা তাঁহার নিজ ভাষায় উদ্ধৃতিযোগ্য।

অধ্যায়ানাং চতুঃষষ্টি মণ্ডলানাং দশৈব তু।
বর্গানাং তু সহস্রে দ্বে সংখ্যাতে চ ষড়ুত্তরে॥
ঋচাং দশসহস্রানি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ পারণং সহস্র কীর্ত্তিতম্॥

শাকল্যদৃষ্টে পদলক্ষমেকং
সার্দ্ধঞ্চ বেদে ত্রিসহস্রসূক্তম্।
শতানি চাষ্টৌ দশকদ্বয়ঞ্চ
পদানি ষট্ চেতি চ চর্চ্চিতানি॥

* * *

চত্বারি বা শতসহস্রাণি দ্বাত্রিংশচ্চাক্ষরসহস্রাণি॥

অর্থাৎ শাকল্য দৃষ্টে ঋগ্বেদসংহিতামধ্যে ১০ মণ্ডল, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০১৭ সূক্ত আছে। ১০৫৮০ ঋক্‌মন্ত্র এবং ১৫০০০০ (সার্দ্ধ লক্ষ) + ৩০০০ + ৮০০ + ২০ (দশকদ্বয়) + ৬ = ১৫৩৮২৬ পদ এবং চারি শত সহস্র বা চারি লক্ষ এবং দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বা বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) অক্ষর আছে।

মুদ্রিত শাকলশাখার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, শৌনক যে ঋগ্বেদ-সংহিতার আলোচনা করিয়াছেন, ঠিক সেই সংহিতাই অপরিবর্ত্তিতভাবে

আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কাত্যায়ন-প্রণীত সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রত্যেক সূক্তের প্রতীক সহিত উহার ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪। যজুর্ব্বেদসংহিতা

ঋগ্বেদসংহিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। তৎপরে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। মনে হইতে পারে, ঋগ্বেদসংহিতা যেমন ঋক্‌মন্ত্রগুলির সংগ্রহ, যজুর্ব্বেদসংহিতা সেইরূপ যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। ইহা আংশিক ভাবে সত্য। যজুর্ব্বেদসংহিতা অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহকারীদের যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল; এই জন্য ইহা আধ্বর্য্যব বেদ। অধ্বর্য্যুগণ মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ঋক্‌মন্ত্রও ব্যবহার করিতে হইত। কাজেই তাঁহাদের জন্য সঙ্কলিত গ্রন্থে ঋক্‌মন্ত্র ও যজুর্মন্ত্র, উভয়ই স্থান পাইয়াছে। যজুঃ-সংহিতায় সংগৃহীত ঋকের সংখ্যা অল্প নহে, প্রায় ৭০০। তাহার মধ্যে অনেক ঋক্ ঋগ্বেদসংহিতাতেও বর্ত্তমান, অবশিষ্ট নূতন ঋক্। কাজেই ঋক্‌সংহিতা যেমন ঋক্‌মন্ত্রেরই সংগ্রহ, যজুঃসংহিতা সেইরূপ কেবল যজুঃসংগ্রহ মাত্র নহে—যজুর্মন্ত্র ত আছেই, অনেক ঋক্‌ও আছে।

যজুঃসংহিতা আবার দ্বিবিধ; কৃষ্ণযজুঃসংহিতা ও শুক্লযজুঃসংহিতা। কৃষ্ণযজুঃসংহিতায় অধ্বর্য্যুব্যবহার্য্য মন্ত্র (যজুঃ ও ঋক্ দ্বিবিধ মন্ত্র) সংগৃহীত আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মন্ত্রের নিয়োগপ্রদর্শক ও ব্যাখ্যায়ক ব্রাহ্মণও আছে। কাজেই যজুর্মন্ত্র ও ঋক্‌মন্ত্র ও তাহাদের অনুযায়ী ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া কৃষ্ণযজুঃসংহিতা। এইরূপ গণ্ডগোল আছে বলিয়াই বোধ করি, বিশেষণ হইয়াছে কৃষ্ণ। শুক্লযজুঃসংহিতাতে কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। কেবল মন্ত্রগুলি (যজুঃ ও ঋক্) সংগ্রহ করিয়া শুক্লযজুঃ-সংহিতা রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাংশ সংহিতা হইতে সরাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে; ঐ গ্রন্থও শুক্লযজুঃসংহিতার অনুযায়ী ব্রাহ্মণ। উহার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ।

ঋক্‌সংহিতা ও যজুঃসংহিতার সঙ্কলন-প্রণালীতেও প্রভেদ আছে। কৃষ্ণযজুঃসংহিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া শুক্লযজুঃসংহিতার সহিত ঋগ্বেদ-

সংহিতার তুলনা করা যাইতে পারে। ঋক্‌সংহিতার সঙ্কলনে মন্ত্রের ঋষি ও দেবতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই সূক্তের অন্তর্গত কোন মন্ত্র কোন যজ্ঞে, কোন মন্ত্র বা ভিন্ন যজ্ঞে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয় মণ্ডলের সমুদয় সূক্তই বিশ্বামিত্র বা তদ্বংশীয় ঋষির দৃষ্ট। নবম মণ্ডলের সমুদয় সূক্ত পবমান সোমদেবতার উদ্দিষ্ট। এখানে সঙ্কলন-প্রণালী এইরূপ। যজুঃসংহিতায় ঋষি বা দেবতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। যথা, শুক্লযজুঃসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সংগৃহীত সমুদয় মন্ত্রই (যে দেবতার উদ্দিষ্ট হউক না) দর্শপূর্ণমাস যাগে ব্যবহার্য্য, কোন অধ্যায়ের সমুদয় মন্ত্র অগ্নিষ্টোমে ব্যবহার্য্য ইত্যাদি।

শুক্লযজুঃসংহিতা অপেক্ষা কৃষ্ণযজুঃসংহিতা প্রাচীন, ইহা পুরাণ-সম্মত। কৃষ্ণযজুঃসংহিতার ব্রাহ্মণাংশ সরাইয়া ফেলিয়া শুক্লযজুঃসংহিতা প্রণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণাদিতে একটি উপাখ্যান আছে। মহামেরুতে ঋষিসমাজে উপস্থিত হন নাই বলিয়া ঋষি বৈশম্পায়ন পাতকগ্রস্ত হন। পাপক্ষালনার্থ তিনি শিষ্যদিগকে ব্রত অনুষ্ঠানে আদেশ দেন। শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য দর্পের সহিত অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, আমি একাকী ব্রত সাধন করিব। বৈশম্পায়ন ক্রোধে বলিলেন, তুমি বিদ্বান্‌দের নিন্দাকারী, তুমি অধীত বিদ্যা ফিরিয়া দাও। যাজ্ঞবল্ক্যও অধীত বিদ্যা বমন করিয়া ফেলিলেন ও অধ্যাপককে ফিরিয়া দিলেন। আবার শিষ্যগণ তিত্তিরিরূপ ধরিয়া তাহা তুলিয়া লইল। তদবধি ঐ বিদ্যার নাম হইল তৈত্তিরীয় বেদ। এ দিকে যাজ্ঞবল্ক্য স্তুতি দ্বারা সূর্য্যকে প্রসন্ন করিলেন। সূর্য্য বাজী অর্থাৎ অশ্ব সাজিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার বরে তিনি নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সেই নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন ও অশ্বরূপধারী সূর্য্যের নামানুসারে বাজী নামে খ্যাত হইলেন। বৈশম্পায়নের শিষ্যেরা—যাঁহারা পুরাতন বিদ্যা পাইলেন, তাঁহারা ঐ "আচরণ" হেতু নাম পাইলেন চরকাধ্বর্য্যু।

ঐ চরকাধ্বর্য্যুদের বেদ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। আর বাজীদিগের বেদ শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। উভয় বেদই কালে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-যজুঃসংহিতার প্রধান শাখা তৈত্তিরীয় সংহিতা; উহাই এখন প্রচলিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া যে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, উহা প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীয়

সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড; কেন না, তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণযজুঃসংহিতা) মধ্যে যেমন কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে, তথাকথিত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেইরূপ অন্য কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা বিশুদ্ধ মন্ত্রগ্রন্থ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ নহে। অন্য শাখার মধ্যে মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠকসংহিতা এখনও বর্ত্তমান; তাহার সহিত তৈত্তিরীয় সংহিতার অধিক প্রভেদ নাই।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মন্ত্রভাগ শুক্লযজুঃসংহিতা, নামান্তর বাজসনেয়িসংহিতা—যাজ্ঞবল্ক্যের অপর নাম বাজসনেয়ী। ব্রাহ্মণভাগ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহার বহু শাখার মধ্যে দুই শাখা এখন বিদ্যমান আছে; মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব—উভয়ের মধ্যে পাঠভেদ যৎসামান্য।

৫। সামবেদসংহিতা

যজুর্ব্বেদসংহিতার পর সামবেদসংহিতা। যে সকল ঋক্‌মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে—মুখতঃ সোমযাগের অনুষ্ঠানে গান করা হইত, সেইগুলিই এই সংহিতাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই ঋক্‌সমূহের অধিকাংশ আবার প্রচলিত ঋগ্বেদসংহিতামধ্যেই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ৮ ও ৯ মণ্ডলমধ্যে পাওয়া যায়। কেবল ৭৫টি ঋক্ নূতন ঋক্। কাজেই ইহাকে একখানা নূতন গ্রন্থ বলাই চলে না। ইহা ঋগ্বেদসংহিতারই কিয়দংশ বাছাই করিয়া বিশেষ কার্য্যের জন্য সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

ঋক্‌মন্ত্র কিরূপে অক্ষরযোগাদি দ্বারা সামে পরিণত করিতে হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র গানগ্রন্থ আছে। একই ঋক্ একাধিক সামে গান চলিতে পারে; কাজেই এই হিসাবে সামমন্ত্রের সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ান যাইতে পারে।

৬। অথর্ব্ববেদসংহিতা

তার পর অথর্ব্ববেদসংহিতা। এখানি কিরূপ গ্রন্থ? ইহা মন্ত্রের সংগ্রহ। অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্, অল্পাংশ (প্রায় ষষ্ঠাংশ) যজুঃ। যে সকল ঋক্‌মন্ত্র শান্তি, পুষ্টি, অভিচারাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইত, শ্রৌত যাগে ব্যবহৃত হইত না, সেই মন্ত্রই মুখ্যতঃ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার

অধিকাংশ ঋক্ই ঋগ্বেদসংহিতায় নাই। প্রায় ১২০০ ঋক্ ঋগ্বেদসংহিতার ১, ৮ ও ১০ মণ্ডলমধ্যে পাওয়া যায়; অন্যান্য মণ্ডলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদসংহিতার শৌনকশাখার গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পিপ্পলাদশাখার একখানি সংহিতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৭। আরণ্যক, উপনিষৎ

যাজ্ঞিকদিগের মতে বেদমন্ত্রও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্র ছাড়াইয়া বেদের যে অংশ, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের কিয়দংশ অরণ্যবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; সেই অংশের নাম আরণ্যক। আরণ্যকের মধ্যেই বেদের জ্ঞানকাণ্ড ক্রমশঃ নিহিত থাকে। ঐ জ্ঞানকাণ্ডান্তর্গত বেদবাক্যকে উপনিষৎ বলে। উহাই বেদান্ত। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার শেষ অধ্যায় জ্ঞানকাণ্ডান্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। ঐ অধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঈশোপনিষৎ। তদ্ভিন্ন উপনিষৎগুলি বেদের ব্রাহ্মণাংশমধ্যেই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত আরণ্যকমধ্যেই নিহিত আছে।

যে সকল যাজ্ঞিক প্রধানতঃ ঋগ্বেদের অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল বহ্বৃচ। তাঁহাদের ব্যবহার্য্য ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বহ্বৃচব্রাহ্মণে হোতা ও তাঁহার সহকারী ঋত্বিক্‌গণের ব্যবহার্য্য ঋক্‌মন্ত্র-সকলের ব্যাখ্যা ও নিয়োগাদি বিবৃত হইয়াছে। ঐরূপ অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহকারীদের ব্যবহার্য্য মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আধ্বর্য্যব ব্রাহ্মণ; উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীদের জন্য ছন্দোগ ব্রাহ্মণ।

বহ্বৃচব্রাহ্মণের দুইখানি বর্ত্তমান আছে—

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক।

(২) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি আরণ্যক।

ঐতরেয় আরণ্যক মধ্যে ঐতরেয় উপনিষৎ ও কৌষীতকি আরণ্যক-মধ্যে কৌষীতকি উপনিষৎ নিহিত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অনুসারী আধ্বর্য্যব ব্রাহ্মণমধ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগ্রন্থ নহে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় যেমন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত রহিয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত আছে। ইহার মধ্যে কঠোপনিষৎ নিহিত। এই

ব্রাহ্মণের শেষাংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তন্মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মহা-নারায়ণীয় উপনিষৎ নিহিত।

মৈত্রায়ণীয় সংহিতার অনুসারী পৃথক্ ব্রহ্মণগ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। ঐ সংহিতামধ্যেও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত আছে। ব্রাহ্মণাংশে মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ নিহিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদে মন্ত্রাংশ ও ব্রাহ্মণাংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণাংশের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। উহারও মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব, উভয় শাখা বর্ত্তমান। মাধ্যন্দিন শাখার শেষ ভাগ এই ব্রাহ্মণের আরণ্যকরূপে গৃহীত হয় ও তন্মধ্যে বিখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ নিহিত।

ছন্দোগ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল তাণ্ড্য শাখার তলবকার (জৈমিনীয়) শাখা বর্ত্তমান। তলবকার শাখার ব্রাহ্মণমধ্যে কেনোপনিষৎ নিহিত। তাণ্ড্য শাখার একখানি ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশ তাণ্ড্য বা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাকে পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট মনে করা যাইতে পারে। তাণ্ড্য শাখার আর একখানি ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, ইহারই অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষৎ। সামবিধান ব্রাহ্মণাদি আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছন্দোগ ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হয়।

অথর্ব্ববেদের অনুসারী ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে, উহা গোপথ ব্রাহ্মণ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ নামক গ্রন্থ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অনুসারী ও প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যাদি বহু উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অনুসারী বলিয়া স্বীকৃত হয়।

৮। বহ্বৃচব্রাহ্মণ

বহ্বৃচব্রাহ্মণের মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষীতকি, উভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, দেখা যাউক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দুই অংশ—প্রথমাংশ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় অংশ ঐতরেয় আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ঐতরেয় আরণ্যক ষোল অধ্যায়ে বিভক্ত। উহার বিষয়ভাগ এইরূপ :—

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ :—

১—১৪ অধ্যায়—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

১৫—২৪ অধ্যায়—উক্‌থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র এবং দ্বাদশাহ যাগ।

২৫ অধ্যায়—অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মার কর্ম্ম।

২৬ অধ্যায়—গ্রাবস্তুৎ ও সুব্রহ্মণ্যের কর্ত্তব্য।

২৭—৩০ অধ্যায়—সোমযাগের বিবিধ অনুষ্ঠান।

৩১ অধ্যায়—পশু বিভাগ।

৩২ অধ্যায়—অগ্নিহোত্র।

৩৩ অধ্যায়—শুনঃশেপের উপাখ্যান।

৩৪—৩৯ অধ্যায়—রাজসূয়।

৪০ অধ্যায়—পুরোহিতের কার্য্য।

ঐতরেয় আরণ্যক :—

১—৫ অধ্যায়—গবাময়ন সত্রের সমাপ্তিকৃত্য।

৬—১৪ অধ্যায়—উপনিষৎ।

১৫ অধ্যায়—মহানাম্নী প্রশংসা।

১৬ অধ্যায়— * *

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের আরম্ভে অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্যের বিবরণ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এগুলি স্থান পায় নাই। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষাংশে বা শেষ বিশ অধ্যায়ে যে সকল কথা আছে, তাহা কৌষীতকিতে নাই। অগ্নিষ্টোমের বিবরণ উভয়েই আছে, এবং সেখানে ভাষাসাদৃশ্য দেখিলে মনে হইতে পারে, এই সাধারণ অংশ সম্ভবতঃ এক মূল অবলম্বনে রচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আরম্ভ—"অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ।" কৌষীতকিতে সেই বিষয় আরম্ভ (৭ অধ্যায় আরম্ভ)—"অগ্নির্বৈ দেবানামবরার্দ্ধো বিষ্ণুঃ পরার্দ্ধ্যঃ।"

৯। বেদ কয়খানি ? ত্রয়ী, না চতুষ্টয়ী ?

বেদ কয়খানি, এই প্রশ্ন করিলে সম্ভবতঃ অধিকাংশ লোকে উত্তর দিবে, চারিখানি—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। কোন্ বেদ আগে, কোন্ বেদ পরে ? এইরূপ একটা প্রশ্ন প্রচলিত আছে। তাহার প্রচলিত উত্তর, ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অথর্ব্ববেদ সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এইরূপ প্রশ্ন ও এইরূপ উত্তর সঙ্গত নহে। বেদ কয়খানি, এরূপ প্রশ্নই হয় না। বেদ কয় রকম ?

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার উত্তর, বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র আগে, না ব্রাহ্মণ আগে, এ প্রশ্ন সঙ্গত। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় স্বীকার করিলেও এ প্রশ্ন সঙ্গত হয়। কেন না, বেদ নিত্য হইলেও উহার প্রকাশকাল বা প্রচারকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ব্রাহ্মণ যখন মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেছে, মন্ত্রেরই বিনিয়োগ দেখাইতেছে, তখন মন্ত্র প্রচারের পর ব্রাহ্মণ প্রচার হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। পৌরাণিক ইতিহাসও ইহা অস্বীকার করে না। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণপ্রবক্তা ঋষির পূর্ব্বে ছিলেন, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। এমন কি, সকল মন্ত্র এক সময়ে প্রচারিত হয় নাই। মধুচ্ছন্দা যখন বিশ্বামিত্রের পুত্র, তখন বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র মধুচ্ছন্দার মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ যখন পরাশরের পিতামহ, তখন বশিষ্ঠদৃষ্ট মন্ত্র পরাশরদৃষ্ট মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা মনে করিলে নিত্যত্ববাদীর আপত্তি করিবার কারণ থাকে না। অতএব মন্ত্র আগে, না ব্রাহ্মণ আগে ; কোন্ মন্ত্র আগে, কোন্ মন্ত্র পরে বা কোন্ ব্রাহ্মণ আগে, কোন্ ব্রাহ্মণ পরে, এ সকল প্রশ্ন আলোচ্য, এবং পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া এ সকল প্রশ্নের কিছু কিছু মীমাংসা হইতে পারে। অতএব মোটের উপর বলা যাইতে পারে, বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এবং বেদের মন্ত্রাংশ বেদের ব্রাহ্মণাংশের পূর্ব্বে, অধিকাংশ স্থলে বহু পূর্ব্বে প্রচারিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

তার পর এইরূপ প্রশ্ন চলিতে পারে যে, মন্ত্র কয় রকম ? এ প্রশ্নের উত্তর,—মন্ত্র তিন রকম,—ঋক্, যজুঃ, সাম (নিগদ মন্ত্র বা প্রৈষ মন্ত্র যজুর্মন্ত্রের অন্তর্গত)। চারি রকমের মন্ত্র নাই।

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রের মধ্যে কোন্ মন্ত্র আগে রচিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও সঙ্গত বটে ; কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। যাঁহারা মনে করেন, ঋক্‌মন্ত্রসকলই অতি প্রাচীন কালে প্রচারিত হইয়াছিল, যজুর্মন্ত্র তাহার পরে প্রচারিত হয়, তাঁহাদের অনুমান সর্ব্বত্র সঙ্গত কিনা বলা কঠিন। সামমন্ত্র মোটের উপর ঋক্‌মন্ত্রের পরবর্ত্তী স্বীকার করা যাইতে পারে। এই হিসাবে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, ঋক্‌মন্ত্র সুর বসাইয়া গান করিলেই উহা সামে পরিণত হয়। অতএব ঋকের উপর সামের প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রও এ কথা ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু ঋক্‌মন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে যজ্ঞকর্ম্মের যে বিবরণ আছে, তাহা ঋক্ ও যজুঃ, উভয়বিধ মন্ত্রদ্বারা সম্পাদ্য। ঋক্ ও যজুঃ, উভয়বিধ মন্ত্রের কোন একটাকে ত্যাগ করিয়া প্রধান যাগযজ্ঞ সম্পাদন করা চলে না এবং যজ্ঞক্রিয়ার সাধনই যখন ঋক্ ও যজুঃ, উভয় মন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন আপনা হইতেই মনে হয় যে, ঋক্ ও যজুঃ সমকালীন। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কাল-সহকারে যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান-বাহুল্য ঘটিয়াছিল। প্রাচীন কালে যজ্ঞক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সরল ছিল, কালসহকারে তাহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণাংশ যে সময়ে প্রচারিত হয়, তখনকার জটিল অনুষ্ঠানে ঋক্ ও যজুঃ, উভয়বিধ মন্ত্র (এবং সোমযাগাদিতে সামমন্ত্রও) বিনিযুক্ত হইত। তাহার অপেক্ষাও পুরাতন কালে যখন ব্রাহ্মণাংশ প্রচারিত হয় নাই, তখন এত মন্ত্র ছিল না। এমন কি, তদপেক্ষা প্রাচীন কালে হয় ত কেবল ঋক্‌মন্ত্রেরই সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইত। এইরূপ অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে—আগে ঋক্, পরে যজুঃ।

ফলে, বেদপন্থী সমাজ যজ্ঞানুষ্ঠান ভারতবর্ষের বাহির হইতে আনিয়াছিলেন। যখন আর্য্য জাতির ইরাণী শাখা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত একত্র বাস করিতেন, তখনই যজ্ঞানুষ্ঠান বহুলরূপে প্রচারিত ছিল। ইরাণীদের প্রাচীন শাস্ত্রে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, যে সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যে সকল সস্কারের উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলিই আমাদের সহিত সাধারণ। যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঋত্বিক্‌দের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন সমাজে ঘটিয়াছিল। সেই ঋত্বিক্‌দের নাম পর্য্যন্ত বেদে ও ইরাণীদের আবেস্তা শাস্ত্রে সাধারণ। এমন কি, আরও প্রাচীন কালে যখন প্রাচ্য আর্য্য প্রতীচ্য আর্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসেন নাই, যখন জর্ম্মান ও ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ এক সমাজের অন্তর্গত ছিলেন, তখনও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান পক্ষে প্রমাণ আছে। সে সময়ে কোন্ মন্ত্রে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহা কিরূপে জানিব? তখন ঋক্ যজুঃ উভয় মন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না, কিরূপে জানিব? তখন যে বেদ প্রচলিত ছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কি না, কিরূপে জানিব? তখনকার ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র দেখিয়াছিলেন, বেদে বা আবেস্তায় তাহার চিহ্ন, তাহার অবশেষ আছে

কি না, কিরূপে বলিব? বালগঙ্গাধর তিলকের অনুমানে আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ এক কালে সুমেরু প্রদেশে অবস্থান করিতেন। সে অতি পূর্ব্বকালের কথা। সুমেরু প্রদেশে তখন এখনকারই মত বহুমাসব্যাপী দিবা ও বহুমাসব্যাপী রাত্রি থাকিত; কিন্তু উহা এখনকার মত চিরনীহারাচ্ছন্ন এবং মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল না। তিলকের অনুমানে সে কালের স্মৃতি এখনও আমাদের ঋক্‌মন্ত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, আমাদের ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানবিবরণে প্রচ্ছন্ন আছে। থাকিতে পারে, কিন্তু সে কালে যে সকল মন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই মন্ত্র এখনকার বেদমধ্যে বিদ্যমান আছে, এ কথা বলিতে তিনিও সাহস করেন নাই।

ফলে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি যে সকল ঋষি আমাদের বেদশাস্ত্রের অধিকাংশ মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাঁহারা ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন; ভারতবর্ষে আর্য্যনিবাসের পর—কত পরে, তাহা বলা কঠিন—তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে বসিয়াই তাঁহারা অধিকাংশ ঋক্‌মন্ত্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে সেই সকল ঋক্‌মন্ত্র প্রকাশিত হয় নাই। যে যে যজ্ঞের যে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাদের দৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্রের বিনিয়োগ বিহিত হইয়াছে, সেই সেই যজ্ঞের সেই সেই অনুষ্ঠান তখন প্রচলিত ছিল না, মনে করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান মন্ত্রগুলির অধিকাংশই যখন প্রচারিত হয় নাই, তখনকার যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সরল ছিল, ইহা মনে করিতে হানি নাই। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধও নহে। শাস্ত্রই বলেন, সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল সত্য, ত্রেতার ধর্ম্ম ছিল তপস্যা, দ্বাপরের ধর্ম্ম ছিল যজ্ঞ, কলির ধর্ম্ম হইয়াছে দান। এই পুরাণবাক্যমধ্যে প্রাচীন কালের স্মৃতি নিহিত আছে, স্বচ্ছন্দে মনে করা যাইতে পারে। দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠানের বাহুল্য হইয়াছিল, এই স্মৃতি। তৎপূর্ব্বে এত যজ্ঞ ছিল না, এত মন্ত্র ছিল না, এত মন্ত্র তখনও প্রচারিত হয় নাই। যজ্ঞ একেবারে ছিল না বলা চলে না, মন্ত্রও একেবারে ছিল না বলা চলে না; যজ্ঞও ছিল, মন্ত্রও ছিল; যাহা ছিল, তাহার অনেক হয় ত লুপ্ত—যুগে যুগে বেদ বিলুপ্ত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহার স্মৃতি আছে,—কিছু হয় ত এখনও অবশিষ্ট আছে; তাহার ঋষির নাম পর্য্যন্ত এখন হয় ত লুপ্ত; তাহার বিনিয়োগ হয় ত পরিবর্ত্তিত।

মন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; যে সকল মন্ত্র এখন লোপের পর অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋষির নাম দেখিয়া বহু স্থলে মন্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় চলিতে পারে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঋক্ প্রাচীন, কি যজুঃ প্রাচীন, পদ্য মন্ত্র প্রাচীন, কি গদ্য মন্ত্র প্রাচীন, তাহার মীমাংসা হইল না। যজুর্মন্ত্র অধিকাংশই অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিকের ব্যবহার্য্য। অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্ কত কালের প্রাচীন, কে বলিবে? ঋক্‌মন্ত্রের অধিকাংশ, হোতানামা ঋত্বিকের ব্যবহার্য্য। হোতা প্রাচীন, না অধ্বর্য্যু প্রাচীন, কে বলিবে? ব্রাহ্মণাংশ-বিহিত যজ্ঞকর্ম্মে হোতা ও অধ্বর্য্যু, উভয়েরই প্রয়োজন। প্রাচীনতর যজ্ঞে উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক ছিল কি না, কে বলিবে? একেবারেই যে ছিল না, তাহা বলা যায় না। প্রচলিত যজুর্মন্ত্রের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-বিহিত জটিল যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী।

যজ্ঞ যখন এত জটিল ছিল না,—ব্রাহ্মণাংশ প্রচারের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—সে সময়ে এই সকল যজুর্মন্ত্রের হয় ত প্রয়োজন ছিল না, এই সকল যজুর্মন্ত্র তখন ছিল না, কিন্তু হয় ত অন্য যজুর্মন্ত্র চলিত ছিল, তাহা এখন লুপ্ত। তখন ঋক্‌ও ছিল, যজুঃও ছিল; সেই ঋক্‌ও এখন লুপ্ত, সেই যজুঃও এখন বিলুপ্ত। কাজেই ঋক্ আগে, কি যজুঃ আগে, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ভাষা দেখিয়া একটা মীমাংসার পথ মিলিতে পারে। বেদের একাংশের ভাষা অপরাংশের ভাষা অপেক্ষা স্পষ্টতঃ প্রাচীন হইতে পারে। ইহাতে বেদের নিত্যত্ব হানি হয় না। কেন না, বেদ নিত্য; কিন্তু বেদের বর্ণ,—যে বর্ণে মনুষ্যকণ্ঠে উহার প্রকাশ,—তাহা নিত্য নহে। যে ঋষি যে বেদ দেখিয়াছেন, তিনি তৎকালের পরিচিত ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা মনে করিতে আপত্তি নাই। যজুর্মন্ত্রের ভাষা প্রাচীন, না ঋক্‌মন্ত্রের ভাষা প্রাচীন? বলা কঠিন। ঋকের ভাষায় বিবিধ স্তর দেখা যায়; কোনও ঋকের ভাষা অবোধ্য, কোনও ঋকের ভাষা সুবোধ্য; যজুঃ সম্বন্ধেও এইরূপ। নিবিৎ নামক কতকগুলি মন্ত্র আছে, যাগমধ্যে তাহার বহুল প্রয়োগ ছিল—উহা গদ্য মন্ত্র বা যজুর্মন্ত্র; কিন্তু উহার ভাষা ঋকের ভাষা অপেক্ষাও দুর্ব্বোধ্য। ঋক্‌দ্রষ্টা ঋষিগণও নিবিৎ মন্ত্রকে প্রাচীন বলিয়া গিয়াছেন। কাজেই কতক যজুঃ

অধিকাংশ ঋকের অপেক্ষাও প্রাচীন, কতক হয় ত সমকালিক, কতক হয় ত আধুনিক। আমরা যে যজুঃসমূহ পাইয়াছি, এবং আমরা যে ঋক্-সমূহ পাইয়াছি, হইতে পারে—তন্মধ্যে মোটের উপর ঋক্‌গুলিই প্রাচীন ও যজুঃ অর্ব্বাচীন। মোটের উপর মাত্র—ইহার উপর সূক্ষ্ম বিচার চলে না।

আদি ঋষি কোন্ মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন? ঋক্, না যজুঃ, কিরূপে জানিব? আদি ঋষি কে, তাহা কিরূপে জানিব? যিনি আদি মানব, তিনিই কি আদি ঋষি? আদি সমাজের যিনি সংস্থাপক, তিনিই কি আদি ঋষি বা আদি মানব? কিরূপে বলিব? আর্য্যসমাজ কি কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে স্থাপিত হইয়াছে? কখনই না। মানবের পিতা মানব, তাঁর পিতা মানব, তাঁর পিতা মানব, কোথায় গিয়া থামিবে? এ কালের জীববিদ্যা বলেন, মানবের—অতএব আর্য্য মানবের—এমন এক পূর্ব্বপুরুষ ছিল, যাহাকে মানব নাম দেওয়া যাইতে পারে না, তাহার নাম বরং মর্কট হইতে পারে। কিন্তু কোন্ দিন মর্কটের পুত্র মানবে পরিণত হইল, তাহার উত্তর জীববিদ্যা দিতে পারে না। তাহার উত্তর নাই। বলিতে পারা যায় না, অমুক দিনে, অমুক পুরুষে মর্কটবংশের শেষ, মানববংশের আরম্ভ। কাজেই কোন্ দিন, কোন্ পুরুষে মানবের আরম্ভ, বলা যায় না। কাজেই বলিতে হয়, মানবের পিতা মানব, তাহার পিতা মানব; এইরূপ ভাবে বল, থামিও না। থামিও না বলিলে কি হয়, এক সময় থামিতে হয়; ক্লান্ত হইয়া থামিতে হয়। তখন আর দৃষ্টি চলে না; বাধ্য হইয়া থামিতে বলিতে হয়; ঐ—ঐখানে যিনি, তিনি আদিমানব, তাঁহার আর পিতা নাই। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি প্রজাপতি। তিনি আদি মানব, তিনি মানবের ভাষায় প্রথমে কথা কহিয়াছিলেন। তিনি স্ফোটকে শব্দে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য শব্দকে প্রথম প্রকাশ দিয়াছিলেন, তিনি প্রথম বেদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে, বাক্ শরীরিণী হইয়া নিঃসৃত হইয়াছিলেন। তিনি আদি ঋষি—তখন অন্য ঋষি কেহ ছিল না—তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিবার জন্য তখন কেহ উপস্থিত ছিল না, তিনি যে ভাষায় কহিয়াছিলেন, সে ভাষা কেহ জানে না, পরবর্ত্তী ঋষিগণ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সেই আদি ঋষির, সেই পুরাণ কবির দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র; তাহার ভগ্নাংশের

অবশেষ মাত্র। সেই আদি বাক্য ঋক্, না যজুঃ, না সাম, কে বলিবে? কেহ তখন ছিল না; কেহ তাহা শুনে নাই। তাহা ঋক্ও নহে, যজুঃও নহে, সামও নহে, অথবা তাহা ঋক্, যজুঃ, সাম, তিনই। ঋক্ যজুঃ সাম, এ তিনের মূলে পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। একসঙ্গেই, এক সময়েই তিনই উচ্চারিত হইয়াছিল। একেই তিন বা তিনেই এক। আদি মানবের কথা ছাড়িয়া দাও, প্রাচীন মানবের কথা বরং বিজ্ঞানের বিষয়। প্রাচীন মানব কিসে কথা কহিত—গদ্যে, না পদ্যে, না গানে? সম্ভবতঃ গদ্যে, গদ্যই মানুষের স্বাভাবিক ভাষা, পরস্পর ভাববিনিময়ের জন্য আমরা গদ্যে কহি; দেবতাকে ডাকিবার সময়ে গদ্যের ভাষাতেই ডাকা স্বাভাবিক। গদ্য ছন্দোবদ্ধ বাক্য নহে, উহা অনিয়ত-পাদাক্ষর। পদ্য কহিতে ছন্দোবন্ধন আবশ্যক। উহাতে ক্ষমতা আবশ্যক, উহা অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ—যাঁহাদের মন্ত্র এখন লুপ্ত—তাঁহারা হয় ত গদ্যেই দেবতাকে ডাকিতেন, তাঁহাদের মন্ত্র হয় ত যজুর্মন্ত্রই ছিল। যজুঃ তাহা হইলে ঋক্ অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু গদ্য বাক্য স্মৃতিতে থাকে না, উহা শীঘ্রই লোপ পায়। বিশেষ হেতু ব্যতীত গদ্য ভাষা কেহ মনে রাখে না। পিতার উক্তি পুত্রে স্মরণে রাখে না, নিজের উক্তি নিজে স্মরণে রাখে না। পদ্যের ভাষা তার চেয়ে কৃত্রিম, কৃত্রিম বলিয়াই মনে রাখা যায়। যে পদ্যের ভাষা কহে, লোকে তাহার কৃতিত্ব দেখিয়া চমকিত হয়। তাহা মনে রাখে, তাহা পুরুষপরম্পরাক্রমে স্থিতি লাভ করে। বাল্মীকি মুনি সারা জীবন ধরিয়া কথা কহিয়াছিলেন, তিনিও সকল কথা মনে রাখেন নাই, তাঁহার শিষ্যেরাও তাহা স্মৃতিতে রাখে নাই। এক দিন সহসা ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একের প্রতি শরাঘাত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সহসা ছন্দোবদ্ধ শ্লোক তাঁহার বদন হইতে বিনির্গত হইল, সেই শ্লোক আজিও লুপ্ত হয় নাই। সেই শ্লোকের অনুকরণে তিনি যে শ্লোকময় মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহীতলে যত দিন গঙ্গা থাকিবেন, ভূতগণ যত দিন বিচরণ করিবে, তত দিন তাহা ধরাধামে বিচরণ করিবে।

ঋক্ আগে, না যজুঃ আগে? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে এত কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। হয় ত যজুর্মন্ত্রই পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সকল পুরাতন যজুঃ লোপ পাইয়াছে, কিছু হয় ত বর্ত্তমান আছে।

যে সকল যজুঃ বর্ত্তমান আছে, তাহার অনেক হয় ত অধিকাংশ বর্ত্তমান ঋকের তুলনায় আধুনিক—জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

আর একবার উপরের কথাগুলি আবৃত্তি করা যাউক। বেদ কয়খানি, এরূপ প্রশ্ন হয় না। ঋক্‌বেদ আগে, কি সামবেদ আগে, কি য়জুর্ব্বেদ আগে, এরূপ প্রশ্নও হয় না। তবে বলা যাইতে পারে, বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের ব্যাখ্যানার্থ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন, অতএব মন্ত্রের পরে ব্রাহ্মণ। উহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত। মন্ত্র আবার ত্রিবিধ—ঋক্, সাম, যজুঃ। ঋক্ গান করিলেই সাম হয়, অতএব সাম ঋকের সমকালিকও বলা চলে, পরবর্ত্তীও বলা চলে। যজুঃ ঋকের পূর্ব্বে, কি পরে, বলা কঠিন। যে সকল যজুর্মন্ত্র এখন বর্ত্তমান আছে, তাহার কতক—হয় ত অধিকাংশ, ঋকের অপেক্ষাও পুরাতন, কতক হয় ত সমকালীন, অনেক হয় ত আধুনিক—এই পর্য্যন্ত বলা যায়। পূর্ব্বে আরও ঋক্ ছিল, আরও যজুঃ ছিল; সে সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা বর্ত্তমান আছে, সেগুলির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার চলিতে পারে। মন্ত্রের ভাষা দেখিয়া, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ইতিহাস দেখিয়া, কোন্ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই অনুষ্ঠানের প্রাচীনতা দেখিয়া, ঋক্ ও যজুঃ, এই উভয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুমিত হইতে পারে। এই ঋক্ হইতে ঐ ঋক্ প্রাচীন কি না, এই যজুঃ হইতে ঐ যজুঃ প্রাচীন কি না, ইহার যেরূপ বিচার হইতে পারে, এই ঋক্ হইতে এই যজুঃ প্রাচীন কি না, তাহারও সেইরূপ বিচার হইতে পারে। "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" এই ঋক্ হইতে "ইষে ত্বা" এই যজুর্মন্ত্রটি প্রাচীন কি না, তাহা লইয়া বিচার-বিতর্ক চলিতে পারে। কোথাও বা উত্তর মিলিবে, কোথাও বা উত্তর মিলিবে না। পণ্ডিতেরা তর্ক-বিতর্ক করিতে পারেন, সর্ব্বত্র সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে না।

এখন আর একটা নূতন কথা উত্থাপন করা যাইতেছে। ঋগ্বেদ অর্থ কি? বেদের দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্‌মন্ত্র ও ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যানপর ব্রাহ্মণ, এই লইয়া ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদসংহিতা কি? ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদসংহিতা, এই দুইটি নাম সমানার্থক নহে। ঋক্‌মন্ত্রগুলির ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিয়া কেবল ঋক্‌মন্ত্রগুলির অধিকাংশ একত্র সঙ্কলিত করিয়া যে গান প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নাম ঋগ্বেদসংহিতা।

ঋগ্বেদসংহিতা কাহাকে বলে, দেখান গেল। তার পরে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। আপাততঃ মনে হইতে পারে, ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত করিয়া যেমন ঋগ্বেদসংহিতা, তেমনি যজুর্মন্ত্রগুলির সঙ্কলনে যজুর্ব্বেদসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এ কথা ষোল আনা ঠিক নহে। অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহকারীরা যজ্ঞে যজুর্মন্ত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগকে ঋক্‌মন্ত্রেরও কিছু কিছু ব্যবহার করিতে হইত। যজুর্ব্বেদসংহিতায় অধিকাংশ যজুর্মন্ত্র নিবিষ্ট হইলেও অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্রও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। ঐ সকল ঋকের অনেকগুলি ঋগ্বেদসংহিতা মধ্যে আছে, কতকগুলি মন্ত্র নূতন—ঋগ্বেদসংহিতায় নাই। অপিচ যজুর্ব্বেদসংহিতা দুই শ্রেণীর আছে। এক শ্রেণীর নাম কৃষ্ণযজুঃসংহিতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম শুক্ল-যজুঃসংহিতা।

কৃষ্ণযজুঃসংহিতাতে মন্ত্র ব্যতীত মন্ত্রের ব্যাখ্যানপর ও বিধিনিষেধপর ব্রাহ্মণও রহিয়াছে। কাজেই ঋগ্বেদসংহিতা যেমন বিশুদ্ধ মন্ত্রসংহিতা, কৃষ্ণযজুঃসংহিতা সেরূপ মন্ত্রসংহিতা মাত্র নহে; উহার মধ্যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয়ই সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাংশ একবারে বর্জ্জন করিয়া, কেবল মন্ত্রাংশ লইয়া যে যজুঃসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার নাম শুক্লযজুঃ-সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণও সংহিতার মতই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয়ের সঙ্কলনে উৎপন্ন। শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণাংশ মন্ত্রাংশ হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই যজুঃসংহিতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, মহামেরুতে ঋষি-সমাজে বৈশম্পায়ন উপস্থিত হন নাই; সেই হেতু তাঁহার ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাতক হয় এবং তাহার ফলে তাঁহার ভাগিনেয়ের মৃত্যু ঘটে। তিনি শিষ্যগণকে ব্রহ্মহত্যাপহ ব্রত অনুষ্ঠানে আজ্ঞা দিলে অন্যতম শিষ্য ব্রহ্মরাত-পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অন্য শিষ্যদিগের নিন্দা করিয়া বলিলেন, আমি একাকী এই ব্রত অনুষ্ঠান করিব। তাঁহার এই দর্পে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈশম্পায়ন বলিলেন, তুমি ইহাদের অপমান করিলে, তুমি অধীত বিদ্যা আমাকে ফিরাইয়া দাও। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার অধীত বিদ্যা সমুদয় বমন করিয়া ফেলিলেন। অন্য শিষ্যেরা তিত্তিরির রূপ ধরিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের পরিত্যক্ত যজুঃসমূহ গ্রহণ করিলেন। সেই যজুঃসমূহের নাম তদনুসারে তৈত্তিরীয় যজুঃ হইল এবং এইরূপ "আচরণ" হেতু সেই শিষ্যগণের নাম "চরক"

অধ্বর্য্যু হইল। যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যালাভের জন্য সূর্য্যের স্তুতি করিলেন। সূর্য্য বাজী(অশ্ব)রূপ ধরিয়া দেখা দিলেন এবং তাঁহার বরে যাজ্ঞবল্ক্য "অয়াতরাস" নামক কতকগুলি নূতন যজুর্মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। সেই যজুর্ব্বিদ্যা লইয়া যাঁহারা অধ্যয়ন করিলেন, অশ্বরূপধারী সূর্য্যের নামানুসারে তাঁহাদের নাম "বাজী" হইল।

অতএব পৌরাণিক কিংবদন্তী মতে বৈশম্পায়ন-শিষ্য ব্রহ্মরাত-পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা। মনে করা যাইতে পারে, তিনিই অধ্বর্য্যু-ব্যবহৃত বেদের মন্ত্রাংশ হইতে ব্রাহ্মণাংশ পৃথক্ করিয়া মন্ত্রাংশে শুক্লযজুঃসংহিতা—যাহার অপর নাম বাজসনেয়িসংহিতা—ও ব্রাহ্মণাংশে শুক্লযজুঃব্রাহ্মণ—যাহার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ—রচনা করেন। মন্ত্রাংশ হইতে ব্রাহ্মণাংশকে পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনই 'শুক্ল' নামের কারণ, তাহা মনে করা যাইতে পারে। টীকাকারেরাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"শুক্লানি যজূংষি শুদ্ধানি যদ্বা ব্রাহ্মণেনামিশ্রিতমন্ত্রাত্মকানি।"

কালক্রমে উভয় যজুঃসংহিতার বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণযজুঃ-সংহিতায় তৈত্তিরীয় শাখাই প্রধান, উহা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থ উহার অনুযায়ী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য শাখার মধ্যে মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠক সংহিতাও বর্ত্তমান আছে। কাঠক সংহিতার উপাদান কপিষ্ঠলসংহিতায়ও কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্রসংহিতা ও ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। উভয়েরই মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব, এই দুই শাখা এখনও বর্ত্তমান আছে। মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব শাখার মধ্যে পাঠভেদ যৎসামান্য মাত্র। ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রগুলি ঋষি দেবতা প্রভৃতির নামানুসারে সাজান হইয়াছে। যথা, তৃতীয় মণ্ডলের যাবতীয় মন্ত্র বিশ্বামিত্র বা তদ্বংশীয়দিগের দৃষ্ট, নবম মণ্ডলের সমুদয় মন্ত্রের দেবতা সোম পবমান। এ স্থলে যজ্ঞকর্ম্মে বিনিয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। একই সূক্তের অন্তর্গত একই ঋষির দৃষ্ট ও একই দেবতার উদ্দিষ্ট কোনও মন্ত্র কোনও যজ্ঞে ব্যবহৃত, অন্য মন্ত্র অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইতে পারে। যজুর্ব্বেদের সঙ্কলনপ্রণালী অন্যরূপ, ইহাতে ঋষি বা দেবতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। কোন এক যজ্ঞে ব্যবহৃত সমুদয় মন্ত্র একই অধ্যায়ে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যথা, বাজসনেয়িসংহিতায় প্রথম

অধ্যায়ের সমুদয় মন্ত্রগুলি দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রযোজ্য। চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ের সমুদয় মন্ত্র অগ্নিষ্টোম যাগে প্রযোজ্য ইত্যাদি।

বাজসনেয়িসংহিতা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ হইতে ১৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলির প্রয়োগস্থল যথাক্রমে দর্শপূর্ণমাস যাগ, পিতৃযজ্ঞ অধ্যায়ের অগ্নিহোত্র, অগ্ন্যুপস্থান, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও রাজসূয়। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম নয় অধ্যায়ে (?) এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার সম্পূর্ণ গ্রন্থে এই সকল মন্ত্র ও তদনুযায়ী ব্রাহ্মণ, উভয়ই আছে। বাজসনেয়িসংহিতার অবশিষ্টাংশে সৌত্রামণি, অশ্বমেধাদি যাগের মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়টি কর্ম্মকাণ্ডগত নহে, উহা বিখ্যাত ঈশোপনিষৎ। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশে এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগবিধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতামধ্যে এই সকল কর্ম্মের স্থান নাই, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণমধ্যে উহাদের স্থান।

ফলে, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এই দুই নাম ঠিক সার্থক নহে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় জড়াইয়া এক গ্রন্থ, তাহার প্রথমাংশ তৈত্তিরীয় সংহিতা, অপরাংশ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। বাজসনেয়িসংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ দুইখানি পৃথক্ গ্রন্থ, মন্ত্রাংশের নাম বাজসনেয়িসংহিতা ও ব্রাহ্মণাংশের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ।

যজুর্ব্বেদসংহিতায় যজুর্মন্ত্র ও ঋক্‌মন্ত্র, উভয়ই আছে। ঋক্‌মন্ত্রগুলির প্রায় ৭০০ ঋগ্বেদসংহিতামধ্যেও পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি নূতন।

সামবেদসংহিতার অর্থ কি? যে সকল ঋক্‌মন্ত্র যজ্ঞকার্য্যে—মুখ্যতঃ সোমযাগে গানার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাই সংগৃহীত করিয়া এই সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল ঋকের অধিকাংশই ঋগ্বেদসংহিতাতেও বর্ত্তমান; কেবল ৭৫টি ঋক্ নূতন।

১০। যজ্ঞ

[গত বৈশাখ হইতে আশ্বিন-সংখ্যা পর্য্যন্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত বেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে বেদপন্থী সমাজের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান যজ্ঞের বিবরণ আরম্ভ হইল। এগুলি গ্রন্থান্তরে* বিশদ ভাবে আলোচিত হইলেও

* 'যজ্ঞ-কথা'—'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক নূতন কথা রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। যাঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা ৺ ত্রিবেদী মহাশয়ের 'যজ্ঞ-কথা' পাঠ করিবেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েক স্থানে দুই একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদগ্রন্থ হইতে যথাস্থানে তাহাদের টীকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী]

যজ্ঞ আর্য্য জাতির অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আর্য্য জাতির ইতিহাসে কোন্ সময়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ হইবে না। আর্য্য জাতির সমুদয় শাখা যখন একত্র ছিলেন, তখন যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পারসীকগণ হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বিচ্ছিন্ন হন নাই, তখনও অনুষ্ঠানবহুল সোমযাগের প্রচলন ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এমন কি, আমরা সোমযাগ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু পারসীকেরা এখনও উহা পরিত্যাগ করেন নাই।

এখন যাহাই হউক, বৈদিক যুগে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। বেদপন্থী গৃহস্থের জীবনের আরম্ভে যজ্ঞ, মধ্যে যজ্ঞ, অন্তে যজ্ঞ। মাণবক যখন ব্রহ্মচারীতে পরিণত হইয়া আচার্য্যের গৃহে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তখন আচার্য্যের অগ্নিতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তাঁহাকে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া হোম করিতে হইত। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজের জন্য অগ্নি স্থাপন করিতেন, এবং সমাবর্ত্তনের পর এই স্বকীয় অগ্নিতে লাজহোমাদি করিয়া পত্নী গ্রহণ করিতেন। অতঃপর তাঁহাকে এই অগ্নি সযত্নে রক্ষা করিতে হইত। যত দিন গৃহস্থাশ্রম করিতেন, তত দিন ইহা সযত্নে রক্ষা করিতেন। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত্ত অগ্নি। এই অগ্নিতে গৃহ্যসূত্রোক্ত পাকযজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এই গৃহ্য অগ্নি ব্যতীত শ্রৌত সূত্রোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য অপর অগ্নি স্থাপন করিতে হইত। সপত্নীক যজমান ঋত্বিকের সাহায্যে শুভ দিনে গৃহসংলগ্ন অগ্ন্যাগারমধ্যে এই নূতন অগ্নি স্থাপন করিতেন। অগ্নিরক্ষার জন্য দুইটি আগার নির্ম্মিত হইত। একটিতে আহবনীয়নামক অগ্নি ও যজ্ঞবেদী থাকিত; অপরটিতে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি রক্ষিত হইত। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়,

এই তিন অগ্নি শ্রৌত অগ্নি বা বৈতানিক অগ্নি। প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্র এই বৈতানিক অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হইত। তদ্ভিন্ন দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্যাদি প্রতিবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মও এই তিন অগ্নিতে নিষ্পাদিত হইত। এই বৈতানিক-অগ্নি হইতেই অগ্নি গ্রহণ করিয়া দূরে—দেবযজনভূমিতে লইয়া গিয়া অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইত।

যাজ্ঞিকমতে দ্রব্য, দেবতা ও ত্যাগ, এই তিন লইয়া যজ্ঞ। চরু, পুরোডাশ, সোম প্রভৃতি যাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গ হয়, তাহা দ্রব্য। অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁহাদের উদ্দেশে দ্রব্যের উৎসর্গ হয়, তাঁহারা দেবতা। আর দেবোদ্দেশে দ্রব্য উৎসর্গের নাম ত্যাগ। ত্যাগকালে অগ্নিতে দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম হোম বা আহুতি।

যজতি ও জুহোতি ভেদে যাগ দ্বিবিধ। যাহার পূর্ব্বে অনুবাক্যা[১] ও যাজ্যামন্ত্র[২] পঠিত হয়, যাজ্যামন্ত্র পাঠের পর হোতা বৌষট্ শব্দ উচ্চারণ করেন ও তৎকালে অধ্বর্য্যু দাঁড়াইয়া আহবনীয় অগ্নিতে দ্রব্য ত্যাগ করেন, তাহার নাম যজতি যাগ। আর যেখানে অধ্বর্য্যু উপবিষ্ট থাকিয়া, স্বাহাকারান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্রব্য প্রক্ষেপ করেন, তাহার নাম জুহোতি হোম। যজ্ঞের মধ্যে কাম্য ও নিত্য ভেদ আছে। ফলেচ্ছা করিলে কাম্য কর্ম্ম করিবে; উহা না করিলে দোষ নাই, কিন্তু করিতে হইলে উহার সমুদয় অঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা ফল হইবে না। নিত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, দাক্ষায়ণ, আগ্রায়ণ, পশুবন্ধ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি কতিপয় যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে। গৃহদাহ, কর্ম্মাঙ্গ বিনাশ ইত্যাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে সকল নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাও

১ "অনুবাক্যা।—ইষ্টিযজ্ঞাদির অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান যাগে অধ্বর্য্যু আহুতি দিবার সময় হোতা যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন; যাজ্যাপাঠের পূর্ব্বে উদ্দিষ্ট দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য হোতা (অথবা স্থলবিশেষে তাঁহার সহকারী) মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যামন্ত্র পাঠ করেন।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পরিশিষ্ট, 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।

২ "যাজ্যা—যাগের পূর্ব্বে হোতা (বা তাঁহার সহকারী) কর্ত্তৃক উচ্চারিত যাগমন্ত্র—'যে যজামহে' এই আগূঃ উচ্চারণ করিয়া, পরে নির্দ্দিষ্ট যাজ্যামন্ত্র পঠিত হয়।"—ঐ ব্রাঃ, ২য় পরিশিষ্ট, 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অশক্ত পক্ষে অঙ্গহানি হইলেও ক্ষতি নাই।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও প্রৈষ, এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্র আছে। অধিকাংশ কর্ম্মই সমন্ত্রক অনুষ্ঠেয়। দুই এক স্থলে বিশেষ বিধি আছে, সেখানে বিনা মন্ত্রেই কর্ম্ম হয়। যজুর্মন্ত্র উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে পাঠ্য। প্রৈষমন্ত্র যজুর্ব্বেদবিহিত হইলেও উচ্চ স্বরে পাঠ্য। ঋকৃমন্ত্র বিশেষ বিধি না থাকিলে উচ্চস্বরে পাঠ্য। সাম উচ্চস্বরে গেয়।

সূত্রকারেরা অনুষ্ঠেয় যজ্ঞগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ। পাকযজ্ঞ স্মার্ত্ত অগ্নিতে এবং হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ শ্রৌত অগ্নিতে নিষ্পন্ন হইত। প্রাত্যহিক প্রাতর্হোম ও সায়ংহোম, বৈশ্বদেব, শ্রবণাকর্ম্ম, অষ্টকাকর্ম্ম প্রভৃতি পাকযজ্ঞের অন্তর্গত। গৃহ্যসূত্রমধ্যে এই সকল পাকযজ্ঞের বিধান আছে, ভিন্ন ভিন্ন বেদাধ্যায়ীর পক্ষে বিধানেও প্রভেদ দেখা যায়। হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ, যাহা বৈতানিক শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদিত হইত, শ্রৌতসূত্রে তাহা বিহিত হইয়াছে। এই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে একাধিক ঋত্বিকের সাহায্য প্রয়োজন হইত। কোন ঋত্বিক্ ঋগ্বেদোক্ত, কেহ বা যজুর্ব্বেদোক্ত, কেহ বা সামবেদোক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঋগ্বেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম বহ্বৃচ-ব্রাহ্মণে, যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম আধ্বর্য্যব ব্রাহ্মণে ও সামবেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম ছন্দোগব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। তত্তৎব্রাহ্মণের অনুযায়ী শ্রৌত-সূত্রে তত্তৎঋত্বিকের কর্ত্তব্য বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের এইরূপ শ্রেণিবিভাগ হয়।

পাকযজ্ঞ, যথা—প্রাতর্হোম, সায়ংহোম, স্থালীপাক, নবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, পিতৃযজ্ঞ, অষ্টকা।

হবির্যজ্ঞ, যথা—অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ।

সোমযজ্ঞ, যথা—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম।

এই সকল যজ্ঞের কোন কোনটি প্রকৃতিযজ্ঞ[৩]। প্রকৃতিযজ্ঞের

৩। "প্রকৃতি—যে যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ শ্রুতিদ্বারা উপদিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রকৃতি।"—ঐ ব্রাঃ, পাদটীকা, 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

আবার বহুবিধ বিকৃতি[৪] আছে। যথা, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ—যাহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইত, উহা সমুদয় ইষ্টিযাগের প্রকৃতি। ইষ্টিযাগের মধ্যে যাহা প্রধান যাগ ও যে সকল যাগাঙ্গ, তাহা সমুদয়ই দর্শপূর্ণমাসে বিহিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাসের পদ্ধতি জানিলে সমুদয় ইষ্টিযাগেরই পদ্ধতি স্থূলতঃ জানা যায়। অন্যান্য ইষ্টিযাগ (পুত্রেষ্টি, প্রজাপত্যেষ্টি, পবিত্রেষ্টি, আয়ুষ্কালেষ্টি ইত্যাদি) দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। অর্থাৎ অন্যান্য ইষ্টিযাগে কতিপয় বিশেষ বিধি আছে মাত্র। সেইরূপ অগ্নিষ্টোম সমুদয় সোমযাগের প্রকৃতি।

অগ্নিষ্টোমেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ষোড়শী, অতিরাত্র প্রভৃতি সোমযাগ। নিরূঢ়পশুবন্ধনামা পশুযাগসমুদয় পশুযাগের প্রকৃতি। অগ্নিষ্টোমের পূর্ব্বে অগ্নীষোমীয় পশুযাগ ও পরে অনুবন্ধ্য পশুযাগ বিহিত আছে। এই দুই পশুযাগ ব্যতীত অগ্নিষ্টোম সম্পূর্ণ হয় না। এই সকল পশুযাগ নিরূঢ়পশুবন্ধের বিকৃতি।

১০। (ক) স্মার্ত্ত কর্ম্ম

পাকযজ্ঞ*

কয়েকটি পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিবৃত করা যাইতেছে। প্রাতর্হোম ও সায়ংহোম :—

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহ্য অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। এই অগ্নিতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম কর্ত্তব্য। অগ্নিস্থাপনের দিন অবধি যাবজ্জীবন এই হোম কর্ত্তব্য। হোম স্বয়ং করিবে অথবা প্রতিনিধিস্বরূপে পত্নীও করিতে পারেন। সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে অগ্নি

৪। "বিকৃতি—যে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্র প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তাহা বিকৃতি।"—ঐ ব্রাঃ, পাদটীকা, 'রামেন্দ্র রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

* "আশ্বলায়নমতে হুত, প্রহুত ও আহুত, এই তিনটি পাকযজ্ঞ। অন্য সূত্রকারের মতে হুত, প্রহুত, আহুত, শূলগব, বলিহরণ, প্রত্যবরোহণ, অষ্টকাহোম, এই সাতটি পাকযজ্ঞ। মতান্তরে শ্রবণাকর্ম্ম, সর্পবলি, আশ্বযুজী, আগ্রায়ণ, প্রত্যবরোহণ, পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞ ও অন্বষ্টকা, এই কয়টি পাকযজ্ঞ। পাকযজ্ঞে গৃহস্থ আপনার স্মার্ত্ত অগ্নিতে হোম করেন।"—ঐ ব্রাঃ, পাদটীকা, ঐ, পৃঃ ২২৯।

সন্দীপিত করিয়া উদয়কালীন হোম ও অস্ত হইবার পূর্ব্বে সন্দীপিত করিয়া, অস্ত হইলে, সায়ংকালীন হোম কর্ত্তব্য। আচমনের পর অদিতি, অনুমতি, সরস্বতী, এই তিন দেবতার অনুমতি লইয়া অগ্নির পার্শ্বে জল-সেচন করিয়া প্রাতর্হোমে "সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্রে ও সায়ংহোমে "অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ পক্বান্ন বা আমান্ন আহুতি দিবে ও হোমের পর অগ্নিতে একটি সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলসেক করিবে। তৎপরে অগ্নিকে প্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমণ করিবে।

স্থালীপাক—অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় স্থালীতে চরু পাক করিয়া অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে দিতে হয় [আহিতাগ্নির পক্ষে বিশেষ বিধান আছে]। গৃহস্থ স্বয়ং হোতা হইবেন, কেবল একজন ঋত্বিক্ বরণ করিতে হয়, তিনি ব্রহ্মা।

নবযজ্ঞ—নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে সেই শস্যে পায়স চরু পাক করিয়া ইন্দ্রাগ্নির উদ্দেশে হোম করিবে। প্রধানাহুতির পর চারিটি আজ্যাহুতি বিধেয়। হবিঃশেষ চরু কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবে।

বৈশ্বদেব হোম—প্রস্তুত পক্বান্ন ব্যঞ্জন সমেত হাতে লইয়া প্রজাপতি ও স্বিষ্টকৃৎ দেবতার উদ্দেশে দুইটি আহুতি বিনা মন্ত্রে গৃহ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে, ইহাই বৈশ্বদেব হোম বা দেবযজ্ঞ।

(পিণ্ড)পিতৃযজ্ঞ—ইহা শ্রৌত কর্ম্ম, অনাহিতাগ্নি ইহা পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর প্রতি অমাবস্যায় গৃহ্যাগ্নিতে সম্পন্ন করিবেন। ইহাতে একটি মাত্র পিণ্ড দিতে হয়।

অষ্টকা—পুষ্টিকামনায় রাত্রিকালে কর্ত্তব্য। কাহারও মতে তিনটি, কাহারও মতে চারিটি কর্ত্তব্য। অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমার পর অষ্টমীতে চরু এবং অপূপ প্রস্তুত করিয়া "অষ্টকায়ৈ স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। পৌষ-পূর্ণিমার পর অষ্টমীতে মাংসাষ্টকা কর্ত্তব্য। গাভী হত্যা করিয়া প্রথমে তাহার বপাহোম (উদরস্থিত মেদ দ্বারা হোম), পরে মাংস ও অন্ন মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা হোম।

মাংসাষ্টকার পরদিনে বা তৎপরদিনে পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, সমাংস অন্নে হোম করিয়া পিণ্ডদান দ্বারা অন্বষ্টক্য কর্ম্ম করিতে হয়। পিণ্ডদানের রীতি শ্রাদ্ধের অনুরূপ। পিণ্ডদানান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন।

মাঘী পূর্ণিমার পর অষ্টমীতে শাকাষ্টকা কর্ত্তব্য। এখানে শাক সমেত অন্ন আহুতি দিতে হয়।

ভূতযজ্ঞ—বৈশ্বদেব হোমের পর পশুপক্ষ্যাদির উদ্দেশে, পৃথিবী বায়ু বিশ্বদেবগণ ও প্রজাপতি, এই দেবতাদের উদ্দেশে, পরে অপ্ দেবতার, ওষধি-বনস্পতিগণের ও আকাশের উদ্দেশে, কামদেবতা ও মন্যু দেবতার উদ্দেশে ও পরিশেষে পিতৃগণের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্নবলি স্থাপন করিবে। যে কোন অন্নে এই বলিকর্ম হইতে পারে। গৃহস্বামী এই বলিকর্ম্ম করিলে পরিবারস্থ অন্য ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হয় না।

শ্রবণাকর্ম্ম—শ্রাবণের পূর্ণিমায় অগ্নিস্থালীর অগ্নি বাহিরে আনিয়া অগ্নির পার্শ্বে সর্পরাজের উদ্দেশে ছাতু বলি রাখিবে ও অবশিষ্ট ছাতু অগ্নিতে ফেলিবে ও প্রদোষে শালাস্থ অগ্নিতে শ্রবণ, বিষ্ণু, প্রজাপতি ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে চরুহোম করিবে। তৎপরে অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়ংহোমের পূর্ব্বে বিনা মন্ত্রে ছাতু বলি দিবে।

আশ্বযুজী—আশ্বিনের পূর্ণিমায় রুদ্রদেবতার উদ্দেশে পায়সচরু পাক করিয়া অগ্নিতে দুইটি আহুতি দিবে এবং কাম্যা, চন্দ্রা ইত্যাদি একাদশটি গোনাম লইয়া একাদশটি আহুতি দিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ—প্রাতর্হোমের পর ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন বিহিত। বেদাধ্যয়ন প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য পাকযজ্ঞের অন্তর্গত।

১০। (খ) শ্রৌত কর্ম্ম

হবির্যজ্ঞ

ক। অগ্ন্যাধান

হবির্যজ্ঞ সমুদয় পাকযজ্ঞ অপেক্ষা জটিল।

হবির্যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। পত্নী-গ্রহণের পর সপত্নীক গৃহস্থ এই অগ্নি স্থাপন করেন। এই ক্রিয়ার নাম অগ্ন্যাধেয় বা অগ্ন্যাধান। অগ্ন্যাধান কর্ম্মটিই অন্যতম হবির্যজ্ঞমধ্যে গণ্য। পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় অগ্ন্যাধান প্রশস্ত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য তিথিতেও অগ্ন্যাধান হইতে পারে।

এই অগ্ন্যাধানকর্ম্মে চারি জন ঋত্বিক্ আবশ্যক। ব্রহ্মা (চতুর্ব্বেদী), হোতা (ঋগ্বেদী), অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী), এক আগ্নীধ্র বা অগ্নীৎ (ব্রহ্মার সহকারী)। ঋত্বিক্ বরণের পর যজমান (যাগকর্ত্তা) প্রথমে অগ্ন্যাগার দুইটি নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে রেখা টানিয়া, সেই রেখার পূর্ব্বাংশে আহবনীয় ও পশ্চিমাংশে গার্হপত্য অগ্নির স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। উভয়ের মধ্যে বেদী নির্ম্মিত হয়। বেদী ও গার্হপত্যের মধ্যে যে স্থান তাহার দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নির স্থান করিতে হয়। গার্হপত্যের স্থান, সমচতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধ-বৃত্তাকার। তিন স্থানেরই বর্গফল সমান—এক অরত্নি (হাত) দীর্ঘ, এক অরত্নি প্রশস্ত ক্ষেত্রের সমান। অগ্নিত্রয়ের জন্য দুইটি গৃহনির্ম্মাণ আবশ্যক। গার্হপত্য গৃহে গার্হপত্য অগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি থাকে। অন্য গৃহে আহবনীয় অগ্নি ও বেদী থাকে। গার্হপত্যাগারের দক্ষিণে ও আহবনীয়াগারের পূর্ব্বে প্রবেশদ্বার থাকে। উভয় গৃহে যাতায়াতের জন্যও পরস্পর সম্মুখে দ্বার থাকে (গার্হপত্যগৃহের পূর্ব্বে ও আহবনীয়-গৃহের পশ্চিমে)।

অগ্ন্যাধানকর্ম্মের পূর্ব্বদিন যজমান কেশশ্মশ্রু-বপন, দেহশুদ্ধ্যর্থ প্রায়শ্চিত্ত, মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্যু বিহিত স্থান হইতে অথবা পাকশালা হইতে অগ্নি আনিয়া গার্হপত্য-ঘরে রাখিয়া দেন। সায়ংকালে যজমান আহবনীয়ের পূর্ব্বদ্বার দিয়া গার্হপত্যাগারে প্রবেশ করেন ও তাঁহার পত্নী গার্হপত্যাগারের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া উত্তরে পূর্ব্বমুখ হইয়া গার্হপ[illegible] পার্শ্বে বসেন। অধ্বর্য্যু তাঁহাদের হস্তে অরণিদ্বয় অর্পণ করেন। [illegible]র্ভ অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা হইতে দুইখানি অরণি প্রস্তুত হয়। একখানি অরণি যজমান অঙ্কে রাখেন, অন্যখানি পত্নীর অঙ্কে থাকে। অঙ্কস্থ অরণির কুঙ্কুম চন্দনাদি দ্বারা পূজা হয়। পূজার পর অরণিদ্বয় পীঠের উপর রাখা হয়। রাত্রিকালে গার্হপত্যাগারে একটি ছাগ বাঁধিয়া রাখিবার বিধি আছে।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে অধ্বর্য্যু রক্তবর্ণ গোচর্ম্মের উপর তণ্ডুল গ্রহণ করেন; এই তণ্ডুলে গার্হপত্যাগ্নিতে চারিজন ঋত্বিকের ভোজ্যার্থ চাতুষ্প্রাপ্য নামক অন্ন পাক হয়।

অধ্বর্য্যু সেই অগ্নিতে তিনখানি সমিৎ আধান করেন। ঋত্বিকেরা তৎপরে ভোজন করেন। যজমান রাত্রি জাগিয়া অগ্নি জাগাইয়া রাখেন।

প্রত্যূষে অধ্বর্য্যু অগ্নি নিবাইয়া দেন অথবা দক্ষিণাগ্নির জন্য অন্যত্র রাখিয়া দেন। অধ্বর্য্যু গার্হপত্যঘরে পঞ্চভূসংস্কারপূর্ব্বক তিন বার উল্লেখন করিয়া ও অভ্যুক্ষণ করিয়া, পরে ক্ষারমৃত্তিকার ও ইঁদুরের তোলা মাটির প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে এক খণ্ড হিরণ্য ও কতিপয় শর্করা (কাঁকড়) রাখিবেন। ঐরূপ আহবনীয়ঘরেও এবং দক্ষিণাগ্নিঘরেও করিবেন।

উদয়ের পূর্ব্বে বা পরে অরণিদ্বয় দ্বারা অগ্নিমন্থন করিবেন। অগ্নিমন্থনের পূর্ব্বে একটি অশ্ব—অশ্বাভাবে একটি বলীবর্দ্দ আনিয়া রাখিতে হয়। অগ্নীৎ সব আনেন। একখানি অরণি যজমান ধরিয়া থাকেন, অন্য অরণি দ্বারা প্রথমে পত্নী, পরে অধ্বর্য্যু অগ্নি মন্থন করেন। মাটির খাপড়ায় শুষ্ক গোময়চূর্ণ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি ধরা হয় এবং যজমান ফুৎকার দিয়া তাহা জ্বালাইয়া দেন ও মুখমধ্যে অগ্নিশিখার শ্বাস টানেন।

অধ্বর্য্যু যজ্ঞীয় কাষ্ঠে সেই অগ্নি ধরাইয়া প্রথমে সমন্ত্রক গার্হপত্যঘরে রাখেন। ব্রহ্মা রথন্তর সাম গান করেন। আরও কাঠ দিয়া আগুন ভাল করিয়া জ্বালাইয়া সেই অগ্নি খাপড়ায় লইয়া আহবনীয়ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। অশ্বটি আগে আগে যায়, যজমান পশ্চাতে চলেন। ব্রহ্মা বামদেব্য সাম গান করেন। অশ্বের একটি পা আহবনীয়ঘরের মধ্যে রাখা হয়। পরে অশ্বকে ঘুরাইয়া পশ্চিমমুখে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ব্রহ্মা বৃহৎ সাম গান করেন। অশ্বের পায়ে অগ্নি স্পর্শ করাইয়া ঐ অগ্নি আহবনীয়ঘরে রাখা হয়। যজমান অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া কতিপয় মন্ত্র পাঠ করেন। পরে অধ্বর্য্যু গার্হপত্য হইতে পুনরায় জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া দক্ষিণাগ্নিঘরে রাখেন। অগ্নিস্থাপনের পর ব্রহ্মা, শ্যৈত বারবন্তীয় ও যজ্ঞাযজ্ঞিয়, এই তিন সাম গান করেন। তৎপরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বটি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

তদনন্তর পূর্ণাহুতি-হোম। পাত্রান্তর হইতে আজ্যস্থালীতে আজ্য লইয়া গার্হপত্যে তপ্ত করিতে হয়। আজ্য নামাইয়া পবিত্র দ্বারা উৎপূত করিতে হয়।

হোমের জন্য দুইখানি হাতা আবশ্যক। একখানি স্রুব, আর একখানি জুহূ। দুই হাতা কুশ দ্বারা মাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে স্রুবদ্বারা আজ্যস্থালীর আজ্য লইয়া জুহূ পূর্ণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু সেই আজ্যপূর্ণ জুহূ দক্ষিণ হস্তে লন ও দক্ষিণ হস্তে জুহূর নীচে অন্য পাত্র রাখেন,

জুহূর আজ্যবিন্দু যেন সেই পাত্রে পড়ে, ভূমিতে না পড়ে। তৎপরে অধ্বর্য্যু প্রাদেশপ্রমাণ পলাশের সমিৎ লইয়া আহবনীয়ের উত্তরে বসিয়া আহবনীয়ের চতুষ্পার্শ্বে কুশের বেড়া দিয়া আহবনীয়ে সমিৎ ফেলিয়া দেন, পরে দক্ষিণ জানু পাতিয়া বসিয়া স্বাহান্ত মন্ত্রে অগ্নির উদ্দেশে জুহূস্থিত আজ্য হোম করেন। যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন এবং হোম-কালে 'ইদমগ্নয়ে' বলিয়া হোমের ত্যাগমন্ত্র পড়েন। ইহাই পূর্ণাহুতি। তৎপরে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দান।

অগ্ন্যাধানকর্ম্ম এইরূপে সমাপ্ত হইল। অগ্ন্যাধানের পর সপত্নীক যজমান অগ্নিহোত্রী গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া সেই দুগ্ধে যথাবিধি অগ্নিহোত্র হোম করেন। অগ্ন্যাধানের পর বার দিন অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে হয় ও বার দিন পরে তিনটি ইষ্টিযাগ করিবার বিধান আছে। প্রথম ইষ্টিতে অগ্নি পবমানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ, দ্বিতীয়ে অগ্নি পাবক ও অগ্নি শুচির উদ্দেশে ঐরূপ দুইখানি পুরোডাশ এবং তৃতীয় ইষ্টিতে অদিতির উদ্দেশে চরু দান করিতে হয়। কেহ বা কেবল অগ্নির উদ্দেশে একটিমাত্র অষ্টাকপাল পুরোডাশ ও অদিতির উদ্দেশে চরুদান ব্যবস্থা করেন। ইষ্টিযাগের ব্যবস্থা দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগের মতই, কতিপয়ে বিশেষ বিধি মাত্র আছে। ইষ্টিযাগের পর ব্রাহ্মণ ভোজন। অগ্ন্যাধানের পর কয়েক দিন (তিন হইতে বার দিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা) যজমান ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। দুগ্ধদ্বারা অগ্নিহোত্র করিবেন। যাবজ্জীবন মিথ্যা বলিবেন না।

কোন কারণে এই অগ্নি বিনষ্ট হইলে আধানের নিয়মানুসারে পুনরাধানের বিধান আছে। আধানের পর বৎসরমধ্যে যজমানের কীর্ত্তিহানি ইত্যাদি ঘটিলেও পুনরাধান কর্ত্তব্য।

(খ) অগ্নিহোত্র

সপত্নীক গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শ্রৌত অগ্নিতে হোম করিবেন। এই হোমের নাম অগ্নিহোত্র, ইহা নিত্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থ স্বয়ং করিবেন; প্রতিনিধি দ্বারাও হোম চলিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামাতা প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারেন। অধ্বর্য্যু দ্বারাও

হোম সম্পাদন চলিতে পারে। স্বয়ং হোমে যে ফল, প্রতিনিধি দ্বারা হোমে ফল তদপেক্ষা অল্প, শ্রৌত অগ্নিহোত্র হোমের পর স্মার্ত্ত অগ্নিতে হোম করিতে হয়।

সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বে গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীয়ের ও দক্ষিণাগ্নির ঘরে স্থাপন করা হয়। ইহার নাম অগ্নির উদ্ধরণ। তৎপরে সন্ধ্যাবন্দনাদির পর সায়ংহোম, অগ্ন্যাগারে সপত্নীক প্রবেশ করিয়া প্রথমে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নির, কুশের বেড়া দিয়া পরিস্তরণ করিবে, তৎপরে প্রত্যেক অগ্নিকে জলধারায় বেষ্টন করিবে, ইহা পর্য্যুক্ষণ। অগ্নিহোত্রী গাভীকে দোহন করাইয়া মৃণ্ময় স্থালীতে (মালসাতে) দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। ঐ দুগ্ধ গার্হপত্যে তপ্ত করিবে। দুগ্ধে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া স্থালী নামাইবে। হোমের জন্য দুইখানি হাতা দরকার—স্রুব ও অগ্নিহোত্রহবনী। স্রুব দ্বারা স্থালী হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অগ্নিহোত্রহবনীতে ঢালিবে, দুগ্ধ ঢালিবার পূর্ব্বে হাতা দুইখানি গার্হপত্যে তাতাইয়া হাতে মাজিয়া লইতে হয়। দুগ্ধ চারি বারে স্রুব দ্বারা লওয়াই নিয়ম। যজমানবিশেষে পাঁচ বারে লইতে হয়। তৎপরে একখানি পলাশকাষ্ঠের সমিৎ লইয়া আহবনীয়ে সমিদ্‌হোম করিতে হয়। সেই সমিধ জ্বলিয়া উঠিলে অগ্নিহোত্রহবনীর দুগ্ধ দ্বারা আহবনীয়ে হোম করিবে। দুই বার দুগ্ধের আহুতি দিতে হয়। প্রথম আহুতির মন্ত্র—অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ। দ্বিতীয় আহুতি প্রজাপতির উদ্দিষ্ট, উহার মন্ত্র নাই, প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া আহুতি দিতে হয়। সমস্ত দুগ্ধ আহুতি দিবে না; কতকটা দুগ্ধ হবিঃশেষরূপে অগ্নিহোত্রহবনীতেই রাখিয়া দিবে।

আহবনীয়ে হোমের পর গার্হপত্যে ও দক্ষিণাগ্নিতে যথাক্রমে দুগ্ধহোম করিবে। এবার অগ্নিহোত্রহবনী আবশ্যক হয় না, স্রুবদ্বারাই স্থালী হইতে দুগ্ধ লইয়া অগ্নিতে দিবে। গার্হপত্যে প্রথম হোম অগ্নি গৃহপতির উদ্দিষ্ট, দ্বিতীয় হোম সমন্ত্রক প্রজাপতির উদ্দিষ্ট। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথম আহুতি অগ্নি অন্নপতির উদ্দিষ্ট, দ্বিতীয় আহুতি সমন্ত্রক প্রজাপতির উদ্দিষ্ট। প্রত্যেক আহুতিই জ্বলন্ত সমিধের উপর দিতে হয়। হোমের পর অগ্নিহোত্রহবনীতে রক্ষিত হবিঃশেষ দুগ্ধ পান করিতে হইবে। হোমের পর অগ্নিহোত্রহবনীতে জল লইয়া কয়েক বার আহবনীয়ের পার্শ্বে সেচন

করিতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটি সমিৎপ্রক্ষেপ। তৎপরে অগ্নিত্রয়ে উপস্থানাদি* করিয়া অগ্ন্যাগার হইতে বাহিরে আসিতে হয়। নিষ্ক্রমণকালে "নড়ায় নৈষিধায় অন্বাহার্য্যপচনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণাগ্নিকে স্মরণ করিবে।

শ্রৌত অগ্নিতে হোমের পর স্মার্ত্ত অগ্নিতে যে কোন হোম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতর্হোম কর্ত্তব্য। এখানেও গার্হপত্য হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি হোম উদ্ধরণের পর সন্ধ্যাবন্দনাদি। অগ্নিত্রয়ের পর্য্যুক্ষণাদি কর্ম্ম প্রায় সায়ংহোমবৎ। অগ্নিহোত্রহবনীদ্বারা আহবনীয়ে প্রথম আহুতির মন্ত্র—"সূর্য্যো জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ।" এই আহুতি সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় আহুতি প্রজাপতির উদ্দিষ্ট। গার্হপত্যে ও দক্ষিণাগ্নিতে হোমও প্রায় পূর্ব্ববৎ। বাহির হইবার সময় পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্নির ধ্যান। শ্রৌত অগ্নিতে হোমের পর স্মার্ত্ত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। যেখানে অগ্নিত্রয়ের ভস্মরাশি স্তূপীকৃত থাকে, সেখানে গিয়া একবার প্রণাম করিয়া আসিতে হয়।

(গ) ইষ্টিযাগ

(দর্শপূর্ণমাস, আগ্রায়ণ, দাক্ষায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য)

অগ্ন্যাধানের পর গৃহীকে কতকগুলি যাগ করিতে হয়। এই সকল যাগ তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে। তদ্ভিন্ন কাম্য যাগও আছে, তাহা ইচ্ছাধীন। এই সমস্ত যাগ স্থূলতঃ ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ, এই তিন শ্রেণীতে ফেলা চলিতে পারে। সপত্নীক যজমান যাগাধিকারী; তিনিই ফলভোক্তা। যাগের সম্পাদনে একাধিক ঋত্বিকের প্রয়োজন। তাঁহারা কার্য্যাভিজ্ঞ, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এই সকল যাগ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যাগের অধিকার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তিন বর্ণেরই ছিল; কিন্তু যাজনে অধিকার অর্থাৎ ঋত্বিকের কর্ম্মে অধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ছিল না। ইষ্টিযাগে চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত, পশুযাগে ছয় জনের, সোমযাগে ষোল জনের। যাগের পূর্ব্বে যজমান যথারীতি ঋত্বিক্‌গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বরণ করিতেন। বরণের পর তাঁহারা

* অর্চ্চনাদি।

আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেন। ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে কেহ ঋগ্বেদোক্ত কর্ম্ম করিতেন, কেহ যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্ম করিতেন, কেহ সামবেদোক্ত কর্ম্ম করিতেন; কাজেই তাঁহাদিগকে সেই সেই বেদে বিশেষজ্ঞ হইতে হইত। ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্ সকল কর্ম্মের পরিদর্শক হইতেন, কোন কর্ম্মে দোষ বা ত্রুটি ঘটিলে তাহার সংশোধন করিতেন, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। কাজেই ব্রহ্মাকে ত্রিবেদজ্ঞ হইতে হইত।

ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্রগ্রন্থে যজ্ঞানুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থই ঋত্বিক্‌দের প্রধান অবলম্বন ছিল। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, প্রত্যেক বেদের নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ আছে এবং প্রত্যেক বেদের ব্রাহ্মণ অবলম্বনে শ্রৌত-সূত্র রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে বিধিনিষেধ ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে বিধি-নিষেধের তাৎপর্য্যব্যাখ্যাও রহিয়াছে। শ্রৌতসূত্রে কেবলই নিধিনিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে; উহার তাৎপর্য্য প্রদর্শনের চেষ্টা হয় নাই। কাজেই যজ্ঞের পদ্ধতি জানিবার পক্ষে শ্রৌতসূত্র গ্রন্থই বিশেষ উপযোগী। উহাতে কোন্ অনুষ্ঠানের পর কোন্ অনুষ্ঠান কিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শ্রৌতসূত্রসমুদয় প্রামাণিক হইলেও স্বতঃপ্রমাণ নহে; উহা স্মৃতিমাত্র। উহার প্রামাণিকতা ব্রাহ্মণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ শ্রুতি।

অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক দ্রব্যত্যাগের পূর্ব্বে হোতা দুইটি মন্ত্র পাঠ করিতেন। একটির নাম অনুবাক্যা বা পুরোনুবাক্যা। অপরটির নাম যাজ্যা। যাগের পূর্ব্বে দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য যে বাক্য বা মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাই পুরোনুবাক্যা। ইহা প্রায় ঋক্‌মন্ত্র। যে মন্ত্র উচ্চারণে যাগ হয়, তাহাই যাজ্যা। ইহাও প্রায় ঋক্‌মন্ত্র, কোথাও বা যজুর্মন্ত্র। যাজ্যা-মন্ত্রের পূর্ব্বে "যে যজামহে" এই দুইটি পদ থাকে, উহার পারিভাষিক নাম "আগূঃ"। যাজ্যামন্ত্রের শেষে "বৌষট্" এই পদ উচ্চারণ করিতে হয়—উহার নাম বষট্‌কার। অধ্বর্য্যুর আদেশে হোতা এই দুই মন্ত্র পাঠ করেন; যাজ্যান্তে বষট্‌কার করিবা মাত্র অধ্বর্য্যু অগ্নিতে দ্রব্য নিক্ষেপ করেন। যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া তখন ত্যাগমন্ত্র বলেন।

প্রধান অপ্রধান, সকল যাগের পক্ষেই এই সাধারণ নিয়ম। যাগ, বিষয়ে আরও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম থাকে। আহবনীয় অগ্নির স্থান

পূর্ব্ব দিকে, গার্হপত্যের স্থান পশ্চিম দিকে। উভয়ের মধ্যে বেদি। বেদির উপর কুশ বিছাইয়া তাহাতে যজ্ঞিয় দ্রব্য ও যজ্ঞপাত্রসমুদয় যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে হয়। যজ্ঞপাত্রের মধ্যে দুইখানি লম্বা হাতা থাকে। একখানির নাম জুহূ, আর একখানির নাম উপভৃৎ। জুহূতে করিয়া হোমের দ্রব্য (পুরোডাশ, ঘৃত প্রভৃতি) লইতে হয়। যাগের পূর্ব্বে অধ্বর্য্যু দক্ষিণ হস্তে জুহূ ও বাম হস্তে উপভৃৎ গ্রহণ করিয়া বেদির উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া আহবনীয়াগ্নির দক্ষিণে দাঁড়ান। এই কর্ম্মের নাম অত্যাক্রমণ। অগ্নীৎনামা ঋত্বিক্ একখানি খড়্গাকৃতি দীর্ঘ কাষ্ঠফলক উর্দ্ধাগ্র করিয়া তুলিয়া বেদির উত্তরে দাঁড়াইয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু আহবনীয়ের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া সেই অগ্নীৎকে আদেশ দেন—"ওঁ শ্রাবয়"। অগ্নীৎ তদুত্তরে বলেন, "অস্তু শ্রৌষট্"। এই আদেশের নাম "আশ্রাবণ" ও উত্তর দানের নাম "প্রত্যাশ্রাবণ"। অগ্নীৎ ঐ উত্তর দিলে অধ্বর্য্যু হোতাকে যাজ্যাপাঠে আদেশ দেন। হোতা বেদির উত্তরে বসিয়া প্রথমে অনুবাক্যামন্ত্র, পরে যথারীতি "আগূঃ" উচ্চারণের পর যাজ্যামন্ত্র পাঠ করিয়া বৌষট্ উচ্চারণ করেন। সেই সময় অধ্বর্য্যু দক্ষিণ হস্তস্থিত জুহূ হইতে হোমদ্রব্য আহবনীয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন। যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ত্যাগমন্ত্র বলেন। যাগান্তে অধ্বর্য্যু জুহূ ও উপভৃৎ হস্তেই বেদির উত্তরে ফিরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসার নাম প্রত্যাক্রমণ। প্রধান অপ্রধান যাগমাত্রেরই এই সাধারণ নিয়ম। যখনই অধ্বর্য্যু যাগ করেন, তখনই এইরূপ অত্যাক্রমণের পর আগ্নীধ্রের আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, হোতার অনুবাক্যা ও যাজ্যাপাঠ, তদন্তে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক যাগ এবং প্রত্যাক্রমণ বিহিত। ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিধিদ্বারা এই সাধারণ নিয়মের এক আধটু ব্যতিক্রম হইতে পারে।

দর্শপূর্ণমাস

অগ্ন্যাধানের পর গৃহীকে যাবজ্জীবন অথবা অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর কাল প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগ করিতে হইত। অমাবস্যায় বিহিত ইষ্টির নাম দর্শেষ্টি, পূর্ণিমায় বিহিত ইষ্টি পূর্ণমাসেষ্টি। এই পূর্ণমাসেষ্টিকে যাবতীয় ইষ্টিযাগের প্রকৃতি বলিয়া ধরা যায়। ইষ্টিযাগমাত্রেরই বিধানাদি পূর্ণমাসেষ্টিরই মত, কেবল দুই দশটা বিশেষ বিধি আছে মাত্র।

কাজেই পূর্ণমাসেষ্টির বিধিবিধান কিরূপ, তাহা জানা থাকিলে অন্যান্য সমুদয় ইষ্টির বিধান স্থূলভাবে জানা যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দর্শপূর্ণমাসের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য সোমযাগ। সমুদয় সোমযাগ অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি। অগ্নিষ্টোমের বিবরণেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আরম্ভ এবং এই ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নিষ্টোমের অঙ্গস্বরূপ অনেকগুলি ইষ্টিযাগ আছে, যথা—দীক্ষণীয়েষ্টি, প্রায়ণীয়েষ্টি, আতিথ্যেষ্টি, উপসদিষ্টি, উদয়নীয়েষ্টি। এই সমুদয় ইষ্টিযাগ পূর্ণমাসেরই বিকৃতি। কাজেই পূর্ণমাসেষ্টির জ্ঞান থাকিলে ঐ সকলের স্থূল জ্ঞান থাকিবে। তদ্ব্যতীত অগ্নিষ্টোমের অঙ্গস্বরূপ পশুযাগ বিহিত। এই পশুযাগের অনেক অনুষ্ঠান ইষ্টিযাগের অনুরূপ। এই জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সমুদয় ইষ্টির প্রকৃতিস্বরূপ পূর্ণমাসেষ্টির একটু সূক্ষ্ম বিবরণ জানা আবশ্যক। পূর্ণিমাকৃত্য পূর্ণমাসেষ্টি জানা থাকিলে অমাবস্যায় বিহিত দর্শেষ্টিরও বিবরণ জানা হইল। উভয় যাগের অঙ্গ একরূপ, কেবল প্রধান যাগে কিছু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কি, পরে বলা যাইবে। এখন পূর্ণমাসেষ্টির বিবরণ দেওয়া যাক।

পূর্ণমাস যাগ প্রতি পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইত। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমায় বা পূর্ণিমাযুক্ত প্রতিপদে অনুষ্ঠান হইবে, সে বিষয়ে শাখাভেদে মতভেদ আছে। যজমানের অগ্ন্যাগারেই ইহা অনুষ্ঠিত হইত। শ্রৌত অগ্নি তিনটিই অর্থাৎ আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি, তিন অগ্নিই আবশ্যক হইত। ঋত্বিক্ চারি জনের অধিক আবশ্যক হইত না—ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা ও অগ্নীৎ। ইহার মধ্যে অধ্বর্য্যু মুখ্যতঃ যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্ম করিতেন, ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ এবং অগ্নীৎ বা আগ্নীধ্র ব্রহ্মার সহকারী।

পূর্ণমাস যজ্ঞে প্রধান যাগ দুইটি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাগ ও হোম প্রধান যাগের অঙ্গ মাত্র। প্রধান যাগের দ্রব্য দুইখানি পুরোডাশ। পুরোডাশ অর্থে চাউলের রুটি—কতকটা সরুচাকলির মত। একখানি অষ্টাকপাল অর্থাৎ আটখানি ছোট ছোট মাটির খোলা তপ্ত করিয়া তাহার উপরে প্রস্তুত। আর একখানি একাদশকপাল অর্থাৎ এগারখানি খোলায় প্রস্তুত। অষ্টাকপাল পুরোডাশখানি অগ্নির উদ্দিষ্ট; একাদশকপাল পুরোডাশখানি অগ্নি ও সোম, এই উভয় দেবতার উদ্দিষ্ট। কাজেই

পূর্ণমাসযজ্ঞের প্রধান দেবতা (১) অগ্নি এবং (২) অগ্নি ও সোম। আহবনীয়নামক অগ্নিতে এই পুরোডাশদ্বয়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হইত। অগ্নিতে অর্পণ করিলেই দেবতা তাহা খাইতেন। কেন না, অগ্নি হব্যবাহ—হব্য অর্থাৎ যে দ্রব্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যায় অগ্নিই তাহা বহন করিয়া সেই দেবতার নিকট লইয়া যান। দেবতারা অগ্নিরূপ মুখে ভোজন করেন। পুরোডাশের সমস্তটা অগ্নিতে অর্পিত হইত না; কিয়দংশ রক্ষিত হইত, উহা হবিঃশেষ। যজমান ও ঋত্বিকেরা উহা যাগান্তে ভক্ষণ করিতেন। হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। যে হবিঃশেষ ভক্ষণার্থ রক্ষিত হইত, তাহার নাম ইড়া।

যজমান স্বহস্তে দ্রব্যত্যাগ ও অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতেন না; উহা অধ্বর্য্যুর কার্য্য ছিল। ত্যাগকালে যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন মাত্র এবং আহুতি দানের পর বলিতেন—ইহা অমুক দেবতার উদ্দিষ্ট—আমার নহে। যথা, অগ্নির উদ্দিষ্ট পুরোডাশ আহুতির পর যজমান বলিতেন—"ইদং অগ্নয়ে, ন মম"—ইহার নাম ত্যাগমন্ত্র। প্রধান বা অপ্রধান যাগমাত্রেই যজমানকে এই ত্যাগমন্ত্র বলিতে হইত।

যাগের সাধারণ নিয়ম বলা গেল। এখন পূর্ণমাস ইষ্টির একটা বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাক।

পূর্ণমাস ইষ্টিতে যাগের পূর্ব্বদিনে অগ্ন্যাধান ও ব্রতনামক ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে অধ্বর্য্যু অথবা যজমান গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়, এই তিন অগ্নিতে তিন তিনখানি সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া রাখেন। এই সমিদাধানকর্ম্ম আগামী দিবসে কর্ত্তব্য যাগকর্ম্মের অনুকূল। এতদ্দ্বারা যেন পরদিনের কর্ম্মে প্রস্তুত হইবার জন্য অগ্নিত্রয়কে আমন্ত্রণ করা হয়। যাগের অনুকূল আধান বলিয়া কর্ম্মের নাম অনু আধান বা অন্বাধান। অপরাহ্ণে যজমান কেশ শ্মশ্রু বপন করিয়া স্নানান্তে কিছু খাইয়া লন ও তৎপরে আহবনীয়ের পশ্চিমে দাঁড়াইয়া সত্যবচনাদি কতিপয় নিয়ম পালন করিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করেন। রাত্রিতে ক্ষুধা হইলে কিছু খাইতে পারেন। সপত্নীক যজমান অগ্ন্যাগারেই শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন।

পরদিন প্রাতে অগ্নিহোত্র সমাপনান্তে যাগ। যজমানের প্রধান কার্য্য ব্রহ্মার বরণ। বরণের পর ব্রহ্মা আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করেন

ও সেখান হইতে সমুদয় পরিদর্শন করেন। তাঁহার পাশে যজমানের আসন থাকে। আহবনীয়ের উত্তরে অধ্বর্য্যুর আসন। ব্রহ্মাবরণের পর প্রণীতাপ্রণয়ন। প্রণয়ন শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিকে নয়ন বা লইয়া যাওয়া। খানিক জল গার্হপত্যের উত্তর হইতে পূর্ব্বমুখে লইয়া গিয়া আহবনীয়ের উত্তরে রক্ষিত হয়। এই জলের নাম প্রণীতা—সংস্কৃত অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উহার বিশেষণও আকারান্ত। ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া অধ্বর্য্যু প্রণীতার প্রণয়ন করেন ও দর্ভদ্বারা ঐ জল ঢাকিয়া রাখেন। ঐ জল ও আহবনীয় অগ্নির মধ্য দিয়া যাতায়াত নিষিদ্ধ।

যজ্ঞকর্ম্মে অনেকগুলি সরঞ্জাম আবশ্যক। সেগুলি আগে হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়। কতকগুলি সরঞ্জামের নাম করা আবশ্যক।

(১) যজ্ঞিয় কাষ্ঠের ছোট ছোট টুকরা—নাম সমিৎ।

এক আঁটি সমিৎ কাটিয়া রাখিতে হয়। কয়েকখানি আহবনীয় অগ্নিকে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য, উহার নাম পরিধি। কয়েকখানি আহবনীয় অগ্নি জ্বালাইবার জন্য বা প্রদীপ্ত করিবার জন্য থাকে।

(২) এক আঁটি* কুশের গোছা আবশ্যক। উহার নাম বর্হিঃ।

এই কুশ বেদির উপর বিছাইয়া, তাহার উপর হোমের হাতাগুলি ও হোমদ্রব্য রক্ষিত হয়। এক আঁটি কুশ পৃথক্ থাকে, উহার নাম প্রস্তর। হোমের প্রধান হাতাখানির নাম জুহূ। বেদির উপর প্রস্তর, তাহার উপর জুহূ থাকে।

(৩) হোমের জন্য আজ্যস্থালী ব্যতীত স্রুব, ধ্রুবা, জুহূ, উপভৃৎ, এই কয়খানি হাতা আবশ্যক। আজ্যস্থালীতে আজ্য বা ঘৃত থাকে, উহা মাটির মালসা। ধ্রুবা, জুহূ, উপভৃৎ ও স্রুব, এই চারিখানি কাঠের হাতা, অন্য হাতার মত ইহার দীর্ঘ দণ্ড থাকে ও মাথায় গর্ত্ত থাকে। প্রধান হাতা জুহূ—উহাতে হোমদ্রব্য রাখিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু উহা দক্ষিণ হস্তে লন। উপভৃৎ আর একখানি হাতা, উহা অধ্বর্য্যু বাম হস্তে লন। জুহূর নীচে উপভৃৎ ধরা হয়; উদ্দেশ্য—কোন দ্রব্য জুহূ হইতে ক্ষরিত হইলে যেন উপভৃতেই পড়ে, ভূমিতে না পড়ে। ধ্রুবা

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তিন আঁটি। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রমতে দুই আঁটি।

আর একখানি হাতা, আজ্যস্থালী হইতে আজ্য লইয়া উহাতে রাখিতে হয় এবং যাগের পূর্ব্বে উহা হইতেই আজ্য লইয়া জুহূতে দিতে হয়। স্রুব আর একখানি হাতা। আজ্যস্থালী হইতে ধ্রুবায় বা ধ্রুবা হইতে জুহূতে ঘি ঢালিবার জন্য উহার ব্যবহার। যাগকালে জুহূ ও উপভৃৎ অধ্বর্য্যুর হাতে থাকে। ধ্রুবা কখনও হাতে লইতে হয় না। উহা বেদির উপর নিশ্চল থাকে—এই জন্য উহার নাম ধ্রুবা।

(৪) অন্যান্য সরঞ্জাম, যথা—সূর্প (ধান ঝাড়িবার জন্য কুলা), অগ্নিহোত্রহবনী (ইহাও একখানা হাতা, গাড়ি হইতে ধান নামাইবার সময় ইহার ব্যবহার,—প্রোক্ষণার্থ জলও ইহাতে রাখিতে হয়), উদূখল ও মুষল (ধান কাঁড়িয়া চাউল বাহির করিবার জন্য), দৃষৎ ও উপল (শিল ও নোড়া—চাউল পিষিবার জন্য), শম্যা (কাষ্ঠখণ্ড—চাউল পিষিবার সময় দৃষতের নীচে রাখিলে দৃষৎ ঢালু হয়), কৃষ্ণাজিন (চাউল কাঁড়িবার সময় উদূখলের নীচে ও পিষিবার সময় দৃষতের নীচে পাতিতে হয়)।

প্রণীতাপ্রণয়নের পর অধ্বর্য্যু এই সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া রাখিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করেন। পূর্ণমাস ইষ্টিতে দুইখানি পুরোডাশ আবশ্যক। তদুপযুক্ত ধান লইয়া উদূখলে কাঁড়িয়া সূর্পে ঝাড়িয়া দৃষতে পিষিতে হয়। গরম জল মাখাইয়া চাউলের দুইটি পিণ্ড পাকাইতে হয়। ছোট ছোট মাটির খোলার নাম কপাল। পুরোডাশ তৈয়ার করিবার জন্য গার্হপত্যের ভিতরের অঙ্গার এক দিকে সরাইয়া ফেলিয়া তপ্ত ভূমিতে খোলাগুলি সাজাইতে হয়।

এক একখানি খোলা দুই আঙ্গুল মাত্র চওড়া। খানকতক খোলা মাঝে রাখিয়া তাহার চারি ধারে অন্য খোলা সাজাইতে হয়, মাঝে যেন ফাঁক না থাকে। মাঝের খোলা চতুষ্কোণ ও বাহিরের খোলা ঘষিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার করিয়া লইলে খোলার সমষ্টি দেখিতে বৃত্তাকার হইবে। অগ্নির উদ্দিষ্ট পুরোডাশের জন্য আটখানি ও অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পুরোডাশের জন্য এগারখানি খোলা এইরূপে সাজাইতে হইবে। গার্হপত্যের অঙ্গারে খোলা তাতাইয়া তাহার উপর চাউলের পিণ্ড ঢালিয়া বিছাইয়া দিবে। মাঝে মাঝে জলহাত মাখাইলে রুটি ফাটিবে না। জ্বলন্ত অঙ্গারে সেকিয়া ভস্মমিশ্রিত অঙ্গার দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

কিছুক্ষণ পরে সেই অঙ্গার সরাইয়া, ঘি মাখাইয়া, বেদির উপর যথাস্থানে রাখিতে হইবে।

পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণাগ্নিতে অন্ন চাপাইয়া দিবে। যাগ-শেষে ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করিবেন—ইহাই তাঁহাদের দক্ষিণা। এই অন্নের নাম অন্বাহার্য্য অন্ন—দক্ষিণাগ্নিতে ইহা পাক হয় বলিয়া দক্ষিণাগ্নির নামান্তর অন্বাহার্য্যপচন।

অতঃপর বেদি নির্ম্মাণ করিয়া, বেদির উপর কুশ বিছাইয়া, তদুপরি যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি ও হোমদ্রব্যগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। বেদি নির্ম্মাণের প্রণালী অগ্ন্যাধানপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

যাগের আয়োজন সমাপ্ত হইল। এখন যাগের উদ্যোগ করিতে হইবে, তজ্জন্য আহবনীয় অগ্নিকে সমিদ্ধ বা সন্দীপিত করিতে হইবে। প্রদীপ্ত অগ্নিতে যাগ বিধেয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নি সমিন্ধন। অধ্বর্য্যু সমিধের আঁটি খুলিয়া ১৫খানি সমিৎ লইবেন ও এক একখানি করিয়া আহবনীয়ে ফেলিবেন। প্রক্ষেপকালে হোতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই মন্ত্রের নাম সামিধেনী মন্ত্র।

যে ঋত্বিক্ সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাকেই হোতৃকর্ম্ম করিতে হইবে। যিনি যাগার্থ দেবতার আহ্বান করেন, তিনিই হোতা। সেই ঋত্বিকের এখনও হোতৃকর্ম্মে অধিকার জন্মে নাই, তিনি স্বয়ং অগ্নিকে ডাকিয়া সেই অধিকার গ্রহণ করিবেন। অগ্নি দেবগণের হোতা ছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতার আরম্ভেই মন্ত্র আছে—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥" যজমানের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহারাও আপনাব অগ্নিকে হোতৃকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানে সেই পূর্ব্বপুরুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অগ্নিকে অর্থাৎ আর্ষেয় অগ্নিকে আহ্বান করিতে হইবে। যিনি এই যজ্ঞে হোতৃকর্ম্ম করিবেন, তিনি প্রথমে আর্ষেয় অগ্নিকে আহ্বান করেন, দেবতাহ্বানের জন্য অনুরোধ করেন, পরে নিগদমন্ত্র দ্বারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দেবতাদিগকে আহ্বান করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম হোতৃকর্ত্তৃক প্রবরপ্রবরণ ও দেবতাহ্বান। ইত্যবসরে অধ্বর্য্যু প্রদীপ্ত আহবনীয়ে প্রজাপতি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে আজ্যহোম করিয়া যজমানের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের নামানুসারে দেবহোতা অগ্নিকে ডাকিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে মনুষ্যহোতাকে স্বকর্ম্মে

নিযুক্ত করেন। এইরূপে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক বৃত হইয়া হোতা বেদির উত্তরে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিবেন। এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে যাগ হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রধান দেবতা অগ্নি এবং অগ্নি ও সোম। তাঁহাদের উদ্দেশে দেয় দ্রব্য পুরোডাশ। এই প্রধান যাগের পূর্ব্বে (১) প্রযাজ যাগ, (২) আজ্যভাগ্যদান, মধ্যে (৩) উপাংশু যাগ ও অন্তে (৪) স্বিষ্টকৃৎ যাগ বিহিত।

এই সকল যাগপক্ষে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম আছে। অধ্বর্য্যু দক্ষিণ হস্তে জুহূ ও বাম হস্তে উপভৃৎ লইয়া বেদির উত্তর পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হন (ইহার নাম অত্যাক্রমণ)। সেইখানে আহবনীয়ের দক্ষিণে ঈশানমুখে দাঁড়াইয়া আগ্নীধ্রনামক ঋত্বিক্‌কে আদেশ দেন—"ওঁ শ্রাবয়"—অর্থাৎ এই যাগের দেবতাকে (যাজ্যামন্ত্র) শুনিতে অনুরোধ কর। আগ্নীধ্র বেদির উত্তরে স্ফ্য নামক একখানি দীর্ঘ খড়্গাকৃতি কাষ্ঠফলক হাতে তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, তিনি উত্তর দেন—"অস্তু শ্রৌষট্‌" অর্থাৎ আচ্ছা, দেবতা শুনিতেছেন (এই কর্ম্মের নাম আশ্রাবণ ও প্রত্যাশ্রাবণ)। তখন অধ্বর্য্যু হোতাকে অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পাঠে অনুজ্ঞা দেন। অনুবাক্যার তাৎপর্য্য—দেবতাকে অনুকূল করা; যাজ্যার তাৎপর্য্য অমুক দেবতার উদ্দেশে হব্য বহন করিবার জন্য অগ্নিকে প্রার্থনা। অনুবাক্যা ঋক্‌মন্ত্র এবং যাজ্যাও ঋক্‌, কোথাও যজুর্মন্ত্র হইয়া থাকে। যাজ্যার আরম্ভে "যে যজামহে অমুকং দেবং" এই বাক্য থাকে, ইহার নাম আগূঃ। যাজ্যাশেষে "বৌষট্‌" (=বহন কর) এই পদ উচ্চারণ করিতে হয়, ইহা বষট্‌কার। হোতা বেদির উত্তরে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করেন। অধ্বর্য্যু জুহূ ও উপভৃৎ হস্তে বেদির দক্ষিণে দাঁড়াইয়াই যাগ করেন অর্থাৎ আহবনীয়ে দ্রব্যক্ষেপ করেন। জুহূ নামক হাতাতে হোমদ্রব্য থাকে, উপভৃৎখানি জুহূর নীচে ধরা থাকে, যেন হোম-দ্রব্য দৈবাৎ ক্ষরিত হইলে উপভৃতেই পড়ে। হোতা যাজ্যান্তে বষট্‌কার করিবামাত্র অধ্বর্য্যু আবহনীয়ে দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া ত্যাগমন্ত্র বলেন। যাগের পর অধ্বর্য্যু যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই বেদির উত্তরে ফিরিয়া আসেন (ইহার নাম প্রত্যাক্রমণ)। ফিরিয়া আসিয়া হোম দ্রব্যের যাহা অবশেষ থাকে,

তাহাতে একটু ঘৃত মাখাইয়া দেন। যাগমাত্রেরই এই সাধারণ ক্রম, স্থল-বিশেষে বিশেষ বিধি দ্বারা এক আধটু ইতরবিশেষ আছে।

(১) প্রযাজ যাগ—প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ—আহুতির দ্রব্য আজ্য—পাঁচ দেবতার উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি—উদ্দিষ্ট দেবতা যথাক্রমে সমিৎ, তনূনপাৎ (যজমানের গোত্রভেদে নরাশংস), ইড়, বর্হিঃ ও স্বাহাকৃতি। প্রযাজ যাগে অনুবাক্যা নাই ; হোতা কেবল যাজ্যা পড়েন।

(২) আজ্যভাগ দান। প্রযাজের পর অগ্নির উদ্দেশে এক ভাগ ও সোমের উদ্দেশে একবার আজ্য আহুতি দিতে হয়।

(৩) তৎপরে প্রধান যাগ—অগ্নির উদ্দেশে প্রথম পুরোডাশ দান ও পরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে দ্বিতীয় পুরোডাশ দান—উভয়ের মাঝখানে অর্থাৎ দ্বিতীয় আহুতির পূর্ব্বে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একটু ঘৃতাহুতি দিতে হয়। এই আহুতিতে উপাংশু বা অনুচ্চ স্বরে যাজ্যাপাঠ হয়, এ জন্য ইহার নাম উপাংশুযাগ।

(৪) প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। উভয় পুরোডাশের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার টুকরা কাটিয়া অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দিতে হয়। অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ রুদ্রদেবতার মূর্ত্তিবিশেষ। দেবতারা রুদ্রদেবতার জন্য এই ভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন।

যাগকালে আহবনীয়ে নিক্ষেপের জন্য প্রত্যেক পুরোডাশ হইতে দুই টুকরা কাটিয়া লইতে হয়। এই কাটিয়া লওয়ার নাম অবপূর্ব্বক দো ধাতু হইতে অবদান—দো ধাতুর অর্থ কাটা। পুরোডাশের এই দুই টুকরায় দুই অবদান, উহার উপরে নীচে দুইবার ঘি মাখাইতে হয়,—এই দুইটিও আজ্যের অবদান।

মোটের উপর এই চারি অবদানে গ্রহণ করিয়া আজ্য ও পুরোডাশ আহবনীয়ে প্রক্ষেপ বিধেয়। যজমানের গোত্রভেদে পাঁচ অবদানেরও বিধি আছে। পুরোডাশের তিন টুকরা ও নীচে উপরে আজ্যাবদান, এই পাঁচ অবদান। যে সকল যজমানের চারি অবদান, তাঁহাদের নাম চতুরবত্তী, যাঁহাদের পাঁচ অবদান, তাঁহারা পঞ্চাবত্তী।*

* জামদগ্ন্য, বৎসবিদ, অর্ষ্টিসেন, ভার্গব, চাবন, এই পাঁচ গোত্রে উৎপন্ন যজমানের পক্ষে পাঁচ অবদান বিহিত। পশুযাগে, বপাহোমে সকলের পক্ষেই পাঁচ অবদান। —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পরিশিষ্ট, 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯।

স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ। যাগের পর পুরোডাশের যাহা অবশেষ থাকে, তাহা যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করেন, নতুবা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। এই ভক্ষণে নানা খুঁটিনাটি আছে। প্রথম পুরোডাশের অবশেষ হইতে কিয়দংশ ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন, এই অংশের নাম প্রাশিত্র ; আর এক অংশ আগ্নীধ্র ভক্ষণ করেন, এই অংশ ষড়বত্ত ; প্রথম পুরোডাশ হইতে আর চারি ভাগ লইয়া এই চতুর্ধাকৃত ভাগ ঋত্বিক্ চারি জনেই—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র ভক্ষণ করেন। প্রথম, দ্বিতীয়, উভয় পুরোডাশের অংশ লইয়া ঘৃতাক্ত করা হয়—এই অংশের নাম ইড়া—ইহা যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ সকলে ভক্ষণ করেন, ভক্ষণের পূর্ব্বে ইড়ানাম্নী দেবতার মন্ত্র দ্বারা আহ্বান হয়—এই কর্ম্ম ইড়োপাহ্বান। হোতা আবার ইড়ার একাংশ পৃথক্‌ভাবে ভক্ষণ করেন—এই অংশ অবান্তরেড়া। প্রথম পুরোডাশের দুই অংশ রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর ব্রহ্মা ও যজমান উহা ভক্ষণ করেন।

ভক্ষণান্তে যজমান অন্বাহার্য্যনামক যে অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক হইয়াছে ; তাহা পূর্ণমাস যজ্ঞের সমৃদ্ধির জন্য দক্ষিণাস্বরূপে উৎসর্গ করেন। ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করিবেন।

ইহার পরও আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান নহিলে ক্রতু শেষ হয় না। আবার একখানি সমিৎ ফেলিয়া আহবনীয়কে প্রদীপ্ত করা হয় এবং ঐ প্রদীপ্ত অগ্নিতে বর্হিঃ, নরাশংস ও অগ্নিস্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে আজ্যাহুতি দেওয়া হয়। এই যাগের নাম অনুযাজ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে যেমন প্রযাজ, পরে তেমনি অনুযাজ। প্রযাজ যাগের মত অনুযাজ যাগেও অনুবাক্যা পঠিত হয় না, কেবল যাজ্যা পঠিত হয়।

আহবনীয় অগ্নি তিনখানি সমিৎ দিয়া বেষ্টন করা হইয়াছিল। এই সমিৎ তিনখানির নাম পরিধি। জুহূ রাখিবার জন্য এক আঁটি কুশ বেদির উপর রাখা হইয়াছিল, উহার নাম প্রস্তর। প্রস্তরে যজমানের শরীর কল্পনা করা হয়। অনুযাজের পর প্রস্তর আহবনীয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রস্তর যখন অগ্নিতে পুড়িতে থাকে, যজমান তখন স্বর্গে যাইতেছেন বুঝিতে হইবে। এই সময় অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা লইয়া হোতা সূক্তাবাক্ নামক মন্ত্র পাঠ করেন।

প্রস্তর দগ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে, যজমান স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সহিত মিশিয়াছেন। এই সময় পুনরায় অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞাক্রমে হোতা শংযুবাক্ নামক মন্ত্র পাঠ করেন। তখন পরিধি কয়খানি আহবনীয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরিধি যেন দৈব হোতার শরীর। দৈব হোতারা এখন যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যান।

শংযুবাকের পর বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে সংস্রব হোম।

অতঃপর যজমানের পত্নীর পক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে—উহা পত্নীসংযাজ। গার্হপত্য অগ্নির নিকট পত্নীর আসন। ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন ঋত্বিক্ এখন পত্নীর নিকটে আসিয়া সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ ও অগ্নিগৃহপতির উদ্দেশে গার্হপত্য অগ্নিতে আজ্যাহুতি দেন।

যজমানপক্ষে প্রধান যাগের পর যেমন হবিঃশেষ ভক্ষণ হইয়াছিল, পত্নীপক্ষে যাগের পরও সেইরূপ হবিঃশেষভক্ষণ বিধান আছে। এখানে হব্য দ্রব্য আজ্য মাত্র। সেই আজ্যের শেষাংশ আজ্যেড়া। আজ্যেড়া সকলে ভক্ষণ করেন।

এবার ইড়াভক্ষণের পর সূক্তবাক্ পঠিত হয় না, তবে শংযুবাক্ পঠিত হয় এবং সংস্রব হোমও হয়।

অতঃপর অধ্বর্য্যু দক্ষিণাগ্নিতে আজ্যাহুতি দেন ও পুরোডাশার্থ ব্যবহৃত চাউলের পিষ্টকের যাহা অবশেষ থাকে, তাহা বিশ্বদেবগণকে আহুতি দেন। ইহা পিষ্টলেপাহুতি। এই সময় পত্নীর কটিদেশের যোক্ত্র খুলিয়া দেওয়া হয়।

যাগার্থ যে সকল দেবতা আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও যজ্ঞস্থান হইতে যান নাই। অধ্বর্য্যু আহবনীয়ে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে একসঙ্গে আজ্যাহুতি অর্পণ করিলে তাঁহারা চলিয়া যান। ইহার নাম সমিষ্ট যজুর্হোম।

তৎপরে বেদির উপরে যে কুশ বিছান হইয়াছিল, তাহা আহবনীয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে চাউল ঝাড়িয়া যে তুষ ও ক্ষুদকণা অবশিষ্ট ছিল, তাহা রক্ষোগণের উদ্দেশে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তৎপরে যজমান বিষ্ণুক্রম প্রক্রমণ করেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া দেবত্ব পাইয়াছিলেন, তদনুকরণে যজমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব্বমুখে আহবনীয় পর্য্যন্ত প্রক্রমণ করেন। পরে তিনি

সূর্য্যোপস্থান ও গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন,—"আমার কৃত এই কর্ম্ম, এই বীর্য্য যেন আমার পুত্র বাহাল রাখেন।" তৎপরে যজমান আহবনীয় উপস্থান করিয়া যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিসর্জ্জন করেন।

ব্রতত্যাগের পর বাহিরে আসিয়া যজমান ও ব্রহ্মা পুরোডাশের যে ভাগ ভক্ষণার্থ রক্ষিত ছিল, তাহা ভক্ষণ করেন। পরে ব্রাহ্মণভোজন। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা আহবনীয়ে সমিৎহোম করিয়া পূর্ণমাস ইষ্টি সমাপ্ত করিয়া দেন।

অমাবস্যায় সাধ্য দর্শেষ্টি পূর্ণমাসেষ্টির মত। প্রধান যাগে একটু বিশেষ আছে। পূর্ণমাসে দ্বিতীয় পুরোডাশখানি অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট, দর্শেষ্টিতে উহা ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দিষ্ট। কেহ কেহ তৎপরিবর্ত্তে ইন্দ্র বা মহেন্দ্রের উদ্দেশে সান্নায্য আহুতি দেন। দধি ও দুগ্ধ মিশাইয়া সান্নায্য প্রস্তুত হয়। ইন্দ্র বৃত্রবধের পর ক্লান্ত হইয়া উহা পান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সান্নায্য দেওয়া হয়। বৃত্রবধের পর ইন্দ্র মহেন্দ্র হইয়াছিলেন, সেই জন্য কাহারও মতে মহেন্দ্রের নামেই সান্নায্য দেওয়া হয়। সান্নায্য কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উপদেশ গাভীর বাছুর সরাইয়া দোহনক্রিয়া হইতে দধি ও দুগ্ধ মিশান পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্মের বিধি আধ্বর্য্যব ব্রাহ্মণে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দর্শপূর্ণমাসের মত আগ্রায়ণ, দাক্ষায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, এই কয়টি ইষ্টিও নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। এই সকল ইষ্টি দর্শপূর্ণমাসেরই বিকৃতি। কাজেই বিশেষ বিধিগুলি জানিলেই এগুলির সহিত দর্শপূর্ণমাসের প্রভেদ জানা যাইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই সকল যাগের কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই। অতি সংক্ষেপে এই যাগগুলির পরিচয় দেওয়া যাইবে।

আগ্রায়ণ

নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে এই ইষ্টি বিহিত। শরৎকালে ব্রীহি (ধান্য) উৎপন্ন হইলে ব্রীহ্যাগ্রায়ণ বিহিত। বসন্তকালে যবাগ্রায়ণ, বর্ষাকালে শ্যামাকাগ্রায়ণ। অগ্রে অর্থাৎ নবান্ন উৎপত্তির পর, অন্য কর্ম্মের পূর্ব্বে 'অয়ন' বা অনুষ্ঠান যাহার, তাহাই আগ্রায়ণ। নূতন শস্যেই পুরোডাশ বা চরু প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে দিতে হয়।

ব্রীহ্যাগ্রায়ণে ইন্দ্রাগ্নিদেবতাকে দ্বাদশ কপালে পক্ব পুরোডাশ, বিশ্বদেবগণকে পায়স চরু এবং দ্যাবাপৃথিবীকে এক কপালে পক্ব পুরোডাশ দিতে হয়।

যবাগ্রায়ণেও সেই দেবতা ও দ্রব্য বিহিত। ব্রীহির পরিবর্ত্তে যবে পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত করা হয়।

শ্যামাকাগ্রায়ণে সোমদেবতার উদ্দেশে শ্যামাকের প্রস্তুত পায়সচরু দিতে হয়। ইহাতে পুরোডাশ নাই।

দাক্ষায়ণ

এই ইষ্টিও দর্শপূর্ণমাসের বিকার এবং অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় সম্পাদ্য। দাক্ষায়ণে অগ্ন্যাধানদিনেই (অর্থাৎ ইষ্টিযাগের পূর্ব্বদিনেই পূর্ব্বাহ্ণেই পূর্ণিমাপক্ষে) অগ্নি ও সোমকে এবং (অমাবস্যাপক্ষে) ইন্দ্র ও অগ্নিকে পুরোডাশ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে ব্রতগ্রহণ। পরদিন (পূর্ণিমাপক্ষে) অগ্নিকে পুরোডাশ ও ইন্দ্রকে (দধিদুগ্ধ-মিশ্রিত) সান্নায্য এবং (অমাবস্যাপক্ষে) অগ্নিকে পুরোডাশ ও মিত্রাবরুণকে সান্নায্য অথবা পায়স্যা (দধি) দেওয়া হয়।

দাক্ষায়ণ যাগ পনের বৎসরের অধিক করিতে হয় না।

চাতুর্ম্মাস্য

বার মাসকে তিন ভাগ করিয়া চারি চারি মাসে এক এক পর্ব্ব। এইরূপে সংবৎসরে চাতুর্ম্মাস্যের তিন পর্ব্ব। প্রথম বৈশ্বদেব পর্ব্ব ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, দ্বিতীয় বরুণপ্রঘাস পর্ব্ব আষাঢ়ী পূর্ণিমায়, তৃতীয় সাকমেধ পর্ব্ব কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আরম্ভ হয়। শুনাসীরীয়নামক চতুর্থ পর্ব্বেরও বিধান আছে। উহার আরম্ভকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বৈশ্বদেব পর্ব্বে

দেবতা—	দ্রব্য—
অগ্নি	পুরোডাশ (৮ কপাল)
সোম	চরু
সবিতা	পুরোডাশ (১২ কপাল)
সরস্বতী	চরু

দেবতা—	দ্রব্য-
পূষা	চরু
মরুদ্‌গণ	পুরোডাশ (৭ কপাল)
বিশ্বদেবগণ	আমিক্ষা (দানা)
দ্যাবাপৃথিবী	পুরোডাশ (১ কপাল)

বরুণপ্রঘাস পর্ব্বে

অগ্নি	পুরোডাশ (৮ কপাল)
সোম	চরু
সবিতা	পুরোডাশ (১২ কপাল)
সরস্বতী	চরু
পূষা	চরু
ইন্দ্রাগ্নি	পুরোডাশ (১১ বা ১২ কপাল)
মরুদ্‌গণ	আমিক্ষা
বরুণ	আমিক্ষা
ক (প্রজাপতি)	পুরোডাশ (১ কপাল)

বরুণপ্রঘাস অত্যন্ত জটিল কর্ম্ম। দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষা অধিক একজন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়,—ইনি অধ্বর্য্যুর সহকারী—নাম প্রতিপ্রস্থাতা। আহবনীয়ের পূর্ব্বে আর দুইটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। তন্মধ্যে উত্তরের বেদি পশুযাগের বেদির অনুরূপ। তাহার দক্ষিণে আর একটি বেদি নির্ম্মিত হয়। আহবনীয় হইতে অগ্নি লইয়া উভয় বেদিতে যথাস্থানে রাখিতে হয়। এই নূতন অগ্নিদ্বয়ে যথাক্রমে অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা আহুতি দেন। প্রতিপ্রস্থাতা নিজ অগ্নিতে মরুত্তের উদ্দেশে আমিক্ষাহুতি দেন। অধ্বর্য্যু নিজ অগ্নিতে অন্যান্য দেবতার উদ্দিষ্ট আহুতি দেন। এই যজ্ঞে নানা সম্ভার প্রয়োজন, তাহার বিবরণ অনাবশ্যক।

সাকমেধ পর্ব্বে

কাল	দেবতা	দ্রব্য
পূর্ব্বাহ্নে	অগ্নি অনীকবান্	পুরোডাশ (৮ কপাল)
মধ্যাহ্নে	সান্তপন মরুদ্‌গণ	চরু
সায়াহ্নে	গৃহমেধী মরুদ্‌গণ	পায়স চরু

পরদিন প্রত্যূষে ইন্দ্রের উদ্দেশে পূর্ণাদর্ব্বি হোম।

কাল	দেবতা	দ্রব্য
প্রাতে	ক্রীড়ী মরুদ্‌গণ	পুরোডাশ (৭ কপাল)
তৎপরে	অগ্নি	পুরোডাশ (৮ কপাল)
	সোম	চরু
	সবিতা	পুরোডাশ (১২ কপাল)
	সরস্বতী	চরু
	পূষা	চরু
	ইন্দ্রাগ্নি	পুরোডাশ (৮ অথবা ১২ কপাল)
	ইন্দ্র	চরু
	বিশ্বকর্ম্মা	পুরোডাশ (১ কপাল)
অপরাহ্নে	মহাপিতৃযজ্ঞ	
তৎপরে	ত্রৈয়ম্বক হোম	

এই কর্ম্মেও আর একটি বেদি আবশ্যক।

(ঘ) পশুযাগ

অবশ্যকর্ত্তব্য পশুযাগের নাম নিরূঢ়পশুবন্ধ। বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই যাগ কর্ত্তব্য। কাহারও মতে বৎসরে দুই বার— উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে কর্ত্তব্য। অগ্নিষ্টোমের অঙ্গমধ্যে অগ্নিষোমীয়, সবনীয় ও অনূবন্ধ্য, এই তিনটি পশুযাগ আছে, উহা নিরূঢ়-পশুবন্ধের বিকৃতি।

পশুযাগের সহিত ইষ্টিযাগের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। ব্রত গ্রহণ, প্রণীতাপ্রণয়নাদি অনুষ্ঠান উভয়ের মধ্যে সাধারণ, এই জন্য পশুযাগকে দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিরূপে গণ্য করা রীতি আছে। এ স্থলে পশুযাগের যেগুলি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান, সেইগুলিরই বিবরণ দেওয়া যাইবে।

দর্শপূর্ণমাসেষ্টিতে চারি জন ঋত্বিক্ আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ। পশুযাগে তদতিরিক্ত দুই জন ঋত্বিক্ আবশ্যক। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ এবং অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা। পূর্ণমাসেষ্টিতে হোতাকেই অধ্বর্য্যুর আদেশে অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পশুযাগে মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা পাঠ করেন এবং অধ্বর্য্যুর আদেশক্রমে

হোতাকে যাজ্যাপাঠে অনুজ্ঞা করেন। হোতৃবরণের পর মৈত্রাবরুণের পৃথক্ বরণ আবশ্যক হয়। প্রতিপ্রস্থাতা অধ্বর্য্যুকে কতিপয় কর্ম্মে সাহায্য করেন।

দর্শপূর্ণমাসে গার্হপত্য ও আহবনীয়, এই দুইয়ের মধ্যে যজ্ঞপাত্র ও হোমদ্রব্য রাখিবার জন্য ঐষ্টিক বেদি থাকে। পশুযাগে আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে আর একটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই বেদির নাম পাশুক বেদি। পাশুক বেদির উপরে আর একটি ক্ষুদ্রতর চতুষ্কোণ বেদি তুলিতে হয়, ইহার নাম উত্তরবেদি। উত্তর দিকে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের মাটিতে এই উত্তরবেদি গঠিত হয়, সেই গর্ত্তের নাম চাত্বাল। চাত্বালের নিকটে পাশুক বেদির ধূলি ও আবর্জ্জনা স্তূপাকৃতি করিয়া উৎকর নির্ম্মিত হয়।

উত্তরবেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় হইতে যথাবিধি অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখিতে হয়। উত্তরবেদি আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে, কাজেই এই অগ্নি আনয়নের নাম অগ্নিপ্রণয়নকর্ম্ম। প্রণয়নের পর সেই নাভিস্থিত প্রণীত অগ্নিতে মন্থনোৎপন্ন নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিলে উহা হব্যবহনযোগ্য হয় এবং তদবধি এই অগ্নিই আহবনীয়রূপে গণ্য হয়। পুরাতন আহবনীয়ে তদবধি গার্হপত্যের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হয়।

সামিধেনী পাঠপূর্ব্বক এই নূতন আহবনীয়ে সমিৎপ্রক্ষেপদ্বারা অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া, যথারীতি আঘার হোম করিয়া, হোতৃপ্রবরণ ও মৈত্রাবরুণ-প্রবরণ সম্পাদ্য। তৎপরে এই অগ্নিতে প্রযাজাদি যাগ করিতে হইবে। এই প্রযাজাদি যাগে যে সকল বিশেষ বিধি আছে, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

ঐষ্টিক বেদি ইষ্টিযাগের উপযোগী যজ্ঞপাত্র ও হোমদ্রব্য রাখিবার জন্য। পাশুক বেদি পশুযাগের উপযুক্ত পাত্র ও দ্রব্য রাখিবার জন্য। উত্তরবেদির উপরে দর্ভ বিছাইতে হয়। পাশুক বেদির একাংশে (?) প্লক্ষশাখা বিছাইতে হয়। উহার উপর পশ্বঙ্গ রাখিতে হইবে।

পশুযাগের আরম্ভেই পশুবন্ধনার্থ যূপ কাটিয়া আনিতে হয়। অধ্বর্য্যু স্বয়ং তক্ষার (ছুতারের) সহিত বাহিরে গিয়া গাছ কাটিয়া আনেন। পলাশাদি বৃক্ষ যূপের জন্য প্রশস্ত। গাছ কাটিয়া উহার ডালপালা ছাঁটিয়া মূল স্তম্ভকে অষ্টাশ্রি (আটকোণা) করিতে হয়। যূপের দৈর্ঘ্য অন্যূন

পাঁচ হাত, উহার পঞ্চমাংশ মাটির নীচে পুঁতিবার জন্য। যূপের মাথায় একটা মুকুটাকার কাষ্ঠখণ্ড পরাইতে হয়; তাহার নাম চষাল। পুঁতিবার পূর্ব্বে যূপস্তম্ভে ঘি মাখাইতে হয়—এই কর্ম্মের নাম যূপাঞ্জন। পাশুক বেদির পূর্ব্বপ্রান্তে অবট (গর্ত্ত) খনন করিয়া তাহাতে যূপ পুঁতিতে হয়। যূপের গায়ে রজ্জুর বেষ্টন দিতে হয়—এই রজ্জুর নাম রশনা। রশনার ভিতর এক টুকরা কাঠ পরাইতে হয়; এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম চষ্কাল। এই সকল কর্ম্মের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যূপে পশুবন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে দুইগাছি দর্ভদ্বারা সমন্ত্রক স্পর্শ করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম উপাকরণ। উপাকরণান্তে পশুর শৃঙ্গান্তরালে রজ্জু বাঁধিয়া, সেই রজ্জু যূপরশনায় বাঁধিয়া দিতে হইবে—এই পশুবন্ধনের নাম পশু-নিয়োজন। পশুর ললাট ঘৃতাক্ত করিয়া দিতে হয়।

পশুনিয়োজনের পর যাগের উদ্যোগ করিতে হইবে। উত্তরবেদির নাভিতে প্রণীত অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপদ্বারা অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া আঘার হোমের এবং হোতার ও মৈত্রাবরুণের প্রবরণের পর প্রযাজ যাগ করিতে হইবে। ইষ্টিযাগ উপলক্ষ্যে এই প্রযাজ যাগের উল্লেখ হইয়াছে। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ ও পরে অনুযাজ যাগ সম্পাদ্য। পূর্ণমাসেষ্টিতে পাঁচটি প্রযাজ বিহিত, কিন্তু পশুযাগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। পশুযাগে অনুযাগের সংখ্যাও এগারটি। তদ্ব্যতিরিক্ত পশুযাগে এগার অনুযাজের সমকালে এগারটি উপযাজের বিধান আছে; এই উপযাজ ইষ্টিযাগে নাই। এগার প্রযাজ যাগের দেবতা যথাক্রমে—১ সমিৎ, ২ তনূনপাৎ অথবা নরাশংস, ৩ ইড়ঃ, ৪ বর্হিঃ, ৫ দুরঃ, ৬ উষানাসক্তৌ, ৭ দৈব্যৌ হোতারৌ, ৮ ত্রিস্রো দেব্যঃ (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ৯ ত্বষ্টা, ১০ বনস্পতি, ১১ স্বাহাকার। অনুযাজ ও উপযাজ-দেবতাগণের নাম পরে বলা যাইবে।

প্রত্যেক প্রযাজ যাগের পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণের আদেশক্রমে হোতা সেই যাগের দেবতার উদ্দিষ্ট যাজ্যামন্ত্র পড়েন। পশুযাগের প্রযাজ যাগে যে যাজ্যামন্ত্র পঠিত হয়, তাহার নাম আপ্রী। ঋগ্বেদসংহিতামধ্যে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে এগার দেবতার উদ্দিষ্ট এগারটি

আপ্রীমন্ত্র আছে। যে ঋষি যে সূক্তের দ্রষ্টা, যজমান সেই ঋষির গোত্রোৎপন্ন হইলে সেই সূক্তের অন্তর্গত আপ্রীমন্ত্র পশুযাগে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় মন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কোন সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রের দেবতা তনূনপাৎ, কোন সূক্তে বা নরাশংস। কাজেই গোত্রভেদে যজমানকে দ্বিতীয় প্রযাজে তনূনপাৎ অথবা নরাশংসদেবতার উদ্দেশে যাগ করিতে হয়। কতিপয় সূক্তে তনূনপাৎ ও নরাশংস, উভয় দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র আছে। সেখানে আপ্রীসূক্তে মন্ত্রসংখ্যা বারটি। যজমান ইচ্ছামত নরাশংসের বা তনূনপাতের উদ্দেশে যাগ করেন। এগার প্রযাজের মধ্যে প্রথম দশটিতে হোমদ্রব্য আজ্য মাত্র, কিন্তু অন্তিম প্রযাজের হোমদ্রব্য পশুর বপা। পশুর উদরে নাভির পার্শ্বস্থিত মেদের নাম বপা। এই বপা দ্বারা স্বাহাকৃতির উদ্দেশে অন্তিম প্রযাজ যাগ করিতে হইবে। কাজেই দশ প্রযাজ অনুষ্ঠানের পর একাদশ প্রযাজের পূর্ব্বেই পশুবধের আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশুবধ করিবে, তাহার নাম শমিতা বা অধ্রিগু। পাশুক বেদির উত্তরে চাত্বালের নিকট পশুবধের স্থান, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। পশুর অঙ্গ পাকের জন্য সেইখানে অগ্নি স্থাপন করিতে হয়, সেই অগ্নি শামিত্র অগ্নি। অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক্ উল্মুক (অগ্নিখণ্ড) হাতে পশুর চারি দিকে ভ্রমণ করেন, উদ্দেশ্য—রাক্ষসেরা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রাক্ষসেরা অগ্নিকে ভয় করে। এই অগ্নি-ভ্রামণ কর্ম্মের নাম পর্য্যগ্নিকরণ। হোতা শমিতার উপদেশে পশুবধার্থ নিগদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন—এই মন্ত্রের নাম অধ্রিগুপ্রৈষ। অগ্নীৎ উল্মুকহস্তে আগে আগে শামিত্র দেশের দিকে চলেন। শমিতা পশুর গলবেষ্টনরজ্জু ধরিয়া পশ্চাতে পশুকে লইয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতিপ্রস্থাতা, অধ্বর্য্যু ও যজমান অনুগমন করেন। শামিত্রে উপস্থিত হইয়া অধ্বর্য্যু একগাছি তৃণ ভূমিতে ফেলিয়া দেন ও যজমান ও ঋত্বিকেরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহবনীয় (উত্তরবেদির নাভিস্থিত) অগ্নির নিকটে মুখ ফিরাইয়া বসেন—যেন পশুহত্যা দেখিতে না হয়। শমিতা সেই সময়ে পশু হত্যা করেন। পশুর মুখ চাপিয়া অথবা গলায় ফাঁস দিয়া শ্বাসরোধের দ্বারা হত্যা করিতে হয়,—এইরূপ হত্যার নাম সংজ্ঞপন। সংজ্ঞপনের পর যজমানের পত্নী জলের কলস লইয়া আসিয়া সেই জলে পশুর চক্ষু

নাসিকাদি অঙ্গ শোধন করেন। অধ্বর্য্যু ও যজমানও জল ঢালিয়া পশুর অন্যান্য অঙ্গ শোধন করিয়া দেন। অধ্বর্য্যু পশুর উদরের ত্বক্ চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। প্রতিপ্রচ্ছাতা দুই খণ্ড কাষ্ঠে সেই বপা গ্রহণ করিয়া, জলে ধুইয়া, শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন। পরে আহবনীয়ের নিকট আসিয়া আহবনীয়াগ্নিতে বপা তপ্ত করিতে থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিতে থাকে ও বপার কিছু ক্ষরিত হইয়া অগ্নিতে পড়িতে থাকে। অধ্বর্য্যু সেই সময়ে বপার উপর আজ্য ঢালিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকেন। স্তোক শব্দের অর্থ বিন্দু—এই আহুতির নাম বপাস্তোকাহুতি। আহুতির সময় হোতা যে অনুবচন মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দ্বিতীয় পঞ্চিকার ৭ম অধ্যায়ের ৫—৮ খণ্ডে* ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে সেই বপার কিয়দংশ দ্বারা যথাবিধি যাজ্যা (আপ্রীমন্ত্র) পাঠের পর স্বাহাকৃতির উদ্দেশে অন্তিম প্রযাজ যাগ করা হয়।

বপার অবশিষ্ট অংশে প্রধান দেবতার যাগ হয়। নিরূঢ়পশুবন্ধ-নামক বাস্তুযাগের উদ্দিষ্ট প্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি (প্রজাপতি বা সূর্য্যও বিকল্পে দেবতা হইতে পারেন)। অগ্নীষোমীয় পশুযাগে প্রধান দেবতা অগ্নি ও সোম ইত্যাদি। অধ্বর্য্যু সেই প্রধান দেবতার উদ্দেশে বপাহুতি দান করিবেন। যাগকালে জুহূতে হোমদ্রব্য রাখাই বিধি। জুহূতে প্রথমে আজ্য তৎপরে একখণ্ড হিরণ্য রাখিয়া তদুপরি বপা রাখিতে হয়। বপার উপরে আবার হিরণ্যখণ্ড ও আজ্য রাখিলে মোটের উপর পাঁচ অবদান গ্রহণ করা হয়। হিরণ্য রাখিবার তাৎপর্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পঞ্চিকার ৭ম অধ্যায় ৪র্থ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে বপাযাগের পর সযজমান ঋত্বিকেরা চাত্বালের নিকটে গিয়া জলস্পর্শ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আসেন।

বপাহোমের পর পশুপুরোডাশ ও পশ্বঙ্গ যাগ। ব্রীহি বা যবের মত ওষধি হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া আহুতি না দিলে পশুযাগ সম্পূর্ণ হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর্য্যগ্নিকরণবিষয়ক আখ্যায়িকা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, পশুর মধ্যে যাহা মেধ্য বা যাগযোগ্য, তাহা ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ওষধিতে পরিণত হইয়াছে, অতএব পুরোডাশযাগে

* 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

পশুযাগেরই ফল পাওয়া যায়। ফলে, পশুর বিবিধ অঙ্গের সহকারে পুরোডাশ আহুতি না দিলে পশুযাগ সম্পূর্ণ হয় না। এই পুরোডাশের নাম পশুপুরোডাশ। নিহত পশুর যে সকল অঙ্গ যাগযোগ্য, তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া, শামিত্র অগ্নিতে পাকের ব্যবস্থা করিয়া, পুরোডাশ-যাগের আয়োজন করিতে হয়। ইষ্টিযাগে যেরূপে পুরোডাশ প্রস্তুত হয় ও যে বিধানে আহুত হয়, এখানেও প্রায় সেই বিধান। নিরূঢ়-পশুবন্ধে ইন্দ্রাগ্নির উদ্দিষ্ট পুরোডাশ দ্বাদশ কপালে (সূর্য্য বা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট হইলে আট কপালে), অগ্নীষোমীয় পশুযাগে অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালে পক্ক হয়। প্রধান দেবতাকে পুরোডাশ দিবার পূর্ব্বে প্রযাজ যাগের প্রয়োজন হয় না। কেন না, পূর্ব্বে যে একাদশ প্রযাজ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট। তবে প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ আবশ্যক। পুরোডাশ হইতে ইড়াভক্ষণও আবশ্যক।

পুরোডাশযাগ সমাপ্ত হইতে হইতে পশ্বঙ্গপাকও সম্পন্ন হইয়া আসে। পশুর সকল অঙ্গ যাগযোগ্য নহে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড় প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। কয়েকটি অঙ্গ স্বিষ্টকৃৎ যাগের জন্য রাখিতে হয়, উপযাজ হোমের জন্য অন্ত্রের কিয়দংশ লইতে হয়, ঋত্বিক্‌দের ভোগ স্বরূপ কয়েকটি অঙ্গ লইতে হয়, পত্নীসংযাজের জন্য লাঙ্গুল লইতে হয়; পশুর রুধির রাক্ষসের উদ্দেশে উৎকরে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই সকল অঙ্গের মধ্যে পশুর হৃদয়কে পৃথক্‌রূপে শূলে বিঁধিয়া শামিত্র অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে; অন্যান্য অঙ্গ পশুকুম্ভীক নামক হাঁড়িতে লইয়া শামিত্র অগ্নির উপর জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। হৃদয়কেও শূল হইতে বাহির করিয়া কুম্ভীস্থিত অন্যান্য অঙ্গের উপরে রাখিবে। শমিতার উপরই এই রন্ধনকর্ম্মের ভার থাকে।

পুরোডাশযাগান্তে শমিতা সংবাদ দেন—পশুপাক শেষ হইয়াছে। তখন অধ্বর্য্যু আসিয়া প্রধান যাগার্থ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গগুলি কাটিয়া জুহূতে গ্রহণ করেন। কুম্ভীস্থিত পশুর বসা পৃথক্‌ভাবে লইতে হয়। ঐ অঙ্গে প্রষদাজ্য মাখাইতে হয়। প্রষদাজ্য অর্থে দধিমিশ্রিত আজ্য। উহাও হোমদ্রব্য মধ্যে গণ্য এবং উহা প্রস্তুত করিবার নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে। জুহূতে গৃহীত পশ্বঙ্গের নীচে ও উপরে আজ্য ও হিরণ্য রাখিয়া আহুতি

দিতে হইবে। জুহূতে পশ্বঙ্গ কাটিয়া লইবার সময় মৈত্রাবরুণ মনোতা-নামক দেবতার উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করেন। মনোতা অন্য দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম খণ্ড দেখ)। জুহূতে গ্রহণান্তে যথাবিধি যাজ্যাপাঠান্তে প্রধান দেবতার উদ্দেশে পশ্বঙ্গ-হোম হয়। প্রধান যাগের পরে বনস্পতিদেবতার উদ্দেশে খানিকটা প্রষদাজ্য আহুতি দিবার রীতি আছে।

তদনন্তর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির জন্য যে কয় অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারও নীচে উপরে আজ্য ও হিরণ্য রাখিয়া হোম করিতে হয়। স্বিষ্টকৃৎ যাগান্তে আজ্যমিশ্রিত বসাশেষ আহবনীয়ে অর্পণ করিবে।

যাগের পর ইড়াভক্ষণের ব্যবস্থা। প্রধান যাগের পশ্বঙ্গ কাটিয়া লইবার সময়ই ব্রহ্মার জন্য প্রাশিত্র এবং সযজমান ঋত্বিক্‌দের জন্য ইড়া সেই সেই পশ্বঙ্গ হইতে কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ঋত্বিক্‌দের ভাগস্বরূপ পূর্ব্বেই লওয়া আছে। এই সকল ভাগ ভক্ষণের পর ঋত্বিকেরা যজমানের সহিত যথাবিধানে ইড়া ভক্ষণ করেন। ভক্ষণান্তে বাহিরে গিয়া জলস্পর্শে শুদ্ধ হইয়া অনুযাজ যাগের আয়োজন করিতে হয়।

ইষ্টিযাগে অনুযাজসংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশুযাগে অনুযাজসংখ্যা এগারটি। অনুযাজের দেবতা যথাক্রমে—বর্হিঃ, দুরঃ (দ্বার), উষাসানক্তৌ, জোষ্ট্রী, উর্জ্জাহুতী, দৈব্যৌ হোতারৌ, ত্রিস্রো দেব্যঃ, নরাশংসঃ, বনস্পতিঃ, ইড় ও অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ।

হোতা (?) আহবনীয় অগ্নিতে পৃষদাজ্য আহুতি দিয়া এই এগার দেবতার উদ্দেশে এগার বার আহুতি দেন, আর প্রত্যেক আহুতির সমকালে প্রতিপ্রচ্ছাতানামা ঋত্বিক্ অন্য এক স্থানে স্বতন্ত্র অগ্নি জ্বালিয়া উপযাজের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অন্ত্রাংশের এক এক টুকরা হাতে কাটিয়া লইয়া "সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" বলিয়া হোম করেন। হোতার প্রদত্ত যাগ অনুযাজ যাগ, আর প্রতিপ্রচ্ছাতার কৃত হোমের নাম উপযাজ হোম। অনুযাজের দ্রব্য পৃষদাজ্য, উপযাজের দ্রব্য পশুর অন্ত্রখণ্ড। এই কর্ম্মের পর স্বরু-হোম। স্বরুনামক কাষ্ঠখণ্ড যূপের রশনার ভিতর রক্ষিত ছিল, উহা এই সময় আহবনীয়ে ফেলিয়া দিতে হয়।

তৎপরে পত্নীসংযাজ। পুরাতন আহবনীয়, যাহা হইতে অগ্নি প্রণয়ন করিয়া উত্তরবেদির নাভিতে রাখিয়া নূতন আহবনীয় হইয়াছে, তাহাই পশুযাগে গার্হপত্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সেই গার্হপত্যে পত্নীসংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মৈত্রাবরুণের সাহায্য আবশ্যক হয় না। হোতাই অনুবাক্যা ও যাজ্যা, উভয় পাঠ করেন। সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ ও গৃহপতি অগ্নি, এই কয়জন এই কর্ম্মে দেবতা। ইঁহাদের উদ্দেশে পশুর লাঙ্গুল আহুতি দিতে হয়। যাগান্তে ইড়াভক্ষণ।

পত্নীসংযাজেই পশুযাগের প্রধান কর্ম্ম শেষ হইল। তৎপরে ইষ্টি-যাগের অনুযায়ী কতিপয় আনুষঙ্গিক কর্ম্মের পর যজমান বিষ্ণুক্রম প্রক্রমণ করিয়া ব্রত বিসর্জ্জন করেন।

১০। (গ) সোমযজ্ঞ

যে যজ্ঞে সোমরস দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাম সোমযজ্ঞ। সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞ প্রধান। একদিনে সম্পাদ্য সোমযাগের নাম ঐকাহিক সোমযাগ; দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যাগের নাম অহীন; আর তদধিক দিনে সম্পাদ্য সোমযাগের নাম সত্র।

জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞ ঐকাহিক। উহার সাতটি প্রকারভেদ বা সংস্থা আছে, যথা—অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়। এই সপ্তবিধ সোমযজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমই সর্ব্বাপেক্ষা সরল। এই অগ্নিষ্টোমই সকল সোমযাগের প্রকৃতি। অগ্নিষ্টোমের বিধি সকল সোমযাগেই অনুষ্ঠেয়, অন্যান্য যাগে কেবল কতিপয় বিশেষ বিধি আছে মাত্র। এই জন্য ঐতরেয়াদি গ্রন্থে অগ্নিষ্টোমের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তৎপরে অন্যান্য যাগের বিশেষ বিধিগুলি সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র।

দ্বাদশাহ যাগ বার দিনে সম্পাদ্য, এই জন্য উহা অহীন বা সত্র, উভয়রূপে গণ্য হইতে পারে। সংবৎসরব্যাপী সত্রের মধ্যে গবাময়ন সত্র প্রকৃতি; আদিত্যানাময়ন, অঙ্গিরসাময়ন প্রভৃতি সত্র উহার বিকৃতি।

এই সকল সোমযাগ ব্যতীত অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি কতিপয় অনুষ্ঠানবহুল আড়ম্বরপূর্ণ সোমযাগের বিবরণ পাওয়া যায়।

অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত ইষ্টিযাগ

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ইষ্টিযাগ নহে। কিন্তু অগ্নিষ্টোমের সম্পূর্ণতার জন্য উহার পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি ইষ্টিযাগ বিহিত। সেগুলি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ইষ্টিযাগগুলির বিবরণ আছে। পূর্ণমাস যাগের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভেদ, জানিবার জন্য এই ইষ্টিযাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার জন্য সপত্নীক যজমানকে কর্ম্মারম্ভে দীক্ষিত হইতে হয়। এই দীক্ষা গ্রহণের আনুষঙ্গিক ইষ্টির নাম **দীক্ষণীয় ইষ্টি।** দীক্ষা গ্রহণের পরদিন প্রাতে কর্ম্মারম্ভসূচক **প্রায়ণীয় ইষ্টি।** সেই দিন সোম ক্রয় করিয়া, ক্রীত সোমকে যজ্ঞশালায় লইয়া যাইতে হয়। যাজ্ঞিকগণের মতে সোম রাজা। রাজা গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অতিথিসৎকার আবশ্যক। এই উপলক্ষ্যে যে ইষ্টিযাগ হয়, তাহার নাম **আতিথ্যেষ্টি।** আতিথ্যেষ্টির পর সেই প্রাতঃকালেই প্রবর্গ্য নামক কর্ম্ম বিহিত। প্রবর্গ্যের পর **উপসদিষ্টি** নামে আর একটি ইষ্টি সম্পাদিত হয়। সে দিন অপরাহ্ণে আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি বিহিত। তৎপরদিনও প্রাতে একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্ণে আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ বিহিত। তৎপরদিন প্রাতঃকালেই দুই বার প্রবর্গ্যান্তে উপসৎ সম্পাদিত হয়। অপরাহ্ণে পশুযাগ হয়। তৎপর-দিন সোমযাগ। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে, তিন বার সোম ছেঁচিয়া, তাহার রস দেবোদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানত্রয়ের নাম যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। তৃতীয় সবনের পর অবভৃতস্নানান্তে আর একটি ইষ্টিযাগ আছে, ইহার নাম **উদয়নীয় ইষ্টি।** প্রায়ণীয় ইষ্টি যেমন আরম্ভসূচক, উদয়নীয় ইষ্টি সেইরূপ সমাপ্তি-সূচক। তৎপরে আর একবার পশুযাগ করিয়া পুনশ্চ একটি ইষ্টিযাগ করিতে হয়। এই ইষ্টিযাগেই অগ্নিষ্টোম সম্পূর্ণ হয়। ইহার নাম **উদবসানীয় ইষ্টি।**

অতএব দেখা গেল, অগ্নিষ্টোমের কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ দীক্ষণীয়, প্রায়ণীয়, আতিথ্য, উপসৎ, উদয়নীয় ও উদবসানীয়, এই কয়টি ইষ্টিযাগ বিহিত। সকলগুলিই পূর্ণমাস যাগের বিকৃতি। তবে সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু বিশেষ বিধি আছে।

পূর্ণমাস যাগের পূর্ব্বদিন প্রাতে গার্হপত্য হইতে অন্য দুই অগ্নির উদয়নান্তে সেই তিন অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপ দ্বারা অন্বাধান করিতে হয়। অপরাহ্ণে যজমান ব্রত গ্রহণ করেন। পরদিন প্রাতে ব্রহ্মার বরণ প্রথম অনুষ্ঠান। তৎপরে প্রণীতাপ্রণয়নাদি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মারম্ভ হয়। কিন্তু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত ইষ্টিগুলিতে (দীক্ষণীয় হইতে উদয়নীয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) এই অন্বাধান ও ব্রতগ্রহণকর্ম্ম করিতে হয় না। ব্রহ্মারও বরণ আবশ্যক হয় না। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের জন্য অন্যান্য ঋত্বিকের সহিত তাঁহার বরণ পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। একেবারে প্রণীতাপ্রণয়নে এই সকল ইষ্টি আরম্ভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক ইষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

দীক্ষণীয় ইষ্টি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে যজমানের অগ্নিষ্টোমার্থ দীক্ষা গ্রহণ ও তদুপলক্ষ্যে দীক্ষণীয়েষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দীক্ষণীয়েষ্টির দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "অগ্নি দেবগণের অবম, বিষ্ণু পরম, অন্য দেবগণ ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত"; "অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও সকল দেবতা, ইঁহাদিগকে পুরোডাশ দিলে সকল দেবতাকেই পুরোডাশ দেওয়া হয়" (১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড)। পুনশ্চ "এই যে অগ্নি আর বিষ্ণু, ইঁহারা দেবগণের মধ্যে দীক্ষার পালনকর্ত্তা। ইঁহারাই দীক্ষাকর্ম্মের প্রভু। অতএব অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট যে হবিঃ, তদ্দ্বারা—যাঁহারা দীক্ষায় ঈশ্বর, তাঁহারাই প্রীত হইয়া যজমানকে দীক্ষাদান করেন। যাঁহারা দীক্ষয়িতা, তাঁহারাই দীক্ষিত করেন" (১ম অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড)। এই উভয় দেবতার উদ্দেশে একসঙ্গে একাদশ কপালে পক্ব পুরোডাশ দিতে হয়। যজমানবিশেষে ঘৃতপক্ব চরুদানেরও বিধান আছে (১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড)।

এই যাগে আহবনীয় অগ্নিসমিন্ধনে হোতা সতেরটি সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করেন; পূর্ণমাসে পনেরটি সামিধেনী বিহিত (১।১)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ডে পুরোডাশ দানের হোতৃপাঠ্য অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রধান যাগের পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃদ্‌যাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আছে।

এই বিশেষ বিধি পালনপূর্ব্বক প্রণীতাপ্রণয়ন হইতে সামিষ্ট যজুর্হোম পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্ম্ম দীক্ষণীয়েষ্টিতে কর্ত্তব্য। আপস্তম্বমতে পত্নীসংযাজে ইহার সমাপ্তি।

প্রায়ণীয় ইষ্টি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকা আছে যে, দেবগণ অদিতির প্রসাদে যজ্ঞলাভ করিয়াছিলেন, অদিতি তাঁহাদিগের নিকট বর চাহিয়াছিলেন—"যজ্ঞসকল মৎপ্রায়ণ (আমাকে লইয়া আরব্ধ) হউক এবং মদুদয়ন (আমাকে লইয়া সমাপ্ত) হউক" (২য় অধ্যায়, ১ম খণ্ড)। তদবধি প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টিতে প্রধান দেবতা অদিতি।

এই ইষ্টিতে অদিতির উদ্দেশে চরু দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পথ্যা (স্বস্তি), অগ্নি, সোম ও সবিতা, এই চারি দেবতার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়। আহবনীয় অগ্নির মধ্যস্থানে অদিতির উদ্দিষ্ট চরু ও সেই অগ্নির পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে অন্য চারি দেবতাকে আজ্য দেওয়া হয় (২য় অধ্যায়, ১ম খণ্ড)। ঐ সকল দেবতাকে কি জন্য আহুতি দিতে হয় এবং এই সকল দেবতার যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ-নামক পাঁচটি আহুতি অগ্নির কোন্ স্থানে দিতে হইবে, তাহার বিশেষ বিধি ২য় অধ্যায়ের ২য় খণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৩য় খণ্ডে পঞ্চ দেবতার যাগের যাজ্যা ও অনুবাক্যা মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ডে ঐ সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃৎ যাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যাবিধান হইয়াছে। কাহারও মতে এই ইষ্টিতে অনুযাজ যাগ বর্জ্জনীয়। ঐতরেয় মতে অনুযাজও কর্ত্তব্য (২য় অধ্যায়, ৫ম খণ্ড)। তবে অনুযাজ যাগের পরবর্ত্তী পত্নীসংযাজ ও সমিষ্ট যজুর্হোম নাই, ফলে প্রথম শংযুবাকেই এই কর্ম্মের সমাপ্তি।

প্রায়ণীয় ইষ্টি অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক ও উদয়নীয় ইষ্টি সমাপ্তিসূচক। উদয়নীয় ইষ্টিও প্রায়ণীয়ের অনুরূপ। উভয়েরই একই দেবতা, একই দ্রব্য। এমন কি, যে স্থালীতে প্রায়ণীয়ের চরু পাক হয়, সেই স্থালীটিই প্রক্ষালন না করিয়াই উদয়নীয়ের চরুপাকার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ হাতা ও কুশ পর্য্যন্ত রাখিতে বলেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞকে একগাছি দীর্ঘ রজ্জুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। রজ্জু যেমন অবিচ্ছিন্ন, যজ্ঞও সেইরূপ বিচ্ছেদহীন হইবে। উহার অন্তর্গত সমুদয় অনুষ্ঠান পরস্পর সম্পৃক্ত থাকিবে। রজ্জুর যেমন দুই প্রান্তে দুইটি গ্রন্থি দিলে উহা দৃঢ় হয়, অবিচ্ছিন্ন অগ্নিষ্টোমের আদিতে ও অন্তে সেইরূপ প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়

ইষ্টি দ্বারা উহাকেও দৃঢ়বদ্ধ করা হয়। দুইটি গ্রন্থি যেমন সর্ব্বাংশে একরূপ, এই দুই ইষ্টিও সেইরূপ সর্ব্বাংশে একরূপ। তবে একটাকে উল্টাইয়া ধরিলে অন্যটা হয়। বিম্বের সহিত দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের যেমন সম্বন্ধ, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। সেই জন্য উভয় যজ্ঞের একই দেবতা ও একই দ্রব্যে যাগ বিহিত হইলেও, প্রায়ণীয়ের অনুকল্প মন্ত্রটিকে উদয়নীয়ের যাজ্যা ও প্রায়ণীয়ের যাজ্যাকে উদয়নীয়ের অনুবাক্যা করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২য় অধ্যায়, ৫ম খণ্ডে ইহা বুঝান হইয়াছে।

আতিথ্যেষ্টি—রাজা সোম ক্রীত হইয়া যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলে তাঁহার আতিথ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য এই ইষ্টি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় অধ্যায়ের ৪।৫।৬ খণ্ডে এই ইষ্টি বিহিত হইয়াছে। ইহার দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুর উদ্দেশে নয়খানি কপালে পক্ব পুরোডাশ দিতে হয়। এই প্রধান যাগের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আজ্যভাগ দানের এবং পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃৎ যাগের যাজ্যানুবাক্যা ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ অর্থাৎ ইড়াভক্ষণেই আতিথ্যেষ্টির সমাপ্তি। অনুযাজ পর্য্যন্ত করিতে হয় না। তৎপরবর্ত্তী পত্নীসংযাজাদির ত কথাই নাই। ঐতরেয় বলিতেছেন, প্রধান যাগের পূর্ব্বে যে প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই অনুযাজেরও ফল পাওয়া যাইবে (৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

আতিথ্যেষ্টিতে একটি নূতন অনুষ্ঠানের বিশেষ বিধি আছে। পূর্ণমাসাদিতে তাহা আবশ্যক হয় না। পূর্ণমাসে গার্হপত্য হইতে যে অগ্নি লইয়া আহবনীয় স্থানে স্থাপিত হয়, তাহাই সমিৎপ্রক্ষেপ দ্বারা সমিদ্ধ বা সন্দীপিত করিয়া তাহাতেই যাগ হয়। কিন্তু আতিথ্যেষ্টিতে বিশেষ বিধি এই যে, অরণিদ্বয় ঘর্ষণ দ্বারা নূতন অগ্নি উৎপাদন করিবে। এবং সেই মন্থনোৎপন্ন অগ্নি আহবনীয়স্থিত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া লইবে। অগ্নিমন্থনের সাধারণ নিয়ম অগ্ন্যাধান প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অগ্নিমন্থনকালে হোতার পাঠ্য ঋক্‌মন্ত্রগুলি ঐতরেয়ের ৩য় অধ্যায়, ৫ম খণ্ডে দেওয়া আছে। এখানে মথিত অগ্নিকেই হোমদ্রব্যরূপে কল্পনা করিয়া আহবনীয়াগ্নিতে উহার আহুতি বিধান হইয়াছে।

উপসদিষ্টি—অগ্নিষ্টোমের পূর্ব্বে তিন দিন প্রবর্গ্যনামা কর্ম্মের* পর উপসদিষ্টি অনুষ্ঠেয়। প্রথম দুই দিন প্রাতে এক বার, অপরাহ্নে এক বার ও তৃতীয় দিন প্রাতেই দুই বার অনুষ্ঠেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায়ে এই ইষ্টির বিবরণ আছে। ঐ অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে আখ্যায়িকা দ্বারা, কেন দুই বার অনুষ্ঠান হয়, তাহা দেখান হইয়াছে।

ইহার দেবতা অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু, তিনেরই উদ্দেশে আজ্য মাত্র আহুতি দিতে হয়। আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বভাগে অগ্নির, মধ্যভাগে সোমের ও পশ্চিম ভাগে বিষ্ণুর উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়।

উপসদের বিশেষ বিধি এই যে, ইহাতে প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজাহুতি নাই, তবে পরবর্ত্তী অনুযাজাহুতি আছে। অগ্নিসমিন্ধনে হোতৃপাঠ্য সামিধেনী মন্ত্র নয়টি মাত্র।

পূর্ব্বাহ্নের উপসদের সহিত অপরাহ্নের উপসদের উল্‌টা পাল্‌টা সম্বন্ধ। সেই জন্য পূর্ব্বাহ্নের অনুবাক্যা মন্ত্র অপরাহ্নে যাজ্যা হয়। পূর্ব্বাহ্নের যাজ্যা অপরাহ্নে অনুবাক্যা হয় (৪ অধ্যায়, আট খণ্ড)।

উদয়নীয়েষ্টি—যাগের সমাপ্তিসূচক উদয়নীয়েষ্টির আর পৃথক্ বিবরণ আবশ্যক নহে। উহা প্রায়ণীয়েষ্টিরই অনুরূপ।

উদবসানীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের সর্ব্বকর্ম্মশেষে এই ইষ্টি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিবরণ দেওয়া হয় নাই। তৃতীয় সবনের পর অবভৃত স্নান, তদন্তে উদয়নীয় ইষ্টি, তৎপরে পশুযাগ, পশুযাগের পর এই ইষ্টি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহা শেষ করিয়া সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়।

এই ইষ্টিতে অন্বাধান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন পর্য্যন্ত প্রকৃতিযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মের বিধান আছে। ইহার দেবতা অগ্নি, দ্রব্য পঞ্চ কপালে প পুরোডাশ।

প্রবর্গ্য কর্ম্ম

প্রবর্গ্য কর্ম্ম উপসদিষ্টির পূর্ব্বে বিহিত। প্রবর্গ্য সমাপন করিয়া উপসৎ করিতে হয়। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন তিন উপসদের বিধি, প্রতি দিন দুই বার—প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে, দ্বিতীয় দিন তদ্রূপ,

* প্রবর্গ্য কর্ম্মের বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নেই দুই বার। এই ছয় বার উপসৎ অগ্নিষ্টোমে বিহিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক উপসদের পূর্ব্বে প্রবর্গ্য কর্ম্মের বিধান থাকায় প্রবর্গ্যও ছয় বার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাকছাড়া, ইহা অন্য কোন যজ্ঞের বিকৃতি নহে। কাজেই প্রবর্গ্য কর্ম্মের যাবতীয় উপদেশ খুলিয়া বলিতে হয়। শাখাভেদে উপদেশেরও অনেকটা ভেদ আছে। কাত্যায়নসূত্রের উপদেশের সহিত আপস্তম্ব বা বৌধায়নের উপদেশ সর্ব্বাংশে মিলে না। কাত্যায়নমতে নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, হোতা, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা এবং প্রস্তোতা, এই কয়জন ঋত্বিক্ প্রবর্গ্য যজ্ঞে আবশ্যক। প্রস্তোতা সামগ ঋত্বিক্, তিনি কর্ম্মের অনুকূল সামগান করেন।

প্রবর্গ্যের প্রধান হোমদ্রব্য ঘর্ম্ম। তপ্ত ঘৃতে ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ মিশাইয়া ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। যে মৃণ্ময় পাত্রে ঘর্ম্ম পাক হয়, তাহার নাম মহাবীর। ঘর্ম্মযাগের পূর্ব্বে ও পরে যবে বা ব্রীহিতে প্রস্তুত পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। অন্য পুরোডাশের মত ইহাও মাটির কপালে (খোলায়) তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয়। বোধনাদি কর্ম্ম করিতে হয় না। একেবারে পিষ্ট যব বা ব্রীহি সংগ্রহ করিয়া পুরোডাশ হয়।

কুম্ভনির্ম্মাণোপযোগী মৃত্তিকায় বল্মীকের মাটি ও বরাহ (শূকর) কর্ত্তৃক উৎখাত মাটি মিশাইয়া মহাবীর গড়িতে হয়। মহাবীর প্রাদেশ মাত্র উচ্চ, মধ্যে সঙ্কুচিত, যেন মুষ্টিতে ধরা যায়। সেই মাটিতেই দুগ্ধ দোহনের ভাণ্ড ও দুই পুরোডাশের জন্য দুইখানি কপাল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। মাজিয়া ঘষিয়া ও আগুনে পোড়াইয়া এই দ্রব্যগুলি ছাগদুগ্ধে ধুইয়া রাখিতে হয়।

হোতাকে কর্ম্মের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুকূল ঋক্‌পাঠ করিতে হয়। এই ঋক্‌মন্ত্রগুলির নাম অভিষ্টব মন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচ খণ্ডে এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রস্তোতানামা ঋত্বিক্‌কে মাঝে মাঝে কর্ম্মের অনুকূল সামগান করিতে হয়। অধ্বর্য্যু যজ্ঞসম্পাদক।

প্রতিপ্রস্থাতা ও অগ্নীৎ কর্ম্মবিশেষে তাঁহাকে সাহায্য করেন। বালুকা দিয়া তিনটি খর (উনান) নির্ম্মাণ করিতে হয়। দুইটি খর গার্হপত্য ও আহবনীয়ের উত্তরে থাকে, তৃতীয় যজ্ঞভূমির দক্ষিণে থাকে।

প্রথম খরের ভিতর এক টুকরা রৌপ্য রাখিয়া, তৃণের আগুন ধরাইয়া, তাহার উপরে ঘৃতাক্ত মহাবীর বসাইতে হয়। মহাবীরের ভিতরে আজ্য (ঘৃত) থাকে। গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া মহাবীরের চারি দিকে রাখা হয় এবং ঐ অঙ্গারের উপরে তেরখানা বিকঙ্কত (বৈঁচি) কাঠ দেওয়া হয়। তিন জন ঋত্বিক্—অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা ও অগ্নীৎ—কৃষ্ণাজিনখণ্ডের ধনিত্র (ব্যজনী বা হাতপাখা) লইয়া মহাবীরের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে হাওয়া দেন। হাওয়া পাইয়া কাঠ জ্বলিয়া উঠে। প্রস্তোতা সাম গান করেন। হোতা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। অধ্বর্য্যু মাঝে মাঝে মহাবীরে ঘৃতসেক করেন। ঘৃত তপ্ত হইলে আবার মহাবীর প্রদক্ষিণ করিয়া উপস্থান করা হয়। প্রস্তোতার সামগান যখন শেষ হয়, তখন অধ্বর্য্যু একখানি রৌহিণ পুরোডাশ রৌহিণ স্থালী নামক হাতায় (স্রুবে) লইয়া আহবনীয়ে আহুতি দেন। ঘর্ম্মদেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। প্রবর্গ্য যজ্ঞকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হয়—তিনিই ঘর্ম্মদেবতা।

যজ্ঞভূমির দক্ষিণে খুঁটি পুঁতিয়া গাভীও রজ্জুতে বাঁধা থাকে। ঘর্ম্মার্থ দুগ্ধ দেন বলিয়া ইহারা ঘর্ম্মদুঘা।

অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন, প্রতিপ্রস্থাতা অজা দোহন করেন। পিন্বননামক ভাণ্ডে দুগ্ধ গৃহীত হয়। প্রস্তোতা সামগান ও হোতা অভিষ্টব ঋক্ পাঠ করেন।

তপ্ত ঘৃতে পূর্ণ মহাবীর খর হইতে নামাইয়া, তাহার নীচে একখানি কাঠের বৃহৎ হাতা ধরা হয়—এই হাতার নাম উপযমনী। এই হাতার মাথায় গর্ত্তের উপর মহাবীর বসিতে পারে। তপ্ত ঘৃতে অজাদুগ্ধ ও গাভীদুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে তিনে মিলিয়া ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উপযমনীতে ঘৃত বা দুগ্ধ কিছু পড়িয়া গেলে তাহাও মহাবীরে ঢালা হয়।

অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া আহবনীয়ের নিকট যান এবং অতিক্রম ও আশ্রাবণের পর হোতাকে যাজ্যাপাঠে আদেশ করেন। হোতা যাজ্যার্থ দুইটি ঋক্ পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্নের প্রবর্গ্যের যাজ্যামন্ত্র ও আপস্তম্বের

যাজ্যামন্ত্র এক নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে অভিষ্টব মন্ত্রমধ্যে পূর্ব্বাহ্নে বিহিত এই যাজ্যামন্ত্র কয়টি দেওয়া আছে। যাজ্যান্তে বষট্কার করিলে (বৌষট্ উচ্চারণ করিলে) অধ্বর্য্যু "অশ্বিনা ঘর্ম্মং পাত" (আপস্তম্ব মতে)—অশ্বিদ্বয় ঘর্ম্ম পান কর—এই মন্ত্রে আহবনীয়ে ঘর্ম্ম আহুতি দেন। হোতা "অগ্নে বীহি"—অগ্নি, তুমি ভক্ষণ কর—এই বাক্য বলিয়া পুনরায় বষট্কার করিলে অধ্বর্য্যু পুনরায় আহবনীয়ে ঘর্ম্মাহুতি দেন। হোতার এই দ্বিতীয় বৌষট্ উচ্চারণের নাম অনুবষট্কার। অনুবষট্কার স্বিষ্টকৃতের স্থানীয়। প্রধান যাগের পর অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে যাগ করিতে হয়। যাগ সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম—ইষ্টিযাগ প্রসঙ্গে ইহা দেখান হইয়াছে। ঐতরেয় বলিতেছেন (৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড)—সোমযাগ, ঘর্ম্মযাগ ও বাজিনযাগ পৃথক্রূপে স্বিষ্টকৃৎযাগে আবশ্যক হয় না। হোতার অনুবষট্কারের পর যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতেই স্বিষ্টকৃৎযাগ অলুপ্ত থাকে। যাগের পর ব্রহ্মা "বিশ্বা আশা দক্ষিণসাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করেন এবং অধ্বর্য্যু ঘর্ম্মাবশেষ-পূর্ণ মহাবীরকে আনিয়া আহবনীয়ের উত্তরস্থিত দ্বিতীয় খরের উপরে রাখিয়া দেন। এই সময়ে আর পাঁচখানি বিকঙ্কত কাষ্ঠ ঘর্ম্মাক্ত করিয়া ঐ ঘর্ম্ম অগ্নিতে নিক্ষেপান্তে কাষ্ঠখণ্ডগুলি খরের নিকট কিছু কাল রাখা হয়, আর দুইখানি কাঠ দক্ষিণে ও উত্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দুইখানি রৌহিণ পুরোডাশের মধ্যে একখানি পূর্ব্বেই আহুতি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পুরোডাশ এই সময়ে আহুতি দিতে হয়। তৎপরে হবিঃশেষ ভক্ষণ, মহাবীরস্থ ঘর্ম্মশেষ উপযমনে ঢালিয়া লইয়া যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করেন। ভক্ষণের মন্ত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা উল্লেখযোগ্য—"হুতং হবিঃ মধু হবিঃ ইন্দ্রতমে অগ্নৌ অশ্যাম দেব তে ঘর্ম্ম, মধুমতঃ পিতুমতঃ বাজবতঃ অঙ্গিরস্বতঃ নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ—" অহে দেব ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যাখ্য যজ্ঞপুরুষ), ইন্দ্রতম অর্থাৎ অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ অগ্নিতে তোমার যে হোমদ্রব্য আহুতিরূপে অর্পিত হইয়াছে, উহা মধু, উহা আমরা ভক্ষণ করিতেছি। তুমি স্বয়ং মধুমান্, পিতৃমান্ (অন্নবান্), বাজবান্ (গতিমান্—স্বর্গে গতিশীল) এবং অঙ্গিরোগণের সহিত যুক্ত (অর্থাৎ অঙ্গিরানামক প্রাচীন ঋষিরা

ঘর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া তোমার সাযুজ্য পাইয়াছেন।) তোমাকে প্রণাম করি, আমাকে যেন হিংসা করিও না।

অতঃপর তৃতীয় ঘরে উপযমনী ধুইয়া যজ্ঞপাত্রগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। ছয় প্রবর্গ্য সমাপ্তির পর সমুদয় সামগ্রী যথাবিধি যজ্ঞভূমির বাহিরে লইয়া গিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

অগ্নিষ্টোম

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চদশ অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, কাজেই এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ হোতার কর্ত্তব্যই বিবৃত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিষ্টোমে অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বনে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র রচিত হইয়াছিল। সামবেদী ঋত্বিক্ উদ্গাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রাদিতে বিবৃত হইয়াছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র অবলম্বন করিয়া এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ সঙ্কলন করা গেল।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রধান কর্ম্ম সোমাহুতি। সোমনামক পার্ব্বত্য লতা ছেঁচিয়া, রস বাহির করিয়া, বিবিধ দেবতার উদ্দেশে আহবনীয় অগ্নিতে তর্পণ করা হয়। আহুতির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা একত্র সেই হোমশেষ পান করেন।

সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করাকে অভিষব বলে। দিনের মধ্যে তিন বার সোমের অভিষব ও সোমের আহুতি হয়। সোমের অভিষব, আহুতি ও ভক্ষণ—ইহাই মুখ্য কর্ম্ম ও ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্মের নাম সবন। আনুষঙ্গিক কর্ম্মসমেত সোমের অভিষব, আহুতি ও ভক্ষণের নামও সবন। দিনের মধ্যে তিন বার সবন হয়—প্রাতে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্নে তৃতীয় সবন। সোমাহুতির আনুষঙ্গিক কর্ম্মমধ্যে পশুযাগ প্রধান। সোমযাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি (বা বিকল্পে এগারটি) পশুর যাগ হয়। সবনের অঙ্গীভূত এই পশুযাগের নাম সবনীয় পশুযাগ। পশুযাগ থাকিলেই তৎসহিত পুরোডাশযাগও থাকিবেই; নিরূঢ়পশুবন্ধবিবরণে তাহা বলা হইয়াছে। সবনীয় পশুযাগের সঙ্গেও তাহার অঙ্গীভূত পশুপুরোডাশ থাকিবেই। অধিকন্তু সবনীয় পশুযাগে

পুরোডাশ ব্যতীত ধানা করম্ভাদি কতিপয় দ্রব্যেরও আহুতি দিতে হয়। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ হইবে।

সোমাহুতির পূর্ব্বে হোতা অথবা তাঁহার সহকারী কতিপয় ঋক্‌সমূহ পাঠ করিয়া যাজ্যান্তে বষট্‌কার করেন। এই ঋক্‌সমূহের নাম শস্ত্র। শস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা সামসমূহ গান করেন। এই সামসমূহের নাম স্তোত্র। স্তোত্রপাঠের পর শস্ত্রপাঠ; শস্ত্রান্তে যাজ্যা ও বষট্‌কার। বষট্‌কারকালে সোমাহুতি। অধ্বর্য্যু (স্থলবিশেষে তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা) আহবনীয় অগ্নিতে সোমাহুতি দান করেন। ব্রহ্মা এই সকল কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা, এই চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ ও তাঁহাদের বার জন সহকারী, মোটের উপর ষোল জন ঋত্বিক্ সোমযাগে আবশ্যক হয়।

যে দিন সোমযজ্ঞের সবনের অনুষ্ঠান হয়, সে দিনের নাম সুত্যা দিন। অগ্নিষ্টোমে সুত্যা দিনের পূর্ব্বে অন্ততঃ আর চারিটি দিন সোমযাগের প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক হয়। সেই সকল প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম পূর্ব্বে সম্পাদন না করিলে সোমযজ্ঞে অধিকার জন্মে না। কাজেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ পাঁচ দিনের কমে সম্পন্ন হইতে পারে না। কোন্ দিনের কি কাজ, নিম্নে দেখান যাইতেছে।

প্রথম দিন—সপত্নীক যজমানের দীক্ষা ও দীক্ষাঙ্গ দীক্ষণীয়েষ্টি যাগ।

দ্বিতীয় দিন—পূর্ব্বাহ্লে সোমযাগের আরম্ভসূচক প্রায়ণীয় ইষ্টিযাগ, সোম ক্রয়, সোমের সংকারার্থ আতিথ্যেষ্টি যাগ। আতিথ্যের পর প্রবর্গ্য কর্ম্ম ও উপসদিষ্টি যাগ। অপরাহ্লে প্রবর্গ্য কর্ম্ম ও উপসদিষ্টি যাগ।

তৃতীয় দিন—পূর্ব্বাহ্লে প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি, অপরাহ্লে প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি। অপিচ ঐ দিন সৌমিক বেদি (মহাবেদি) নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়।

চতুর্থ দিন—(উপবসথ্য দিন) পূর্ব্বাহ্লেই প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৎপরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ। সায়ংকালে পরদিনের সোমাভিষব কর্ম্মের জন্য বসতীবরী-নামক জল আনিয়া রাখিতে হয়। শেষ রাত্রিতে ঋত্বিকের সোমযাগের আয়োজন; হোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করেন।

পঞ্চম দিন—(সুত্যা দিন) প্রাতে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্নে তৃতীয় সবন। তৎপরে অবভৃথস্নান ও যজ্ঞসমাপ্তিসূচক অনুবন্ধ্য পশুযাগ ও সর্ব্বশেষে উদবসানীয় ইষ্টিযাগ।

দেখা যাইতেছে, সোমযজ্ঞের অধিকার লাভের জন্য এবং উহার সম্পূর্ণতার জন্য কতিপয় ইষ্টিযাগও করিতে হয়। যথা—দীক্ষণীয়েষ্টি, প্রায়ণীয়েষ্টি, আতিথ্যেষ্টি, প্রবর্গ্যসমেত উপসদিষ্টি, উদয়নীয়েষ্টি এবং উদবসানীয়েষ্টি। এই সকল ইষ্টিযাগ পূর্ণমাসেরই বিকৃতি। ইতঃপূর্ব্বে এই সকল ইষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমযাগের পূর্ব্বে বিহিত অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ ও পরে বিহিত অনুবন্ধ্য পশুযাগ, নিরূঢ়পশুযাগের বিকৃতি; উহারও পুনরুল্লেখ আবশ্যক নহে। অন্যান্য কর্ম্মগুলির বিবরণ যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়া অগ্নিষ্টোম যাগের অনুষ্ঠান বুঝান যাইতেছে।

প্রথম দিন

বসন্তকালে দেবপক্ষে অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠেয়। যজমান মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া ঋত্বিক্‌বরণ করেন। সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি যজমানের পক্ষ হইতে ষোল জন ঋত্বিক্‌কে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। যজমান প্রথমে ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারি জন প্রধান ঋত্বিক্ বা মহর্ত্বিক্ বরণ করিয়া, পরে তাঁহাদের বার জন সহকারী বা হোত্রাশংসীর বরণ করেন। ঋত্বিক্‌দের নাম যথা—

চতুর্ব্বেদী—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র (নামান্তর অগ্নীৎ), পোতা।

সামবেদী—উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্যা।

ঋগ্বেদী—হোতা, মৈত্রাবরুণ (নামান্তর প্রশাস্তা), অস্থাপক, গ্রাবস্তুৎ।

যজুর্ব্বেদী—অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা।

[এতন্মধ্যে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী ও অস্থাপক, এই তিন জনের উপাধি হোত্রক।]

দেবগণ স্বয়ং যজ্ঞপরায়ণ; অগ্নি তাঁহাদের হোতা, আদিত্য অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা, অপ্‌সমূহ হোত্রাশংসী। অগ্নিষ্টোমে যজমান প্রথমে এই দেবঋত্বিক্‌গণকে বরণ করিয়া, তৎপরে মনুষ্যলোকে তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সোমপ্রবাক কর্ত্তৃক আহূত মানুষ ঋত্বিক্‌দের বরণ করেন।

কৌষীতকিমতে আর একজন ঋত্বিকের বিধান আছে—ইঁহার নাম সদস্য। সদস্য থাকিলে ঋত্বিক্‌সংখ্যা সতের হন। বরণান্তে মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দেবযজনভূমি প্রার্থনা করেন। "অগ্নির্মে হোতা স মে দেবযজনং দদাতু" ইত্যাদি ক্রমে প্রথমে দেবঋত্বিক্‌গণের নিকট দেবযজন প্রার্থনা করিয়া, পরে মানুষ ঋত্বিক্‌দের নিকট প্রার্থনা হয়।

যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ ভূমির নাম দেবযজনভূমি। দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগ যজমানের গৃহস্থিত অগ্নিশালাতেই হয়, কিন্তু অগ্নিষ্টোমের মত অনুষ্ঠানবহুল কর্ম্মের জন্য গ্রামের বাহিরে উচ্চ, দৃঢ় সমতল ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া সেইখানে যাইতে হয়। ঐ দেবযজনভূমিতে একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। উহা আকারে সমচতুর্ভুজ বা দীর্ঘচতুর্ভুজ। তদনুসারে উহার নাম বিমিত (দীক্ষিত বিমিত) বা শালা। খুঁটির উপরে বাঁশ খাটাইয়া মণ্ডপের আচ্ছাদন হয়। আচ্ছাদনের বাঁশগুলি পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত হয় বলিয়া এই শালার নাম প্রাগ্‌বংশ বা প্রাচীনবংশশালা। শালার চারি দিকে বেড়া দিয়া দুয়ার রাখিবে।

এই মণ্ডপের ভিতরে যজ্ঞাঙ্গ ইষ্টিযাগগুলির অনুষ্ঠানের জন্য ঐষ্টিক বেদি ও গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নির স্থান করিতে হয়। যজমানের গৃহস্থিত অগ্ন্যাগারের যেমন তিন অগ্নি ও বেদি থাকে, এখানেও ঠিক তদ্রূপ হইবে। গার্হপত্যের স্থান বৃত্তাকার, আহবনীয়ের চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নি অর্দ্ধবৃত্তাকার হইবে। গার্হপত্যের পূর্ব্বে আহবনীয়, উভয়ের মধ্যে ঐষ্টিক বেদি, তাহার দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি।*

যজমানের গৃহস্থিত গার্হপত্য দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকে, অগ্নিহোত্র বা দর্শপূর্ণমাসাদিতে যাগের পূর্ব্বে গার্হপত্য হইতে অগ্নি তুলিয়া আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালান হয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নির উদ্ধরণ। দেবযজন-দেশে যে নূতন গার্হপত্য স্থাপিত হয়, উহাতে অরণিদ্বয় দ্বারা যথাবিধি অগ্নি মন্থন করিয়া অগ্নি স্থাপনা করা হয় এবং সেই গার্হপত্য হইতে অগ্নির উদ্ধরণ করিয়া নূতন আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নির স্থাপনা হয়। কিন্তু গৃহস্থিত গার্হপত্য ও দেবযজনের গার্হপত্য যে স্বতন্ত্র অগ্নি নহে, উভয়

* পরিশিষ্টে চিত্র দেওয়া ত্রিবেদী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল।—সম্পাদক

অগ্নিই এক, ইহা বুঝাইবার জন্য গৃহ হইতে গার্হপত্য অরণিদ্বয় তপ্ত করিয়া আনিতে হয়, এবং সেই তপ্ত অরণি মন্থনদ্বারা দেবযজনের জন্য নূতন গার্হপত্যের উৎপাদন হয়। গৃহপতি যজমানের গৃহস্থিত অগ্নিকেই যেন অরণিতে সমারোপিত করিয়া দেবযজনে আনিয়া রাখা হইল এবং সেই গার্হপত্য হইতেই নূতন আহবনীয়ের ও দক্ষিণাগ্নিরও গ্রহণ হইল।

দেবযজনে অগ্নিস্থাপনের পর সপত্নীক যজমানের দীক্ষা।

শালার বাহিরে বসিয়া যজমান ও তাঁহার পত্নী নখ কাটিবেন। যজমান কেশ ও শ্মশ্রু ফেলিয়া মুণ্ডন করিবেন। উভয়ে স্নানান্তে নূতন ক্ষৌম বসন পরিবেন। দর্ভের উপর দাঁড়াইয়া নবনীত (মাখন) দিয়া মস্তক হইতে অধঃক্রমে শরীরের অভ্যঙ্গ করিবেন। চক্ষুতে অঞ্জন পরিবেন, কুশগুচ্ছ (দর্ভপিঞ্জল) দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিয়া পূত করিবেন। নাভির উপর সাতগাছি কুশ দিয়া দুই বার, নাভির নিম্নে সাতগাছি কুশ দিয়া এক বার, এই একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলে মার্জ্জন করিবেন। দুই হাতের অঙ্গুলিসঙ্কোচ দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাগ্‌যত হইয়া শালার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেখানে দীক্ষণীয়েষ্টিযাগ-সমাপ্তির পর আহবনীয়ের দক্ষিণে দুইখানি কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণ মৃগের চর্ম্ম) পাতিয়া তাহার উপর বসিবেন। মুঞ্জ তৃণ ও শণে নির্ম্মিত ত্রিগুণ বেণার আকারে গ্রথিত মেখলা পরিবেন, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন, পরিধানবস্ত্রে কৃষ্ণ মৃগের বিষাণ (শৃঙ্গ) বাঁধিয়া লইবেন। (উহা গাত্রকণ্ডূয়নাদিতে লাগিবে), হস্তে উদুম্বরদণ্ড গ্রহণ করিবেন। যজমানের পত্নী মেখলার স্থলে যোক্ত্র কটিতে পরিবেন, কণ্ডূয়নার্থ উদুম্বরশঙ্কু লইবেন। এইরূপে বেশভূষা করিলে একজন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবেন—"দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ"—এই ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন।

দীক্ষিতকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদুবাক্য বলিবেন, ব্রাহ্মণকে চমসিত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে বিচক্ষণ বিশেষণ দিয়া সম্বোধন করিবেন। সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমনকালে শালামধ্যেই থাকিবেন, জলে প্রবেশ করিবেন না, বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। শূদ্রসম্ভাষণ, গুরুজনের অভিবাদন, দান, অগ্নিহোত্র পর্য্যন্ত দীক্ষিতের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভোজন সম্বন্ধেও তাঁহাকে নিয়ম পালন করিতে হয়। যে দিন অপরাহ্নে দীক্ষা হয়, সেই দিন দীক্ষার পূর্ব্বে

পায়স মোদকাদি ইচ্ছামত খাইয়া লইবেন; কিন্তু দীক্ষার পর ভোজনের বাঁধাবাঁধি নিয়ম। তখন দুই বেলা দুগ্ধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম "ব্রত"। দুগ্ধপান "ব্রতপান"। যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা যায়, তাহার নাম "ব্রতদুঘা" গাভী। সন্ধ্যার পর দোহন করিয়া, সেই দুগ্ধ শেষ রাত্রিতে ও প্রাতে দোহন করিয়া, সেই দুগ্ধ মধ্যাহ্নের পর পান হয়। দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। দীক্ষার দিন সন্ধ্যার পর গাভীর চারিটি স্তন (বাঁট) হইতে দোহন হয় এবং সপত্নীক যজমান তাহা শেষ রাত্রিতে পান করেন। পরদিনের দুগ্ধ তিন স্তন হইতে, তৎপরদিন দুই স্তন হইতে, তৎপরদিন এক স্তন হইতে দুগ্ধ লওয়া হয়। পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ সুত্যাদিনে—যে দিন প্রকৃত সোমযাগ, সে দিন আর দুগ্ধ পানও চলে না। সে দিন কেবল হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়। ব্রতদুগ্ধ যজমানের জন্য গার্হপত্য অগ্নিতে ও তাঁহার পত্নীর জন্য দক্ষিণাগ্নিতে পাক হয়।

দ্বিতীয় দিন

পরদিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক প্রায়ণীয়েষ্টি যাগ। প্রায়ণীয়েষ্টির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যে চরুস্থালীতে চরু পাক করিয়া অদিতির উদ্দেশে যাগ হয়, তাহা না ফেলিয়া, যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয়েষ্টির জন্য রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বেদির উপর আস্তীর্ণ কুশগুলিও উদয়নীয়ের জন্য রাখিয়া দেন। ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

প্রায়ণীয় ইষ্টির পর সোম ক্রয় করিতে হয়। সোম পার্ব্বত্য লতা। এক সময়ে সোম গন্ধর্ব্বদিগের নিকট ছিল, দেবগণ কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৫ম অধ্যায় ১ম খণ্ডে তাহার আখ্যায়িকা আছে। গন্ধর্ব্বগণ স্ত্রীকামী। দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বাগ্‌দেবতাকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাগ্‌দেবতা নগ্না কুমারীর রূপ ধরিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন।

এ স্থলেও সেই পুরাতন ঘটনার অনুকরণে সোম ক্রয়ের অভিনয় হয়। সোমলতা পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত থাকে। দীক্ষার দিন উহা শালামধ্যে রক্ষিত ছিল। পরদিন উহা বাহিরে আনিয়া ক্রয়ের অভিনয় হয়। সোমবিক্রয় নিন্দিত কর্ম্ম। কুৎসগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ অথবা কোন

শূদ্র সেই সোমকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বিক্রয় করিতে বসেন। গোচর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর সোমখণ্ড রাখা হয়। সোম ক্রয়ের জন্য একটি বৎসতরী শালার বাহিরে থাকে—এই বাছুরটি বাগ্‌দেবতার স্থানীয়। অধ্বর্য্যু গাভীকে ছাড়িয়া দেন, গাভী ছয় পা চলিয়া সপ্তম পদ ফেলিলে যজমান, অধ্বর্য্যু ও কয়েকজন ঋত্বিক্ উহাকে ঘেরিয়া বসেন ও সপ্তম পদচিহ্নের উপর এক টুক্‌রা সোনা (হিরণ্য) রাখিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি দেন। হিরণ্য অগ্নিস্বরূপ—উহার উপর আহুতি দেওয়া চলে। সেই পদচিহ্নের ধূলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়—পরে কাজে লাগিবে।

অধ্বর্য্যু সোমবিক্রয়ীর নিকট আসিয়া সোমের দর করিয়া ক্রয় করিবেন। এই ক্রয়ব্যাপারের অভিনয় একটু কৌতুককর। অধ্বর্য্যু ও সোমবিক্রয়ীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবে।

অধ্বর্য্যু। এই সোম কি বিক্রয়ের জন্য?

বিক্রেতা। হাঁ, বিক্রয়ের জন্য।

অধ্বর্য্যু। আচ্ছা, আমি কিনিব।

বিক্রেতা। কিনুন না।

অধ্বর্য্যু। এই বাছুরটির ষোল ভাগ মূল্য দিব।

বিক্রেতা। সে কি মহাশয়, সোম রাজা—এত কম মূল্যে কি দিতে পারি?

অধ্বর্য্যু। গরুটা কি সামান্য? ইহার দুধে সর হয়, ক্ষীর হয়, ছানা হয়, ঘোল হয়। আচ্ছা, ইহার আট ভাগ মূল্য দিব।

বিক্রেতা। তা কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। আমার গরুটাই কি কম? আচ্ছা, ইহার সিকি মূল্য দিব।

বিক্রেতা। তা কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। গরুই কি কম? আচ্ছা, অর্দ্ধ মূল্য দিব।

বিক্রেতা। তাও কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। আচ্ছা, গরুটাই দিব।

তখন বিক্রেতা সম্মত হইলে অধ্বর্য্যু বাছুরটির বিনিময়ে সোম গ্রহণ করিবেন। পরে বাছুরটিকেও ছাড়াইয়া লইতে হইবে। আরও কতিপয় দ্রব্য—হিরণ্যখণ্ড, বস্ত্র, ছাগল, এক জোড়া গাই বলদ, আর তিনটি গাভী বিক্রেতাকে দেখাইবেন। বিক্রেতা লোভে পড়িয়া চক্‌চকে হিরণ্যখণ্ড

গ্রহণ করিবে। অধ্বর্য্যু বাছুরটিকে সরাইয়া লইয়া সহসা বিক্রেতার হাত হইতে স্বর্ণখণ্ড কাড়িয়া লইবেন ও বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া বিক্রেতাকে খেদাইয়া দিবেন। সোমবিক্রেতার সকলই গেল—সে গন্ধর্ব্বের স্থানীয়—দেবতারা গন্ধর্ব্বদিগকে ঠকাইয়া সোম আনিয়াছিলেন।

একখানা কাপড়ে সোম জড়াইয়া, আর এক টুক্‌রা কাপড়ে বাঁধিয়া, যজমান উহা মাথায় করিয়া লন ও নিকটে দুই বলীবর্দ্দবাহিত শকট থাকে, সেই শকটে কৃষ্ণাজিনের উপর রাখিয়া দেন। তার পর সেই শকটে করিয়া সোমকে শালার মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। যজমান গাড়ীর উপরে সোম ছুঁইয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু শকটের পিছনে বসেন। সুব্রহ্মণ্যনামা ঋত্বিক্ গাড়ী হাঁকাইয়া দেন। গাড়ী চলিতে থাকিলে হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড)।

শকটখানি শালার ঈশান দিকে লইয়া গিয়া, একটি বলদ খুলিয়া, আর একটি গাড়ীতে জোড়া থাকিতেই সোম শকট হইতে নামাইতে হইবে এবং উদুম্বর (ডুমুর) আসন্দীর (আসনের) উপর কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া তাহার উপর সোম রাখিয়া আপাততঃ আহবনীয়ের দক্ষিণে স্থাপন করিবে।

সোমের উপাধি রাজা। রাজা গৃহে আসিলে তাঁহার যেমন অভ্যর্থনা আবশ্যক, সেইরূপ সোম শালা-প্রবেশ করিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আতিথ্যেষ্টি করিবে। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া, সেই মথিত অগ্নি আহবনীয়ের অগ্নিতে মিশাইয়া, তাহাতেই আতিথ্যেষ্টি ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট পুরোডাশ দান হইবে। আাতথ্যেষ্টির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

আতিথ্যেষ্টির পুরোডাশ দান ও ইড়াভক্ষণের পর একটি অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম তানূনপত্র। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় দেবগণ ঐক্যদ্বারা বলবৃদ্ধির সম্ভাবনায় একমত হইয়া একসঙ্গে আজ্যস্পর্শ দ্বারা শপথ করিয়াছিলেন। তদনুকরণে সকল ঋত্বিক্ ও যজমান একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে একমত হইয়া কর্ম্ম করিব; পরস্পর ক্রোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূনপত্র। তানূনপত্রে ব্যবহৃত আজ্য রাখিয়া দিতে হয়, যজমান ব্রতদুগ্ধ পানের সময় ঐ আজ্য দুগ্ধে মিশাইয়া পান করেন।

ব্রাহ্মণমতে ঘৃত ভীষণ দ্রব্য। ইন্দ্র ঘৃতকে বজ্রস্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারা বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। রাজা সোমের নিকট ঘৃত আনা ক্রূর কর্ম্ম।

রাজা সোম আহবনীয় অগ্নির নিকট আসন্দীতে স্থাপিত আছেন, তাঁহার নিকটেই ঘৃতস্পর্শ দ্বারা ঋত্বিকেরা তানূনপত্র করিয়াছেন, ইহাতে রাজা সোমের প্রতি ক্রূর কর্ম্ম করা হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪র্থ অধ্যায়, ৯ম খণ্ড)। এখন সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতিবিধানার্থ রাজা সোমের আপ্যায়ন কর্ত্তব্য। যজমান খানিকটা উষ্ণ জল স্পর্শ করিয়া আপনার হাতের মুষ্টি ও কটিস্থ মেখলা আরও দৃঢ়বদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নীও ঐরূপ করেন। ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু, অগ্নীধ্র ও যজমান, এই ছয় জনে উষ্ণ জল স্পর্শের পর কাপড় খুলিয়া সোম বাহির হইলে সোমে জল ছিটাইয়া তাঁহার আপ্যায়ন বা তৃপ্তিবিধান করেন। আপ্যায়নের মন্ত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায় ৯ম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রের জন্য সোমের অংশু (খণ্ড) সকল আপ্যায়িত (বর্দ্ধিত) হউক ; ইন্দ্র ও সোম পরস্পর আপ্যায়িত করুন—সবনকাল পর্য্যন্ত সোম নির্ব্বিঘ্নে থাকুন। ফলকথা, সোমের টুক্‌রাগুলি তিন দিন ধরিয়া কাপড়ে বাঁধা থাকিবে। চতুর্থ দিনে উহা ছেঁচিয়া রস বাহির করিতে হইবে। এই কয় দিনে সোমকে সরস রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা।

ঐষ্টিক বেদির উপর এক গোছা কুশ থাকে, উহার নাম প্রস্তর। ঐ প্রস্তরের বা কুশগুচ্ছের উপরে জুহূনামক হোমের হাতা রাখিতে হয়। কোন দ্রব্য আহবনীয়ে আহুতি দিবার সময় অধ্বর্য্যু জুহূ প্রস্তরের উপর হইতে তুলিয়া লন এবং জুহূতে হোমদ্রব্য রাখিয়া তদ্দ্বারা আহবনীয়ে প্রক্ষেপ করেন। সোমের আপ্যায়নের পর ঐ ছয় জন (যজমান ও পাঁচ জন ঋত্বিক্) সেই প্রস্তরের উপর দুই হাত উত্তান (চিৎ) করিয়া ধরেন, বাম হাত নীচে ও ডানি হাত উপরে থাকে, ঐরূপ প্রস্তরে হাত রাখিয়া নিহ্নব করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আপ্যায়নমন্ত্রের পরই নিহ্নবমন্ত্র দেওয়া আছে। নিহ্নব অর্থে নমস্কার, পূজা। দ্যাবাপৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। ঐতরেয় বলিতেছেন, রাজা সোম দ্যাবাপৃথিবীর অপত্যস্বরূপ। তাঁহাকে নমস্কার করিলে সোমেরও বর্দ্ধন হয়।

সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নবকর্ম্মের নামান্তর অবান্তর দীক্ষা।

আতিথ্যেষ্টি ও অবান্তর দীক্ষার পর পূর্ব্বাহ্লেই প্রবর্গ্য ও উপসৎ। অপরাহ্লেও পুনরায় প্রবর্গ্য ও উপসৎ। প্রবর্গ্য ও উপসদের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক উপসদের মাঝে একবার করিয়া সোমের

আপ্যায়ন ও নিহ্নব করিতে হয় (কাত্যায়ন)। কেবল এই কথাটি অধিক বলা আবশ্যক যে, সোমকে সরস রাখিতে হয়।

তৃতীয় দিন

এ দিনও পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্যান্তে উপসৎ ও অপরাহ্নে প্রবর্গ্য ও উপসৎ। উপসদের মধ্যে সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নব।

পূর্ব্বাহ্নের প্রবর্গ্য ও উপসৎ সমাপ্ত করিয়া এই দিন সোমযাগের উপযোগী সৌমিক বেদি বা মহাবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। পূর্ব্বে দেবযজনভূমিতে দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিযাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তিন অগ্নির স্থাপনা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বেদি ও অগ্নি সোমযাগের বা তদন্তর্গত পশুযাগের উপযোগী নহে। ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নি, তাহারও পূর্ব্বে এই মহাবেদি নির্ম্মিত হইবে। নিম্নে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহাতে এই মহাবেদির আকার আয়তন বুঝা যাইবে।

এই মহাবেদি ঐষ্টিক বেদি অপেক্ষা বৃহত্তর। আকারে উহা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। পশ্চিম ও পূর্ব্বের ভুজ সমান্তরাল, কিন্তু পশ্চিমের ভুজ বড় ও পূর্ব্বের ভুজ ছোট। উত্তর ও দক্ষিণের ভুজ সমান্তরাল নহে, কিন্তু সমান। ১৫ অঙ্গুলিতে এক পদ, আর ৩ পদে এক প্রক্রম। মহাবেদির পশ্চিম ভুজ (১৫ + ১৫ =) ৩০ প্রক্রম, পূর্ব্বভুজ (১২ + ১২ =) ২৪ প্রক্রম ; উভয় ভুজের দূরত্ব ৩৬ প্রক্রম।

বেদির চারি কোণের নাম—অংস ও শ্রোণি। পশ্চিম ভুজের দুই প্রান্তে শ্রোণি, আর পূর্ব্ব ভুজের দুই প্রান্তে অংস। এই মহাবেদির পূর্ব্বাংশের উপর সমচতুর্ভুজ উত্তরবেদি একটু উঁচু করিয়া তুলিতে হয়। যে গর্ত্তের মাটি তুলিয়া উত্তরবেদি গাঁথিতে হয়, উহার নাম চাত্বাল। উহা মহাবেদির উত্তরে থাকে। বেদির ধূলি আবর্জ্জনা যেখানে স্তূপীকৃত করা হয়, তাহা উৎকর। উহাও চাত্বালের নিকট, একটু পশ্চিমে। পশুযাগ প্রসঙ্গে যে পশুক বেদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এই সৌমিক বেদিও তাহারই মত। কেন না, ইহা সোমযাগ ও পশুযাগ, উভয়েরই উপযোগী। উত্তর-বেদির উপর প্লক্ষশাখা বিছাইতে হয়। তদুপরি মেষলোম, গুগ্গুল, পীতদারু (দেবদারু) কাঠ রাখিয়া, তদুপরি অগ্নি আনিয়া রাখিতে হইবে। মহাবেদি নির্ম্মাণের দিন অগ্নি আনা হয় না, পরদিন হইবে।

চতুর্থ দিন

এই দিনের নাম উপবসথ্য দিন। দিনের বেলা ব্রতদুগ্ধ পানের পর যজমানকে উপবাস করিতে হয়। রাত্রিতে আর ব্রতপান করিতে পান না। এ দিন পূর্ব্বাহ্নেই দুই বার প্রবর্গ্য ও উপসৎ সারিয়া লইতে হইবে। দুই উপসৎ শেষ করিয়া প্রবর্গ্যের সম্ভার(জিনিষপত্র, সরঞ্জাম)গুলি অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ (উৎসাদন) করিবে।

তৎপরে অনেকগুলি অনুষ্ঠান আছে। প্রথম অনুষ্ঠান :—অগ্নিপ্রণয়ন। ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বস্থিত আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর-বেদিতে রাখিতে হইবে। অগ্নিকে পশ্চিম হইতে প্রাঙ্‌মুখে বা পূর্ব্বমুখে আনিতে হয়—এই জন্য এই কর্ম্মের নাম প্রণয়ন। বরুণপ্রধান যাগে ও পশুযাগেও এইরূপ অগ্নিপ্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অতঃপর উত্তরবেদিস্থিত এই প্রণীত অগ্নিই আহবনীয়রূপে গণ্য হইবে, ইহাতেই পশুযাগ ও সোমযাগ সম্পন্ন হইবে। পুরাতন আহবনীয়ের আর আহবনীয়ত্ব থাকে না, উহার নাম হয় শালাদ্বার্য্য বা শালামুখীয় অগ্নি—প্রাগ্বংশশালার পূর্ব্বদ্বারের প্রবেশ-মুখে অবস্থিত বলিয়া ঐ নাম। শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে এখন গার্হপত্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান :—হবির্ধান প্রবর্ত্তন। সোমযাগে আহুতির জন্য নিষ্কাশিত সোমরস যে শকটে রক্ষিত হয়, তাহার নাম হবির্ধান। হবির অর্থাৎ হোমদ্রব্যের আধান বলিয়া ঐ নাম। দুইখানি শকটে গরু জুড়িয়া প্রাচীনবংশশালার পূর্ব্বদ্বারের নিকট আনিয়া রক্ষিত হয়। একখানি শকট অধ্বর্য্যুর, একখানি প্রতিপ্রস্থাতার। অধ্বর্য্যুর খানি একটু বড়। দুই শকটের উপর তৃণময় ছাদ (টপ্পর) বাঁধা হয়। শকট দুইখানি প্রাচীনবংশশালার পূর্ব্ব দুয়ারের দুই পার্শ্বে রাখিয়া অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা আপন আপন শকটের চাকার নীচে হিরণ্যখণ্ড রাখিয়া তদুপরি ঘৃতাহুতি দেন। সোমক্রয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, হিরণ্য অগ্নিস্বরূপ, উহাতে আহুতি হইতে পারে। যজমানের পত্নী শকটদ্বয়ের অক্ষধুরে ঘি মাখাইয়া দেন। তৎপরে ঋত্বিক্‌দ্বয় আপন আপন শকট মহাবেদি অভিমুখে চালাইবেন। শকটচক্র ঘর ঘর শব্দ করিতে থাকিলে হোতা হবির্ধানপ্রবর্ত্তনের (অর্থাৎ প্রাঙ্‌মুখে পরিচালনের) অনুকূলে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন। যজমানও যথাবিধি মন্ত্র পড়িবেন। মহাবেদির

ভিতর আসিলে গরু খুলিয়া লইয়া উত্তরবেদির পশ্চিম দিকে শকট দুই-খানি রাখিতে হইবে। শকটের যুগ (জোয়াল) ঠেকা দিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। দুই শকটের উপর মণ্ডপ গড়িতে হইবে। চাটাই বা দরমা দিয়া ঘিরিয়া মণ্ডপের দেওয়াল হইবে। উপরে তদ্বিধ আচ্ছাদন (ছাদ) থাকিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে দুয়ার থাকিবে—ঋত্বিকেরা মণ্ডপের মধ্য হইতে সেই দুয়ার দিয়া বাহিরে আসিয়া সম্মুখেই উত্তরবেদি দেখিতে পাইবেন। সেই দুয়ারের উপর বাঁশ চিরিয়া খিলানের মত করিয়া দিবেন—উহার নামররাটী। এই ররাটীকে অলঙ্কৃত করা হইবে। এইরূপে হবির্ধানশকট রক্ষার জন্য মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, সেই মণ্ডপের নামও হবির্ধানমণ্ডপ।

তৃতীয় অনুষ্ঠান :—উপরব খনন। দুইখানি হবির্ধানশকট মণ্ডপমধ্যে পাশাপাশি থাকে—একখানি থাকে উত্তরে, একখানি থাকে দক্ষিণে। দক্ষিণের শকটের নিম্নে, ভূমিতে চারিটি গর্ত্ত পাশাপাশি খুঁড়িতে হয়। গর্ত্তের গভীরতা বাহুপরিমাণ। নীচে চারিটি গর্ত্তে পরস্পর যোগ থাকে। এই গর্ত্তের উপর একখানা কাষ্ঠফলক পাতিয়া, তাহার উপর গোচর্ম্ম বিছাইয়া, তদুপরি সোমের টুক্‌রা ছেঁচিতে হয়। পরদিন সোমাহুতির পূর্ব্বে এইরূপ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশন করিতে হইবে। পূর্ব্বদিন তজ্জন্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। এই গর্ত্ত চারিটির নাম উপরব; উপরে কাঠের উপর যখন পাষাণের আঘাতে সোম ছেঁচা হয়, তখন এই গর্ত্তে ঢোলের মত শব্দ বা রব বাহির হয়—তজ্জন্য নাম উপরব। উপরবের নিকট বালি দিয়া একটা ঢিপি তুলিতে হয়—উহার নাম খর।

চতুর্থ অনুষ্ঠান :—সদোগৃহ নির্ম্মাণ। মহাবেদির পশ্চিমাংশে হবির্ধান-মণ্ডপের পশ্চিমে আর একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে—ইহার নাম সদঃশালা বা সদোগৃহ। মণ্ডপের দেওয়াল বেড়া দিয়া বাঁধিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে দ্বার রাখা হয়। উপরে বাঁশের মাচার উপর ছদি (আচ্ছাদন বা ছই) থাকে। এই মণ্ডপের দৈর্ঘ্য ১৮ হাত, বিস্তার ৯ হাত। এই মণ্ডপের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি এক সারি অগ্নিস্থান প্রস্তুত করিতে হয়—উহার নাম ধিষ্ণ্য। চাত্বাল হইতে মাটি তুলিয়া আনিয়া, মাটি ও বালি দিয়া এই ধিষ্ণ্যগুলি গঠিত হইবে। এক এক ধিষ্ণ্য ছোট চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, দীর্ঘে বিস্তারে ১৮ অঙ্গুলিপরিমিত। ধিষ্ণ্যের সংখ্যা ছয়টি।

মহাবেদির উত্তর সীমায় ও দক্ষিণ সীমায় দুইখানি ছোট ঘর তুলিয়া, তাহার মধ্যে দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান গড়িতে হয়। উত্তরের ধিষ্ণ্যের নাম আগ্নীধ্রীয়; ইহার নিকট আগ্নীধ্রনামা ঋত্বিক্‌কে বসিতে হইবে। দক্ষিণের ধিষ্ণ্যের নাম মার্জ্জালীয়। সদঃশালার মধ্যে যে ছয়টি ধিষ্ণ্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা উত্তর দিক্ হইতে যথাক্রমে অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, হোতা ও মৈত্রাবরুণের ব্যবহার্য্য।

১ অচ্ছাবাক্, ২ নেষ্টা, ৩ পোতা, ৪ ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, ৫ হোতা, ৬ মৈত্রাবরুণ, ৭ আগ্নীধ্রীয়, ৮ মার্জ্জালীয় [মোট এই আটটি ধিষ্ণ্য।]

হোতা ও মৈত্রাবরুণের ধিষ্ণ্যের মাঝে একটি উডুম্বরবৃক্ষের শাখা পুঁতিতে হয়, ইহা স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা সামগান করেন।

পঞ্চম অনুষ্ঠান :—অগ্নির ও সোমের প্রণয়ন। আহবনীয় অগ্নি ইতঃপূর্ব্বেই উত্তরবেদির নাভিতে স্থাপিত হইয়াছে, ঐ অগ্নি আহুতির জন্য। ধিষ্ণ্যগুলিতে স্থাপনের জন্য অগ্নির প্রয়োজন। শালাদ্বার্য্য (পুরাতন আহবনীয়) অগ্নি হইতে গ্রহণ করিয়া ধিষ্ণ্যের জন্য অপর অগ্নি লইতে হইবে। এই ক্রিয়া অপরাহ্নে অনুষ্ঠেয়। শালাদ্বার্য্য অগ্নি লইয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখিয়া দিতে হয়। তৎপশ্চাৎ সোমেরও প্রণয়ন কর্ত্তব্য। সোম এতক্ষণ প্রাচীনবংশশালায় ছিলেন। তাঁহাকেও লইয়া সদঃশালায় যাইতে হয় ও অন্যতর হবির্ধানশকটে রাখিয়া দিতে হয়। অগ্নি ও সোমের প্রণয়নের সময় হোতা তদনুকূল ঋক্ পাঠ করেন। এই সময়েই ঋত্বিকেরা পশুযাগের ও সোমযাগের সরঞ্জামগুলিও মহাবেদির দিকে লইয়া যান।

ষষ্ঠ অনুষ্ঠান :—অগ্নি এবং সোম মহাবেদিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ পশুযাগ বিধেয়। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু ছাগপশু—উহার বিশেষণ অগ্নীষোমীয় পশু। পশুযাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যূপছেদন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কার্য্যই করিতে হইবে। পশুর বপা, পশ্বঙ্গ, পশুপুরোডাশ, পৃষদাজ্য প্রভৃতি হোমদ্রব্য যথাবিধানে দিতে হইবে। ইহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

সপ্তম অনুষ্ঠান :—অগ্নীষোমীয় পশুযাগের সহিতই সোমযাগের পূর্ব্বে বিধেয় প্রাসঙ্গিক কর্ম্মগুলি শেষ হইল। এখন প্রকৃত সোমযাগের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পরদিন অর্থাৎ পঞ্চম দিন প্রাতেই

সোমযাগ আরম্ভ হইবে। সেই সোম ছেঁচিবার জন্য জল পূর্ব্বদিনই সায়ংকালে আনিয়া রাখিতে হয়—এই জলের নাম বসতীবরী। সংস্কৃত অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। নদীর স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাদ্য বাজাইয়া সমারোহে বসতীবরী আনিতে হয় এবং রাত্রির মত আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের নিকট রাখিতে হয়, সোমকেও হবির্ধান হইতে নামাইয়া রাত্রির মত সেইখানেই রাখিতে হয়। যজমান সারারাত্রি জাগিয়া সেইখানে পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন

পঞ্চম দিনে সোমযাগ। এই দিনের নাম সুত্যা দিন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যজমান ঋত্বিক্‌দিগকে জাগাইয়া দেন। ঋত্বিকেরা উঠিয়া যাগের ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রগুলি সাজাইয়া লন। সোম রাত্রিকালে আগ্নীধ্রীয়ে রক্ষিত ছিল; সেখান হইতে বাহির করিয়া, কাপড় খুলিয়া, হবির্দ্ধানে রাখা হয়। কেন না, এইখানেই উপরবের উপর উহা ছেঁচিতে হইবে। হোতা অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞাক্রমে প্রাতরনুবাকনামক ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। প্রাতঃকালে পাখী ডাকা পর্য্যন্ত এই প্রাতরনুবাক পাঠ করিতে হয়, কাজেই মন্ত্রসংখ্যা অনেকগুলি। পাখী ডাকিতে বিলম্ব হইলে মন্ত্রসংখ্যা আবশ্যকমত বাড়াইয়া লইতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ডে এই প্রাতরনুবাকমন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য ও নিয়ম বিবৃত হইয়াছে।

এ দিন সোমযাগের সঙ্গে সঙ্গে পশুযাগেরও বিধান আছে। একটি অথবা বিকল্পে এগারটি পশুর দ্বারা যাগ হয়। এক পশু হইলে উহা ঋত্বিক্ উদ্দিষ্ট হয়। একাদশ পশু স্থলে অগ্নি ব্যতীত সরস্বতী, পূষ্ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে এগার পশু এগার যূপে অথবা এগার পশু একই যূপে বাঁধিতে হয়। সবনকর্ম্মের আনুষঙ্গিক এই পশুর নাম সবনীয় পশু। পশুযাগ প্রকরণে দেখা হইয়াছে, পশুযাগ মাত্রেই পুরোডাশ আহুতির বিধান আছে। সবনীয় পশুযাগে কেবল পুরোডাশ নহে; ধানা, করম্ভ, পরিবাপ ও পয়স্যা, এই কয় দ্রব্যেরও আহুতি দিতে হয়। ধানা অর্থে ভাজা যব, করম্ভ অর্থে ঘৃতপক্ব ছাতু, পরিবাপ অর্থে ঘৃতপক্ব চালভাজা এবং পয়স্যা অর্থে দুগ্ধমিশ্রিত দধি। হোতা যখন প্রাতরনুবাক-

মন্ত্র পড়িতে থাকেন, সেই অবসরে আগ্নীধ্রনামা ঋত্বিক্ এইগুলি যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালে প্রস্তুত হয়।

প্রাতরনুবাক পাঠ শেষ হইলে অর্থাৎ প্রত্যূষে, অধ্বর্য্যু আর কয়েক জন ঋত্বিক্ ও পরিকর্ম্মী (পরিচারক) সঙ্গে লইয়া তড়াগাদি হইতে জল আনিতে যান। তিনটি বা পাঁচটি কলশে জল তুলিতে হয়। এই কলশের নাম একধন কলশ—জলের নাম একধনা। যজমানের পত্নীও ঐ সঙ্গে দুইটি পৃথক্ কলশে জল তুলিয়া আনেন; ঐ জলের নাম পান্নে জল। ইহার ব্যবহার পরে দেখা যাইবে। পরিকর্ম্মীরা একধন কলশে জল তুলিয়া আনেন; অধ্বর্য্যু পৃথক্ একটা ছোট পাত্রে জল আনেন। ঐ জলের সহিত পূর্ব্বদিনের সায়ংকালে আনীত বসতীবরী জল স্পর্শ করাইয়া, বসতীবরীর কিয়দংশ একধনায় মিশাইয়া পৃথক্ পাত্রে রাখা হয়। এই জলের নাম হয় নিগ্রাভ্য। সোম ছেঁচিবার সময় বসতীবরী, একধনা ও নিগ্রাভ্য, এই তিন জলই আবশ্যক হইবে। হোতা ইঁহাদের সঙ্গে জল আনিতে যান নাই। তিনি হবির্দ্ধানমণ্ডপের দ্বারে বসিয়া ছিলেন এবং অপোনপ্ত্রীয়নামক সূক্ত পড়িতেছিলেন। ইঁহারা জল লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সূক্তপাঠ শেষ হয় এবং হোতা প্রশ্ন করেন—"অবেরপাঃ"—জল পাইয়াছ কি? অধ্বর্য্যু উত্তর দেন—"উতেম নন্নমুঃ"—উহা ঠিক পাইয়াছি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮ অধ্যায়, ২ খণ্ড)।

জল লইয়া হবির্দ্ধানে প্রবেশান্তর সোম ছেঁচিবার আয়োজন। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন, তৃতীয় সবন, তিন সবনেই সোমাহুতির জন্য সোমরস পৃথক্‌ভাবে বাহির করিতে হয়। এই সোমরস নিষ্কাশনকর্ম্মের নাম সোমের অভিষব।

হবির্দ্ধান-মণ্ডপমধ্যে উপরবনামক গর্ত্তের চারি দিকে অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, এই চারি জন ঋত্বিক্ ঘিরিয়া বসেন। উপরবের উপর কাষ্ঠফলক (অধিষবণ ফলক) চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম (অধিষবণচর্ম্ম) বিছাইয়া, তাহার উপরে সোমের টুক্‌রা রাখিতে হয় এবং পাষাণের (নুড়ির) আঘাতে সোম থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। এই পাষাণের নাম গ্রাব। চারি জন ঋত্বিক্ চারিখানি পাষাণ হাতে লইয়া, সোমকে চারি ভাগে লইয়া ছেঁচিতে থাকেন। প্রাতঃসবনে

সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিয়া ফেলা হয়, মাধ্যন্দিন সবনে বাকী অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়; কোন একখানা বড় টুক্‌রা পৃথক্ থাকে—উহা হইতে তৃতীয় সবনে রস নিষ্কাশন হয়। তৃতীয় সবনে অধিক রসের প্রয়োজন নাই। ছেঁচিবার সময় মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলের ছিটা দিতে হয় ও সোমখণ্ড নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া ও থেঁতলাইয়া যতক্ষণ সোমখণ্ড ঋজীষ অর্থাৎ নীরস ছিবড়ায় পরিণত না হয়, ততক্ষণ পাষাণের আঘাত দিয়া রস বাহির করিতে হয়। এইরূপে প্রাতঃসবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের জন্য প্রচুর রস পাওয়া যায়। প্রাতঃসবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের ঋজীষ(সোমের ছিবড়া)গুলি ফেলিতে নাই। তৃতীয় সবনে ঐ ঋজীষ নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ রস পাওয়া যায়। তৃতীয় সবনে অল্প রসের প্রয়োজন—ইহাতে সোম ছেঁচিবার সময় নিগ্রাভ্য জলে ভিজানও দরকার হয় না। এইরূপে সোমনিষ্কাশনের নাম মহাভিষব। আর একরকম অভিষব আছে, তাহাকে ছোট অভিষব বলে, উহা প্রাতঃসবনের আরম্ভে প্রযোজ্য। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ হইবে।

নিষ্কাশিত সোমরস রাখিবার জন্য কয়েকটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র (জালা) আবশ্যক। এইটির নাম আধবনীয়। এই আধবনীয় পাত্রে বসতীবরী ও একধনা, উভয় জল ঢালিয়া মিশাইতে হয়। প্রত্যেক সবনে উভয় জলের তৃতীয়াংশ লইতে হইবে। আধবনীয় এইরূপে জলপূর্ণ করিয়া, সেই জলে অভিষবে নিষ্কাশিত সোমরস ঢালিবে। এইরূপে আহুতির উপযোগী সোমরস প্রস্তুত হইবে। আধবনীয়ে সোমরস সঞ্চিত থাকে বটে, কিন্তু আহুতির জন্য সোমরস আধবনীয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় না। যতটুকু সোমরস একেবারে আহুতির জন্য গৃহীত হয়, তাহার নাম গ্রহ। গৃহীত বলিয়া গ্রহ। অনেক দেবতার উদ্দেশে আহুতির জন্য অনেক বার সোমরস অর্থাৎ গ্রহ লইতে হয়। এই গ্রহ আধবনীয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় না। দ্রোণ কলশ আর পূতভৃৎ নামে আর দুইটি বৃহৎ কাষ্ঠময় পাত্র থাকে। দ্রোণ কলশের মুখে মেষলোমের ছোট কম্বলের ছাঁকনি দিয়া আধবনীয়ের সোমরস উহাতে ঢালিতে হয়। ছাঁকা সোম দ্রোণ কলশে প্রবেশ করে। ছাঁকিলে উহা পূত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয়। যদ্দারা সোমকে পূত করা যায়, সেই ছাকনির নাম পবিত্র—পবিত্রের

প্রান্তে মেষলোমের সুতা (দশা) বাহির হইয়া থাকে, এই জন্য উহার নাম দশা-পবিত্র। সোম যখন ছাঁকা হয়, তখন উহার নাম হয় পবমান সোম। আধবনীয়ের সোমরস এইরূপে দ্রোণ কলশে ঢালিবার সময় সোমরসের যে ধারা অধোমুখে পতিত হয়, সেই ধারা হইতে কতিপয় গ্রহ গৃহীত হয়—এই গ্রহগুলির নাম ধারাগ্রহ। সোমরসের অর্দ্ধেক দ্রোণ কলশে ঢালিয়া অপরার্দ্ধ পূতভৃৎ নামক অপর পাত্রে রাখা হয়; আহুতির জন্য অন্য গ্রহগুলি এই দ্রোণ কলশস্থ সোমরস হইতে অথবা পূতভৃতের সোমরস হইতে গৃহীত হইয়া থাকে।

আহুতিকালে সোমরস গ্রহণের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের পাত্র থাকে। আকারভেদে এই পাত্রগুলি তিন শ্রেণীর; কতকগুলির নাম "পাত্র," কতকগুলির নাম "স্থালী," কতকগুলির নাম "চমস"। পাত্রের সংখ্যা ১১, স্থালীর সংখ্যা ৪, চমসের সংখ্যা ১০। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল।

পাত্র

উপাংশু পাত্র ১, অন্তর্যাম পাত্র ১, দ্বিদেবত্য পাত্র ৩, শুক্র পাত্র ১, মন্থি পাত্র ১, আদিত্য পাত্র ১, উক্থ্য পাত্র ১, ঋতু পাত্র ২। সমষ্টি—১১।

স্থালী

আদিত্য স্থালী ১, উক্থ্য স্থালী ১, আগ্রায়ণ স্থালী ১, ধ্রুব স্থালী ১। সমষ্টি—৪।

চমস

যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও হোতা, এই চারি জনের ব্যবহার্য্য—৪, মৈত্রাবরুণ, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক, এই ছয় জনের ব্যবহার্য্য—৬। সমষ্টি—১০।

প্রাতঃসবন

এখন প্রাতঃসবনে সোমাহুতির ক্রমানুসারে বিবরণ দেওয়া যাইবে।

১। উপাংশু গ্রহ—সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই আহুতি। [চারি জন ঋত্বিক্ চারি পাষাণের আঘাতে সোমরস নিষ্কাশন

করিয়া আধবনীয়ে ঢালেন; ইহাই অভিষবের সাধারণ নিয়ম এবং এই অভিষবের নাম মহাভিষব। আর একরকম অভিষব আছে; তাহার নাম ক্ষুল্লকাভিষর্ব বা ছোট অভিষব; ইহাতে কেবল অধ্বর্য্যু পঞ্চম ও স্বতন্ত্র একখানি পাষাণের আঘাতে কিঞ্চিৎ সোমরস বাহির করেন। এই রস আধবনীয়ে না ঢালিয়া একেবারে উপাংশুপাত্র নামক পাত্রে গ্রহণ করা হয়। এই উপাংশু পাত্রে গৃহীত রসের নাম উপাংশুগ্রহ। অধ্বর্য্যু হবির্দ্ধানের বাহিরে আসিয়া ঐ উপাংশুগ্রহ উত্তরবেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন।] এই সোমাহুতির পূর্ব্বে হোতাকে অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পড়িতে হয় না; অধ্বর্য্যু স্বয়ং উপাংশু (অনুচ্চ) স্বরে একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া সুর্য্যের উদ্দেশে সোম ঢালিয়া দেন।

উপাংশুগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় গ্রহ মহাভিষবে নিষ্কাশিত সোমরস হইতে গৃহীত হয়।

২। অন্তর্যাম গ্রহ—সুর্য্যের উদ্দিষ্ট। ইহা ধারাগ্রহ অর্থাৎ মহাভিষবে নিষ্কাশিত ও আধবনীয়ে সঞ্চিত সোমরসের ধারা দ্রোণ কলশে ঢালিবার সময় এই স্রবন্ত ধারা হইতে অন্তর্যামপাত্রনামা পাত্রে গৃহীত। সুর্য্যোদয়ের পরে অধ্বর্য্যু এই গ্রহ লইয়া আহুতি দেন। আহুতির রীতি উপাংশু-গ্রহের মতই। এখানেও অনুবাক্যা যাজ্যা নাই; হোমশেষভক্ষণও নাই। [অন্তর্যামগ্রহ আহুতির পর আরও কতিপয় ধারাগ্রহ গ্রহণ করিয়া গ্রহপাত্রগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। পরে অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা ও যজমান সামগায়ী ঋত্বিক্‌দের সহিত হবির্দ্ধানের বাহিরে আসিয়া মহাবেদির উত্তরে চাত্বালের নিকটে আসিয়া বসেন। তখন উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সামমন্ত্রে পবমান-স্তোত্রনামক স্তোত্র গান করেন। ধারাগ্রহ গ্রহণকালেই আধবনীয়ের সোমের অর্দ্ধাংশ দ্রোণ কলশে গৃহীত হইয়াছিল। অপর অর্দ্ধাংশ এই সময়ে অর্থাৎ স্তোত্রগানকালে পূতভৃৎনামক অপর পাত্রে ঢালা হয়। পূতভৃতের মুখে ছাঁকনি দিয়া সোম ছাঁকিয়া ঢালা হয়। উন্নেতানামক ঋত্বিক্ সোম ঢালিতে থাকেন। যে সোম এইরূপে ছাঁকা বা পূত করা হইতেছে, তাহার নাম পবমান সোম।

পবমান সোম ঢালিবার সময় গীত স্তোত্রের নাম পবমানস্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে চাত্বালের নিকট গীত হয় বলিয়া এই স্তোত্রের নাম

বহিষ্পবমানস্তোত্র। পূর্ব্বদিন অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখা হইয়াছিল। এ ধিষ্ণ্য আগ্নীধ্রনামা ঋত্বিকের আস্থ স্তোত্রান্তে আগ্নীধ্র আপন ধিষ্ণ্য হইতে অগ্নি তুলিয়া সদোগৃহ হইতে 'অন্য ধিষ্ণ্যগুলিতে রাখেন। সোমাহুতির কালে ঋত্বিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ধিষ্ণ্যের নিকট বসিয়া থাকেন। এই সময় সবনীয় পশুযাগের আয়োজন হয়। পশুযাগের বিধানক্রমে পশুর আলম্ভন ও পশুর বপা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ এবং হরি (ইন্দ্রের অশ্ব), পূক্ষ, সরস্বতী ও মিত্রাবরুণের উদ্দেশে ধানা, করম্ভ, দধি ও পয়স্যা দেওয়া হয়। পুরোডাশাদি আহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক স্বিষ্টকৃৎ যাগ সমাপ্ত করিয়া পুরোডাশাদি হইতে ভক্ষণার্থ ইড়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়—ইড়াভক্ষণ এখন স্থগিত থাকে।]

৩-৫। দ্বিদেবত্য গ্রহত্রয়—সোমাহুতির পাত্রমধ্যে তিনটি দ্বিদেবত্য পাত্রের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিদেবত্য পাত্রে আহুতির জন্য গৃহীত সোমরসের নাম দ্বিদেবত্য গ্রহ। প্রত্যেক গ্রহ দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট—এই জন্য নাম দ্বিদেবত্য। প্রথম ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ—ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট; দ্বিতীয় মৈত্রাবরুণ গ্রহ। প্রথম দুই গ্রহ ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত ধারাগ্রহ, তৃতীয় গ্রহ দ্রোণ কলশস্থিত অথবা পূতভৃৎস্থিত রস হইতে গৃহীত।

অধ্বর্য্যু ক্রমান্বয়ে ঐ তিন গ্রহ আহবনীয়ে আহুতি দিবেন। আহুতির পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা ও হোতা যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন—যাজ্যান্তে বষট্‌কারকালে আহুতি দেন। প্রত্যেক আহুতির সময় অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দ্রোণ কলশস্থিত সোমরস আদিত্যপাত্রে গ্রহণ করিয়া আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন ও সোমাবশেষ আদিত্যস্থালীতে রাখেন।

তিন দ্বিদেবত্য গ্রহের হোমশেষ হোমকর্ত্তা (অধ্বর্য্যু) ও বষট্‌কর্ত্তা (হোতা) একযোগে ভক্ষণ করেন। ঘ্রাণমাত্রে ভক্ষণ অথবা ঠোঁট ভিজাইলেই চলে, পান অনাবশ্যক।

৬-৭। শুক্রগ্রহ ও মন্থিগ্রহ—ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। উভয়ই ধারাগ্রহ। অধ্বর্য্যু শুক্রগ্রহ ও তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা মন্থিগ্রহ মন্থিপাত্রে গ্রহণ করিয়া উত্তরবেদির পূর্ব্বদিকে যূপের নিকটে গিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যান্তে বষট্‌কারকালে আহবনীয়ে আহুতি

দেন। এখানে গ্রহশেষ, হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা মিলিয়া উভয়কে পান করিতে হয়। কেবল ঘ্রাণে চলে না।

শুক্র ও মন্থিগ্রহের আহুতির সমকালে চমসহোম হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সোমাহুতির জন্য দশটি চমস থাকে। যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, এই চারি জন চমসীর চারি চমস এবং মৈত্রাবরুণ, পোতা, নেষ্টা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক, এই ছয় জন চমসীর জন্য ছয় চমস। চমসে সোম গ্রহণ করিবার জন্য দশ জন লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাঁহাদের নাম চমসাধ্বর্য্যু। এক এক চমসীর নির্দ্দিষ্ট এক এক চমসাধ্বর্য্যু। অচ্ছাবাকের নির্দ্দিষ্ট চমসাধ্বর্য্যুকে বর্জ্জন করিয়া আর নয় জন চমসাধ্বর্য্যুর চমস সোমে পূর্ণ করিতে হয়। উন্নেতানামক ঋত্বিক্ পূতভৃতের সোমে চমসগুলি পূর্ণ করিয়া দেন। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা যখন শুক্রগ্রহ ও মন্থিগ্রহ আহুতি দেন, সেই সময়ে এই নয় জন চমসাধ্বর্য্যু আপন চমসের সোম আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন। ঢালিয়া—যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও হোতা, এই চারি জনের চমসাধ্বর্য্যু সেখান হইতে সরিয়া যান। অবশিষ্ট পাঁচ জন পুনরায় দ্রোণ কলশ হইতে সোমরস লইয়া একে একে অধ্বর্য্যুর হাতে দেন। যে চমস যে ঋত্বিকের, তিনি আপন ধিষ্ণ্যে উপবিষ্ট হইয়া অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করেন। যাজ্যান্তে বষট্‌কারকালে অধ্বর্য্যু একবার আহুতি দেন। "সোমস্য অগ্নে বীহি" বলিয়া অনুবষট্‌কারকালে অধ্বর্য্যু আবার আহুতি দেন। হোমশেষ পানের জন্য রক্ষিত হয়।

এই চমসাহুতির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা আসিয়া সদোগৃহে উপবিষ্ট হন ও সমারোহে সোমরসের হুতাবশেষ পান করেন। দ্বিদেবত্য গ্রহের ও শুক্রমন্থিগ্রহের শেষও এতক্ষণ পান করা হয় নাই—পানার্থ রক্ষিত ছিল মাত্র। কোন্ ব্যক্তি কোন্ গ্রহের শেষ পান করিবেন, এ বিষয়ে খুঁটিনাটি আছে। মোটামুটি এই বলা যায় যে, গ্রহশেষপক্ষে হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা, এই উভয়ে একযোগে পান করেন। আর চমসশেষপক্ষে যাঁহার চমস, যিনি সেই চমসে হোম করেন, আর যিনি যাজ্যাপাঠান্তে বষট্‌কার করেন, ইঁহারা একযোগে পান করেন। দ্বিদেবত্য গ্রহ পানের মন্ত্র সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৯ অধ্যায়, ৩ খণ্ড দ্রষ্টব্য। দ্বিদেবত্য গ্রহ

ভ্রাণমাত্রে পান করিয়া, শুক্র ও মন্থিগ্রহের শেষ পীত হয়, তৎপরে চমসগুলির শেষ পীত হয়।

চমসাহুতির কালে অচ্ছাবাক বৰ্জ্জিত হইয়াছিল। এইবার তাঁহার ডাক পড়ে। তিনি স্বয়ং পূতভৃৎ সোম তুলিয়া, নিজের চমসে লইয়া, উহা অধ্বর্য্যুর হাতে দেন। অচ্ছাবাক আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া যাজ্যান্তে বষট্কার ও অনুবষট্কার করেন। অধ্বর্য্যু বষট্কারকালে ও অনুবষট্কার-কালে সোমাহুতি দেন। পরে অধ্বর্য্যু ও অচ্ছাবাক, উভয়ে মিলিয়া চমসশেষ পান করেন। [পশুযাগের পুরোডাশাহুতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইড়াভক্ষণ স্থগিত ছিল; এই সময়ে যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়াভক্ষণ করেন ও পুরোডাশ-যাগের অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।]

৮-১৯। দ্বাদশ ঋতুগ্রহ—সোমাহুতির পাত্রমধ্যে দুইটি ঋতুপাত্রের উল্লেখ হইয়াছে—একটি অধ্বর্য্যুর জন্য, একটি প্রতিপ্রস্থাতার জন্য। দ্রোণ কলশ হইতে সোমরস আপন ঋতুপাত্রে গ্রহণ করিয়া অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন—ইহার নাম ঋতুগ্রহ হোম। অধ্বর্য্যু আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন, পরে প্রতিপ্রস্থাতা আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন। আবার অধ্বর্য্যু আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন, আবার প্রতিপ্রস্থাতা আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন। এইরূপে ইনি ছয় বার, উনি ছয় বার, মোটের উপর বার বারে বার ঋতু-গ্রহের আহুতি হয়। প্রত্যেক আহুতির দেবতা পৃথক্। আহুতিকালে যাজ্যাপাঠক অর্থাৎ বষট্কর্ত্তাও পৃথক্। ঋতুগ্রহে বষট্কার হয়, অনু-বষট্কার হয় না। নিম্নে যথাক্রমে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল।

ঋতুগ্রহ	হোতা	বষট্কর্ত্তা	দেবতা
১	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	ইন্দ্র
২	প্রতিপ্রস্থাতা	৫ পোতা	মরুদ্গণ
৩	অধ্বর্য্যু	৬ নেষ্টা	ত্বষ্টা
৪	প্রতিপ্রস্থাতা	৭ আগ্নীধ্র	অগ্নি
৫	অধ্বর্য্যু	৩ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ইন্দ্র
৬	প্রতিপ্রস্থাতা	২ মৈত্রাবরুণ	মিত্রাবরুণ
৭	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	দেব দ্রবিণোদ
৮	প্রতিপ্রস্থাতা	৫ পোতা	ঐ

ঋতুগ্রহ	হোতা	বষট্‌কর্ত্তা	দেবতা
৯	অধ্বর্য্যু	৬ নেষ্টা	দেব দ্রবিণোদা
১০	প্রতিপ্রস্থাতা	৪ অচ্ছাবাক	ঐ
১১	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	অশ্বিদ্বয়
১২	প্রতিপ্রস্থাতা	১ হোতা	অগ্নি গৃহপতি

প্রত্যেক প্রহরে হোতা ও বষট্‌কর্ত্তা সেই প্রহরের সোমশেষ পান করেন।

২০-২২। ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ, বৈশ্বদেব গ্রহ, উক্‌থ্য গ্রহ, এই তিন গ্রহ আহুতিতে কিছু বিশেষ আড়ম্বর আছে। ফলে প্রাতঃসবনের সোমাহুতির মধ্যে এই তিন আহুতিই প্রধান; ইহার পূর্ব্বে যে সকল আহুতি হইয়াছে, তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র। অন্য আহুতির পূর্ব্বে হোতা যাজ্যা পাঠ করেন, কিন্তু এই তিন আহুতিতে কেবল যাজ্যাপাঠে হয় না। যাজ্যার পূর্ব্বে আরও অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইবে, ঐ মন্ত্রে সেই দেবতার শংসন (প্রশংসা বা স্তুতি) হয়, এই জন্য এই মন্ত্রসমূহের নাম শস্ত্র। যদ্দ্বারা শংসন হয়, তাহা শস্ত্র। শস্ত্রপাঠের নানা খুঁটিনাটি নিয়ম আছে, স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ হইবে। যে সকল গ্রহের আহুতির পূর্ব্বে শস্ত্রপাঠ হয়, তাহাদের নাম সশস্ত্র গ্রহ। ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব ও উক্‌থ্য, এই তিনটি সশস্ত্র গ্রহ। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন সামগায়ী ঋত্বিক্ কতিপয় সামমন্ত্রও গান করেন—ইহার নাম স্তোত্র গান। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্র গীত হয়। অতএব যত শস্ত্র, তত স্তোত্র। স্তোত্রগানের নিয়মও যথাস্থানে বলা যাইবে। বহিষ্পবমানস্তোত্র ভিন্ন অন্য সমুদয় স্তোত্র সদোমধ্যে গীত হয়। সদোমধ্যে যে উডুম্বরশাখা প্রোথিত হইয়াছে, সেই উডুম্বরী স্পর্শ করিয়া উদ্গাতারা স্তোত্র গান করেন। বহিষ্পবমান-স্তোত্র বেদির বাহিরে চাত্বালের নিকট গীত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

এখন এই তিন সশস্ত্র গ্রহের আহুতির নিয়ম বলা যাইতেছে।

(১) ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ—ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশের বা পূতভৃতের সোম অন্যতর ঋতুপাত্রে গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন। আহুতির পূর্ব্বে হোতা শস্ত্র পাঠ করিয়া, যাজ্যান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। এই শস্ত্রের নাম আজ্য শস্ত্র। এই শস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তোত্র—

বহিষ্পবমানস্তোত্র ইতঃপূর্ব্বেই (অন্তর্যাম গ্রহাহুতির পর) চাত্বালের নিকটেই গীত হইয়াছে।

গ্রহাহুতির সময় দশ জন চমসাধ্বর্য্যু পূতভৃতের সোমে পূর্ণ স্ব স্ব চমস হাতে করিয়া নাড়িয়া দেন—আহুতি দেন না, কাঁপাইয়া দেন মাত্র—ইহার নাম চমসকম্পন।

হোমকর্ত্তা (অধ্বর্য্যু) ও বষট্‌কর্ত্তা (হোতা), উভয়ে গ্রহশেষ এবং চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন।

(২) বৈশ্বদেব গ্রহ—বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশের সোমরসে শুক্রপাত্র (যাহা হইতে শুক্রগ্রহের আহুতি হইয়াছিল) পূর্ণ করিয়া আহুতি দেন। হোতা তৎপূর্ব্বে বৈশ্বদেব শস্ত্র (বা প্রউগ শস্ত্র) পাঠ করিয়া, যাজ্যান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। শস্ত্রের পূর্ব্বে উদ্গাতারা উদুম্বরী স্পর্শ করিয়া আজ্যস্তোত্র গান করেন। গ্রহাহুতির সঙ্গে পূর্ব্ববৎ চমসকম্পন। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা, উভয়ে গ্রহশেষ ও চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন।

(৩) উক্‌থ্য গ্রহ—উক্‌থ্য স্থালীতে ধারাগ্রহ পূর্ব্বেই লওয়া হইয়াছে; উহা তিন ভাগ করিয়া তিন বারে উক্‌থ্যপাত্রে লইয়া হোম করা হয়। ফলে, তিন বারে তিন গ্রহের হোম হয়। প্রথম বারে হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যু, বষট্‌কর্ত্তা হোতা নহেন—হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ—তিনিই শস্ত্রপাঠান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। আহুতি মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় বারের আহুতি ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট—হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যু নহেন, তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা, বষট্‌কর্ত্তা (শস্ত্রপাঠক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। তৃতীয় আহুতি ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দিষ্ট; হোমকর্ত্তা প্রতিপ্রস্থাতা, শস্ত্রপাঠক ও বষট্‌কর্ত্তা অচ্ছাবাক। তিন শস্ত্রেরই নাম আজ্যশস্ত্র এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন স্তোত্রেরই নাম আজ্যস্তোত্র।

তিন আহুতির সঙ্গে সঙ্গে চমসহোম বিহিত। দশ জন চমসাধ্বর্য্যু আপন আপন চমস পূতভৃতের সোমরসে পূর্ণ করিয়া আহবনীয়ে আহুতি দেন—এ স্থলে কম্পন মাত্র নহে, প্রকৃতই আহুতি দিতে হয়।

তিন বারেই হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা একযোগে গ্রহশেষ পান করেন এবং চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন। এইখানে প্রাতঃসবনের সমাপ্তি।

মাধ্যন্দিন সবন

প্রাতঃসবনের সহিত মাধ্যন্দিন সবনের যোগ রাখিবার জন্য মাধ্যন্দিন সবনের অন্তর্গত কতিপয় অনুষ্ঠান প্রাতঃসবন সমাপ্তির পূর্ব্বেই শেষ করিয়া রাখিতে হয়। প্রাতঃসবনে সবনীয় বস্তুর বপাযাগ পর্য্যন্ত হইয়া আছে, পশ্বঙ্গযাগ হয় নাই। মাধ্যন্দিন সবনেও পশ্বঙ্গযাগ হয় না। উহা তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। তবে পশ্বঙ্গের পাকাদি কর্ম্ম তৃতীয় সবনের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া থাকে। পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশাদি যাগ মাধ্যন্দিনেও নূতন করিয়া করিতে হয়; তজ্জন্য পুরোডাশাদি দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া আছে। মাধ্যন্দিনে দুইখানি পুরোডাশ দিতে হয়—অগ্নির উদ্দেশে অষ্ট কপালে একখানি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপালে সংস্কৃত একখানি। পুরোডাশের সহিত ধানা, করম্ভ ও দধিও দিতে হয়, পয়স্যা দিতে হয় না। পশুপুরোডাশের পূর্ব্বে দধিঘর্ম্মনামক আর একটি দ্রব্যের যাগ মাধ্যন্দিনে বিহিত, প্রাতঃসবনে উহা ছিল না।

মাধ্যন্দিন সবনের সোমাভিষবের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বসতীবরী ও একধনা জলের এক-তৃতীয়াংশ জলে অভিষুত সোমরস মাধ্যন্দিনে মিশাইতে হয়। মাধ্যন্দিনে উপাংশুগ্রহ নাই, কাজেই ক্ষুল্লকাভিষবও নাই। একেবারে মহাভিষব। অন্তর্যাম ও দ্বিদেবত্য গ্রহও নাই। শুক্র ও মন্থিগ্রহ আছে।

১-২। শুক্রগ্রহ, মন্থিগ্রহ, এই দুই গ্রহাহুতির নিয়ম প্রাতঃসবনেরই মত। অধ্বর্য্যু শুক্রগ্রহ ও প্রতিপ্রস্থাতা মন্থিগ্রহ হোম করেন। পরে চমসাহুতি প্রাতঃসবনবৎ। প্রভেদ এই যে, প্রাতঃসবনে অচ্ছাবাকের চমস প্রথমে বর্জ্জন করা হইয়াছিল, মাধ্যন্দিন সবনে উহার বর্জ্জন হয় না। দশ চমস হইতেই হোম হয়। হোমশেষ ও চমসশেষ পীত হয়।

৩। মরুত্বতীয় গ্রহ—ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু একটি ঋতুপাত্রে সোম লইয়া আহুতি দেন; এই আহুতির পূর্ব্বে যাজ্যা-মাত্র পঠিত হয়, শস্ত্র হয় না। হোমশেষ ভক্ষিত হয়। তৎপরেই অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, উভয়েই এক একটি ঋতুপাত্র, দ্রোণকলশ বা পূতভৃৎ হইতে সোমপূর্ণ করিয়া ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দেশে আহুতি দেন। ইহার পূর্ব্বে হোতা মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ করেন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী

মাধ্যন্দিন-পবমানস্তোত্র কিছু পূর্ব্বেই (শুক্র ও মন্থিগ্রহ যাগের পূর্ব্বেই) ঔদুম্বরীপার্শ্বে (চাত্বাল নিকটে নহে) গীত হইয়াছে। আহুতির পর চমসকম্পন (চমসাহুতি নহে)। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তার গ্রহশেষ পান, চমসীদের চমসস্থিত সোমপান।

৪। মাহেন্দ্র গ্রহ—মহেন্দ্রের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশ হইতে শুক্রপাত্রে সোম গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন। তৎপূর্ব্বে হোতা নিষ্কেবল্য শস্ত্র পাঠ করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠস্তোত্র। গ্রহাহুতির পর চমসকম্পন। গ্রহশেষ ভক্ষণ ও চমস ভক্ষণ পূর্ব্ববৎ।

৫। উক্‌থ্য গ্রহ—প্রাতঃসবনে যেমন উক্‌থ্যস্থালীর রস তিন ভাগ করিয়া উক্‌থ্য পাত্রে লইয়া তিন বারে আহুতি হয়, মাধ্যন্দিনেও ঠিক সেইরূপ। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা, গ্রহশেষভক্ষণ, চমসাহুতি, চমসশেষভক্ষণও প্রাতঃসবনবৎ। তিন বারের তিন শস্ত্রেরই নাম নিষ্কেবল্য শস্ত্র ও স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠস্তোত্র। উক্‌থ্যগ্রহহোমে মাধ্যন্দিন সবন সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় সবন

মাধ্যন্দিন সবনের সহিত তৃতীয় সবনের যোগ রাখিবার জন্য তৃতীয় সবনের সোমাভিষব মাধ্যন্দিনসমাপ্তির পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় সবনের অভিষব সংক্ষিপ্ত। অল্প সোমরস আবশ্যক, উহা একখানা বৃহৎ সোমখণ্ড ছেঁচিয়া এবং প্রাতঃসবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের সোমের ছিবড়া ছেঁচিয়া বাহির করিতে হয়। বসতীবরী ও একধনার তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, উহা আষবণীয়ে ঢালিয়া সোমরস মিশাইতে হয়। আষবণীয়ের সোমরস দ্রোণ কলশে না ঢালিয়া সমস্তই পূতভৃতে ছাঁকিয়া ঢালিয়া লইতে হয়। পূতভৃতের সোমে আশির (দধি) মিশাইতে হয়।

পশ্বঙ্গহোম স্থগিত ছিল। উহা তৃতীয় সবনের আরম্ভেই সম্পন্ন করিয়া, তৃতীয় সবনের শেষাশেষি পশ্বঙ্গসম্বন্ধীয় অনুযাজ, পত্নীসংযাজাদি কর্ম্ম শেষ করা যায়। পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশযাগও পৃথক্ করিয়া করিতে হয়। পুরোডাশের সহিত ধানাদি দিতে হয়, পয়স্যা দিতে হয় না।

তৃতীয় সবনের সোমাহুতিও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু, অন্তর্যাম, দ্বিদেবত্য ত নাই, শুক্র ও মন্থিগ্রহ পর্য্যন্ত নাই। তবে শুক্র ও মন্থিগ্রহের আনুষঙ্গিক চমসাহুতি আছে। পূর্ব্বসবনে যেরূপে চমসাহুতি হইয়াছিল, এ বারও দশ চমস হইতেই প্রায় সেইরূপেই আহুতি হয় এবং আহুতির শেষে হোমকর্ত্তা, বষট্‌কর্ত্তা ও চমসীরা চমসশেষ পান করেন। তৎপরে গ্রহাহুতি—

১। আদিত্যগ্রহ—এই গ্রহাহুতিতে শস্ত্র পঠিত হয় না। আদিত্য-স্থালীতে সোমরস সঞ্চিত ছিল, তাহা আদিত্যপাত্রে লইয়া অধ্বর্য্যু যাজ্যান্তে আহুতি দেন। চমসাহুতি নাই।

২। সাবিত্রীগ্রহ—সবিতার উদ্দিষ্ট। আগ্রায়ণস্থালীতে সোমধারা গৃহীত থাকে। তাহার কিয়দংশ উপাংশুপাত্রে লইয়া উন্নেতানামক ঋত্বিক্ আহুতি দেন। হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। শস্ত্রপাঠ নাই। গ্রহশেষও পীত হয় না।

৩। বৈশ্বদেব গ্রহ—বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট। ঐ উপাংশুপাত্রেই পূতভৃতের সোমরস লইয়া অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। তৎপূর্ব্বে হোতা বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করেন। কিয়ৎপূর্ব্বে ঔতুম্বরীপার্শ্বে আর্ত্তব পবমান-স্তোত্র গীত হইয়াছে।

গ্রহাহুতির পর পূর্ব্বের মত চমসকম্পন। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তার গ্রহশেষপান ও চমসীদের চমসস্থ সোমপান।

[এই সময়ে সোমের উদ্দেশে আশির (দধি)-মিশ্রিত চরু দেওয়া হয়। এই চরুযাগের বিশেষত্ব এই যে, ইহার পূর্ব্বে আজ্যভাগদান ও পরে স্বিষ্টকৃৎযাগ ও ইড়াভক্ষণ পর্য্যন্ত নাই। চরুশেষ উদ্‌গাতা ভক্ষণ করেন। চরুহোমের পর ধিষ্ণ্যগুলিতে একটু করিয়া আজ্য ফেলিয়া দিতে হয়।]

৪। পত্নীব্রত গ্রহ—অগ্নি ও পত্নীবনের উদ্দিষ্ট। আগ্রায়ণস্থালীস্থিত সোমের আর খানিকটা অন্তর্যামপাত্রে লইয়া অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। শস্ত্র নাই। যাজ্যাপাঠ করেন এবার অগ্নীৎ। তিনি নেষ্টার কোণে বসিয়া পত্নীব্রতগ্রহশেষ পান করেন। [এই সময়ে নেষ্টা একবার যজমানের পত্নীকে সদোমধ্যে লইয়া আসেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, একধনা জল আনিবার সময় পত্নীও দুইটি কলশ জলপূর্ণ করিয়া আনিয়া-

ছিলেন—এই জলের নাম পান্নেজন জল। একটি কলশের জল সবনীয় পশু নিহত হইলে উহার গায়ে ঢালা হইয়াছে, অন্য কলশের জল সহিত পত্নী এই সময়ে সদোমধ্যে প্রবেশ করেন এবং উদ্গাতার সম্মুখে বসিয়া সেই জলে আপনার দক্ষিণ উরুদেশ ধুইয়া ফেলেন। তার পর তিনি যথাস্থানে ফিরিয়া যান।]

৫। আগ্নীমারুত গ্রহ (ধ্রুবগ্রহ ?)—এই গ্রহ সশস্ত্র গ্রহ। ইহার পূর্ব্বে হোতা আগ্নীমারুত শস্ত্র পাঠ করেন। তৎপূর্ব্বে যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র গীত হইয়াছে। [এই স্তোত্রগানের সময়েই পত্নী আসিয়া উদ্গাতার সম্মুখে বসিয়া উরুতে জলসেক করিয়াছিলেন।] অধ্বর্য্যু এই গ্রহ হোতার চমসে গ্রহণ করেন। অন্য চমসগুলি পূতভৃতের সোমে পূর্ণ করিয়া চমসাধ্বর্য্যুরা স্বয়ং আহুতি দেন। অধ্বর্য্যু ও হোতা গ্রহশেষ পান করেন। হোতা তদ্ব্যতীত অন্যান্য চমসেরও শেষ পান করেন। অন্য চমসীরা স্ব স্ব চমসের শেষ পান করেন।

৬। হারিযোজন গ্রহ—হরিবান্ ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। এই গ্রহের হোমের রীতিতে একটু নূতনত্ব আছে। আগ্রায়ণস্থালীতে এখনও একটু সোমরস অবশিষ্ট আছে। [পূতভৃতে আর সোম নাই, উহা সমুদয়ই চমসে ঢালিয়া হোম করা হইয়াছে।] সেইটুকু দ্রোণ কলশে ঢালিতে হয় ও তাহাতে ধানা (ভাজা যব) মিশাইতে হয়। এই সোমের নাম ধানা-সোম। উন্নেতা এই ধানাসোমপূর্ণ দ্রোণ কলশ মাথায় লইয়া দাঁড়ান। হোতা যাজ্যান্তে বষট্কার ও অনুবষট্কার করিলে উন্নেতাই উহা আহুতি দেন। পরে সকল ঋত্বিকে মিলিয়া ঐ সোমসিক্ত ধানাশেষ ভক্ষণ করেন। এইখানে সোমাহুতি শেষ—আর সোমরস কোথাও অবশিষ্ট নাই। অতঃপর আর কয়েকটি অনুষ্ঠানেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমাপ্তি হয়।

ঋত্বিকেরা চাত্বালে গিয়া চমসগুলি জলপূর্ণ করিয়া স্পর্শ করেন ও আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যশালায় প্রবেশ করিয়া দধি ভক্ষণ করেন। পশ্বঙ্গযাগ ইহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। উহার পত্নীসংযাজাদি স্থগিত ছিল, তাহা এখন সম্পন্ন হয়।

তৎপরে সামগান শুনিতে শুনিতে সকলে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোমযাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া জলে হোম হয়।

বরুণের উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতির পর সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করেন; পরে দেবযজনভূমিতে ফিরিয়া উদয়নীয় ইষ্টিযাগ।

প্রায়ণীয় ইষ্টিতে যজ্ঞারম্ভ হইয়াছিল, উদয়নীয় ইষ্টিতে শেষ। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। ইষ্টিযাগের পর একটি পশুযাগ। বন্ধ্যা গাভী, অভাবে উক্ষা (বৃষ) পশুদ্বারা পশুযাগের নিয়মে যাগ হয়—এই যাগের নাম অনুবন্ধ্য পশুযাগ।

পশুযাগের পর মন্থনদ্বারা নূতন অগ্নি উৎপাদন করিয়া, সেই অগ্নিতে উদবসানীয় ইষ্টিযাগ। অগ্নির উদ্দেশে পাঁচ কপালে পুরোডাশ দিতে হয়। ইষ্টিযাগের পর বেদিতে আস্তৃত বর্হিঃ জ্বালাইয়া দিলে সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য। অন্ততঃ এক শত গাভী ইহাতে দক্ষিণা দিতে হয়। ষোল জন ঋত্বিকের ভাগ এইরূপ—

ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু, প্রত্যেকে ১২টি করিয়া—৪৮টি
ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা,
প্রত্যেকে ৬টি করিয়া—২৪টি
পোতা, প্রতিহর্ত্তা, অচ্ছাবাক, নেষ্টা, প্রত্যেকে ৪টি করিয়া—১৬টি
অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, প্রত্যেকে ৩টি করিয়া—১২টি

১০০টি

এই গাভী ব্যতীত হিরণ্য, অশ্ব (একটি), বস্ত্র, ক্ষীরমিশ্রিত শক্তু, তিল ইত্যাদি দক্ষিণা দিতে হয়। এ সকলেরও ভাগ ঐ অনুপাতে। এতদ্ভিন্ন চমসাধ্বর্য্যু প্রভৃতিকেও যথাসম্ভব দক্ষিণা পৃথক্‌রূপে দিতে হয়। মাধ্যন্দিন সবনমধ্যে দক্ষিণাদানের বিধান।

ব্যয়সাধ্য বলিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সুসাধ্য ছিল না। তবে যে ব্রাহ্মণের পিতা পিতামহ, দুই পুরুষে অগ্নিষ্টোম না করিয়াছেন, তিনি দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পর তিনি অগ্নিষ্টোমে অধিকারী হইতেন।

স্তোত্র ও শস্ত্র

শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান সোমযজ্ঞের বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রত্যেক সবনে নানা দেবতার উদ্দেশে সোমাহুত হয়। তন্মধ্যে যে কয়টি আহুতি প্রধান,

তৎপূর্ব্বে শস্ত্রপাঠের বিধান আছে। শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান বিহিত ; কাজেই যতগুলি শস্ত্র, ততগুলি স্তোত্র। যে ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার শংসন, প্রশংসা বা স্তুতি হয়, তাহার নাম শস্ত্র। ইহার নামান্তর উক্‌থ। হোতা এবং তিন জন হোত্রক (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক), এই চারি জনের মধ্যে কোন একজন সদোমধ্যে আপনার নির্দ্দিষ্ট ধিষ্ণ্যের নিকট বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। তৎপূর্ব্বে উদ্‌গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ মিলিয়া স্তোত্রগান করেন। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক যাজ্যামন্ত্র পড়িয়া বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। বষট্‌কারকালে ও অনুবষট্‌কার-কালে হোমকর্ত্তা (অধ্বর্য্যু অথবা প্রতিপ্রস্থাতা) উত্তরবেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে সোমরসের আহুতি দেন।

কোন্ সোমাহুতির পূর্ব্বে কোন্ শস্ত্র পঠিত ও কোন্ স্তোত্র গীত হয়, শস্ত্রপাঠকের (বৌষট্‌কর্ত্তার) ও হোমকর্ত্তার নামের সহিত তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান যাইতেছে—

প্রাতঃসবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক বষট্‌কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
বহিষ্পবমান	আজ্যশস্ত্র	ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ	ইন্দ্র ও অগ্নি	হোতা	অধ্বর্য্যু
আজ্যাস্তোত্র	প্রউগশস্ত্র	বৈশ্বদেবগ্রহ	বিশ্বদেবগণ	ঐ	ঐ
ঐ	আজ্যশস্ত্র	উক্‌থ্যগ্রহ	মিত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্র	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	প্রতিপ্রস্থাতা
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্রাগ্নি	অচ্ছাবাক	ঐ

মাধ্যন্দিন সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক বষট্‌কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
মাধ্যন্দিন পবমান	মরুত্বতীয় শস্ত্র	মরুত্বতীয় গ্রহ	ইন্দ্রমরুত্বান্	হোতা	অধ্বর্য্যু
পৃষ্ঠস্তোত্র	নিষ্কেবল্যশস্ত্র	মাহেন্দ্র গ্রহ	মাহেন্দ্র	হোতা	অধ্বর্য্যু
ঐ	ঐ	উক্‌থ্য গ্রহ	মিত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্র	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	প্রতিপ্রস্থাতা
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্রাগ্নি	অচ্ছাবাক	ঐ

তৃতীয় সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক	বষট্‌কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
আর্ত্তব পবমান	বৈশ্বদেবশস্ত্র	বৈশ্বদেব গ্রহ	বিশ্বদেবগণ		হোতা	অধ্বর্য্যু
যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র	অগ্নিমারুতশস্ত্র	ধ্রুবগ্রহ(?)	অগ্নি ও মরুদ্গণ		হোতা	অধ্বর্য্যু

দেখা যাইতেছে—প্রাতঃসবনে পাঁচ, মাধ্যন্দিন সবনে পাঁচ ও তৃতীয় সবনে দুই, মোটের উপর বারটি শস্ত্র ও সেই সঙ্গে বারটি স্তোত্র অগ্নিষ্টোমে বিহিত। অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি, উক্‌থ্য, অতিরাত্র প্রভৃতি সোমযজ্ঞে শস্ত্র ও স্তোত্রের সংখ্যা বারটির অধিক। অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে কেবল হোতার শস্ত্র আছে; হোত্রকদের শস্ত্র নাই। উক্‌থ্যাদি যজ্ঞে তৃতীয় সবনে হোত্রকদিগেরও শস্ত্র আছে।

প্রাতর্হোতার প্রথম শস্ত্রের নাম আজ্যশস্ত্র, হোত্রকদের শস্ত্রের নামও আজ্যশস্ত্র। চারিটি শস্ত্রের নাম আজ্যশস্ত্র বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শস্ত্র এক নহে। হোতার আজ্যশস্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্র, আর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর আজ্যশস্ত্রের মন্ত্র এক নহে, আবার অচ্ছাবাকের মন্ত্রও অন্যরূপ। মাধ্যন্দিন সবনে নিষ্কেবল্য শস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা।

শস্ত্রপাঠের নিয়ম

শস্ত্রপাঠের অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। পাঠের পূর্ব্বে শস্ত্রপাঠক সদোগৃহমধ্যে আপনার ধিষ্ণ্যের সম্মুখে পূর্ব্বমুখে বসেন, হোমকর্ত্তাও তাঁহাকে পিছনে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে বসেন। শস্ত্রপাঠক মনে মনে তূষ্ণীং জপ করেন। "সু মৎ পদ্ বগ্ দে পিতা মাতরিশ্বাচ্ছিদ্রা পদাধাৎ অচ্ছিদ্রোবংথাঃ কবয়ঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্‌থা মদানি শংসিষদ্ বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি" —এই মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তির নাম তূষ্ণীং জপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১০ অধ্যায়, ৬ খণ্ড)।

সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মতে তূষ্ণীংজপের আরম্ভে সু, মৎ, পৎ, বক্, দে, এই যে পাঁচ অক্ষর উচ্চারিত হয়, ঐ এক একটি অক্ষর ব্রহ্মবাচক। সু দ্বারা ব্রহ্মের পূজিতত্ব, মৎ দ্বারা প্রহৃষ্টত্ব, পৎ দ্বারা সর্ব্বব্যাপিত্ব, বক্ দ্বারা সর্ব্ববক্তৃত্ব, ও দে দ্বারা ফলদাতৃত্ব প্রকাশ পায়। হোতৃজপের পর

তিনি "শোংসাবোম্" এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করেন। এতদ্দ্বারা আহ্বান করা হয় বলিয়া ঐ মন্ত্রের নাম আহাব। "শোংসাবোম্"= শংসাবঃ ওঁ=আমরা উভয়ে শংসন বা শস্ত্রপাঠ করি এস। প্রাতঃসবনে আহাবমন্ত্র "শোংসাবোম্"। মাধ্যন্দিন সবনের আহাবমন্ত্র "অধ্বর্য্যো শোংসাবোম্," তৃতীয় সবনের মন্ত্র "অধ্বর্য্যো শোশোংসাবোম্"। আহাবান্তে হোমকর্ত্তা "শংসামো দৈবোম্"=আচ্ছা, তুমি শংসন কর, উহাতে আনন্দ (হর্ষ) হইবে (সায়ণ), এই বলিয়া উত্তর দেন। এই উত্তরের নাম প্রতিগর। তিন সবনেই প্রতিগরমন্ত্র এক। প্রতিগর শুনিয়া শস্ত্রপাঠক তূষ্ণীংশংস নামক মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। প্রাতঃসবনে তূষ্ণীংশংস— "ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ," মাধ্যন্দিন সবনে—"ওঁ ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ," তৃতীয় সবনে—"ওঁ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৯ অধ্যায়, ৭।৮ খণ্ড)। তূষ্ণীংশংস জপের পর শস্ত্র-পাঠক শস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন।

শস্ত্রমধ্যে এক বা একাধিক ঋক্‌সূক্ত থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ঋক্‌মন্ত্রও থাকিতে পারে। এই সকল সূক্ত ও মন্ত্র, যার পর যেটি বিহিত, সেই ক্রমানুসারে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে হয়। এই সকল ঋক্‌মন্ত্র ব্যতীত আরও কতিপয় স্বাক্ষরগ্রথিত যজুঃসদৃশ প্রাচীন মন্ত্র শস্ত্রমধ্যে পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির নাম নিবিৎ। নিবিৎ নহিলে শস্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ হয় না। কোন্ শস্ত্রের কোন্‌খানে নিবিৎ বসাইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। যদ্দ্বারা দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞকে নিবেদন করা যায়, তাহার নাম নিবিৎ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিবিতের এইরূপ তাৎপর্য্য করিয়াছেন। সূক্তগুলিই শস্ত্রের প্রধান অংশ। প্রাতঃসবনে সূক্তের পূর্ব্বে, মাধ্যন্দিনে সূক্তের মধ্যে ও তৃতীয় সবনে সূক্তের শেষ ভাগে নিবিৎ বসাইতে হয়। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১১ অধ্যায়, ১০ খণ্ড)।

শস্ত্র যখন পঠিত হয়, হোমকর্ত্তা তাহার মধ্যে মধ্যেও প্রতিগর করেন। শস্ত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি "ওঁ" বলিয়া প্রতিগর করিয়া সোমাহুতি দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ান এবং যথাস্থানে স্থাপিত সোমরস লইয়া আসিয়া আহবনীয়পার্শ্বে দাঁড়ান।

শস্ত্রপাঠক শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া 'উক্‌থবীর্য্য' উচ্চারণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন শস্ত্রের পর উক্‌থ্যবীর্য্যও বিভিন্ন ; যথা—প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য

শস্ত্রান্তে "উক্‌থং বাচি," মাধ্যন্দিনে হোতার পাঠ্য শস্ত্রান্তে "উক্‌থং বাচি ইন্দ্রায়," তৃতীয় সবনে হোতার পাঠ্য শস্ত্রান্তে "উক্‌থং বাচি ইন্দ্রায় দেবেভ্যঃ"।

হোত্রকেরা সর্ব্বত্র শস্ত্রপাঠের পর কেবল 'উক্‌থং বাচি' এই দুই পদ উচ্চারণ করেন, ইহাই তাঁহাদের উক্‌থবীর্য্য। উক্‌থবীর্য্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমি যে উক্‌থ (শস্ত্র) বলিলাম (পাঠ করিলাম), তাহা যেন অমুক দেবতা শুনিতে পান। উক্‌থবীর্য্যের উত্তরে অধ্বর্য্যু বলেন—"ওঁ উক্‌থশাঃ"=হাঁ, উক্‌থশংসন হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১২ অধ্যায়, ১ম খণ্ড)।

উক্‌থবীর্য্য উচ্চারণ করিয়া শস্ত্রপাঠক যথাবিহিত যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। যাজ্যার পর বষট্‌কার(বৌষট্‌ উচ্চারণ)কালে হোমকর্ত্তা অগ্নিতে সোমাহুতি কিয়দংশ দান করেন। যাজ্যাপাঠক পুনরায় "সোমস্য অগ্নে বীহি"—অগ্নি, তুমি সোম পান কর—বলিয়া পুনরায় বৌষট্‌ উচ্চারণ করেন, ইহার নাম অনুবষট্‌কার। অনুবষট্‌কারকালে আরও খানিকটা সোমরস অগ্নিতে আহুত হয়। হোমের পর কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে। হোমকর্ত্তা সদোমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বষট্‌কর্ত্তার সহিত একযোগে সেই সোমাবশেষ পান করেন।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে শস্ত্রপাঠের বিধি স্পষ্টতর হইবে। প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য প্রথম শস্ত্র আজ্যশস্ত্রটিকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ লওয়া যাউক।

ধিষ্ণ্যে উপবিষ্ট হোতার—

হোতৃজপ—সু মৎ পদ্‌ বগ্‌ দে পিতা······শংসিষ্যতি।

আহাব—শোংসাবোম্‌।

[ধিষ্ণ্য পশ্চাতে রাখিয়া অধ্বর্য্যুর প্রতিগর—শংসামো দৈবোম্‌।]

তূষ্ণীংশংস—ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ।

নিবিৎ—অগ্নির্দেবেদ্ধঃ, অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ, অগ্নিঃ সুষমিৎ, হোতা দেববৃতঃ, হোতা মনুবৃতঃ, প্রণীর্দেবানাং, রথীরধ্বরাণাং, অতূর্ত্তো হোতা, তূর্ণির্হব্যবাট্‌, আদেবো দেবান্‌ বক্ষৎ, যথাদগ্নির্দেবো দেবান্‌, সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ।

সূক্ত—[৩ মণ্ডল, ১৩ সূক্ত, ঋষভ ঋষি, অগ্নির্দেবতা, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ]।

(১) প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ।
গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ॥
(তিন বার পাঠ্য)।

(২) ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচংত উতয়ঃ।
হবিষ্মংতস্তমীলতে তং সনিষ্যংতোঽবসে॥

(৩) স যংতা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ষঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘং॥

(৪) স নঃ শর্মাণি বীতয়েঽগ্নির্যচ্ছতু শংতমা।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্‌স্বা॥

(৫) দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।
ঋক্বানো অগ্নিমিংধতে হোতারং বিশ্‌পতিং বিশাং॥

(৬) উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্‌থেষু দেবহূতমঃ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ॥

(৭) নূ নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্য্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতং॥
(তিন বার পাঠ্য)।

উক্‌থবীর্য্য—উক্‌থং বাচি।

[অধ্বর্য্যু ওঁ বলিয়া প্রতিগরান্তে হবির্দ্ধানে প্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ লইয়া বাহিরে আসেন ও আগ্রায়ণের পর বলেন—"উক্‌থশাঃ যজ্ঞং সোমস্য"। ইহাই হোতার প্রতি যাজ্যাপাঠে আদেশ।]

যাজ্যা—যে যজামহে।

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপযাতং।

অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবাঃ॥

(ঋ সং, ৩।২৫।৪, বিশ্বামিত্র ঋষি, ইন্দ্রাগ্নি দেবতা, বিরাট্ ছন্দ)।

বষট্‌কার—বৌষট্।

(অধ্বর্য্যু কর্তৃক ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের আহুতি)।

অনুবষট্‌কার—সোমস্য অগ্নেবীহি—বৌষট্।

[অধ্বর্য্যু কর্তৃক ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের পুনরায় আহুতি।]

আহুতির পর হোতার সম্মুখে বসিয়া অধ্বর্য্যু ও হোতা, উভয়ে গ্রহশেষ যথাবিধি পান করেন।

স্তোত্রগানের নিয়ম

প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন ঋত্বিক্ একযোগে স্তোত্রগান করেন। যতগুলি শস্ত্র, ততগুলি স্তোত্র, ঋক্‌মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলে উহা সামে পরিণত হয়। গাহিবার সময় কোন কোনও মন্ত্রকে গানের নিয়মানুসারে একাধিক বার আবৃত্তি করিলে সামমন্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যে কয়েকটি ঋকে স্তোত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে, গানকালে আবৃত্তি হেতু মন্ত্রসংখ্যা তার চেয়ে অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপে মন্ত্রসংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাম জন্মে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে। প্রাতঃসবনে হোতা প্রউগ শস্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে যে স্তোত্র গীত হয়, তাহার নাম আজ্যস্তোত্র। তিনটি মাত্র ঋকে এই স্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। মনে কর, ঐ তিন ঋক্ ক, খ, গ। ঐ তিন ঋকে সুর দিয়া তিন পর্য্যায়ে গাহিতে হয়। প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হয়, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হয়, তৃতীয় পর্য্যায়ে তৃতীয় মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হয়। এইরূপে মোটের উপর পনের মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। যথা :—

প্রথম পর্য্যায় ক ক ক—খ—গ—৫ মন্ত্র

দ্বিতীয় পর্য্যায় ক—খ খ খ—গ—৫ মন্ত্র

তৃতীয় পর্য্যায় ক—খ—গ গ গ—৫ মন্ত্র

সাকল্যে ১৫ মন্ত্র হওয়ায় এই স্তোত্র পঞ্চদশ স্তোমে গীত হইল। অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃৎ (৯ মন্ত্র) পঞ্চদশ (১৫ মন্ত্র), সপ্তদশ (১৭ মন্ত্র), ও একবিংশ (২১ মন্ত্র), এই চারিটি স্তোমের ব্যবহার আছে। দ্বাদশাহ যজ্ঞে এতদ্ব্যতীত চতুর্ব্বিংশ (২৪), ত্রিনব (২৭), ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩), চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪), অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) স্তোম ব্যবহৃত হয়।

অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্তোত্র ত্রিবৃৎ স্তোমে ও আজ্য-স্তোত্রত্রয় পঞ্চদশ স্তোমে গীত হয়। মাধ্যন্দিনে সমুদয় স্তোত্র সপ্তদশ স্তোমে এবং তৃতীয় সবনের সকল স্তোত্র একবিংশ স্তোমে গীত হইয়া থাকে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে চারিটির অধিক স্তোম না থাকায় উহার নাম চতুষ্টোম যজ্ঞ।

প্রত্যেক সবনের প্রথম স্তোত্রের নাম পবমানস্তোত্র। সবনের উপক্রমে অধ্বর্য্যু হবির্দ্ধানমণ্ডপে আহুতির সোমরস গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্র পূর্ণ করেন ও পরে বাহিরে আসিয়া অগ্নিতে একটু ঘৃতাহুতি দেন।

সোমরস গ্রহণকালে সোমবিন্দু যদি ভূপতিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার দোষ নিবারণের জন্য এই হোম। এই হোমের পর পবমানস্তোত্র গীত হয়। গানের আরম্ভে অধ্বর্য্যু প্রস্তোতার হাতে দুইগাছি কুশ দিয়া বলেন—"সোমঃ পবতে"—সোম পূত হইতেছেন। দ্রোণ কলশে ও বিভিন্ন পাত্রে সোম গ্রহণের পর আধবনীয়ে যে সোমরস সঞ্চিত ছিল, তাহা এই সময়ে পূতভৃৎনামক পাত্রে ঢালিতে হয়। পূতভৃতের মুখে মেষলোমের ছাঁকনি দেওয়া হয়, উন্নেতা সোম ঢালেন। ছাঁকার নাম পূত করা বা বিশুদ্ধি সাধন। ছাঁকনির নাম পবিত্র। ছাঁকিবার সময় সোম হন পবমান সোম। ছাঁকিবার সময় যে স্তোত্র গীত হয়, তাহা পবমানস্তোত্র।

প্রাতঃসবনের পবমানস্তোত্রের নাম বহিষ্পবমানস্তোত্র। উহা সদোগৃহের বাহিরে চাত্বালের নিকটে গীত হয়। মাধ্যন্দিন সবনে মাধ্যন্দিন পবমান ও তৃতীয় সবনে আর্ভব (ঋভুদৈবত) পবমান বেদিতে সদোগৃহের মধ্যে উদুম্বরশাখার পার্শ্বে গীত হয়। তিন সবনেই আর সমুদয় স্তোত্র ঐ উদুম্বরশাখাপার্শ্বেই গীত হয়।

অন্যান্য ঐকাহিক সোমযজ্ঞ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা বা প্রকারভেদ—অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম। অগ্নিষ্টোম এই সমুদয় যজ্ঞের প্রকৃতি—অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র। অগ্নিষ্টোমের সহিত এই সকল যজ্ঞের সম্বন্ধ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

অগ্নিষ্টোম—১২ স্তোত্র, ১২ শস্ত্র, ১ সবনীয় পশু (অগ্নির উদ্দিষ্ট ছাগ)।

উক্‌থ্য—১৫ স্তোত্র, ১৫ শস্ত্র, ২ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ)।

অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে তিন হোত্রকের শস্ত্র নাই, প্রথম দুই সবনে আছে, উক্‌থ্য যজ্ঞে তৃতীয় সবনেও তিন হোত্রকের তিন শস্ত্র আছে। কাজেই উক্‌থ্য যজ্ঞে শস্ত্রসংখ্যা ১৫, অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা তিনটি অধিক। শস্ত্র ১৫ হওয়ায় স্তোত্রও ১৫।

ষোড়শী—১৬ স্তোত্র, ১৬ শস্ত্র, ৩ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ)।

[উক্‌থ্য যজ্ঞের পনেরো শস্ত্রের অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র এই যজ্ঞে বিহিত; কাজেই ইহার শস্ত্র ও স্তোত্রের সংখ্যা ১৬। যজ্ঞের নামও এই

জন্য ষোড়শী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১৬ অধ্যায়, ১-৪ খণ্ডে এই অতিরিক্ত ষোড়শ শস্ত্রের বিবরণ আছে।]

অত্যগ্নিষ্টোম—১৩ স্তোত্র, ১৩ শস্ত্র, ১ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ)।

অগ্নিষ্টোমের অতিরিক্ত একটি শস্ত্র যোগ করিলে অত্যগ্নিষ্টোম। এই শস্ত্র ষোড়শী যাগের ষোড়শ শস্ত্র হইতে অভিন্ন।

অতিরাত্র—ষোড়শী যজ্ঞের উপর রাত্রিকৃত্য অনুষ্ঠান অতিরিক্ত চাপাইয়া অতিরাত্র হয়। রাত্রিকৃত্যে তিন পর্য্যায়, প্রতি পর্য্যায়ে ৪ স্তোত্র, ৪ শস্ত্র (হোতার এক ও হোত্রকদের ৩)। তদ্ব্যতীত পরদিন প্রত্যূষে ১ স্তোত্র (সন্ধিস্তোত্র) ও ১ শস্ত্র (আশ্বিন শস্ত্র) বিহিত। ৪ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ—সরস্বতীর ছাগ)।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১৬ অধ্যায়, ৫-৬ খণ্ড; ১৭ অধ্যায়, ১-৫ খণ্ড দেখ।]

বাজপেয়—[উক্থ্য দেখ]।

অপ্তোর্যাম—অতিরাত্রের উপরে আর চারিটি অতিরিক্ত স্তোত্র-যোগে নিষ্পন্ন।

দ্বাদশাহ যাগ

উপরিউক্ত যজ্ঞগুলি ঐকাহিক বা একদিনে সম্পাদ্য সোমযজ্ঞ। দুই হইতে বারো দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন, আর বারো বা তদধিক দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম সত্র। দ্বাদশাহ যজ্ঞ বারো দিনে সম্পাদ্য বলিয়া উহা অহীন বা সত্র, উভয়রূপেই গণ্য হয়। দ্বাদশাহের অনুষ্ঠানক্রম যথা:—

প্রথম দিন—প্রায়ণীয় দিন—অতিরাত্র যজ্ঞ।

পরবর্ত্তী ৯ দিন	ষড়হ* ৬ দিন	প্রথমত্র্যহ—৩ দিন
		দ্বিতীয়ত্র্যহ—৩ দিন
	তৃতীয়ত্র্যহ ৩ দিন	ছন্দোম দিন—উক্থ্য যজ্ঞ।

* ষড়হ দ্বিবিধ—অভিপ্লব ষড়হ ও পৃষ্ঠ্য ষড়হ।

অভিপ্লবে—১ দিন অগ্নিষ্টোম, ২, ৩, ৪, ৫ দিন উক্থ্য, ৬ দিন অগ্নিষ্টোম।

একাদশ দিন—অবিবাক্য দিন—অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।
অন্তিম দিন—উদয়নীয় দিন—অতিরাত্র যজ্ঞ।

সংবৎসর সত্র

সংবৎসরব্যাপী সত্রের প্রকৃতি গবাময়ন। উহার মধ্যদিন বিষুব দিন। তৎপূর্ব্বে ছয় মাস—১৮০ দিন—প্রথমার্দ্ধ, পরবর্ত্তী ছয় মাস—১৮০ দিন—অপরার্দ্ধ; প্রথমার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধের অনুষ্ঠানক্রম পরস্পর উল্‌টা পাল্‌টি। সূর্য্যের সংবৎসরে ভ চক্র পরিভ্রমণের অনুকারী। সংবৎসর সত্রেয় অনুষ্ঠানক্রম নিম্নে দেখান যাইতেছে।

পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রায়ণীয় দিন—অতিরাত্র		১
চতুর্ব্বিংশ দিন—উক্‌থ্য (এ দিনের সকল স্তোত্র চতুর্ব্বিংশ স্তোম বিহিত)		১
৪ অভিপ্লব ষড়হে—২৪ দিন ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে— ৬ দিন	৩০ দিন ৫ মাসে	১৫০
৩ অভিপ্লব ষড়হে— ১৮ দিন ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে— ৬ দিন ১ অভিজিৎ দিন — ১ দিন ১ স্বরসাম — ৩ দিন		২৮
		সমষ্টি—১৮০ দিন

মধ্যস্থিত
বিষবৎ দিন।

পৃষ্ঠ্যে—১ দিন অগ্নিষ্টোম, ২-৩ উক্‌থ্য, ৪ দিন ষোড়শী, ৫-৬ দিন উক্‌থ্য।

অপিচ অভিপ্লব ষড়হে—ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ স্তোম বিহিত। পৃষ্ঠ্য ষড়হে তদতিরিক্ত ত্রিণব, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম বিহিত।

অপরার্দ্ধ

৩ স্বরসাম দিন — ৩ দিন			২৮
১ বিশ্বজিৎ দিন — ১ দিন			
১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে — ৬ দিন			
৩ অভিপ্লব ষড়হে—১৮ দিন			
১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে	৬ দিন	৩০ দিন	১২০
৪ অভিপ্লব ষড়হে	২৪ দিন	৪ মাসে	
৩ অভিপ্লব ষড়হে—	১৮ দিন		৩০
১ গোষ্টম (অগ্নিষ্টোম)	১ দিন		
১ আয়ুষ্টোম (উকৃথ্য)	১ দিন		
১ দশ রাত্র প্রথম ও শেষ দিন বর্জ্জিত দ্বাদশাহ			১০
১ মহাব্রত দিন—অগ্নিষ্টোম			১
১ উদয়ণীয় দিন—অতিরাত্র			১
			সমষ্টি—১৮০ দিন

('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' ১৩৩৪ বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ; ১৩৩৫ বৈশাখ-আষাঢ়)

বিদ্যালয়-পাঠ্য

রচনাবলী

ধূলি

ধূলির প্রভাব বোধ হয় অনেকের নিকট অবিদিত। আমাদের সমক্ষে ধূলি জঞ্জাল বলিয়া পরিচিত, কেবল দ্রব্যাদি ময়লা করে,—পরিচ্ছন্ন থাকিতে দেয় না; যখন রাস্তায় বাহির হই, তখন ধূলি, বায়ুবেগে আমাদের নাকে মুখে গিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে। ধূলির জ্বালায় নগরের রাজপথে গ্রীষ্মকালে বহির্গত হওয়া সময়ে সময়ে দুর্ঘট হইয়া উঠে। এমন কি, বড় বড় সহরে এই ধূলির উৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অর্থ ব্যয় ও প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ধূলি কেবল উৎপাত মাত্র নহে। ধূলি কর্ত্তৃক অনেক বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অনেকের হয় ত ধারণা আছে, রাস্তায় ও ময়লা জায়গায় কেবল ধূলি বর্ত্তমান। সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, তাহাকেও বায়ুমণ্ডল বলিতেছি। বায়ুমণ্ডলের কোথাও এমন নির্ম্মল অংশ দেখা যায় নাই, যেখানে ধূলি নাই। কেবল যে ঝড়বাতাসের সময় বায়ু ধূলিপূর্ণ হয়, তাহা নহে। বায়ু যতই নির্ম্মল, যতই পরিচ্ছন্ন হউক না কেন, উহাতে নিয়ত ধূলিকণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সহর ও গ্রামের বায়ুর ত কথাই নাই, বিজন প্রান্তরে, নিবিড় অরণ্যে, সুবিস্তৃত সমুদ্রের উপর, উচ্চ পাহাড়ের উপর, সর্ব্বত্রই ধূলি বর্ত্তমান। বেলুনে চড়িয়া ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করিলে সেখানে নির্ম্মল বায়ুমধ্যেও ধূলির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সকল স্থানে ধূলির পরিমাণ সমান নহে। সহরে মনুষ্যবসতির বা কলকারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে বায়ু ধূলিতে অত্যন্ত দূষিত থাকে। পাহাড়ের উপর, সমুদ্রের উপর, জনশূন্য স্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল।

গৃহের অভ্যন্তরে বায়ু সচরাচর নির্ম্মল বোধ হয়। গবাক্ষ রুদ্ধ থাকিলে উহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, রশ্মিপথে অসংখ্য ধূলিকণা বায়ুসাগরে ভাসিতেছে। সহজ অবস্থায় উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার হয় এবং ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিতে ধূলিকণাসমূহ দীপ্তি লাভ করে, তখন তৎসমুদয়

আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময়ে সেই আলোকরেখার নিকট কোন বস্তু আন্দোলিত করিলে ধূলিকণার সংখ্যা বাড়িয়া উঠে এবং ধূলিকণাগুলি বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ধূলিকণা বায়ুসাগরে ভাসিতেছে। এগুলি সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে চক্ষুর অগোচর এই সামান্য ধূলিকণার উপর আমাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে।

ধূলির শক্তি ও গুণের বিষয়ে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইবে যে, ধূলিকণাটিও সামান্য পদার্থ নহে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের গবেষণায় এই সামান্য পদার্থের অসামান্য গুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

আকাশ নীলবর্ণ দেখায় কেন? আকাশ ত শূন্য, সেখানে কিছুই নাই। ভূপৃষ্ঠের উপর কিছু দূর পর্য্যন্ত বায়ু আছে; তাহার উপর আর কিছুই নাই। কেবল অনন্ত শূন্য ধূ ধূ করিতেছে। পক্ষান্তরে বায়ু একেবারে বর্ণহীন। আকাশ যদি কিছু নহে, আর ভূতলের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল যদি বর্ণহীন হয়, তবে নভোমণ্ডল নীলবর্ণ দেখায় কেন? বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণা এই নীলবর্ণের একটি কারণ। সম্প্রতি এই তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

প্রদীপের শিখামাত্রই প্রায়ই পীতবর্ণ। যেখানে প্রদীপ জ্বালান যায়, সেইখানে দীপশিখা ঘোরতর পীতবর্ণ হয়। ইহার কারণ কি? এক একটি দ্রব্যের এক একটি বিশেষ বর্ণযুক্ত আলোকের উৎপাদন-ক্ষমতা আছে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পোড়াইলে বিশেষ বিশেষ আলোকের উৎপত্তি হয়। আমরা যে লবণ খাই, সে লবণে এমন একটি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা পীত বর্ণের উৎপত্তি হয়। প্রদীপের শিখায় একটু লবণচূর্ণ ধরিলে দেখিতে পাইবে, পীত বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেই পদার্থ একটি ধাতু। ইংরাজিতে উহা সোডিয়ম্ নামে অভিহিত হয়। ঐ ধাতু ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের ঠিক এইরূপ পীত বর্ণ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই। বায়ুরাশিতে যে সকল ধূলিকণা থাকে, তৎসমুদায়ের অনেকগুলিতে ঐ পদার্থ বর্ত্তমান আছে; বায়ুসাগরে সর্ব্বদাই যে লবণের কণা ভাসিতেছে, প্রদীপ জ্বালিলে সেই লবণকণা শিখাসংস্পর্শে আসিয়া উহাকে পীতাভ করে।

বায়ুতে যে সকল ধূলিকণা ভাসে, উহাদের মধ্যে অনেকগুলি সজীব জীবাণু অথবা উদ্ভিদণু। উহাদের জীবন আছে। তালের বা খেজুরের রস কিছুক্ষণ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিলে উহা হইতে ফেঁনা উঠিতে থাকে, এবং উহার মাদকতা জন্মে। ঐ রস হইতে মদ প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যটি ঐ সকল ধূলিকণা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তালরস ও খর্জ্জুররসে চিনি আছে। বায়ুস্থিত সজীব ধূলিকণা উক্ত রসে পাতত হইয়া, ঐ চিনি খাইতে থাকে। ক্রমে উহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়; কিয়ৎক্ষণ মধ্যে দুই দশটি সজীব ধূলিকণা হইতে দুই দশ লক্ষ সজীব ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। চিনির কিয়দংশ উহারা খাইয়া ফেলে; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা মদ্যে পরিণত হয়। উক্ত বীজাণু ব্যতিরেকে চিনি সুরায় পরিণত হয় না। বায়ুসাগরে ভাসমান সজীব ধূলিকণার অস্তিত্ব কি বিচিত্র ব্যাপার!

জীবসমূহের মৃত্যু হইলে কিছুক্ষণ পরে উহাদের শরীর পচিতে থাকে। ধূলির প্রভাবেই জীবদেহ পচিয়া থাকে। জীবনহীন দেহ পাইলেই উক্ত কীটাণুসমূহ সেই দেহে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; ক্রমে উহারা জীবশরীর ভক্ষণ করিতে করিতে সংখ্যায় অগণ্য হইয়া পড়ে। উহারা এইরূপে দলে ও সংখ্যায় পুষ্টিলাভ করে। এ দিকে সেই জীবনহীন দেহ ক্রমশঃ বিকৃত, ক্ষীণ হইয়া, শেষে লোপ পায়। উহা হইতে নানাবিধ বাষ্প ও বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ুরাশির সহিত সম্মিলিত হয়। জীবদেহ পচিবার কারণ ও প্রণালী এইরূপ।

সজীব ধূলিকণায় কেবল সুরার উৎপত্তি হয় না, কেবল জীবনহীন দেহ পচিয়া বিলুপ্ত হয় না; কিংবা কেবল ঐ জীবদেহে উক্ত সজীব ধূলিকণার বসতি স্থাপিত হয় না। সজীব ধূলিকণা জীবনহীন দেহের ন্যায় সজীব দেহও আক্রমণ করে। এই সকল জীবাণু তাদৃশ নিরীহ নহে; এমন কি, মানুষের তেমন শত্রু আর নাই। উহারা কোনরূপে জীবদেহে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে রক্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি হইতে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সেইখানে উহারা দলে, বলে ও সংখ্যায় পুষ্টিলাভ করিয়া নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি করে। ঐ সকল জীব এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা সবিশেষ যত্নের সহিত না দেখিলে উহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহারা শরীরমধ্যে প্রবেশলাভ করিলে এবং সেখানে

উহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিলে, মানুষ সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

মানবের অনেক মারাত্মক ব্যাধি এই ধূলিকণায় উৎপন্ন হয়। ইহাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কেহ কোনরূপ জ্বরের উৎপাদন করে; কেহ হামের উৎপত্তি করে; কেহ ধনুষ্টঙ্কার, কেহ বসন্ত, কেহ যক্ষ্মা, কেহ ওলাউঠা ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে।

এই সকল জীবাণু কেবল বায়ুতে থাকে না। অনেকগুলি জলে থাকে। জল ও বায়ু আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। অতি নির্ম্মল জল ও বায়ুতেও এই সকল প্রাণসংহারক ধূলিকণা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। উহারা মানুষ ভিন্ন পশু পক্ষী প্রভৃতির শরীরেও ব্যাধি উৎপাদন করে।

সকল সময়েই বায়ুতে জলীয় বাষ্প অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান আছে। নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ, বিশেষতঃ সমুদ্রের জলরাশি নিয়ত বাষ্পাকারে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইতেছে। এই বাষ্প আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বায়ুর মত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, সহসা শীতল হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। তখন আমরা দেখিতে পাই। ঐ পরিদৃশ্যমান পদার্থকে কুজ্ঝটিকা বা কুয়াশা বলে। কুজ্ঝটিকা আকাশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিতি করিলে মেঘ বলিয়া অভিহিত হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, বায়ু শীতল হইলেই তত্রত্য বাষ্প জমিয়া কুজ্ঝটিকা ও মেঘের উৎপত্তি করে। কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক নহে। বায়ুস্থিত ধূলিকণা কুয়াশা ও মেঘের সৃষ্টির একটি কারণ। কেবল বায়ু শীতল হইলেই কুয়াশা—হয় না। ধূলিকণা থাকা চাই। এক একটি ধূলিকণার আশ্রয়ে এক একটি জলকণার উৎপত্তি হয়। যতগুলি ধূলিকণা থাকে, জলকণাও ঠিক ততগুলি হয়। একখানি মেঘ বা কুজ্ঝটিকায় কত জলকণা আছে ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে নিশ্চল বায়ুমধ্যে কত ধূলিকণা আছে, বুঝিতে পারিবে। বায়ুসাগরে এরূপ অসংখ্য ধূলিকণা অবস্থিতি করিতেছে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে স্থির হইয়াছে যে, ধূলিকণার আশ্রয় না পাইলে অতিশয় শৈত্যযোগেও বাষ্প জমিয়া জলকণা হইতে পারিত না।

এখন বুঝা গেল, সামান্য ধূলিকণার কত কাজ। উহাঁ শূন্য আকাশ নীলবর্ণ করে। দীপশিখাকে বর্ণ দেয়। উহার অনেকে ধূলিকণামাত্র নহে, সজীব পদার্থ। উহাদের আবার অপরাপর জীবের ন্যায় জাতি-বিভাগ, জন্ম, আহার, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই আছে। কেহ চিনি হইতে মদ প্রস্তুত করে, কেহ দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি করে, কেহ মাখন নবনীতকে অম্ল করে, কেহ শবদেহ গলিত ও লুপ্ত করে, জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া কেহ ধনুষ্টঙ্কার, কেহ অতিসার, কেহ জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। আবার ধূলিকণা না থাকিলে কুজ্ঝটিকা হইত না, মেঘ হইত না, বৃষ্টি হইত না। সুতরাং জীবের জীবনধারণও অসম্ভব হইত। এইরূপ সামান্য ধূলিকণায় অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মানব! তুমি যতই জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিবে, ততই এতাদৃশ কত অদ্ভুত বিষয় বিদিত হইতে থাকিবে। ('সাহিত্য ও বিজ্ঞান,' ১৮৯২, জানুয়ারি। ১২৯৯ সাল [?])

আমরা কি খাই ?

কোন ব্যক্তিকে ছাই খাইতে অনুরোধ করিলে সে কখনই সন্তুষ্ট হয় না। সে মনে করে, আমাকে বুঝি গালি দিল। কিন্তু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া থাকি, তাহা মোটের উপর ছাই আর কয়লা।

কয়লা কি, তাহা তোমরা সকলেই জান। কাঠ পোড়াইলে তাহার জল বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া, যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কয়লা। কয়লাতে এক ফোঁটা জল ফেলিলে শীঘ্র শুষিয়া লয়। কয়লার ভিতরে সরু সরু অসংখ্য ছিদ্র থাকায় জল সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। শুধু জল কেন, অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ সেই ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে। একটা কলসীতে কতকগুলা কয়লা রাখিয়া যদি তাহাতে ময়লা ঘোলা জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, কলসীর নীচে ফুটা করিয়া সেই জল বাহির করিলে দেখিতে পাইবে, জল আর পূর্ব্বের মত ময়লা নাই। জলে যে সকল পদার্থ ভাসিতেছিল, তাহা কয়লার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া

গিয়াছে। এইরূপে কয়লা দিয়া ময়লা জল ছাঁকিলে ভাল জল পাওয়া যায়।

বায়ুতে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর পদার্থ ভাসিয়া থাকে; ঘরের এক কোণে কতকগুলা কয়লা ফেলিয়া রাখিলে কয়লা সেই সকল ক্ষুদ্র পদার্থ শুষিয়া লয়। যে ঘর ধুঁয়াতে পরিপূর্ণ, সে ঘরে প্রবেশ করিলে শ্বাস রুদ্ধ হয়। কিন্তু কয়লা গুঁড়া করিয়া একটা পুঁটুলি করিয়া দুই নাকের ছিদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে কয়লার ভিতর দিয়া বায়ু অক্লেশে যাতায়াত করে। কিন্তু ধুঁয়া বা অন্য দূষিত পদার্থ যাহা বায়ুতে ভাসে, তাহা যাইতে পারে না। এইরূপে কয়লাতে জল বায়ু উভয়ই পরিষ্কার করে, উভয়ই কয়লার দ্বারা ছাঁকিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুর্গন্ধ পচা জিনিসের উপর কতকগুলা কয়লার গুঁড়া ফেলিয়া দিলে সেই দুর্গন্ধ আর কয়লা পার হইয়া আসিতে পারে না।

কয়লার মত কালো জিনিষ কিছুই নাই; কিন্তু গরম করিলে কয়লা যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমন আর কিছু হয় না। সোনা, রূপা প্রভৃতি পদার্থ সহজে বড় উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু গরম করিলে সকলেই কয়লার নিকট পরাস্ত হয়। এক টুকরা রূপার পাতলা পাতে কয়লার দাগ কাটিয়া আগুনে গরম করিলে দেখিতে পাইবে, কয়লার দাগটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর তার কাছে রূপা ম্লান হইয়া রহিয়াছে। পুড়িবার সময় কয়লা গরম হইয়া উজ্জ্বল হয়। তখন উহাকে অঙ্গার বলে। আমরা সাধারণতঃ কয়লা গরম করিয়াই আলোক উৎপাদন করিয়া থাকি। প্রদীপের শিখা হইতে যে কালো ধুঁয়ার মত পদার্থ উঠে, তাহাকে আমরা ভুষা বলি। উহা কয়লারই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা মাত্র। প্রদীপের শিখায় কোন ঠাণ্ডা জিনিষ ধরিলেই তাহার গায়ে ভুষা পড়ে। প্রদীপের শিখাতে যে ভুষা বা কয়লার কণা থাকে, তাহাই গরম হইলে দীপ্তিশালী হইয়া উজ্জ্বল হয়। আমরা উহাতেই আলো পাই। কলিকাতার নূতন বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো দেখিয়া থাকিবে। ঐ আলো এত উজ্জ্বল যে, সহজে উহার দিকে চাওয়া যায় না। কৌশলক্রমে কয়লা গরম করিয়া ঐ উজ্জ্বল আলো বাহির করা হয়।

কয়লার প্রধান গুণ এখনও বলা হয় নাই। কয়লা গরম করিলেই আলো পাওয়া যায়; কিন্তু কয়লা না পোড়াইলে উহা গরম হয় না।

কয়লা পোড়াইলে তাপ উৎপন্ন হয়। কয়লা ছাড়া আরও অনেক জিনিস আছে, যাহা পোড়াইলে তাপ জন্মে। গন্ধক পোড়ান যায় দেখিয়াছ। এমন কি, লোহাকেও পোড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করা যায়; যে সকল জিনিস পোড়ান চলে, কয়লা তাহাদের মধ্যে শস্তা। সেই জন্য আমরা কয়লা পোড়াইয়াই তাপ উৎপন্ন করি। পুড়িবার সময় কয়লা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। কয়লা আর কয়লা থাকে না; আর একটা বায়ুর মত পদার্থ হইয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। কয়লা যত পোড়ে, তত কমে; কিছুক্ষণ পরে আর কিছুই থাকে না।

কাঠ, খড়, পাতা প্রভৃতি পোড়ান চলে। বাস্তবিক ঐ সকল পদার্থের মধ্যে যে কয়লা আছে, তাহাই পোড়ে। কয়লা ভিন্ন জল প্রভৃতি অন্য যাহা আছে, তাহা পোড়ে না, তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। ঐ সকল পদার্থ পোড়ান কার্য্যে বরং বাধা দেয়। এক সের কাঠের চেয়ে এক সের কয়লা পোড়াইলে বেশী তাপ পাওয়া যায়; কেন না, কয়লা সবটাই পোড়ে। কাঠের মধ্যে যেটুকু কয়লা আছে, সেইটুকুই পোড়ে, বাকীটা কোন কাজেই লাগে না।

কেবল কাঠ, খড়, পাতাতেই কয়লা আছে এমন নহে। গাছপালা, উদ্ভিদ্ হইতে যে কিছু জিনিস পাওয়া যায়, সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কয়লা আছে। চিনি এমন সুখাদ্য মিষ্ট জিনিস, ধরিতে গেলে উহা খানিকটা কয়লা আর খানিকটা জল মাত্র। চিনি একটু গরম করিলেই দেখিতে পাইবে, খানিকটা কালোমত পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; উহা কয়লা মাত্র; উহা রীতিমত পুড়িয়া যায়। চাল, ময়দা, আলু প্রভৃতি পদার্থ চিনির মত মিষ্ট না হইলেও কাজে চিনির সহিত উহাদের বড় তফাত নাই। উহারাও প্রধানতঃ খানিকটা কয়লা ও খানিকটা জল। খানিকটা ময়দা গরম করিলে দেখিতে পাইবে, জলটা চলিয়া যাইবে, কয়লাটুকু কালো হইয়া অবশিষ্ট থাকিবে। পোড়াইলে সমস্ত কয়লাটুকু পুড়িয়া যাইবে। শুধু গাছপালা, উদ্ভিদ্ কেন, জীবজন্তুর শরীরেও যথেষ্ট কয়লা বর্ত্তমান আছে। এক ফোঁটা রক্ত বা এক টুকরা মাংস গরম করিয়া কালো কয়লা অবশিষ্ট পাওয়া যায়। তেল, ঘি, চর্ব্বি প্রভৃতি পদার্থ আমরা পোড়াইবার জন্য ব্যবহার করি; উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা বর্ত্তমান আছে। কেরোসিন তৈল পোড়াইবার সময় রাশি রাশি কয়লা

ধুঁয়ার আকারে শিখা হইতে নির্গত হয়। একটি কাচের চিমনি দিয়া ঐ ধুঁয়াকে আটকাইলে প্রায় সমুদয় ধুঁয়া পুড়িয়া যায়। তখন আর কালি পড়ে না।

আমাদের শরীরের রক্ত, মাংস, চর্ব্বি প্রভৃতির প্রধান উপাদান কয়লা। ডাল, ভাত, দুগ্ধ, মাংস, চিনি, ঘি, তেল, তরকারি প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী হইতে আমরা দেহের পুষ্টির জন্য কয়লা সংগ্রহ করি। আসল বিশুদ্ধ কয়লা আমরা হজম করিতে পারি না; তাই ডাল ভাত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ হজম করিতে পারি, সেই সকল পদার্থ খাইয়া তাহা হইতে কয়লা গ্রহণ করি।

ঘি, চিনি, তেল প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে পোড়াইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কয়লাটুকু পুড়িয়া যায়; আর যাহা থাকে, তাহা জলের বাষ্পরূপে বায়ুতে মিশে। কিন্তু এক খণ্ড কাঠের কয়লা পোড়াইলে একটু সাদা মত পদার্থ প্রায় অবশিষ্ট থাকে। সেটুকু আর কোন মতেই পোড়ে না। সেইটুকুর নাম ছাই বা ভস্ম। কাঠ, খড়, পাতা প্রভৃতি ভাল করিয়া পোড়াইলেও এইরূপই দেখা যায়। উহার খানিকটা অংশ, যাহাতে জলের ভাগ বেশী, তাহা না পুড়িয়া বায়ুতে মিশে। খানিকটা অর্থাৎ যে ভাগটা কয়লা, তাহা পুড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত বায়ুতে মিশে। আর একটু ছাই না পুড়িয়া অবশিষ্ট থাকে। গোবরের ঘুঁটে আমাদের দেশে জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়; উহার কয়লাভাগ পুড়িয়া যায়; সেইটুকু কাজে লাগে। আর যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহা আমরা ফেলিয়া দিই বা অন্য কার্য্যে লাগাই। পাথুরে কয়লা বা কোক্ কয়লা পোড়াইলেও ঐরূপ খানিকটা ছাই অবশিষ্ট থাকে, উহা আর কোন মতে পুড়িতে চায় না। লবণ, সোরা, তুঁতে, ফটকিরি প্রভৃতি পদার্থ তোমরা দেখিয়াছ, ঐ সকল পদার্থ পোড়ে না; কয়লার মত বা গন্ধকের মত উহাদিগকে পোড়ান চলে না। ছাই ঐ জাতীয় পদার্থ; ইহাও পোড়ে না।

আমাদের শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি পোড়াইলেও ঐরূপ একটা ছাই পাওয়া যায়। অবশ্য কয়লার ভাগ বেশী, ছাইয়ের ভাগ অনেক কম। চিনি, ঘি, তেল, ভাত, ময়দা প্রভৃতিতে ছাই থাকে না; ডাল তরকারি প্রভৃতি পদার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাই থাকে। খাদ্য

সামগ্রী হইতে আমরা জল, কয়লা ও ছাই, তিনই সংগ্রহ করি। তিনই আমাদের শরীর ধারণের জন্য আবশ্যক। তাই খাদ্য সামগ্রীতে তিনই আছে।

সুতরাং আমরা কি খাই? আমরা জল খাই, আর কয়লা খাই, আর ছাই খাই। এই তিনের বেশী অন্য কোন জিনিস খাওয়ার দরকার নাই। ('মুকুল,' ভাদ্র ১৩০২)

মেরুপ্রদেশ

বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস আমাদের দেশে বড় গরম ও কয়েক মাস ধরিয়া বড় শীত পড়ে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমে আমাদিগকে ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়, আবার পৌষ মাঘ মাসে লেপ গায়ে দিয়াও কাঁপিতে হয়। কেন এ রকম হয়, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বেলা দুপুরের সময় আকাশের দিকে চাহিলে দেখিতে পাইবে, সূর্য্য প্রায় মাথার উপর রহিয়াছে। পৌষ মাঘ মাসে সেই সময়ে দেখিতে পাইবে, সূর্য্য আর মাথার উপর নাই। অনেকটা দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন মাথার উপর থাকে, তখন রৌদ্র বড় প্রখর হয়; সূর্য্য মাথার উপর হইতে নামিয়া গেলে রৌদ্র তেমন প্রখর থাকে না। আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনগুলা খুব লম্বা হয়, কোন মতে ফুরাইতে চায় না। পৌষ মাঘ মাসে দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; রাত্রি কিন্তু লম্বা হইয়া পড়ে, কোন মতে পোহাইতে চায় না। তবেই দুইটা ঘটনা একযোগে ঘটিতেছে, দেখিতেছ। গ্রীষ্মের সময় একে সূর্য্য মাথার উপর থাকায় রৌদ্র প্রখর হয়, তার পর দিন দীর্ঘ হওয়ায় সেই প্রখর রৌদ্র আমরা অধিক ক্ষণ ধরিয়া পাইয়া থাকি। আবার শীতকালে একে সূর্য্যের তাপ কম, তার উপর দিন ছোট হওয়ায় সেই তাপ বেশী ক্ষণ পাই না। কাজেই গ্রীষ্মকালে মোটের উপর আমরা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পাই, সুতরাং তখন বড়ই গরমি বোধ হয়। শীতকালে অধিক উত্তাপ পাই না; ছোট দিনে যে একটু উত্তাপ পাওয়া যায়, লম্বা রাত্রিতে সে সবটুকু—এমন কি, পূর্ব্বের সঞ্চিত উত্তাপেরও খানিকটা চলিয়া যায়; তাই তখন শীতের প্রবলতা।

পৃথিবীর একখানি মানচিত্র লইলে দেখিতে পাইবে, ইংরাজদের দেশ আমাদের দেশের অনেক উত্তরে। সূর্য্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আমাদের মাথার উপর আইসে। কিন্তু ইংরাজদের দেশে সূর্য্য কখনই মাথার উপর আসে না। কাজেই সেখানে সূর্য্যের তাপ কখনই আমাদের দেশের মত প্রখর হয় না। ইংরাজদেরও গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল আছে, কিন্তু উহাদের গ্রীষ্মকালেও আমাদের দেশের মত গরম হয় না, আর উহাদের শীতকালে এমন প্রবল শীত হয় যে, আমরা এই গরম দেশে বসিয়া তাহা মনে কল্পনাও করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে যতই উত্তর মুখে যাওয়া যায়, সূর্য্যের তেজ ততই ক্ষীণ হইয়া আসে; কারণ, সূর্য্য আর মাথার উপর আসে না। কাজেই শীতের ভাগটা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

মানচিত্রে দেখিতে পাইবে—এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা, তিন মহাদেশেরই উত্তর ভাগে সমুদ্র রহিয়াছে। এই সমুদ্রকে উত্তর-মহাসাগর বলে। ঐ উত্তর-মহাসাগরের অধিকাংশ ভাগটাকে মেরুপ্রদেশ বলে। মেরুপ্রদেশটায় মোটের উপর ভয়ঙ্কর শীত। সেই মেরুপ্রদেশের অবস্থা কিরূপ, তাহার কিছু তোমাদিগকে বর্ণনা করিয়া জানাইব।

মেরুপ্রদেশ নাম কেন হইল, তোমরা বোধ হয় জান। পৃথিবী প্রত্যহ আপনার শরীরটাকে ঘুরাইতেছে শুনিয়া থাকিবে। একটা লেবুর অথবা বেলের বোঁটার কাছে ও মাথার কাছে আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে, অথবা একটা মাটির ভাঁটা তৈয়ার করিয়া, তাহার ভিতর মাঝামাঝি একটা কাঠি চালাইয়া, সেই কাঠির দুই প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে লেবু, বেল ও ভাঁটা যেমন ঘুরিতে থাকে, পৃথিবীর ঘোরাও কতকটা সেইরূপ। অবশ্য পৃথিবীতে এরূপ কোন কাঠি নাই অথবা পৃথিবীকে কোন ব্যক্তি ধরিয়া ঘুরায় না। পৃথিবী আপনি ঘুরিতেছে। বেল, লেবু ও ভাঁটা যখন ঘুরে, তখন দেখিতে পাইবে, উহার মাঝের ভাগটা যত দ্রুত ঘুরিতেছে, অন্য স্থান তত দ্রুত ঘুরিতে পায় না, এবং যেখানটা ধরা আছে, সে জায়গাটা একেবারেই ঘুরিতে পায় না। সেইরূপ পৃথিবীতে দুইটা স্থান আছে, তাহারা একেবারে ঘুরে না। সে দুইটা স্থানের নাম মেরু। একটা স্থানের নাম সুমেরু, উহা উত্তর দিকে রহিয়াছে; অন্য স্থানের নাম কুমেরু, উহা দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। কুমেরু ও সুমেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান ঘুরে তবে মধ্য ভাগের ন্যায় দ্রুতগতিতে

ঘুরে না। সেই নিকটবর্ত্তী প্রদেশকে মেরুপ্রদেশ বলে। আমরা যদি কলিকাতা, কি বাঙ্গলা দেশের অন্য কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, পাহাড় পর্ব্বত না মানিয়া, বরাবর উত্তর মুখে চলি, তাহা হইলে উত্তর মেরুপ্রদেশে উপস্থিত হইতে হইবে; এবং অবশেষে সুমেরুতে উপস্থিত হইয়া আর উত্তর মুখে যাওয়া চলিবে না।

একবার এই সুমেরুতে কোন রকমে হাজির হইতে পারিলে নানা কৌতুকজনক ব্যাপার দেখা যাইতে পারে। আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই, আকাশে রাত্রিকালে নক্ষত্রগুলি পূর্ব্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু মেরুতে দাঁড়াইলে এরূপ উদয় অস্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সেখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম নাই, উদয় অস্ত নাই। সমুদয় নক্ষত্রগুলি চিরকালই দেখা যাইবে; কোনটিরই অস্ত দেখিতে পাইবে না। ঠিক মাথার উপরে একটা স্থান ও একটা নক্ষত্র স্থির নিশ্চল বোধ হইবে। অন্য নক্ষত্রগুলা সেইটাকে মাঝখানে রাখিয়া তাহারই চারি দিকে ঘুরিতেছে, এইরূপ বোধ হইবে। সমুদয় আকাশটা যেন সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। একটা ছাতা খুলিয়া মাথার উপরে ধরিয়া, তাহার বাঁট ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে যেমন দেখায়, সমুদয় আকাশটাকে তেমনি দেখাইবে। একটা বাঁশ পুঁতিয়া, তাহাতে ছোট বড় অনেকগুলি দড়ি দিয়া কতকগুলি ভেড়া বাঁধিয়া দিয়া, তাহাদিগকে একমুখে তাড়া দিলে যেমন তাহারা সেই বাঁশের চারি দিকে ঘুরে, নক্ষত্রগুলাকে সেইরূপে ঘুরিতে দেখা যাইবে।

সুমেরুতে সূর্য্যের উদয় অস্ত আরও কৌতুকজনক ব্যাপার। আমরা সূর্য্যকে প্রত্যহ পূর্ব্বদিকে উঠিতে ও পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখি। এইরূপ বৎসরে সূর্য্য ৩৬৫ বার উঠে ও ৩৬৫ বার অস্ত যায়। কিন্তু সুমেরুতে তাহা হয় না। সুমেরুতে ১০ই চৈত্র তারিখে ঠিক্ দক্ষিণ দিকে সূর্য্যের উদয় হয়। তার পর সূর্য্য আর অস্ত যায় না। সঙ্গে যদি ঘড়ি থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কত চব্বিশ ঘণ্টা উপরি উপরি কাটিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্য আর অস্ত যাইতে চায় না, দিনও কোন মতে ফুরাইতে চায় না। সূর্য্য অস্ত না গিয়া আকাশের চারি দিকে পাক খায় ও একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে। স্ক্রুপের গায়ে যে সূতা কাটা থাকে, সেই সূতা ধরিয়া উঠিলে যেমন পাক খাইতে খাইতে

একটু একটু করিয়া উঠিতে হয়, অথবা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের সিঁড়িতে যেমন পাক খাইতে খাইতে উঠা যায়, সূর্য্য কতকটা সেইরূপ আকাশের চারি ধারে পাক দিতে দিতে উপরে উঠে; কিছু দূর উঠিয়া আবার সেইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া অস্ত যায়। সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে, তখন কিন্তু আর চৈত্র মাস নাই। পৃথিবীর অন্যত্র তখন ১০ই আশ্বিন উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে সূর্য্যের উদয় হইয়া ছয় মাস পরে ১০ই আশ্বিন তারিখে সূর্য্যের অস্ত ঘটিবে। এই ছয় মাস কাল ক্রমাগত সুমেরুতে দিন। তার পর ১০ই আশ্বিন হইতে পুনরায় ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত আর সূর্য্য একেবারেই দেখা দিবে না। তখন সুমেরুতে রাত্রি। ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত দিন ও ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত রাত্রি। মনে কর দেখি, এ কিরূপ ব্যাপার। আমাদের সংবৎসর মধ্যে ৩৬৫টা দিন ও ৩৬৫টা রাত্রি ঘটে। কিন্তু সেখানে সারা বৎসরে কেবল একটা দিন আর একটা রাত্রি।

আমাদের দেশে যখন ঘোরতর গ্রীষ্ম, সেই মেরুপ্রদেশের হাওয়া তখন বরফের মত ঠাণ্ডা। শীতকালের ত কথাই নাই। সুমেরুতে ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি বলিয়াছি। সুমেরুর নিকটস্থ স্থানে ছয় মাস না হউক, দুই মাস, চারি মাস, পাঁচ মাস করিয়া রাত্রি থাকে। সেই রাত্রে, সেই শীতে, সে প্রদেশের কি অবস্থা হয়, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সেখানে সমুদয় মহাসাগর সারা বৎসর বরফে আচ্ছন্ন থাকে। সমুদ্রের জল জমিয়া বরফে একাকার হইয়া রহিয়াছে। বরফেরই দেশ, বরফেরই পাহাড়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় সেই বরফের পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে বরফ গলিয়া পুষ্করিণী ও হ্রদ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। আবার দেখিতে দেখিতে হয় ত সমুদয় পুষ্করিণী বা হ্রদ জমাট বাঁধিয়া যায়। আমি এ স্থলে ঠিক সুমেরুর কথা বলিতেছি না; সুমেরু হইতে তিন চারি শত ক্রোশ দূরের কথা বলিতেছি। সেইখানেই এইরূপ অবস্থা। জল জমিয়া যায় বলিয়া জাহাজ সমুদ্র দিয়া চলিতে পারে না। বরফের উপর দিয়া এক-রকম চাকাহীন গাড়ীতে চড়িয়া পিচ্ছিল পথে চলিতে হয়। এক প্রকার হরিণ এই গাড়ী টানে। কোন গাছপালা ঘাস পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কোন পরিচিত জন্তু দেখা যায় না। অপূর্ব্ব সামুদ্রিক জলজন্তু বরফের উপর কখন কখনও খেলা করিয়া বেড়ায়। উহাদিগকে মারিয়া অনেক

সময়ে আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। লোকালয় নাই। যেখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে মানুষে কষ্টে সৃষ্টে শাদা ভালুক, আর একরূপ হরিণ, আর সামুদ্রিক সীল নামক প্রাণী তাড়াইয়া একরূপে জীবন ধারণ করে। তাহাদেরই মাংস খায়, তাহাদেরই চামড়া গায়ে দেয় ও তাহাদেরই চর্ব্বি জ্বালাইয়া আগুন তৈয়ার করে। সে সকল মানুষের অবস্থাও প্রায় জন্তর মত। মাঝে মাঝে হয় ত বরফের পাহাড় ও বরফের মাঠ ফাটিয়া দুখান হইয়া মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা হয়, সেই রাস্তায় কোনরূপে জাহাজ চালান যাইতে পারে। হয় ত অকস্মাৎ জাহাজ সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় চারি দিকে বরফ জমিয়া গেল ও জাহাজের গতি একবারে রুদ্ধ হইল। জাহাজ আট্‌কাইয়া গেল, অথবা চারি দিকের বরফের ধাক্কায় জাহাজ ভাঙ্গিয়া পিশিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আরোহীরা যে কোথায় গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইরূপে কত বার কত জনে জাহাজ লইয়া সুমেরুর অভিমুখে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। কত বার তাঁহারা অকূল বরফের মাঝে হারাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ঠিক পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। একবার ফ্রাঙ্কলিন নামক একজন সাহেব কতকগুলি সঙ্গী লইয়া এইরূপ মেরুপ্রদেশ দেখিতে গিয়া হারাইয়া যান। দশ পোনের বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের সন্ধানার্থ কত লোকে আবার সেই ভয়াবহ প্রদেশে যাত্রা করে। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কত বৎসর ধরিয়া আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু হায়, অবশেষে কেবল তাঁহাদের হাতের লেখা কাগজপত্র ও জিনিসপত্র ভিন্ন আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। এত যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এখনও সুমেরু হইতে দুই শত ক্রোশের ভিতরে মানুষ এ পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। এই দুই শত ক্রোশ অতিক্রম করিবার কোন ভরসা বা উপায় দেখা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় জাতির অধ্যবসায় দমনে রাখিবার নহে। সম্প্রতি বেলুনে চড়িয়া আকাশমার্গে সুমেরু যাত্রার প্রস্তাব উঠিয়াছে ও তার জন্য উদ্যোগ হইতেছে। শীঘ্রই শুনা যাইবে, এই চেষ্টার ফল কিরূপ দাঁড়াইল।

মেরুপ্রদেশে যখন সুদীর্ঘ রাত্রি, যখন দুই মাস চারি মাস ধরিয়া নিবিড় আঁধারে চারি দিক্ আবৃত থাকে, তখন মধ্যে মধ্যে আকাশে এক অপূর্ব্ব আলোক দেখা যায়। দেখিতে দেখিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধনুর আকারে যেন জ্বলিয়া উঠে ; এবং সেই আলোকের ধনু হইতে কিরণরাশি ঊর্দ্ধমুখে মাথার উপর দিয়া চলিতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে নানাবিধ বিচিত্র রং দেখা যায়, তাহার বড় শোভা। আবার দেখিতে দেখিতে কিছু কাল পরে সমুদয় অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। এই অদ্ভুত আলোকের ইংরাজী নাম "অরোরা"। মেরু হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে, সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকার উত্তর ভাগ—এমন কি, স্কটলণ্ডেও সচরাচর এই ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে আকাশের শোভা জন্মে বটে, কিন্তু ইহার মৃদু চঞ্চল আলোকে মানুষের কোনও কাজ হয় না। কি কারণে এইরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা আজিও বুঝিতে পারা যায় নাই। ('মুকুল,' আশ্বিন ১৩০২)

নিউটনের কীর্ত্তি

নিউটনের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মত জ্ঞানী লোক এ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। পুরাতন হইলেও নিউটনের সম্বন্ধে একটি কথা আজ তোমাদিগকে বলিব। নিউটনের সম্বন্ধে জানিবার কথা এত আছে যে, তোমরা যদি সমগ্র জীবনে পরিশ্রম করিয়া তাহা জানিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব।

বড়লোকের কথা যে বলে ও যে শুনে, উভয়েরই পুণ্য সঞ্চয় হয়। নিউটনের মত বড়লোক পৃথিবীতে খুব অল্প জন্মিয়াছেন। তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত অপরের কাজের তুলনা করিলে সন্দেহ হয়, এরূপ বড়লোক বুঝি আর জন্মান নাই। সুতরাং নিউটনের কথা আলোচনা করিলে আমাদের সকলেরই কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন, সেই বৎসর গালিলিওর মৃত্যু হয়। গালিলিও ইতালিদেশবাসী ছিলেন। গালিলিওর নামও পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত। গালিলিও পেণ্ডুলমযুক্ত ঘড়ি বাহির করেন। গালিলিও প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা আকাশ পরীক্ষা করেন। গালিলিও আরও অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার

নাই। গালিলিও খুব বড়লোক ছিলেন; কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড়লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কি? তোমরা হয় ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণশক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণশক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয় ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্পে নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুতঃ নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

প্রথমতঃ অনেকে সন্দেহ করেন, গল্পটা হয় ত আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। এক দিনে অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এবং বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদিগকে এখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব না; আশা করি, কালক্রমে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তথাপি স্থূল কথাটা জানা ভাল। তোমাদের যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, পৃথিবীর ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ নামে একটা শক্তি আছে, তাহারই বলে পৃথিবী অন্য পদার্থকে টানে, আর অন্য পদার্থে সে শক্তি নাই, তাই তাহারা পৃথিবীকে টানিতে পারে না; তাহা হইলে তোমাদের সে বিশ্বাস ভুল। বস্তুতঃ নিউটন সেরূপ কিছু আবিষ্কার করেন নাই। যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে পৃথিবী কোন পদার্থকে স্বয়ং আকর্ষণ করিতে পারে, নিউটন তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না।

তবে নিউটনের কাজটা কি? একটা ফল হাত হইতে ফেলিলে উপরে না যাইয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে চলে। ইহা তোমরাও জান,

নিউটনও জানিতেন, তাহার পূর্ব্বেও লোকে জানিত। পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিলে সেই কথাটাই ঘুরাইয়া বলা হইল; নূতন কথা কিছুই হইল না! নিউটন এমন নির্ব্বোধের মত লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে, ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে; নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে। অত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কি? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়াও তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, ঠিক সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্ত ভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়; চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আট্‌কাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয় ত আশ্চর্য্য হইবে। বলিবে—কৈ, চন্দ্র ত কত দিন আমাদের মাথার উপর উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এত দিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ?

কিন্তু আশ্চর্য্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যে দিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে, এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূর চলিয়া, তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিসটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে; আরও বেগে দিলে হয় ত দু-শ, তিন-শ কি দু হাজার তিন হাজার হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগ দিতে পারিলে হয় ত গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে, না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেরূপ বেগ দিতে পারি না, তাই অত দূর যায় না। অধিক বেগ দিবার উপায় থাকিলে আমরা উহাকে মক্কা কেন, আফ্রিকা পার করিয়া আটলান্টিক সাগরে ফেলিতে পারিতাম। যত দূরেই যাউক, পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া, একেবারে পৃথিবীটা ঘুরিয়া, আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছছাড়া হইতে পারিত না।

তাই মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্ব্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই চন্দ্র পূর্ব্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্ব্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এত দিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয় ত ভাঙ্গিয়া যাইত।

একগাছি লম্বা সূতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তার পর ডানি হাতের দুটি আঙ্গুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও; সূতাগাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলে দেখিবে, ঢিলটি

আবার স্বস্থান মুখে চলিল। যেন সেই স্বস্থানের দিকে তাহার একটা টান আছে। যেখানে ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে, আবার সেই স্থানেই যাইবে। কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ, আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাহার চারি দিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ, রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে; তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্ব্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে—পৃথিবীর নিকট যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকেও ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকট আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারি দিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ যেন পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার জো নাই। তবে বলদ ঘানিগাছে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা থাকে, তাই ঘানিগাছের দিকে তাহার টান। আর চন্দ্র পৃথিবীর দিকে সেইরূপ আমাদের দৃষ্টির অগোচর কোন দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। নিউটনও তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বলিয়া যান নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন—বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলা পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে ছোট, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়, কলুর বলদের মত সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্য্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে, তাহা আমরা জানি না। হয় ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে, আম নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে, আর পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে। অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে

চারি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে সর্ব্বত্র একই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও উহার দিকে চলিতেছে, এ ইহাকে ঘুরিতেছে, ও উহাকে ঘুরিতেছে।০

স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহাতে তোমরা মনে করিও না যে, এই ব্যাখ্যায় তোমরা নিউটনের ক্ষমতার এক-সহস্রাংশেরও পরিচয় পাইলে। যদি এই ব্যাখ্যা শুনিয়া, নিউটন কত বড়লোক ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই এই প্রস্তাবের পাঠ সফল হইবে। নিউটনের সম্বন্ধে আরও কথা সময়ান্তরে বলিব। ('মুকুল,' ফাল্গুন ১৩০২)

ভূমিকম্প

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্পে সমুদয় দেশ চকিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এমন ভয়ানক ভূমিকম্পের কথা আর কখনও শোনা যায় নাই। বৈকালে পাঁচটার সময় সহসা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে কত অট্টালিকা, ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কত লোক হত আহত হইল, মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আসাম প্রদেশে ও উত্তর-বাঙ্গালায় এই কম্প অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। সেখানে বিস্তর লোক নিহত হইয়াছে। পাকা বাড়ী মাত্রেই ভূমিসাৎ হইয়াছে অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। মাটিতে বড় বড় ফাট হইয়াছে। মাটির ফাট হইতে বালি, কাদা ও জলের ফোয়ারা উঠিয়াছে। পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি সহসা জলশূন্য হইয়াছে, কোথাও বা নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিয়া গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। নদীর গর্ভ কোথাও বসিয়া গিয়াছে, কোথাও উঠিয়া পড়িয়াছে। শস্যক্ষেত্র বালুকারাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এমন কি, পাহাড় পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে, সঙ্গে বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। মানুষের ভাগ্যে নানাবিধ দৈব দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু এমন আকস্মিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া লোকে এই কম্প অনুভব করিয়াছিল, তবে উত্তর-বাঙ্গালার যত দূর অনিষ্ট হইয়াছে, তত দূর অন্য স্থানে হয় নাই। আসাম অঞ্চলেই ইহার মাত্রা

অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। সেখানে যে কি পরিমাণ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এখনও তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই।

শুধু ভারতবর্ষ কেন, ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু দূর পর্য্যন্ত এই ভূমিকম্প বুঝা গিয়াছিল। ভূমিকম্প বুঝিবার জন্য সম্প্রতি একরকম যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে অতি সামান্য কম্প উপস্থিত হইলেও এই যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। আমরা যে সকল কম্পন একবারেই বুঝিতে পারি না, সেই সকল কম্পেও এই যন্ত্র বিচলিত হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের বিষয় আলোচনা করেন। আমরা সে দিন যে সময়ে কম্পন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা ঠিক সেই সময়ে যন্ত্র দ্বারা এই দূরদেশস্থ ভূমিকম্প টের পাইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বোধ হয় এমন স্থান নাই, যেখানে ভূমিকম্প একেবারে হয় না। তবে সকল স্থানে ইহার প্রকোপ সমান নহে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে ভূমিকম্প মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। গত ১২৯২ সালের আষাঢ় মাসের ভূমিকম্প অনেকের স্মরণ থাকিবে। সে কম্পও নিতান্ত সামান্য হয় নাই। সে বারেও উত্তর-বাঙ্গালাতেই কম্প প্রবল হইয়াছিল, এবং সে বারেও অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। স্থানে স্থানে বাড়ী চাপা পড়িয়া মানুষ মারা গিয়াছিল। তার পর ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের রাত্রিতে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাও বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল স্থানেই অনুভূত হয়। কয়েক বৎসর হইল, গুজরাট প্রদেশে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া কচ্ছ নামক স্থানটি বসিয়া গিয়াছিল। সে বৎসর কাশ্মীরে ভূমিকম্প হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছিল।

বস্তুতঃ সমগ্র হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ব্যাপিয়া চিরদিনই অল্প বা অধিক মাত্রায় ভূকম্প ঘটিয়া থাকে। আসাম প্রদেশ হিমালয়ের দক্ষিণে এবং গারো ও খাসিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। এ বৎসর এই প্রদেশেরই সর্ব্বনাশ ঘটিল। ভবিষ্যতে আর কি হইতে পারে, কেহ বলিতে পারে না।

কয়েক বৎসর হইল, জাপান দেশে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর লোক মরিয়াছিল। জাপান দেশ ভূমিকম্পের উপদ্রবের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে প্রায়ই প্রবল কম্প ঘটিয়া থাকে। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগ ও

আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রতট ব্যাপিয়া ভূমিকম্পের উপদ্রব বর্ত্তমান। ইংরাজী ১৭৫৫ সালের নবেম্বর মাসে পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগরে ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটিয়া সমস্ত নগরটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। লিস্‌বন নগরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। অনেকে বাড়ী চাপা পড়িয়া মরিবার ভয়ে সমুদ্রতীরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অকস্মাৎ সমুদ্র হইতে তালগাছের মত ঢেউ আসিয়া তাহাদিগকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

জাপান, যবদ্বীপ, ইতালি, সিসিলি, দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম উপকূল প্রভৃতি স্থানে আগ্নেয় গিরির উৎপাত অধিক এবং ভূমিকম্পের উপদ্রব এই সকল প্রদেশেই বেশী। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে প্রায় প্রবল ভূমিকম্প ঘটে। আগ্নেয় পর্ব্বতের সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর মানচিত্রে একটি দীর্ঘ বাঁকা রেখা টান। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-সমুদ্রতটের ধারে ধারে, আন্দীস পর্ব্বতশ্রেণীর ধারে ধারে উত্তর মুখে চল। পরে পানামা যোজক পার হইয়া উত্তর-আমেরিকারও পশ্চিম কূল বাহিয়া উত্তর মুখে চলিতে থাক। বেরিং প্রণালীর নিকট সমুদ্র পার হইয়া জাপানের দ্বীপগুলিতে দক্ষিণ মুখ ধর। জাপান হইতে চীনদেশের পূর্ব্বতট বাহিয়া হিমালয়ের পূর্ব্ব-সীমান্তে উপস্থিত হও। এই সময়ে আর একটি রেখা যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব উপদ্বীপ পার হইয়া হিমালয়ের পূর্ব্ব-সীমান্তে আসিয়া মিলিবে। এই দুই রেখা একত্র হইয়া হিমালয়ের ধারে ধারে পশ্চিম মুখে চলিবে; পরে পারস্যদেশ ও তুরস্ক অতিক্রম করিয়া ইউরোপের দক্ষিণ ও ভূমধ্যসাগরের উত্তর তট বাহিয়া শেষে বিশাল আতলান্তিক মহাসাগরে শেষ পাইবে। এই যে সুদীর্ঘ রাস্তায় রেখা টানা গেল, এই রেখার পথেও উভয় পার্শ্বে ভূমিকম্পের প্রকোপ চিরকালই অধিক। পৃথিবীর বড় বড় আগ্নেয় পর্ব্বতও এই রেখারই স্থানে স্থানে অবস্থিত আছে।

আমরা স্থৈর্য্যগুণের উপমা দরকার হইলে পৃথিবীর নাম করিয়া থাকি। ভূপৃষ্ঠের মত স্থির কে? কিন্তু এই ধরিত্রীই কেন কাঁপিয়া উঠিয়া জীবকুলকে ভয়ত্রস্ত করেন? মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ধরাপৃষ্ঠে ঘর বাড়ী

তৈয়ার করিয়া বাস করিতে থাকে। অকস্মাৎ সেই ধরাপৃষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিয়া মানুষের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে ও মানুষের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়। এই আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতে মানুষ হতবুদ্ধি হয় ও ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া নানাবিধ বিভীষিকা কল্পনা করে।

যে সকল ঘটনা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে বিস্মিত হই না। যাহা সচরাচর দেখা যায় না, তাহা হঠাৎ উপস্থিত হইলে আমরা বিস্মিত হই। এবং উহা প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে মনে করিয়া নানাবিধ অলীক ও অমূলক আশঙ্কা করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্পে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

জল, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক উৎপাতও যেমন সাধারণ নিয়মে ঘটিয়া থাকে, ইহাও তাহাই।

আসল কথা, পৃথিবীর পৃষ্ঠকে স্থির মনে করাটাই ভুল। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই চঞ্চল। পূর্ব্বে যে যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, তাহার সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, ভূপৃষ্ঠ প্রায় সর্ব্বদাই কাঁপিতেছে। তবে সেই কম্প এত ক্ষীণ যে, আমরা আদৌ তাহা টের পাই না। যখন ঘটনাক্রমে একটু তীব্র হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি ও ভয় পাই। ভূপৃষ্ঠ কেন এমন চঞ্চল হয়, তাহা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে, পৃথিবীর ভিতরটা খুব গরম। গভীর কূপের ভিতর বা খনির ভিতর এই গরম স্পষ্ট বুঝা যায়। ভূগর্ভ হইতে স্থানে স্থানে গরম জল ও গরম জিনিস বাহির হইয়া উষ্ণ প্রস্রবণাদির সৃষ্টি করে। বস্তুতই পৃথিবীর ভিতরটা খুব গরম; এত গরম যে, সেখানে লোহা ও পাথরও হয় ত গলিয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর পৃষ্ঠটাই অপেক্ষাকৃত শীতল ও জীবজন্তুর বাসের যোগ্য। একটা খুব গরম বর্ত্তুল যেন একটা পাতলা ঠাণ্ডা আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া আছে। তবে গরম জিনিস মাত্রই কালে ঠাণ্ডা হয়। পৃথিবীও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতেছে। উপরটা ঠাণ্ডা হইয়াছে বলিয়াই পিঠটা উচুনীচু। গরমে জিনিস কুঞ্চিত, সঙ্কুচিত হয়; এমন কি, ফাটিয়া যায়। গরমে মাটি ফাটে, কাঠ ফাটে, পাথর ফাটে; সেইরূপ ঠাণ্ডাতেও মাটি কাঠ ফাটে। কাচের বাসন হঠাৎ গরম পাইলে ফাটে, আবার উহাতে বরফ ঠেকিলেও ফাটিয়া যায়। রাত্রে ঠাণ্ডা পাইলে দরজা জানালার কপাট সঙ্কুচিত হয় ও স্থানে স্থানে

ফাটিয়া যায়। নিস্তব্ধ রাত্রে তাহার ফুটফাট শব্দ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পৃথিবীর পিঠটা নিতান্ত বন্ধুর, কর্কশ, উঁচুনীচু হইয়াছে। যেখানটা উঁচু, সেখানে পর্ব্বত, যেখানে নীচু, সেখানে সাগর। এখনও এই কাজ চলিতেছে। এই কারণে পৃথিবীর পিঠ কোথাও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উঠিতেছে, কোথাও বা নামিতেছে। কোথাও ধীরে কাঁপিতেছে; কোথাও দ্রুত কাঁপিতেছে। কোথাও বা উপরে ফাটিতেছে, কোথাও বা কিছু নীচে ফাটিতেছে। কোন কোন ব্যাপার সর্ব্বদাই ধীরে ঘটে; আমরা টের পাই না বা গ্রাহ্য করি না। কোন ব্যাপার বা অকস্মাৎ দ্রুত প্রবল ভাবে ঘটে, তখন আমরা চমকিয়া উঠি বা ভয় পাই। আগ্নেয় গিরির উৎপাত ও ভূমিকম্প এইরূপ কতকটা আকস্মিক প্রবল ব্যাপার। বস্তুতঃ উহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভূপৃষ্ঠের দু-মাইল দশ মাইল নীচে, কোন স্থানে হঠাৎ একটা ফাট ফাটিলে বা একটা কিছু স্থানচ্যুত হইলেই তাহার ধাক্কা চারি দিকে সংক্রান্ত হয়। জাহাজে জলের পিঠে কোন একটা ধাক্কা পড়িলে বা নাড়া দিলে তখন চারি দিকে ঢেউ উঠিতে থাকে, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের নীচে কোন স্থানে কোন একটা ধাক্কা পড়িলে, সেই রকম কতকগুলা ঢেউ উঠিয়া চারি দিকে চলিতে থাকে ও ভূপৃষ্ঠে আসিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া কাঁপাইয়া দেয়। তাহাতে ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, গাছপালা উন্মূলিত হয়, মাটি বসিয়া যায়, উঠিয়া পড়ে, ফাটিয়া যায়, নদ নদীর স্রোত বন্ধ হয়, সমুদ্রে ঢেউ উঠে; একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়।

ভূমিকম্পে আমাদের সচরাচর কোন উপকার বা লাভ নাই। তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে এইরূপ উঠানামা হয়, ইহা না হইলে ভূপৃষ্ঠ একবারে গোল সমতল হইত। এখন যেমন খানিকটা জলে ঢাকা সমুদ্র রহিয়াছে, খানিকটা পর্ব্বতাদিযুক্ত আমাদের বাসযোগ্য স্থলভাগ রহিয়াছে, সেরূপ থাকিত না। ('সখা ও সাথী,' আষাঢ় ১৩০৪)

গাছের আহার

গাছের জীবন আছে, তোমরা হয় ত জান না। মানুষ, পশু ও পক্ষীর মত গাছও জীবন্ত পদার্থ। মানুষের যেমন জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, গাছেরও সেইরূপ জন্ম মৃত্যু আছে। মানুষের যেমন শৈশব ও বার্দ্ধক্য আছে, গাছেরও সেইরূপ আছে। মানুষ যেমন ছোট হইতে বড় হয়, গাছও তেমনি ক্রমে ছোট হইতে বড় হয়। মানুষের আহার দরকার; গাছেরও আহার বিনা চলে না।

গাছেরও আহার আবশ্যক। এই আহারে গাছের বৃদ্ধি হয় ও তাহার শরীর রক্ষা হয়। আহার বন্ধ করিলে গাছের পুষ্টি হয় না।

গাছ মাটির ভিতর দিয়া শিকড় চালায়; সেই শিকড় দিয়া মাটি হইতে রস টানিয়া লয়; যদি রৌদ্রের উত্তাপে মাটি অনেক দিন ধরিয়া শুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে গাছ অধিক রস পায় না; গাছ শুকাইয়া যায় ও মরিয়া যায়।

বড় বড় গাছ মাটির অনেক নীচে পর্য্যন্ত মূল চালাইয়া, রস আকর্ষণ করিতে পারে; ছোট ছোট গাছের শিকড় তত দীর্ঘ নয়, উহারা অধিক দূর হইতে রস টানিয়া আনিতে পারে না। কাজেই জলাভাবে ছোট গাছের যত শীঘ্র বিপদ্ ঘটে, বড় গাছের তত শীঘ্র ঘটে না। ছোট গাছ বাড়িবার সময় মৃত্তিকায় জল দিতে হয়; মাটি যাহাতে না শুকায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই সকল দেখিয়া তোমাদের হয় ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, রসই গাছের প্রধান খাদ্য। মাটি হইতে শিকড় দ্বারা যে রস টানিয়া লয়, তাহারই বলে গাছ বাড়ে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। গাছের প্রধান আহারসামগ্রী রস নহে; প্রধান আহারসামগ্রী বায়ু। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত কথা। বরং রস নহিলে গাছের চলিতে পারে, কিন্তু বায়ু নহিলে চলে না।

গাছের শরীরের নানা অংশ; কাঠ, পাতা, ছাল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যে কোন অংশ উত্তাপ দিয়া গরম কর, অথবা আধপোড়া কর, দেখিতে পাইবে, উহা ক্রমে কালো হইয়া আসিতেছে। গরম করিলে

খানিকটা জল বাহির হইয়া যায়, খানিকটা ধোঁয়া হইয়া বাহির হইয়া যায়; যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ; উহাকে কয়লা বলে।

কাঠ, পাতা, ঘাস, খড়, যে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ হউক না কেন, এইরূপে গরম করিলে বা আধপোড়া করিলে, খানিকটা জলীয় ও বায়বীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তাহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তাহার নাম কয়লা।

এই কৃষ্ণবর্ণ কয়লাকে আবার পোড়াও। দেখিতে পাইবে, কয়লা প্রথমে গরম হইয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিবে ও ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকিবে। শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কয়লা পুড়িয়া যাইবে। কেবল একটু সাদা মত পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; সেটুকু আর পুড়িতে চাহে না; তাহার নাম ছাই বা ভস্ম। যত চেষ্টা কর, এই ছাইটুকু কিছুতেই পুড়িবে না। একখানা প্রকাণ্ড কয়লার মধ্যে খানিকটা ছাই থাকে। সমস্ত কয়লাটা পুড়িয়া যায়, ছাইটুকু কিছুতেই পোড়ে না। কয়লা ও ছাই, উভয়ের মধ্যে এই তফাত। কয়লা কৃষ্ণবর্ণ, ছাই কতকটা সাদা।

কাঠ, পাতা, ঘাস, খড়, এই সকল পদার্থের মধ্যে কয়লাও আছে, ছাইও আছে। কয়লার ভাগ অনেক বেশী, ছাই অনেক কম। এখন প্রশ্ন এই যে, এই এতটা কয়লা ও এইটুকু ছাই আসিল কোথা হইতে?

দুইটা জলের বাটি লও; একটাতে একখানা কয়লা ফেলিয়া দাও, আর একটাতে একটু ছাই ফেলিয়া দাও। দেখিবে, কয়লা কোন মতেই জলের সহিত মিশিবে না; যতই চেষ্টা কর, জল আর কয়লা পৃথক্ হইয়া থাকিবে। কয়লাকে চূর্ণ করিয়া জলে ফেল, তথাপি মিশিবে না। আবার ছাঁকিয়া ফেলিলে কয়লাকে বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ছাই তেমন নহে। অল্পক্ষণেই ছাই জলে দ্রবীভূত হইয়া জলের সহিত মিলিয়া যাইবে। লুন, চিনি প্রভৃতি যেমন জলে গলিয়া যায়, ছাইও সেইরূপ জলে গলে। ছাই জলে মিশে, কিন্তু কয়লা কোন মতে মিশে না।

ছাই জলে গলিয়া যায়, কয়লা গলে না। আবার কয়লা পুড়িয়া যায়; কিন্তু ছাই কোন ক্রমেই পোড়ে না। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

কয়লা পুড়িলে কি হয়? কয়লা পুড়িয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। বায়ু নানাবিধ। সকল বায়ুর গুণ সমান নয়। কয়লা পুড়িয়া যে বায়ু হয়,

সে এক রকমের বায়ু। এ বায়ু আমরা চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু অন্য উপায়ে ইহাকে ধরিতে পারি।

একরকম বায়ু আছে, তাহা নহিলে আমরা বাঁচি না। বায়ুতে আমরা নিশ্বাস লই, নিশ্বাস গ্রহণের সময় সেই বায়ু আমাদের শরীরের মধ্যে যায়। সেই বায়ুতেই আবার প্রদীপ জ্বলে। সেই বায়ুর যাতায়াতের জন্য লণ্ঠনের নীচে ও উপরে ছিদ্র বা যাতায়াতের পথ রাখিয়া দিতে হয়। সেই বায়ুর প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইলে প্রদীপ জ্বলে না, আগুনও জ্বলে না। আবার সেই বায়ু ব্যতীত আমরা নিশ্বাস লইতে পারি না। ইহাকে বলিব এক নম্বরের বায়ু। আর একরকম বায়ু আছে, তাহার গুণ অনেকাংশে বিপরীত। এই বায়ুর মধ্যে মানুষকে রাখিয়া দিলে মানুষ তৎক্ষণাৎ শ্বাসরোধে মরিয়া যায়। এই বায়ুর মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া দিলে তখনই নিবিয়া যায়। ইহাকে বলিব দুই নম্বরের বায়ু।

প্রদীপের তেলে ও বাতির চর্ব্বিতে যথেষ্ট কয়লা আছে; প্রদীপ ও বাতি যখন জ্বলে, তখন এই কয়লা পুড়িতে থাকে। কয়লা আছে, তাহা সহজেই দেখান যাইতে পারে। দীপশিখার উপরে একখানি ঠাণ্ডা রেকাব ধর। দেখিবে, রেকাবের গায়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কয়লা জমিবে। তেল ও বাতি জ্বলিবার সময় এই কয়লা পোড়ে; কয়লার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুঁড়াগুলি উত্তাপে রাঙ্গা হয়, তাহাতেই আমরা আলো পাই। কয়লা পুড়িয়া এই দুই নম্বরের বায়ুতে পরিণত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক নম্বরের বায়ু ব্যতীত প্রদীপ জ্বলে না, বাতি জ্বলে না, কয়লা পোড়ে না। জ্বলিবার সময় ও পুড়িবার সময় কয়লার সহিত এই এক নম্বরের বায়ুর সংযোগ ঘটে। কয়লা বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়; উভয়ে মিলিয়া দুই নম্বরের বায়ু তৈয়ার হয়।

এখন বাতি জ্বলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। বাতিতে কয়লা আছে। সেই কয়লা এক নম্বরের বায়ুর সহিত মিশে; ফলে দুই নম্বরের বায়ু তৈয়ার হয়। কয়লা ও এক নম্বরের বায়ু একত্র যোগে দুই নম্বরের বায়ু প্রস্তুত হয়। দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে কয়লা ও এক নম্বরের বায়ু, উভয়ই বর্ত্তমান থাকে।

এক নম্বর ও দুই নম্বর, উভয় বায়ুই আমাদের চোখের অদৃশ্য। এক নম্বরের বায়ুতে কয়লা মিশিয়া, সেই কয়লা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন

আর সে কয়লা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সেই কয়লা দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে এই কয়লা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু আমরা সহজে এই কয়লা আবার বাহির করিয়া লইতে পারি না। এক নম্বরের বায়ুর সহিত কয়লাকে মিশাইয়া দুই নম্বরের বায়ু তৈয়ার করা সহজ; কিন্তু দুই নম্বরের বায়ুকে ভাঙ্গিয়া সেই কয়লা পুনরায় বাহির করিয়া ফেলা আমাদের অসাধ্য। আমরা পারি না, কিন্তু সূর্য্যদেব পারেন। সূর্য্যের কিরণ দুই নম্বরের বায়ুর ছোট ছোট কণাতে প্রচণ্ড ঘা দেয়, আর কণাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া কয়লা বাহির হইয়া পড়ে।

আমরা যে বায়ুরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া যে বায়ুরাশি আছে, যে বায়ুরাশি একটু নড়িলেই ঝড় হয়, সেই বায়ুরাশির মধ্যে উভয় বায়ুই বর্ত্তমান আছে। এক নম্বরের বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আছে; দুই নম্বরের বায়ু কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। এই দুই নম্বরের বায়ু যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে, তাহাতেই গাছপালার জীবন রক্ষা হয়।

অধিকাংশ গাছ শত সহস্র সবুজ রঙের পাতা বিছাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী খাদ্য সামগ্রী উদরস্থ করে। এই সকল পাতাই যেন গাছের উদর। সূর্য্যের কিরণে দুই নম্বরের বায়ু হইতে যে কয়লা বাহির হয়, এই সকল পাতা সেই কয়লাকে গ্রাস করে ও আত্মসাৎ করে। কয়লা পাতার মধ্যে মিশিয়া যায়।

এইরূপে গাছের শরীরে পাতার সাহায্যে ও রৌদ্রের সাহায্যে কয়লা সঞ্চিত হইতে থাকে। গাছের প্রধান খাদ্যই কয়লা; গাছ এইরূপে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করে।

সূর্য্যকিরণের সাহায্য না পাইলে, পাতা আপনা হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতে পারে না; এই জন্য অন্ধকারে, সূর্য্যকিরণের অভাবে গাছ বাড়ে না। গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্য্যকিরণ আবশ্যক।

এখন বুঝিতে পারিলে, গাছের প্রধান আহার কি? উপরে বলিয়াছি, গাছের শরীরে যেমন কয়লা আছে, তেমনি একটু ছাইও আছে। ছাই জলে গলে। মাটির মধ্য হইতে যে রস মূল দ্বারা আকৃষ্ট হয়, সেই রসে এই ছাই আছে। লোণা জলে যেমন লবণ থাকে, সরবতে যেমন চিনি থাকে, মৃত্তিকাস্থিত রসে সেইরূপ এই ভস্ম দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। গাছের শিকড় সেই রস টানিবার সময় ছাই সমেত গ্রহণ করে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখিও, গাছের প্রধান আহার বায়ু। ('মুকুল,' আশ্বিন ১৩০৫)

উনবিংশ শতাব্দী

এখন ইংরাজী ১৮৯৯ সাল চলিতেছে ; আর একটা বৎসর ও কয়েক মাস পরেই বিখ্যাত উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবে। ইংরাজী বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইবে। উনবিংশ শতাব্দী বিখ্যাত—নানা কারণে বিখ্যাত। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বোধ করি, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির জন্য। এই পক্ষে গত শত বৎসরে মানুষের যত উন্নতি ঘটিয়াছে, আর কোন এক শত বৎসরে এত উন্নতি ঘটে নাই। এই এক শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর চেহারাটাই মানুষে উল্টিয়া দিয়াছে, বলিলে বলিতে পারে। যদি এক শত বৎসরের পূর্ব্বের কোন মানুষ এখন সহসা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে চমকিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তাহার মনে হইবে, এই পৃথিবী কি সেই পৃথিবী? এই মানুষ কি সেই মানুষ? এই এক শত বৎসরে মানুষে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছে, শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। বোধ করি, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কেহ তখন মনে করিতে পারে নাই যে, মানুষের দ্বারা এই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। বস্তুতঃই এই এক শত বৎসরের ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র ও আশ্চর্য্য। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য—এই এক শত বৎসরের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস। এখন তোমরা সে সকল ঘটনা সচরাচর প্রত্যক্ষ করিতেছ, যাহা দেখিয়া তোমরা কিছুই বিস্মিত হও না, হয় ত মনে কর, ইহাতে আর নূতন কি আছে, শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাহারও মনে আসিত না। ইহা কি কম আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই শত বৎসরের কাহিনী তোমাদিগের কিছু কিছু জানা উচিত। যে সকল বড় বড় লোকে এই অপূর্ব্ব উন্নতির পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে প্রধান পুরুষ। তাঁহাদের নাম ধাম সকলেরই জানা উচিত। কিরূপে, কি উপায়ে, কত গভীর চিন্তার পর, কত পরিশ্রমের পর তাঁহারা সফল হইয়াছিলেন, তাহাও জানিতে চেষ্টা করা উচিত। সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কেন না জ্ঞানের উন্নতি অনেক চিন্তার ফল ; সে চিন্তা সকলের

সাধ্য নহে। তবু কথাচ্ছলে অনেক নূতন কথা শিখিতে পারা যায়। কথাচ্ছলে ক্রমশঃ উনবিংশ শতাব্দীর অপূর্ব্ব ইতিহাস তোমাদিগকে শুনাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

বিজ্ঞানের নানা ভাগ। এই বিশাল জগতের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলই জ্ঞানের বিষয়, সকলই বিজ্ঞানের আলোচ্য। বিজ্ঞান সকলের সম্বন্ধেই কথা কহে। আকাশে যে সকল গ্রহ তারা দেখা যায়, তাহারা কেমন জিনিস, তাহারা কত দূরে আছে, তাহারা কি পদার্থে নির্ম্মিত, এ সমস্তই মানুষ ক্রমে জানিতেছে।

আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা পূর্ব্বে কেমন ছিল এবং এখন কিরূপ, তাহাও বিজ্ঞান ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছে। পৃথিবীতে জীবজন্তু পূর্ব্বে কেমন ছিল, তাহাদের জীবন ধারণের কি প্রণালী ছিল, বর্ত্তমান কালে যে সকল জীবজন্তু রহিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কিরূপ, ক্রমেই স্থির হইতেছে। তাপ কি, আলোক কি, বিদ্যুৎ কি, এই সকল তত্ত্ব ক্রমেই মানুষ জানিতে পারিতেছে। জগতে এই তাপ দ্বারা, এই আলোক দ্বারা, এই বিদ্যুৎ দ্বারা কত রকম কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, মানুষ ক্রমে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে; এবং তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া, ঐ তাপ, ঐ আলোক, ঐ বিদ্যুৎকে আপন মনের মত কাজে লাগাইয়া, আপন মনের মত কাজ সাধন করিয়া লইতেছে। ফলে জগতের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, মনুষ্য সমস্তই জানিবার চেষ্টায় আছে, এবং গত শত বৎসরে যে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সকল বিষয়েই নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা লোকে জানিত না, এখন তাহা জানে; পূর্ব্বে যে কাজ পারিত না, এখন তাহা পারে। মানুষের জ্ঞান বাড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্ষমতাও বাড়িয়াছে। কেন না, জ্ঞান হইতে ক্ষমতা জন্মে। তোমরা জ্ঞান বাড়াইবার চেষ্টা কর, তোমাদের শক্তি আপনা হইতেই বাড়িবে। ('মুকুল,' বৈশাখ ১৩০৬)।

জ্যোতিষের কথা

তোমাদিগকে ঊনবিংশতি শতাব্দীর জ্ঞানোন্নতির কথা বলিব বলিয়াছি। আজ জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুই চারিটা কথা বলিব। জ্যোতিষ শাস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন শাস্ত্র। কত হাজার বৎসর ধরিয়া মনুষ্য জাতি এই শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। পাঁচ সাত হাজার বৎসর কি ততোধিক পূর্ব্বে মিশর দেশে ও বাবিলন দেশে এই জ্যোতিষের আলোচনা হইত। আমাদের দেশেও প্রাচীন ঋষিদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের আলোচনা আছে। ইউরোপে গ্রীক্‌জাতি জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়াছিলেন; তার পরে প্রায় দেড় হাজার বৎসর ইউরোপের জ্ঞানের উন্নতি স্থগিত থাকে। সেই সময়ের মধ্যে আরবীয় জাতি জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়াছিল। আরবীদের নিকট ইউরোপের লোকে নূতন করিয়া জ্যোতিষ শিখিতে আরম্ভ করে। তার পর গত চারি শত বৎসর মধ্যে জ্যোতিষের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত নিউটন বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যে নূতন পন্থা দেখাইয়া যান, সেই রাস্তা ধরিয়া এতটা উন্নতি হইয়াছে। সে সমস্ত কথা অতি অপূর্ব্ব বিস্ময়কর। এক্ষণে সকল কথা বলিবার সময় নাই। গত শত বৎসরে যে যে নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহারই মধ্যে দুই চারিটা সহজ সহজ কথা তোমাদিগকে অদ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

গ্রহ কাহাকে বলে জান কি? আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্থির, আপন স্থান হইতে সরে না; মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে একই স্থানে থাকে। আবার কয়েকটি আছে, তাহারা ইতস্ততঃ সরিয়া বেড়ায়। সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই কয়েকটি জ্যোতিষ্ককে এইরূপে আকাশের মধ্যে সরিয়া যাইতে, চলিয়া যাইতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে ইহাদিগকেই গ্রহ বলিত। শুক্রগ্রহ তোমরা সহজেই চিনিতে পারিবে। সন্ধ্যার পর কখনও কখনও খুব বড় একটা তারা পশ্চিম আকাশে দেখা যায় সেইটা শুক্র। আবার কিছু দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই তারা পূর্ব্বাকাশে উঠে। যখন পশ্চিমাকাশে দেখা যায়, তখন আর প্রাতে দেখা যায় না;

আবার যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দেয়, তখন আর সন্ধ্যার পর দেখা যায় না। শুক্র কখনও অস্তগত সূর্য্যের পূর্ব্বে দেখা যায়, আবার কিছু দিন উদয়োন্মুখ সূর্য্যের পশ্চিমে দেখা যায়; এই জন্য শুক্র গ্রহ।

আগে লোক মনে করিত, এই গ্রহ কয়টি পৃথিবীর চারি দিকে পরিভ্রমণ করে; সেই জন্য এইরূপ চলন্ত দেখায়। কিন্তু এখন আমরা জানি, সূর্য্য স্থির থাকে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে; আর তাহাদের সঙ্গে পৃথিবীও সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে। আর চন্দ্র, সে আবার পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে। কাজেই এখন গ্রহের তালিকা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের নাম কাটা গিয়াছে এবং পৃথিবীর নাম নূতন প্রবেশ করিয়াছে।

এ কালে যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে, তাহাদিগকে গ্রহ বলা যায়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই কয়টি এখনও গ্রহের মধ্যে। চন্দ্রকে গ্রহ বলা যায় না; গ্রহের অনুচর বলিয়া উহাকে উপগ্রহ বলা যায়।

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। অন্য কয়টি গ্রহ সকলকেই আমরা চোখে দেখিতে পারি। তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই গ্রহ কয়টিকে চিনিয়া ফেলিতে পারিবে। এরূপ চেষ্টা করা উচিত। উহাতে যথেষ্ট আমোদ পাইবে।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কেহ জানিত না যে, এ কয়টি ব্যতীত আরও গ্রহ আছে, এবং তাহারাও সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিয়া থাকে। এক শত বৎসরের কিছু অধিক হইল, উইলিয়ম্ হর্শেল নামক এক ব্যক্তি সহসা দূরবীণের দ্বারা একটা নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই গ্রহ ইহার পূর্ব্বে আর কেহ চোখে দেখে নাই। বস্তুতঃ এই গ্রহ নিতান্ত ছোট নহে, আমাদের পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক বড়, কিন্তু এত দূরে আছে যে, আমরা সহজ চোখে দেখিতে পাই না।

এই হর্শেল অতি অদ্ভুত লোক ছিলেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন; তাঁহার বাজনার ব্যবসায় ছিল; গান-বাজনার ব্যবসায় পণ্ডিতের ব্যবসায় নহে, কিন্তু হর্শেলের জ্যোতিষে কিরূপ ঝোঁক পড়িয়া যায়। তিনি নিজের হাতে দূরবীণ তৈয়ার করিতেন ও সেই দূরবীণ লইয়া রাত্রি জাগিয়া আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন। নূতন গ্রহ

আবিষ্কার করিয়া তাঁহার নাম পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া গেল। এই গ্রহের নাম ইংরাজীতে হইয়াছে "উরেনস্," বাঙ্গালাতে ইহাকে বরুণ গ্রহ বলা হয়। দেবতাদের নামানুসারে গ্রহ-নক্ষত্রাদির নামকরণ হয়। বরুণ গ্রহ বাহির হওয়ায় জ্যোতিষীদের মধ্যে একটা কলরব পড়িয়া যায়। তবে ত আকাশের মধ্যে আরও গ্রহ অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ভাল বড় দূরবীণ হইলে তাহাদিগকে ধরা যাইতে পারে।

গত শতাব্দীতে আরও নূতন গ্রহ ধরিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই সেই চেষ্টা পুনশ্চ ফল লাভ করে। সে ইতিবৃত্ত বড়ই আশ্চর্য্য।

সূর্য্যের খুব নিকটে বুধগ্রহ, তার পর শুক্র; তার পর পৃথিবী, ক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও বরুণ। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁক আছে; এই উভয় গ্রহের মধ্যে এতটা ব্যবধান ধরিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিতেন, এতটা ব্যবধান কেন, অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন গ্রহ অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে। এই জন্য কোন কোন জ্যোতিষী দূরবীণ দ্বারা সেই প্রদেশটার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর ঠিক প্রথম বৎসরই সেই দেশে আর একটি নূতন গ্রহ বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহারা অনুমানের জোরে খুঁজিতে গেলেন, অনুমান বাস্তবিকই যথার্থ হইয়া পড়িল।

নূতন গ্রহ আর একটি বাহির হইল বটে, কিন্তু এই গ্রহটি অন্যান্য পূর্ব্বপরিচিত গ্রহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে, অন্যান্য পরিচিত গ্রহের সঙ্গে এক শ্রেণীতে নাম দিতেই কেমন কেমন ঠেকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই ঠিক সেই প্রদেশেই, অর্থাৎ সেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে আরও একটা গ্রহ বাহির হইল। এ গ্রহটাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দেখিতে দেখিতে আর একটা, আর একটা, আর একটা, এইরূপে অনেকগুলি ছোট ছোট জড়পিণ্ড, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন গ্রহ বাহির হইয়া শেষে হিসাব রাখা দুষ্কর হইয়া পড়িল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইহাদের সবগুলিই বুধ শুক্রাদি পূর্ব্বপরিচিত গ্রহগণের তুলনায় আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অথচ সকলেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ, পৃথিবী, শনি ও বরুণ প্রভৃতি মহাকায় গ্রহ যে নিয়মে সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে, এই সকল ক্ষুদ্র

পিণ্ডগুলিও ঠিক সেই নিয়মে যথাকালে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। আর ইহারা পরস্পর এত কাছে যে, অনেকে মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি বা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে একটা মহাকায় গ্রহই এককালে বর্ত্তমান ছিল। কোন সময়ে কোন কারণে সেই বৃহৎ গ্রহটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া, এই শত খণ্ডে ক্ষুদ্র গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনুমান সত্য কি না, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে সেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষেই আরম্ভ হইয়াছে, আজিও তাহা থামে নাই, আজ পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত ক্ষুদ্র গ্রহ সেই প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এখনও কত বাহির হইবে, কে বলিতে পারে ?

কিন্তু আজকাল যে সকল ক্ষুদ্র গ্রহ বাহির হইতেছে, তাহারা আবার এত ছোট যে, অতিবৃহৎ দূরবীণেও তাহাদিগকে দেখা যায় না। হর্শেল যে দূরবীণ তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহা সে কালের মধ্যে খুব আশ্চর্য্য যন্ত্র বলিয়া গণিত হইত। সেই দূরবীণ এত বৃহৎ যে, তাহার চোঙের ভিতর মানুষে সপরিবারে বাসা লইয়া থাকিতে পারিত। হর্শেল আমোদ করিয়া তাঁহার ছেলেপিলের সঙ্গে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেন। উইলিয়ম্ হর্শেলের পুত্র সার্ জন হর্শেল জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন ; পিতার পাণ্ডিত্য ছিল না, পুত্রের পাণ্ডিত্য বিশ্ববিখ্যাত। পিতা পুত্রে ঐ দূরবীণের সাহায্যে কতই না নূতন নূতন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সে এক শত বৎসরের পুরান কথা। আজকাল যে সকল দূরবীণ তৈয়ার হয়, তাহাদের ক্ষমতা আরও অধিক। অথচ এই সকল দূরবীণের সাহায্যেও এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ চোখে দেখা যায় না।

তোমরা হয় ত অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যদি উৎকৃষ্টতম দূরবীণেও চোখে ধরা না পড়ে, তবে ধরা পড়িল কিরূপে ? ইহার উত্তর অতি আশ্চর্য্য। আজকাল এমন এক জিনিস বাহির হইয়াছে, তাহার আলো দেখিবার শক্তি চোখের অপেক্ষাও অধিক। এই জিনিস আর কিছুই নহে, ফটোগ্রাফারের তৈয়ারি কাচ। ফটোগ্রাফি তোমরা জান। কাচের গায়ে বা কাগজের গায়ে একটা প্রলেপ দিয়া, মানুষের সম্মুখে ধরিলেই মানুষের ছবি সেই কাচে বা কাগজে একেবারে চিরস্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। সেই তৈয়ারী প্রলেপ দেওয়া কাচ বা কাগজ দূরবীণের

সামনে ধরিলে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী পদার্থের ছবি সেই কাচে বা কাগজে অঙ্কিত হয়। দূরবীণ চোখে লাগাইলে চোখে আলো পড়ে, খুব দূরের জিনিসের আলো পড়ে। আর চোখের বদলে এই তৈয়ারী কাচ দিলে তাহাতে আরও দূরের জিনিসের আলো পড়িয়া চিহ্ন থাকিয়া যায়। যে আলো এত কম যে, চোখে আঁধারই থাকে, সে আলোও এই প্রলেপে চিহ্ন রাখিয়া দেয়। ফটোগ্রাফির এমনই মাহাত্ম্য। আজকাল এমনই প্রলেপের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই গত বৎসরই এইরূপ ফটোগ্রাফি দ্বারা একটা ক্ষুদ্র গ্রহ বাহির হইয়াছে। সেটা এত ছোট যে, কোন কালে চোখে বাহির হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই গ্রহটা আবার ঠিক মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে নহে। ইহা পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝে। পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝে ইহার পূর্ব্বে কোন গ্রহের আমরা অস্তিত্ব জানিতাম না। কিন্তু গত বৎসর এই ছোট গ্রহটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গতিবিধি কিছু বিচিত্র রকমের। এক এক বার সন্দেহ হয়, ইহাও এককালে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী গ্রহমালার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কোন রকমে ছট্‌কিয়া পড়িয়া স্বস্থানভ্রষ্ট ও স্বশ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ('মুকুল,' আষাঢ় ১৩০৬)।

চাঁদের কথা

পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। যতক্ষণ সূর্য্য দেখা যায়, ততক্ষণ দিন, যতক্ষণ দেখা যায় না, ততক্ষণ রাত্রি। এমনি দিনের পর দিন, তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়। চাঁদও পূর্ব্বে উঠে, পশ্চিমে ডুবে। তবে চাঁদ রাত্রে দেখা যায়; কখন বা দিনেও দেখা যায়। চাঁদ যে দিন সমস্ত দেখা যায়, সে দিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ছোট হয়, ক্রমে যেন ক্ষয় পায়; চৌদ্দ পনর দিন পরে আর কিছুই দেখা যায় না। তখন অমাবস্যা হয়। তার পর চাঁদ আবার বাড়িতে থাকে। আস্তে আস্তে বাড়িয়া আবার চৌদ্দ পনর দিন পরে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। চন্দ্র সূর্য্য ছাড়া আকাশে আমরা কত তারা দেখি। তাহারাও

পূর্ব্বে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। এইরূপে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণের উদয় অস্ত প্রত্যহ হইতেছে।

তোমরা হয় ত শুনিয়া থাকিবে, চাঁদও একটা ছোটখাঁট পৃথিবীর মত। পঞ্চাশটা চাঁদ একত্র করিলে পৃথিবীর মত আকার হয়। কাজেই চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। আকারে পঞ্চাশগুণ ছোট; ওজনেও অনেক কম। আশীটা চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের সমান।

চাঁদে মানুষ আছে কি না? খুব সম্ভব মানুষ নাই। চাঁদে জল নাই, বায়ু নাই, আমাদের মত মানুষ থাকিবে কিরূপে? আচ্ছা, যদি চাঁদে জল বায়ু থাকিত, আর মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আকাশে চাহিলে কি দেখিত, জানিতে ইচ্ছা হয় না কি?

আমরা আকাশে তারা দেখি; চাঁদে মানুষ থাকিলে, তাহারাও তেমনি তারা দেখিত। তাহাদেরও আকাশে পূর্ব্বদিকে তারা উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যাইত।

মনে কর, তুমি চাঁদে গিয়াছ। কি দেখিবে? চাঁদে দিন রাত্রি ঘটিবে। সূর্য্যের উদয় অস্ত হইবে। তবে চাঁদের দিন কত লম্বা! চাঁদের এক একটা দিন, আমাদের সাড়ে উনত্রিশটা দিনের সমান। সূর্য্যের উদয়ের পর আমাদের দিনের চৌদ্দ পনর দিন ব্যাপিয়া সেখানে সূর্য্য দেখা যায়। তার পর অস্ত। তার পর চাঁদের রাত্রি। আবার সেই রাত্রি পোহাইতে আমাদের চৌদ্দ পনর দিন কাটিয়া যায়। বুঝিতে পারিতেছ, সেখানকার দিনই বা কেমন, আর রাতই বা কেমন! আমরা যদি কোন মতে চাঁদে যাইতে পারি, তবে সেখানে এক দিনের মধ্যে কত বার আহারের যোগাড় করিতে হইবে! আর, এক রাত্রি ঘুমাইয়া শেষ করাও কুম্ভকর্ণের মত লোকের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের এই যে দিন, ইহাই যখন একটু বড় হয়, তখন আমরা গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্ করি; আবার রাত যখন একটু বড় হয়, তখন শীতে কাঁপিতে থাকি। চাঁদে দিনের বেলা কেমন গরম, আবার রাত্রে কেমন ঠাণ্ডা, মনে করিতে পার কি?

আমাদের সূর্য্য আছে; চাঁদেরও সূর্য্য আছে। আমাদের চাঁদ আছে; চাঁদেরও কি চাঁদ আছে? আছে বৈ কি। আমাদের এই পৃথিবীই চাঁদের চাঁদ। আমরা কখন দিনের বেলায়, কখন রাত্রে চাঁদ

দেখি ; চাঁদে যদি কেহ থাকিত, তবে সেও কখন দিনের বেলায়, কখন রাত্রে এই পৃথিবীকে, অর্থাৎ চাঁদের চাঁদকে দেখিত। কিন্তু আমাদের চাঁদ ও চাঁদের চাঁদ কি ঠিক একই রকম ? কখনই নহে। আমাদের চাঁদ ছোট, লোকে বলে—পূর্ণচন্দ্র একখানা থালার মত, আর চাঁদের চাঁদ মস্ত, আমাদের চাঁদের বারটার সমান।

আমাদের চাঁদ কখন ছোট হয়, কখন বড় হয়। পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র ; অমাবস্যার চাঁদ দেখাই যায় না। চাঁদের চাঁদও ছোট হয়, বড় হয়। যখন খুব বড় হয়, যখন পূর্ণচন্দ্র হয়, তখন আমাদের বারটা চাঁদের মত হয়। আবার ক্রমে ছোট হইতে হইতে চৌদ্দ পনর দিন পরে কিছুই দেখা যায় না।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য একটা কথা। আমাদের চাঁদের উদয় আছে, অস্তও আছে। কিন্তু চাঁদে যদি মানুষ থাকে, তবে তাদের চাঁদের উদয়ও নাই, অস্তও নাই। সে চাঁদ আকাশের ঠিক এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা দিবা রাত্রি চিরকাল ধরিয়া এক জায়গাতেই চাঁদকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছে। তাদের চাঁদ আপন স্থান হইতে নড়ে না, কেবল একটু ইতস্ততঃ দোলে মাত্র। সেই এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া দুলিতে দুলিতে, আস্তে আস্তে ছোট হইয়া অদৃশ্য হয়, আবার আস্তে আস্তে বড় হইয়া, গোলাকার পূর্ণচন্দ্র হয়।

আর একটা কথা। আমাদের পৃথিবীর যে যেখানেই থাক্, সকলেই চাঁদ কখন না কখন দেখিতে পায়। চাঁদের এক পিঠে যদি দাঁড়াও, তাহা হইলে চাঁদের চাঁদ চিরকালই দেখিবে ; তাহার আর উদয় অস্ত ঘটিবে না। কিন্তু যদি অন্য পিঠে যাও, তাহা হইলে কোন কালে চাঁদ দেখিতে পাইবে না। সেই পিঠে যদি কোন প্রাণী বাস করে, সে কখন চাঁদের চাঁদ, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী দেখিবে না।

আমাদের যেমন গ্রহণ হয়, চাঁদের লোকেরও তেমনি গ্রহণ হয়। আমাদের যখন চন্দ্রগ্রহণ, ঠিক সেই সময়ে তাদের সূর্য্যগ্রহণ। আর আমাদের যখন সূর্য্যগ্রহণ, সেই সময়ে তাদের চন্দ্রগ্রহণ।

আকাশের তারাগুলি আমরা যেমন দেখি, চাঁদের লোকেও তেমনি দেখে। তবে আমরা দিনের মধ্যে নক্ষত্রগণের একবার উদয়, একবার অস্ত দেখি। তাহারা আমাদের দিনের ২৭ দিনে একবার উদয়, একবার অস্ত দেখে। একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের সঙ্গে চাঁদের লোকের কত তফাত। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদে মানুষ নাই। এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবার কেহ নাই। আর যদি থাকিত, তাহাদের পক্ষে সেই ঘটনাই স্বাভাবিক হইত। আমরা যাহা আশ্চর্য্য মনে করি, তাই তাহারা স্বাভাবিক মনে করিত। (যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত গ্রন্থ 'ছবি ও গল্প,' ১৯০৬।)

অপরের রচিত গ্রন্থের

ভূমিকা

'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম' পুস্তকের "মুখবন্ধ"

(১৩০৪)

[আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে জড়বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানিকেই আদি বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৭৯৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয় এবং দীর্ঘ ২৪ বৎসর পরে ১৮৯৭ সনে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পাদনায় ইহা সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি অধুনা বিলুপ্তপ্রায়—অথচ পুস্তকের "মুখবন্ধে" রামেন্দ্রসুন্দর এই পুস্তকের ভাষা পরিভাষা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে হেমেন্দ্রনাথের পুস্তকখানি কোনও প্রকাশক পুনঃপ্রকাশিত করিবেন, এই ভরসায় "মুখবন্ধ"টি রামেন্দ্র-রচনাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইল। এমনিতে সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা নিরর্থক বোধ হইবে।—সম্পাদক]

স্বর্গীয় মহোদয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞানশাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল কথাগুলি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে কতকগুলি এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহা প্রকাশ করিলে অনেক স্থলে হয় ত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতেন। স্বর্গীয় মহোদয়ের কৃতী পুত্র আমার পরমশ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই রচনাগুলির সাহিত্যমধ্যে স্থায়িত্ব-প্রদান বাঞ্ছা করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন ; এবং আমার প্রতি সানুগ্রহ শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া রচনাগুলির সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে সেই ক্ষমতার প্রয়োগে আমাকে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতে হইয়াছে। একটা কারণ, পরলোকগত লেখকের রচনায় হস্তক্ষেপে অপরের কতটা অধিকার আছে, তাহার নিরূপণ দুরূহ। আর একটা কারণ, আমার কৃত কার্য্যের বা অকার্য্যের জন্য পাঠক হয় ত লেখককে দায়ী করিতে পারেন, এই আশঙ্কা। এরূপ স্থলে দায়িত্ব বড় গুরুতর ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে সে বিপদে পড়িতে হয় নাই। কেন না, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই পুস্তক প্রকাশিত হইল ; সংশোধনের বা পরিবর্ত্তনের অধিক প্রয়োজন দেখিলাম না।

পুস্তকের ভাষা বোধ হয়, পাঠকের নিকট স্থানে স্থানে জটিল ও দুর্ব্বোধ মনে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য রচনার দোষ দেওয়া চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী হয় নাই ; বিজ্ঞানের বাঙ্গালা এখনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাষার অভাবে এখনও বিজ্ঞানের

গ্রন্থ লিখিতে কেহ সাহস করেন না। লিখিলেই রচনা অপাঠ্য ও অবোধ্য হইয়া উঠে। এই গ্রন্থে তাড়িত বিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। এই গ্রন্থের রচনার পূর্ব্বে বোধ হয়, এই সকল বিষয়ে কেহ কোন কথা লেখেন নাই, অদ্যাপি সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় না। এই গ্রন্থের রচয়িতা এত অসুবিধা সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে সাহসী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ থাকিবে।

আর একটু বিস্তৃত করিয়া লিখিলে বোধ হয়, সাধারণ পাঠকের ও প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হইত। গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থপ্রকাশের অবসর পাইলে বোধ হয়, এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তজ্জন্য পরিতাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আমি সাধারণতঃ গ্রন্থের ভাষার উপরে হস্তক্ষেপে সাহসী হই নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্র সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু ভাষা ও রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র লেখকের নিজস্ব সম্পত্তি। বিশেষতঃ, লেখক যেখানে সমালোচনার স্পর্শের অতীত, সেখানে তাঁহার নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপে অনধিকারচর্চ্চা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়।

এই কারণে দুই চারিটা শব্দ বা দুই চারিটা বাক্যমাত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের পরিবর্ত্তনে কিছু অধিক মাত্রায় স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিবিধ বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সংকলনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত অনেক শব্দ এই গ্রন্থে দেখা যাইবে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভাষায় স্থায়িত্ব লাভ করিবে আশা করি। তাঁহার রচিত ও ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বদলাইয়া, তাহার স্থানে এখনকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ দেওয়া গিয়াছে। রাসায়নিক অংশে গ্রন্থকারের রচিত পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত আরও কতকগুলি নূতন শব্দ আমাকে বসাইতে হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে* "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় আমি রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। ক্ষিতীন্দ্র বাবু ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ প্রস্তাবের প্রতি কতকটা পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে—এমন কি, অনুরোধক্রমে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমার রচিত কতকগুলি রসায়নসংক্রান্ত পারিভাষিক

* ১৩০২ বঙ্গাব্দ।—সম্পাদক।

শব্দ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সেই শব্দগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা দায়ী হইবেন না। পরিভাষায় ঐ শব্দগুলি তারকাচিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল।

গ্রন্থের আকার ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয় বিস্তৃত। এতগুলি বিষয় এত সঙ্কীর্ণ স্থানে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্রুত উন্নতিশীল; এমন কি, উহার মূল সত্যগুলিরও আকার এই কয় বৎসরে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থরচনার সময় যে আকার ছিল, এখন তাহা নাই। শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের শেষ কথা শুনানই ব্যবস্থা। সেই অনুরোধে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, স্থানে স্থানে ফুটনোট যোগ করিয়া দিতে হইয়াছে। অঙ্ক ও সংখ্যা সম্বন্ধে যেখানে স্থূল জ্ঞানই যথেষ্ট, সেখানে সূক্ষ্ম হিসাব দিবার চেষ্টা করা যায় নাই।

পুস্তক ক্ষুদ্র ও প্রথমশিক্ষার্থীর জন্য লিখিত হইলেও ইহার বর্ণনা-প্রণালীতে একটু অসাধারণত্ব আছে। ওস্তাদের হাত অতি সামান্য কাজেও ধরা পড়ে। জ্ঞানের আহরণে লাভ আছে, কিন্তু জ্ঞানাহরণের প্রকৃষ্ট পন্থা দেখাইতে পারিলে ও সেই পন্থায় চলিতে পারিলে আরও লাভ। জ্ঞান আহরণ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সকলে চলিতে পারেন না; আপনার সমগ্র চিন্তাপ্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত সঙ্গত করিয়া তোলা সকলের সাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রন্থকারের আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয় এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থমধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জড় পদার্থের গঠন এবং অণু ও পরমাণুর সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল স্থানে ওস্তাদী হাতের পরিচয়; সকল হাতে এমনটুকু বাহির হয় না। এইখানে গ্রন্থকারের অসামান্যত্ব; অথবা বঙ্গের যে অসামান্য গৃহস্থ পরিবারকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া গ্রন্থকার অকালে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশ এই অসামান্য পরিবারের নিকট অশেষ বিষয়ে ঋণগ্রস্ত। আক্ষেপ যে, বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও অধিকতর ঋণস্বীকারে অবসর পাইল না।

স্বর্গীয় মহোদয় বাঙ্গালীর জন্য বিজ্ঞানপ্রচারে অন্যতম পথপ্রদর্শক। বাঙ্গালী বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই অবসর পাইয়া আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছি।

'খুকুমণির ছড়া' পুস্তকের "ভূমিকা"

(১৩০৬)

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যে বোধ করি একটা নূতন উদ্যম। ইহার একটা ভূমিকা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় যখন আমাকে এই ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন আহ্লাদের ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি এই ভার গ্রহণ করি। আহ্লাদের কারণ যে, আমি এইরূপ ছড়া-সংগ্রহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম; কৃতজ্ঞতার কারণ, প্রকাশক মহাশয় সেই অভাব এত সত্বর পূর্ণ করিতেছেন। ইংরেজীতে বালক-জনের চিত্তাকর্ষক বিবিধ সাহিত্যগ্রন্থ রাশি রাশি বর্ত্তমান আছে; বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এ জন্য তিনি বঙ্গের বালকবালিকাগণের ও তাহাদের পিতামাতাদিগের সর্ব্বথা কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় উপাখ্যানাদির সমাবেশে শিশুজনের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যে তিনি একটু অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন; সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ প্রশংসার্হ।

কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়াসংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরম-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতা-সংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন; ঐ প্রস্তাবে যে ভাবুকতা, সরসতা ও চিন্তাশীলতার সহিত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণের অতীত। ঐ প্রস্তাবটিকেই বর্ত্তমান পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিলে, আমার নীরস ওকালতি হইতে পাঠকগণ নিস্তার পাইতেন।

রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না; তিনি স্বয়ং সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছু দিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ 'পরিষৎ-পত্রিকা'র পাঠকসম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়ার সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রবীণ-জনোচিত গাম্ভীর্য্যে আর আঘাত লাগে নাই, ভাল কথা; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যে আমার বিবেচনায় একটা প্রকাণ্ড অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছিল। বর্ত্তমান সংগ্রহের প্রকাশক এ পর্য্যন্ত প্রবীণসম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কোন পরিশ্রম করেন নাই; বালকসম্প্রদায়ের জন্যই তাঁহার পরিশ্রম এ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; ইহা আমি একটা সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করি। এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রবীণ বন্ধুগণের নীরব বিদ্রূপময় কটাক্ষপাত সহ্য করিয়াও তিনি যে এই 'ছেলেমি' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহার বর্ত্তমান উদ্যম বালকবালিকাগণের পরিতোষের জন্য সীমাবদ্ধ হইলেও, ইহার ফল দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে বলিয়া আমি বস্তুতই বিশ্বাস করি; এবং তজ্জন্যই এই ভূমিকার বাগাড়ম্বরে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি না।

যাহাতে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হয় না; কিন্তু শিশু-জনপ্রিয় সাহিত্যের ভিতর হইতে সেরূপ কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কাশনে আমি একান্ত অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিয়া রাখিতে পারি যে, এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত না থাকিলেও, হয় ত দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকিতে না পারে, এমন নহে। ভূতত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন গ্রিম্ বা মক্ষমূলার এই বাঙ্গালীর ছেলের ছেলেমি-ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দুই একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের কোন বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কি না জানি না। 'দামোদর ছুতোর,' 'শ্যামঠাকুর,' 'শিবু সদাগর,' 'কংশ রাজা' ও 'হড়ম বিবি'

কোন্ অতীত কালের বিস্মৃতপ্রায় ইতিবৃত্তের অপরিচিত স্মৃতিচিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা আমরা এখন কল্পনায় আনিতে পারি না। কল্পনায় আনিতে পারি না, কিন্তু এই সকল লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের উপরই রহিয়াছে। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে আমরা ভবিষ্যতের নিকট মার্জ্জনার অধিকারী হইব না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই; এবং আমার বিশ্বাস, এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্য-জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্য যতটা লোলুপ ও সত্যের আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই। সত্যকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহি না; আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বিনা প্রযত্নে, বিনা উদ্যমে প্রকৃতিদেবী সত্য-সমষ্টি দ্বারা আপনার যে দেবদেহ নির্ম্মিত করিয়াছেন, সেই দেহের জ্যোতিঃ আমাদের চোখের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া দেখাইবেন এবং সেই পরা জ্যোতির আনন্দ উপভোগে আমাদিগকে সমর্থ করিবেন।

কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়া-সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব-জীবনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।

প্রকৃতির বজ্রশাসনে নিয়মিত হইয়া আমাদের মত বয়স্ক মানুষ স্বয়ং সংযত হয় ও প্রকৃতিকে সংযত মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে সর্ব্বত্র আমরা নিয়মের ও শৃঙ্খলার অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

সেই নিয়মের বন্ধনে আমরা আপন জীবনকে আবদ্ধ দেখি ও সেই নিয়মের শাসনে আমরা চলিয়া থাকি। যে সকল ঘটনা নিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখা যায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের বন্ধন দেখা যায়। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ও পরস্পর নির্দ্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনার সমবায় ও পরম্পরা লইয়া প্রকৃতির এই শরীর; এই শরীরের কিয়দংশ ব্যাপিয়া আমাদের কারবার; আমাদের কারবার যে পরিমাণে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করে, জীবনযাত্রায় আমাদের সাফল্যও সেই পরিমাণে ঘটে। কিন্তু এমন অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনাও সচরাচর আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, প্রকৃতি-শরীরে যাহার ঠিক স্থান আমরা সহসা নির্দ্দেশ করিতে পারি না বা অন্যান্য পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত যাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি না। এক সম্প্রদায়ের লোকে এইরূপ ঘটনাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এইরূপ আপাততঃ অতিপ্রাকৃতিক অসাধারণ ঘটনার সংখ্যা যতই অধিক হয়, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ততই নষ্ট হয়; এবং এই শৃঙ্খলা হইতে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি, সেই সৌন্দর্য্যও ততই বিকৃত হয়। বস্তুতঃ সুনিয়ত মনুষ্যবুদ্ধির নিকট শৃঙ্খলাতেই সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলাই কুৎসিত; যাহা প্রাকৃত, তাহা সুন্দর; যাহা অতিপ্রাকৃত, তাহা প্রকৃতির মহাকাব্যে কেবল ছন্দোভঙ্গ ও যতিভঙ্গ করিয়া রসাস্বাদনে ব্যাঘাত জন্মায়।

বয়স্ক ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত মনুষ্যের পক্ষে এই কথা; কিন্তু শিশুর পক্ষে সমস্তই ইহার বিপরীত। প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্ম্মিত হইয়া মানব-শিশু সদ্যঃ সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তিও সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযম-রহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতিপ্রাকৃত; অথবা বয়স্ক লোকে যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিতে চায় ও যাহার অস্তিত্বে শঙ্কিত বা চিন্তিত বা হতবুদ্ধি হয়, যাহাকে প্রাকৃতের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধিশক্তিকে

বিনিয়োগ করে, তাহাই তাহার নিকট একমাত্র প্রাকৃত। শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্য্য যে, বন্ধনের ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না। এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্য্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। প্রকৃতির কাব্যে একটু ছন্দঃপাত দেখিলেই আমাদের মত বয়স্কের কাণে ও প্রবীণের কাণে কেমন কেমন ঠেকে; কিন্তু শিশুর নিকট সেই কাব্যখানা আদ্যোপান্ত ছন্দোহীন। উহাতে কোনরূপ মিলের বিচার নাই, কোনরূপ বিরামের নিয়ম নাই। সঙ্গীতটার আগাগোড়াই বেসুরো ও বেতালা। অথচ এই ছন্দের ও মিলের অভাব, এই সুরের ও তালের সম্পূর্ণ অসদ্ভাবই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও পরিতোষ উৎপাদনে সমর্থ। ছন্দের অস্তিত্ব ও তালের অস্তিত্বই হয় ত তাহার অসংযত মুক্ত স্বাধীনতাকে ব্যাঘাত দিয়া তাহার আনন্দের তীব্রতার হানি জন্মায়।

আমার প্রবীণ বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বকথার জন্য লালায়িত, তাঁহারা ছেলে-ভুলান ছড়ার মধ্যে এইরূপ একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইবেন; একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মীমাংসা দ্বারা তাঁহাদের বিজ্ঞতার পরিমাপে তাঁহারা অবকাশ পাইবেন। কোন্ পথে মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের আলোচনায় আমি এ স্থলে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সে ক্ষমতাও নাই, এবং বর্ত্তমান ক্ষুদ্র পুস্তকের দুর্ব্বল মেরু-দণ্ড তদ্বিধ তত্ত্বালোচনার ভারবহনেও সর্ব্বথা অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে এই মাত্র বলিয়া রাখিতে পারি, এই শিশুজনসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে একবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধের মধ্যেও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন জাতির উপাসনাপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই শৈশবোচিত প্রবৃত্তির ভূরি পরিমাণে পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে। আমরা যে সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটাই এইরূপ অনিয়ত, বন্ধনশূন্য অতিপ্রাকৃতে নির্ভর ও বিশ্বাস মাত্র, ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, আমাদের মধ্যে ও পৃথিবীর সভ্যতম জাতির মধ্যেও বোধ করি, পোনের আনার অধিক লোক এই অতিপ্রাকৃতের মরীচিকার প্রতি সুপেয় বারিভ্রমে ধাবিত রহিয়াছে।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিয়া যাঁহাদের বুদ্ধি মর্ম্মাহত ও অবমানিত হয় না, অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে যাঁহাদের জগৎ-প্রণালীর প্রতি ভক্তির সঞ্চার ও প্রেমের সঞ্চার হয় না—প্রত্যুত এই অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব, এই ছন্দের ও সুরের অভাবই যাঁহাদের উল্লাসের ও আনন্দের উৎপাদক, তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রভাব পৃথিবীমধ্যে এখনও সামান্য নহে। ইহাকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, তাহার বিচারে আমি সর্ব্বথা অসমর্থ।

আর একটা কথা আছে। বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ। প্রাকৃতিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা, দেশভেদে ও কাল-ভেদে মানবচরিত্রের স্বাভাবিক কাঠামটাকে নোয়াইয়া, বাঁকাইয়া, তাহার উপর পালিশ দিয়া, রঙ ফলাইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদান করে; কিন্তু শিশু-চরিত্র বোধ করি, সর্ব্বদেশেই ও সর্ব্বকালেই একরূপ। বয়স্ক বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বহিতে একেবারেই অসমর্থ; কিন্তু মানব-শিশু যখন সূতিকাগার হইতে প্রথম বাহির হইয়া সংসারের সহিত পরিচয় আরম্ভ করে, তখন শাদা চামড়া ও কাল চামড়া, উভয়েরই অভ্যন্তরে ঠিক একজাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। যাঁহাদের অবকাশ আছে, তাঁহারা বাঙ্গালীর ছেলের ছড়া ও ইংরেজের ছেলের 'নর্শারি গান' মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত রকমের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই সৌসাদৃশ্য সর্ব্বত্র বুঝাইবার জন্য উভয় শিশুর পূর্ব্বপিতামহের কাস্পীয়-সাগর-তটে বাস কল্পনা না করিলেও চলিতে পারে; কেন না, এই সৌসাদৃশ্য আর্য্য-ভূমির সম্পূর্ণ বাহিরে ষোল-আনা-অনার্য্য-শিশুর শৈশবলীলা অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে। কেবল শিশু-প্রকৃতি কেন, বয়স্ক মনুষ্যের প্রকৃতিতেও যে অংশটুকু মানব-জাতি-সাধারণ, তাহারও পরিচয় এই বিভিন্ন দেশের ছড়া-সাহিত্যে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইবে। স্নেহবিবশা জননী যখন গৃহকোণের অন্ধকারমধ্যে, লোক-নয়নের অন্তরালে অস্ফুটবাক্ অস্ফুটবুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গী কার্য্যভঙ্গী কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রণালীর কোন ধার ধারিতে চাহে না; তখন স্বাভাবিক মানব-চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দ্দার অন্তরাল সরাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্ন মূর্ত্তি আবিষ্কার

করে ; সেই মূর্ত্তি বোধ করি, 'চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত' সকল দেশের মধ্যেই এক।

বাঙ্গালী শিশুর ও বাঙ্গালী জননীর স্বাভাবিক চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু না থাকুক, কিন্তু সেই জননীর ও তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সামাজিক চরিত্রে বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে বাসনিবন্ধন যে অনন্যসাধারণত্ব, যে বৈশিষ্ট্য আছে, এই ছড়া-সাহিত্যে তাহারও পরিচয় না পাওয়া যাইবে, এমন নহে। বস্তুতঃ এই সকল ক্ষুদ্র মাহাত্ম্যহীন অর্থহীন অসংলগ্ন কবিতার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক এক স্থানে গৃহস্থ বাঙ্গালীর গৃহের সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই বটে, অথবা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে বাঙ্গালীর যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহাতে গৌরবের সামগ্রী কিছুই নাই বটে ; তথাপি সেই লক্ষ্মণসেনের পর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ধারাবাহিক স্রোত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে অংশের কাহিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে, তাহা মাধুর্য্যে ও কারুণ্যে ও কোমল শান্তরসের আতিশয্যে পৃথিবীতে হয় ত অতুল্য। বাঙ্গালী জীবনের সে অংশে কোন উৎকট দীপ্তি, কোন তীব্র জ্বালা, কোন গৌরবময় মহিমা নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য অন্যান্য বিশেষণেরও প্রয়োজন। মমতা ও করুণা, ভক্তি ও প্রীতি, বাৎসল্য ও পবিত্রতা যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়, তবে বাঙ্গালীর জীবন জগৎসংসারে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করা যাইতে পারে। পরলোকগত সার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ কিছু দিন হইল, হিন্দুজাতির 'হোম' নাই বলিয়া করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশাল হিন্দু-জাতির কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে 'হোমের' মধ্যে আশৈশব লালিত হইয়া আসিয়াছি, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বৃদ্ধা দিদিমা ও অতিবৃদ্ধ দাদা মহাশয় যে 'হোমের' মধ্যে বাস করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতির বিনিময় করিয়া আসিতেছেন, 'মাসী পিসী বনগাঁ-বাসী'—এমন কি, যাহাদের 'বনের মধ্যে ঘর,' তাহাদেরও যে 'হোমের' মধ্যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, মুষ্টিভিক্ষাজীবী অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিও মুহূর্ত্তের জন্য যে 'হোমে' আপনার বিহিত স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, এবং গৃহমার্জ্জার, গৃহগোধিকা ও বাস্তুসাপ পর্য্যন্ত যে 'হোমের' মধ্যে নিতান্ত

অন্তরঙ্গ ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশাল 'হোমের'' সহিত অনুদার অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রাচীরবেষ্টিত বিলাতী 'হোমের' তুলনা করিয়া বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের অবমাননা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রার্থনা যে, বঙ্গভূমিতে এইরূপ 'হোমের' প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হউক।

বাঙ্গালী জাতির সমগ্র সাহিত্যটাতেই বাঙ্গালীর সেই গৃহের বিবিধ চিত্র নানা রঙে চিত্রিত হইয়াছে, এবং স্বভাবের তুলিকা যেন সেই রঙ ফলাইবার জন্য কোন কৃত্রিম উপকরণের সাহায্য লয় নাই; স্বভাবের ভাণ্ডার হইতেই সেই রঙগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি আধুনিক যুগের কৃত্রিম শিক্ষার প্রভাবে নির্ম্মিত কৃত্রিম সাহিত্যের কথা বলিতেছি না; বাঙ্গালীর অকৃত্রিম প্রাচীন নিজস্ব সাহিত্যের কথা বলিতেছি; এবং এই অকৃত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিশু-সাহিত্য বা ছড়া-সাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয়। যাঁহারা উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলেই উদাহরণের বহুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আমি আর সে পরিশ্রমটুকু গ্রহণ করিলাম না।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলিব। এই পুস্তকে সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই শতেরও কম। পাঠককে অনুরোধ করি, তন্মধ্যে কয়টির মধ্যে 'বৌ' নামক অবগুণ্ঠনান্তরালস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থের প্রসঙ্গ আছে, একবার গণিয়া দেখিবেন। এবং ভবিষ্যতের বাঙ্গালী গৃহস্থ মহাশয় যখন দন্তহীন অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে দোদুল্যমান থাকিয়া 'আধ আধ বাণী' ও 'খল খল' হাস্যের ছটায় জননীর আঁধার মানসাকাশে থাকিয়া থাকিয়া তড়িল্লতার বিকাশ করেন, তখন মাতৃদেবী ভবিষ্য কালে তাঁহার গৃহের জ্যোতিঃস্বরূপা, কিন্তু তদানীং মাতৃকুক্ষিতে অলব্ধপ্রবেশা অপ্রাপ্ত-জীবিতা বধূটির 'সোণা হেন রংটি' ও 'ঠোঁটে আলতা গোলার ঢেউ' কল্পনা করিয়া ও সেই মনঃকল্পিত-রূপা বধূর হস্তে তাঁহার 'কাল সোণা'কে 'তিনটে ঠোনা' খাওয়াইয়া কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, তাহার অনুভবে একবার চেষ্টা করিবেন। আমার বাল্য-বিবাহ-বিরোধী বন্ধুগণকে 'খুকুমণির ছড়া'র এই অংশগুলি সযত্নে পরিহার করিতে অনুরোধ করি, কিন্তু আমার যে সকল প্রবীণ বন্ধু সাহিত্য-

মধ্যে তত্ত্বসংগ্রহের জন্য লালায়িত, তাঁহারা মানব-চরিত্রের বা মানবী-চরিত্রের এই অদ্ভুত বিকাশে একটা উৎকট তত্ত্বনির্ণয়ের অবকাশ পাইবেন, ভরসা করি।

যাহা হউক, এই শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধু সম্প্রদায় 'খুকুমণির ছড়া'র মধ্যে কোনরূপ তত্ত্বসংগ্রহে বা আনন্দসংগ্রহে সমর্থ হউন বা না হউন, আশা করি, যাহাদের জীবন অদ্যাপি জগতের কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্ফূর্ত্তিহীন হইতে পায় নাই, যাহাদের নিকট বিশ্ব-সংসারের সকলই নূতন, সকলই কৌতুকময়, সকলই সত্য, সকলই স্বাভাবিক, সকলই উন্মুক্ত বিশৃঙ্খলতার কলরবে ও উল্লাসে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের আনন্দের মাত্রা-সম্বর্দ্ধনে এই গ্রন্থ কৃতকার্য্য হইয়া প্রকাশকের শ্রম সফল করিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার তুলনায় "ভূমিকা"র দীর্ঘ আয়তন ও অসঙ্গত আড়ম্বর হয় ত পাঠক পাঠিকার অরুচি উদ্রেক করিবে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার যেরূপ সংস্কার আছে, তৎকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমি তাঁহাদের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। যে পাঠকসম্প্রদায়ের কোমল করে এই সুরঞ্জিত উপহার প্রকাশক মহাশয় কর্ত্তৃক অর্পিত হইবে, আমি ঠিক্ তাহাদিগের জন্য এই ভূমিকা লিখি নাই। আশা করি, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত অবজ্ঞাত গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধীসমাজ কর্ত্তৃক যথোচিত ভাবে আরব্ধ হইবে।

'ছড়া ও গল্পে'র "ভূমিকা"

(অভিভাবকদিগের জন্য)

(১৩১৭)

অনেক ঘটনা কেন ঘটে, বুঝা যায় না। আবার অনেক ঘটনা কেন ঘটে না, তাহা বুঝা আরও কঠিন।

কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা শিশুপাঠ্য সাহিত্য শিশুযোগ্য করিবার জন্য দেশে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। শুভক্ষণে রবিবাবু চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পর্কে "মেয়েলি ছড়া" নামে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে এই হাওয়া ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। ছেলেভুলান গল্প, কবিতা, ছড়া সংগ্রহ করিয়া অনেকগুলি ছেলে-ভুলান গ্রন্থ এই কয় বৎসরে

প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি রামায়ণ মহাভারতের—এমন কি, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী গ্রন্থাদিরও পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিকে শিশুজনের আনন্দবর্দ্ধনে বিনিয়োগের চেষ্টা দেখিতেছি। এই চেষ্টা এত দিন ঘটে নাই কেন, তাহাই বুঝা কঠিন।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এ দেশে অতি প্রাচীন কালে ছেলেদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, আমাদের দেশেই এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প এই দেশ হইতেই বিস্তার লাভ করিয়া দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই কথাগুলি আমাদের কোলের কাছে রহিয়াছে, অথচ বাঙ্গালার ছেলেদের আনন্দবর্দ্ধনে এতাবৎ এই কথাগুলির বিনিয়োগ হয় নাই কেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতশিক্ষার্থী বালকের জন্য পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প ঋজুপাঠ প্রথম ভাগে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আধুনিক শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা হইয়াও তিনি কথামালা গ্রন্থে বিদেশী গল্পের সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এই খাঁটি স্বদেশী গল্পগুলিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই কেন?

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষের হিতোপদেশে দেশী কথাগুলি স্থান পাইয়াছে। আর কেহ এ চেষ্টা করিয়াছেন কি না জানি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা বা ঈশান বাবুর হিতোপদেশ মুখ্যতঃ ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। আনন্দবর্দ্ধন উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিহাস-রসিকতা এত দিন আমাদের মত ত্রিতাপক্লিষ্ট বুড়াদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। "বালক-জগৎ" মধ্যে তিনি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্যের অবতার, ইহাই জানিতাম। সরল ও তরল ভাষায় লঘুতা আশ্রয়ে ছেলে ভুলাইতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। অধ্যাপক-সমাজ তাঁহার এই লঘুতার ক্ষমা করিবেন কি না, সন্দেহ হইয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের কথা নাকি রাজপুত্রদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রের কথকের মুখ সর্ব্বদা গম্ভীর—ভাষাও গুরুগম্ভীর। তিনি কাঁকড়াকে কুলীরক ও শেয়ালকে জম্বুক বলেন; তাঁহার সিংহের নাম ভাসুরক ও পায়রার নাম লঘুপতনক। তাঁহার কুলীরক যখন "বকস্য মৃণালধবলাং মৃদুগ্রীবাং চকর্ত্ত" করিয়া দেয়, অথবা তাঁহার জম্বুক যখন

বিশুদ্ধ সংস্কৃতে "হংহো বিল হংহো বিল" বলিয়া গর্ত্তকে ডাকে, তখন বৃদ্ধ কথকের মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠে; আমাদের মত বুড়ারা সেই বুড়ার মুখের গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে ঈষৎ ক্ষীণ হাস্যের মধুররস উপভোগ করিয়া ক্ষণেকের জন্য পুলকিত হয়। সে কালের রাজপুত্রেরাও হয় ত পুলকিত হইতেন। কিন্তু এ কালের ছেলেরা—যাহাদিগকে "চকর্ত্ত" পদ সাধিতে না পারিলে পণ্ডিত মহাশয়ের হুঙ্কার শুনিতে হইবে—তাহারা সেই আনন্দরসের উপভোগ কতটা করে সন্দেহ।

যাক্, কোন রাজপুত্র যখন ললিতবাবুর শ্রোতা নহেন; আমাদের মত গরিব গৃহস্থের ছেলেরাই যখন তাহাদের পিতামহীর মুখে শ্রুত চিরপরিচিত ভাষায় এই অতি পুরাতন "রূপকথা"গুলি শুনিয়া আনন্দ অর্জ্জন করিবে, তখন অধ্যাপক মহাশয়ের এই চাপল্যাপরাধ ক্ষন্তব্য; অধ্যাপক-সমাজের পক্ষ হইতে এই অভয় ঘোষণা করা গেল।

দুঃখের বিষয়, আমার এই ভূমিকাটা কিছু গুরুগম্ভীর হইয়া পড়িল—অন্ততঃ গ্রন্থের তুলনায়।

'প্রকৃতি-পরিচয়ে'র "ভূমিকা"

(১৩১৮)

অধ্যাপক টিণ্ডাল তাঁহার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির নাম দিয়াছিলেন—"Fragments of Science for Unscientific People." বড় জিনিসের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ছোট জিনিসের নাম করা সকল সময়ে সঙ্গত হয় না—তথাপি সেই বড় দৃষ্টান্তের অনুকরণে বলা যাইতে পারে, এই গ্রন্থও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের টুক্‌রার সঙ্কলনমাত্র।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে এতই সুপরিচিত যে, তাঁহাকে চেনাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে না। আজকাল বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, প্রবন্ধের নীচে জগদানন্দ বাবুর স্বাক্ষর দেখা যাইবে। বাস্তবিক, পাশ্চাত্য দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তত্ত্ব আজকাল আবিষ্কৃত

হইতেছে, এ দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার ঘোষণার ভার একা জগদানন্দ বাবুর উপরই পড়িয়াছে; অথবা তিনি তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্য যে কয় ব্যক্তি পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন তাঁহারা প্রায়ই আত্মগোপন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ যখন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য লিখিত, তখন ইহার প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের ভ্রুকুটীভঙ্গী প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। এই কথা বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। এক দল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। অবৈজ্ঞানিককে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটা হরপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক মর্ত্ত্য জনের প্রবেশ নিষেধ।

ইহার একটু হেতু আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্যধিক আদরের সামগ্রী। জহুরি মণিমাণিক্যের কারবার করে ও মূল্য জানে; বাজারের মধ্যে সে মণিমাণিক্য উপস্থাপিত করিয়া 'ইজ্জত' নষ্ট করিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরিশ্রমে যে সকল মহামূল্য সত্যের আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্য তাঁহারাই বুঝেন। ইতর সাধারণের সম্মুখে তাহার সমুচিত সমাদর কখনই সম্ভবে না। কাজেই তাঁহারা ইতরের সম্মুখে তাঁহাদের মহামূল্য সত্যগুলির উপস্থাপনে কুণ্ঠিত।

কত প্রমাণপরম্পরা সংগ্রহের পর, কত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও আয়াসসাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার-বিতর্ক-বিতণ্ডার পর বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি-দেবীর রহস্যলোক হইতে গুপ্ত তত্ত্বের সংবাদ সঙ্কলন করেন, ইতর লোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্ম্মের গুরুত্ব নির্দ্ধারণও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের যে বিস্ময়, যে আনন্দ জন্মে, ইতর জনে তাহার অল্পাংশের অনুভবেও অধিকারী নহে। যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্ষ উপস্থিত হয়, সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়া নিরূপণ করেন—সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটী মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহা নির্ব্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং নব্বই কোটী হইলেও তাহার বিস্ময়ের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক অসাধ্যসাধনের স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধিত হন,

অবৈজ্ঞানিক অতি অকাতরে তাঁহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ মানিয়া লয়। তাহার কোন ইন্দ্রিয় কোনরূপ বিকারলক্ষণ দেখায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথবা অভেদ্য অচ্ছেদ্য পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন আস্ফালন করেন, তাঁহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পুঁথির ছেঁড়া পাতা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহার চৌদ্দ পুরুষ পূর্ব্বে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ, না তরল পদার্থ, এই দারুণ সমস্যার সমাধানে বসিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, অথবা সেই পরমাণুগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া, ইলেক্ট্রনের গুঁড়ায় পরিণত হইতেছে দেখিয়া যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, তাঁহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন। তাঁহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাঁহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক মনে করিয়া, তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে মানিয়া লয়। পাগল ঠাওরানো বরং সহা যায়; কিন্তু এই নির্ব্বিকারতা একেবারে অসহ্য। নির্জন দ্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দার সেলকার্ক সহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মত গোটা মানুষকে নূতন দেখিয়াও পশু পাখীতে বিকারলক্ষণ দেখায় নাই, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল।

অনধিকারীর নিকট তত্ত্বকথাপ্রকাশে তত্ত্বদর্শীরা চিরকালই কুণ্ঠিত এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা উপস্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সঙ্কোচ বোধ করেন। যত সহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক না, অনধিকারী যে বৈজ্ঞানিক সত্যের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। জহুরি ব্যতীত ইতর লোকে মণিমাণিক্যের সমুচিত সমাদর করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। মুক্তার মালা সকলের গলায় শোভা পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে; কিন্তু নরের শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু বিরল।

এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সময়ে অসময়ে ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গুরুগম্ভীর তত্ত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ আছে। অধ্যাপক

টিণ্ডালের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি; অবৈজ্ঞানিক জনসমাজের সহিত মাখামাখি গলাগলি করিতে তাঁহার মত সকলে প্রস্তুত না হইতে পারেন,—কিন্তু হেলমহোৎজ, কেলবিন, টেট, ক্লিফোর্ডের মত দিক্‌পালগণও তাঁহাদের দেবলোক হইতে অবসরমত নামিয়া আসিয়া বিজ্ঞানের অমৃতভাণ্ড হইতে অমৃতকণিকা মর্ত্ত্যলোকে বিলাইতে কৃপণতা করেন নাই। স্বর্গের অমৃতের যেমন মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামৃতেও সেইরূপ একটা মাদকতা আছে। মাদক দ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আপনার আনন্দের ভাগ দিতে চান;—না দিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া এত বড় বড় নাম ও বড় বড় কথা আনিবার হয় ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের মতই মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী; তবে দেবলোক হইতে দিক্‌পালেরা বিজ্ঞানামৃতের যে ছিটা-ফোঁটা যাহা মর্ত্ত্যলোকে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তিনিও আমাদের মতই তাহার আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং সেই ছিটা-ফোঁটার আস্বাদনে তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীকে অংশভাক্ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর কৃতজ্ঞতাভাজন। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার এই উদ্যমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেন না, বাঙ্গালা সাহিত্য এ বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। এই গ্রন্থে সেই দারিদ্র্যের কতকটা মোচন হইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। গ্রন্থকর্ত্তা সেই অভাবমোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি সেই কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়দানের এই সুযোগ পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি।

'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে'র "ভূমিকা"

(১৩১৮)

অন্য দেশে মৃত্যুর পর প্রিয়জনকে সমাহিত করিয়া, তাহার অবশেষ যথাসাধ্য রক্ষার চেষ্টা করে; ভারতবর্ষে প্রিয়জনকে চিতায় দগ্ধ করিয়া, তাহার চিহ্নমাত্র রাখে না। তাহার জন্মকোষ্ঠী পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু ছিল না। অতীত ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সমুদায়ই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্মকোষ্ঠী ও জীবনের কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে।

অন্য দেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এ দেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এ দেশ রাখিতে চাহে না। স্বদেশের অতীতকেই ভুলিয়া গিয়াছে; বিদেশের ত কথাই নাই। বিদেশের কোন সংবাদই কখনও রাখিত কি না, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাহার প্রমাণ নাই।

ইউরোপের কাছে এই বিদ্যাটা আমাদের শিখিবার ছিল। চতুষ্পাঠীতে এই বিদ্যার জন্য কখনও কাহারও কৌতূহল ছিল না, এখনও নাই। ইংরেজের স্থাপিত স্কুল-কলেজে এই বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজের নিকট আর যাহা শিক্ষণীয় থাক না কেন, এই বিদ্যা শিখিবার ছিল।

অর্দ্ধশত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাসের গ্রন্থ অনেক মুখস্থ করিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাস-বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, কোন দেশের ইতিহাস জানিতে আমাদের শ্রদ্ধার কোন প্রমাণ পাই না। আমাদের ধাতে ইহা লাগে নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ঘরটা একেবারে শূন্য। খানকতক পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। আজকাল স্বদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক দেখিতেছি। তাহাতে এখনও ফলের চেয়ে পল্লবের আধিক্য।

স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা দেখি না। সেই অতীতের কথা আলোচনা করিতে ভাবুকের চিত্ত স্তম্ভিত হয়, দার্শনিকের চিত্ত দিশাহারা হয়, যাঁহারা মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল, তাঁহারা গন্তব্য ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া হাবুডাবু খান।

এ দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এ জন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটি উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি বিদেশের কাহিনী আলোচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশের কথারও যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছিলেন; বিদেশের নিকট যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্বদেশের আলোচনায় তাহা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়া গন্তব্য ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে একটি বই ভূদেব জন্মিল না। হায় বাঙ্গালা দেশ!

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীমান্ বিনয়কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। ইঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা আছে, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অনুরাগ আছে। এই তরুণ বয়সে ইঁহার উদ্যমের পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিতেছেন; সেই তুলনামূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার অর্জ্জনে উদ্যম করিতেছেন। সেই উদ্যমের ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তক।

পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটা আকাঙ্ক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পড়িয়া আমার আনন্দ হইয়াছে; আশা করি, পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন। ইতিহাসকে কেবলমাত্র ঘটনাপঞ্জী মনে করিয়া যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা দুর্ভাগ্য। বহু সহস্র বৎসরের মানব-জাতির মর্ম্মকথা ইতিহাসমুখে প্রকাশ পায়; মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের হৃৎস্পন্দন ইতিহাস দ্বারা কর্ণগত হয়; সেই পুরুষের তপ্ত নিশ্বাস ইতিহাস-মুখে বহির্গত হয়। স্থির-যৌবন মানব তাহার শত শতাব্দের বার্দ্ধক্য অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ভূয়োদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার বলে গুরুগম্ভীর উপদেশবাণী প্রচারিত করে, তাহা ইতিহাসের মুখেই শুনিতে পাই। সকলে শুনিতে পায় না। শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বিনয়বাবুর স্পৃহা ও উত্তম ও অধ্যবসায় আছে। সেই উপদেশবাণী শুনিবার জন্য যদি কোন পাঠকের মনে কিয়ৎপরিমাণেও সেই স্পৃহা ও উত্তম ও অধ্যবসায় এই পুস্তিকাদ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রচার ব্যর্থ হইবে না।

'ব্রত-কথা'র "ভূমিকা"

(১৩১৯)

পাঁচথুপীনিবাসী সম্ভ্রান্তকুলোৎপন্ন শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দাসী মহাশয়া এই ব্রত-কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিষদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিষৎ কথাগুলি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করেন; শারীরিক অসুস্থতার জন্য সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ায় আমি সম্পাদন-কার্য্যের শ্রমভার সমুচিতরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

সঙ্কলনকর্ত্রী প্রচলিত ভাষা এবং উচ্চারণ রক্ষা করিয়া কথাগুলির সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কান্দি মহকুমা উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্গত। অতএব এই ভাষাকে উত্তর-রাঢ়ের কিয়দংশের প্রচলিত ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ সঙ্কলনে প্রাদেশিকতা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই সকল প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ সহ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় উহা সাধ্য হইল না। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাদেশিক শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ রক্ষা করা বড়ই দুরূহ। এ বিষয়ে এখনও কোন সুসঙ্গত প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। ইচ্ছা সত্ত্বেও বর্ত্তমান গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনে কোনরূপ সমঞ্জস প্রণালীর অবলম্বন আমার সামর্থ্যে কুলায় নাই। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আশা করি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত এবং পরিষৎ-কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-অংশ এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে পথ প্রদর্শন করিবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্কলন-কার্য্যে এই ব্রতকথাগুলির স্থান কত উচ্চে, তাহা এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। ভিন্ন

ভিন্ন প্রদেশ হইতে এইরূপ সঙ্কলন প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্যের পুষ্টিসহকারে বাঙ্গালার সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। পল্লীবাসিনী সম্ভ্রান্তকুলজাতা একজন মহিলা এ বিষয়ে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়া, যে আদর্শ স্থাপন করিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহাতে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণের ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

'অভয়ের কথা'র "ভূমিকা"

(১৩২২)

আকাশে তারা জ্বলিয়া উঠে—একটা তারা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে ও কয়েক দিন মাত্র উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিয়া আবার নিবিয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে ক্ষেত্রমোহনও সেইরূপ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া চমক জন্মাইয়াছিল—আবার অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। 'মানসী'র পাঠক, গত বৎসর যার মুখে 'অভয়ের কথা' শুনিয়াছিলে, এবার 'ঠাকুরাণীর কথা' কহিতে কহিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সে কোথায় গেল?

ক্ষেত্রমোহন রিপন কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিত। অবসরমত কেবলই নবেল পড়িত—ইংরেজি নবেল। হঠাৎ নবেল ছাড়িয়া বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিল;—হাতে দেখিতাম ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি ইত্যাদি। পরে দেখিলাম, বেদান্ত গ্রন্থ পড়িতেছে। যাহা যখন পড়িত, তন্ময় হইয়া পড়িত। আমার হাসি পাইত—ক্ষেত্র আবার ভক্তিশাস্ত্র পড়িতেছে—বেদান্ত পড়িতেছে।

একদিন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে ধরিয়া ফেলিলাম—ক্ষেত্র বেদান্ত হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিলাম, ক্ষেত্র আমার গুরুগিরি করিবার অধিকারী হইয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা—দশ বার বৎসরের হইবে। তদবধি আমি উহাকে বাছিয়া ধরিয়াছিলাম। ক্ষেত্রের ভিতরে যে পদার্থ আছে, তাহা

কিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রকে কলম ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতাম—সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত—আমার লেখা আবার কে পড়িবে? কিছুতেই নোয়াইতে পারি নাই।

গত বৎসর হঠাৎ আবার নোয়াইয়া গেল। একদিন অভয়ের কথার নমুনা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। নমুনা দেখিয়া আমার চমক লাগিল। যে কখনও কলম হাতে করে নাই, সে একবারে এমন লিখিবে, ইহা মনেও ভাবি নাই। সে কি অপূর্ব্ব ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।

'মানসী'তে প্রকাশের পূর্ব্বে 'অভয়ের কথা'র এক এক টুকরা আমার পার্সীবাগানের বাসায় বসিয়া পড়া হইত। সন্ধ্যার পর এ জন্য ছোট মজলিস বসিত। কি যে আনন্দের তুফান উঠিত, যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। যে বহ্নি এত কাল ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, তাহা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আমাদের চোখ ঝল্‌সিয়া গেল।

'অভয়ের কথা' গ্রন্থ আকারে বাহির করিবার জন্য এক বৎসর ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিলাম। আবার সেই কথা—আমার লেখা কে পড়িবে? বলিতাম, সে ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না—পাঠককে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার নাই। এক এক বার আক্ষেপ করিত,—কই, কারও যে ভাল লাগিল, তাহা ত জানিলাম না। বলিতাম—ভয় নাই, বিপুলা চ পৃথ্বী।

এখনও বুঝি এক মাস হয় নাই, 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার জন্য জোরের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। আমরা চুরি করিয়া প্রেসে দিব, এরূপ ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। তখন প্রতিশ্রুত হইল, এই কয়টা দিন যাক্—আগামী জন্মাষ্টমীর দিন নিশ্চয় প্রেসে দিব—ইহার অন্যথা ঘটিবে না।

জন্মাষ্টমীর দিন—বৎসরের এত দিন থাকিতে জন্মাষ্টমীর দিন কেন? জন্মাষ্টমীর দিন সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পৃথিবীতে আনন্দ বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মাথা তুলিয়া দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া সে পথে চলিত—আনন্দের স্রোত তার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; যেখানে দুই দণ্ড বসিত, আনন্দের তুফান উঠিত। পরব্যোমে স্থিত আনন্দঘন পুরুষের আনন্দকণিকা

যেন ঘনীভূত হইয়া মর্ত্ত্যভূমে আসিয়াছিল। এইরূপ মাঝে মাঝে আসে; নতুবা মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষ টিকিতে পারিত না। 'অভয়ের কথা' ও 'ঠাকুরাণীর কথা' এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রকে যে জানিত, সে-ই সে আনন্দের ধারা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, না তৃপ্ত হইয়া উপায় ছিল না; সে আনন্দ এমন, যে যত পাইয়াছে সে তত আরও চাহিয়াছে। ক্ষেত্রমোহনের জীবনচরিত লেখা আমার কাজ নহে। অন্যে তাহা লিখিবেন। আমার কলমে যে দুই কথা আসিল, তাহা লিখিয়া দিলাম।

পুনশ্চ—

১৩২১ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে ক্ষেত্রমোহন 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়টা কথা লিখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাসের 'মানসী'তে তাহা বাহির হয়। সেই কথা কয়টাই 'অভয়ের কথা'র ভূমিকাস্বরূপে বাহির হইল।

আজ ১৩২২ সালের আশ্বিন; এক বৎসর পরে 'অভয়ের কথা' বাহির হইল। প্রকাশকের ইচ্ছা, এই উপলক্ষে আরও দুই কথা যোগ করিয়া দিই।

ক্ষেত্রমোহনের জীবন-কাহিনী এই প্রসঙ্গে দিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা আমার কাজ নহে। কালেজে পাঠাবস্থায় ক্ষেত্রমোহনের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, পরে একই কালেজে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রমোহনের সহিত আমার সম্পর্ক—প্রীতির সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক। বোধ করি, সকলের পক্ষেই তাই;—কেন না, আনন্দময়তাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

শিক্ষকতাব্যবসায়ী বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনে কর্ম্মের বাহুল্য থাকে না; সম্ভবতঃ ক্ষেত্রমোহনের জীবনেও তেমন কিছু ছিল না।

শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপে ক্ষেত্রমোহন বড় ভাগ্যবান্ ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত, প্রীতি করিত। সকল শিক্ষকের ভাগ্যে এতটা ঘটে না। ছাত্রদেরই প্রীতির নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ বাহির হইল,—তাহাদেরই উদ্যোগে ও তাহাদের অর্থব্যয়ে এই

গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। নতুবা ক্ষেত্রমোহনের নিঃসহায় বালক পুত্রের পক্ষে এই গ্রন্থ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। ক্ষেত্রমোহনের চিতা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার ছাত্রগণ যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা আজ সিদ্ধ হইল।

'মন্দিরে'র "ভূমিকা"

(১৩২২)

এই গ্রন্থ যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ছাপিবার পূর্ব্বে কবিতাগুলি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পড়িয়া আমার ভাল লাগিয়াছিল,—এই আমার অপরাধ। সেই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ লেখক আমাকে ধরিয়া বসিলেন, ইহার একটা ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড;—অনেক অনুরোধেও আমাকে তিনি নিষ্কৃতি দিলেন না।

আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, তাহা অন্যেরও ভাল লাগিবে, এরূপ মনে করি না। সেরূপ মনে আনার ধৃষ্টতাও আমার নাই। আমার যদি ভালই লাগিয়া থাকে, তাহা জনসমাজে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা বা অধিকার আমার আছে কি না, তাহাও জানি না। কিন্তু লেখক আমাকে কিছুতেই আত্মগোপন করিতে দিলেন না।

আমি কবিও নহি, কাব্য-সমালোচকও নহি। আমাকে নিঙড়াইয়া কোনরূপ কাব্যরস বাহির করা চলিবে না। তথাপি লেখকের ইচ্ছা, আমাকে কিছু লিখিতেই হইবে।

একই রস রুচিভেদে বিভিন্ন আস্বাদন দেয়। কিন্তু একটা না একটা আস্বাদন সকলেই পায়। কেন ভাল লাগে বা কেন মন্দ লাগে, তাহা বলিতে কেহই পারেন না। আমার যদি কবিতাগুলি ভাল লাগিয়া থাকে, কেন লাগিয়াছে, তাহা বলিতে পারিব না।

কবিতাগুলি ভক্তিপথের পথিকের জন্য—মন্দির-পথে যাত্রীকে যে সকল ধাপ উত্তীর্ণ হইতে হয়, সেই ধাপগুলির পরিচয় ইহাতে আছে। সোপান-পরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রী দেবতার নিকট আত্মনিবেদন করেন, আত্মসমর্পণ করেন। এখানেও সকলের সমাপ্তি হয় না। চরম লক্ষ্য

থাকে, যোগ-মিলন। মিলনের সঙ্গে বিরহ-থাকে।—মিলনই হউক, আর বিরহই হউক, উভয়েরই ফল আনন্দ।

এই আনন্দ অনুভূতির বিষয়। যে অনুভব করিয়াছে, সে-ই ইহার স্বরূপ জানে। অন্যের পক্ষে ইহার পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা—শুক পাখীর মত পড়ান' কথা আওড়ান মাত্র।

এই কবিতার লেখক [কিরণচাঁদ দরবেশ] সেই আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কতটা সফল হইয়াছেন, ভুক্তভোগী তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

রসগ্রহণ ও রসবুদ্ধি হইতে ভাব জন্মে। ভাবের একটা প্রেরণা আছে। তাহা ভাষা আশ্রয় করিয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে। ভাবুকতা যেখানে অকৃত্রিম, ভাষাও সেখানে স্বাভাবিক হইয়া প্রকাশ পায়। অনাবিল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষা সেই স্বাভাবিকতার লক্ষণ। আমার মনে হইয়াছে, লেখকের ভাবুকতা আছে—রসজ্ঞতা আছে। আছে বলিয়াই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয় নাই। ভাব যেন আপনা হইতেই স্বচ্ছন্দভাবে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভাষারূপে বাহির হইয়াছে। সেই জন্যই হয় ত কবিতাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে।

ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহাতে লেখকের দোষ নাই। এ-যুগে সেই প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। লেখক সেই প্রভাবকে অনেকটা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ভাষার উপরে তাঁহার প্রভুত্ব আছে। তিনি ভাষাকে ইচ্ছামত খেলাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেগে চলিয়াছে, দ্রুত চলিয়াছে, স্থানে স্থানে কূল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ;—বাঁধ ছাড়িয়া অকূলে বোধ করি ছুটে নাই।

লেখক বলেন, কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি লিখিতে বসেন নাই। ধর্ম্ম-সাধনা-সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইতে পারে। সেরূপ উদ্দেশ্য কিছু না থাকিলেও কার্য্যত একটা লক্ষ্য আছে, নিশ্চয়। লক্ষ্যটা কি, তাহা পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন।

অলমতিবিস্তরেণ। কবিতাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে ; আশা করি, আমার মত আরও অনেকের ভাল লাগিবে।

'আদর্শ জীবনী'র "ভূমিকা"

(১৩১৬)

কোচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষ পরমসম্মানভাজন শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর তাঁহার কন্যার [সরোজিনী দেবী] রচিত এই গ্রন্থখানি দেখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি গ্রন্থখানি দেখিয়াছিলাম এবং গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইচ্ছামত সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আমার উপর অর্পিত থাকিলেও অধিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখি নাই ; স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধনের জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে যে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহা পালিত হইয়াছে। স্থূলতঃ গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্রীর নিজস্ব ; আমার অনবধানে যদি কোন ত্রুটি অসংশোধিত হইয়া থাকে, পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমার অবকাশের যেরূপ অভাব, তাহাতে সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, বলিতে পারি না।

বাঙ্গালা দেশের কতিপয় মহাপুরুষের জীবনচরিত এই গ্রন্থে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা সঙ্কলনমাত্র। যাঁহারা ঐ সকল মহাপুরুষচরিতের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোন বিশেষ নূতন কথা পাইবেন না। সঙ্কলন-গ্রন্থমধ্যেও এখানি হয় ত অদ্বিতীয় নহে ; তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবনচরিত গ্রন্থের সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাও সেই বিরল সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবে এবং সাধারণের উপকারে আসিবে, এই বিশ্বাসে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশের জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে আমি উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আশা করি, সাধারণে ইহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।

আনন্দের বিষয় যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীর অভাব নাই। তবে অধিকাংশ স্থলেই মহিলাগণ সাহিত্যের কাব্যাংশের আলোচনাতেই নিযুক্ত আছেন। সাহিত্যের অন্যান্য অংশে তাঁহাদের প্রযত্নও বিশেষভাবে আদরের যোগ্য হইবে। এই কারণেও আমি এই গ্রন্থখানি সম্যক্ সমাদরের উপযুক্ত বোধ করি।

যে সকল মনস্বী মহাজন বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের গঠনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, এই গ্রন্থে বিশেষতঃ তাঁহাদেরই কীর্ত্তিকথা বিবৃত হইয়াছে। দৈনন্দিন জপমালা ঘুরাইবার সময় তাঁহাদের নাম স্মরণীয় ও উচ্চার্য্য। তাঁহাদের চারিত্রপঞ্জিকা আমাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবে; তাঁহারা যে নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনের স্রোতস্বতীকে তরঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবের আঘাত আমাদের জীবনের গতিতে বেগদান করিবে। এই সকল মহাপুরুষের নামের কীর্ত্তনে ও স্মরণে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ইহা অত্যুক্তি নহে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যাঁহাদের গৃহে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের সেই পুণ্যসঞ্চয়ে কতকটা সুযোগ ঘটিবে, ইহাতে দ্বিধা করি না।

'আকাশের গল্পে'র "ভূমিকা"

(১৩২০)

অতি বাল্যকালে খগোলবিবরণ নামে একখানি বাঙ্গালায় লেখা জ্যোতিষের বহি পড়িয়াছিলাম; ঐ পুস্তকে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-সকলের বিবরণ পড়িয়া বালকের মনে কত আনন্দের উদয় হইত, কত কৌতূহল জাগিয়া উঠিত। ঐ পুস্তকখানির প্রণেতার নাম মনে হইতেছে নবীনচন্দ্র দত্ত। তৎপরে বাঙ্গালায় আর জ্যোতিষের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আমি ভাল জানি না; তবে সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক দুই একখানি মাঝে মাঝে হাতে পড়ে; তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিবিধ বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ যাহা রচিত হইত, এখন আর যেন তাহা হয় না। অথচ সে কালের চেয়ে এ কালে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা, ছাপাখানার সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। ছাপিবার খরচও সম্ভবতঃ বিস্তর কমিয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বেও পাঠশালার ছেলেদের জন্য দুই চারিখানা পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা লিখিত হইত, এখন গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত

বাট্‌খারার মাপে বহি না লিখিলে পাঠশালাতে চলে না। কাজেই স্কুল-পাঠ্যরূপেও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার দেখিতে পাই না।

পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একবারে নাই কি? পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই কি? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনস্বীরা যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এমন নিষ্ফল হইল কেন?

হঠাৎ যখন এই 'আকাশের গল্প' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার [যতীন্দ্রনাথ মজুমদার] কর্ত্তৃক আমার নিকট স্থাপিত হইল, তখন আমার মনে ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারি নাই। তবে গ্রন্থকর্ত্তা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অভাব দূর করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য গ্রন্থকারের প্রতি পরম শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ আকাশ-স্থিত জ্যোতিষ্কগুলির বিবরণ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। জ্যোতিষের কোন দুরূহ বা নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস হয় নাই। এই শ্রেণীর পুস্তকে সেরূপ প্রয়াস সম্ভবতঃ নিষ্ফল হইত। গ্রন্থের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে, তাহাতে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

দূরবীণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জ্যোতিষ্কগুলিকে কেমন দেখায়, কেবল বিবরণ পড়িয়া তাহা হৃদ্গত করা সহজ নহে। বিলাতি বহিতে ভাল ভাল চিত্র দিয়া তাহা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। সেরূপ চিত্র দেওয়া এ দেশে অসম্ভব। উৎকৃষ্ট চিত্রের ব্যয়ভার বহনও বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতার পক্ষে সুসাধ্য নহে। এই সকল মনে করিয়া পুস্তকখানির বিচার করিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় গ্রন্থকার যথাসাধ্য ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। তাঁহার পরিশ্রমের ফল তিনি পাইবেন না, ইহা বলিতে বিশেষ দুঃসাহসের আবশ্যক নহে। তাঁহার উদ্যমের জন্য ও পরিশ্রমের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচকবর্গের নিকট কতটুকু প্রশংসা পাইবেন, তাহাও নিতান্ত সংশয়ের বিষয়। নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবার প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কোন প্রণোদনা তাঁহার আছে, মনে করিবার হেতু দেখি না।

এই স্বার্থহীন সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াই আমি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন যে অবস্থা, তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকেও আমি বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করি।

'সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে' "আমার নিবেদন"

(১৩২৩)

মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের নামমাহাত্ম্যে ঐ গ্রাম আজি বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামে রাজা বাহাদুরের লাইব্রেরিতে অনেক মহামূল্য ও দুর্ল্লভ ছাপা বহি ও হাতে লেখা পুঁথি ছিল। রাজা বাহাদুরের দানযজ্ঞ কতকটা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের মত ;—ঐ লাইব্রেরিটি এখন প্রায় আলমারি-মাত্র-শেষ হইতে বসিয়াছে। আমি যখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম, মাঝে মাঝে পুস্তকের ও পুঁথির বোঝা আমার নিকট আসিত—সাহিত্য-পরিষদে অর্পণের জন্য একদিন একখানি বৃহৎ পুস্তক আসিল—সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম। এই বহিখানির নাম আমি জানিতাম ;—পরিষদের লাইব্রেরিতে উহার একখণ্ড আগেই সংগৃহীত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক দিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া ঐ বহি পরিষদের জন্য আমার হাতে অর্পণ করেন। বহিখানি অতি দুর্ল্লভ দেখিয়া আমি আদরে উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম যে, ঐ বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অনুরাগ ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলিতেছে। আমি সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই উড়াইয়া আগুন জ্বালাইতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; সেই আগুনের আলোক এবং তৎসঙ্গে হয় ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষৎ এখন ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমিধ যোগাইয়া যজ্ঞের আগুনের মত ইহা রক্ষা করিতে পারেন, পরিষদেরই ভাগ্য।

সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম গ্রন্থখানি দানের পর রাজা বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, গ্রন্থখানি পুনঃ প্রচার করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা,

গানগুলি সাধ্যমত সংশোধন করিয়া সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যে প্রস্তুত স্বরলিপি সমেত ভাল কাগজে ভাল হরপে ছাপিতে হইবে ;—সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করিবেন।' তাঁহার আদেশে আমার হৃৎকম্প হইল,—এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডের ভার লইতে আমার সাহসে কুলাইল না। জীবনে অনেক অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছি—কিন্তু সঙ্গীত-বিদ্যা চিরকাল আমার অধৃষ্য হইয়া আছে। আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না; মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরের একটা স্বভাবগত বিশিষ্টতা আছে; হঠাৎ একটা সাধু সঙ্কল্প তাঁহার মনে আসে—আপনা হইতেই মনে আসে,—যতক্ষণ সেটা কাজে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাঁহার শান্তি হয় না; বোধ করি, ঘুম হয় না।

আমার নিকট সাহিত্য সম্বন্ধে ও সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে তাঁহার যে পত্ররাশি আছে, তাহাতে পদে পদে সেই পরিচয় পাইয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল—তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। সাহিত্যে তাঁহার যেমন অনুরাগ—সঙ্গীতেও অনুরাগ প্রায় তত্তুল্য; তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির লক্ষণ দেখিয়া অগত্যা বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বসুর শরণ লইলাম। নগেন্দ্র বাবু প্রাচ্যবিদ্যায় মহার্ণব হইলেও সঙ্গীতবিদ্যায় হয় ত গোষ্পদ—তিনি এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে নিজমুখেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিপুল অধ্যবসায়ের জন্য তিনি দেশের মধ্যে ধন্য ;—আমি তাঁহার আশ্রয় লইলাম এবং রাজা বাহাদুরও তাঁহাকে ডাকিয়া এই বিপুল গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পণ করিলেন। গ্রন্থের গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া সাধ্য হইল না; তবে নগেন্দ্র বাবু নানা ভাষায় অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞগণের সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যে নানা ভাষার গানগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গীত-বিদ্যার শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বচনগুলির আকর সংগ্রহ করিতেও তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে,—অন্যের পক্ষে ইহা সাধ্য হইত কি না, জানি না। রাজা বাহাদুরের আগ্রহাতিশয়ে ও ব্যয়ে এবং নগেন্দ্র বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে এই বিপুলকায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইল,—সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য হইবে।

এই গ্রন্থের এবং গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের ইতিহাস নগেন্দ্র বাবু দিয়াছেন—একজন ব্রাহ্মণ সে কালে কিরূপে এইরূপ একখানা সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এত বড় সংগ্রহগ্রন্থ ভারতবর্ষে আছে কি না জানি না,—এতগুলি ভাষায় রচিত এত গানের একাধারে সন্নিবেশ বোধ করি এ দেশে আর নাই। যাঁহারা সঙ্গীত-সাহিত্যে ও সঙ্গীত-বিদ্যায় অনুরাগী, তাঁহারা রাজা বাহাদুরের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হইবেন, সন্দেহ নাই। মান্যবর গ্রীয়ার্সন হিন্দী-সাহিত্যের বিবরণ লিখিতে বসিয়া এই গ্রন্থ হইতে যে আনুকূল্য পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তিনি নিজেই করিয়াছেন। গুণী গুণং বেত্তি—গুণী গ্রীয়ার্সন বিদেশী হইয়াও এ দেশের সাহিত্যের গুণবেত্তা। আশা করি, আমার স্বদেশেও গুণবেত্তা গুণীর অভাব হইবে না।

অভাব হইবে কি না, তাহার সম্যক্ পরিচয়ের অবসর আসিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের অধিকাংশ দেবনাগরে মুদ্রিত হইয়াছে,—বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে এই গ্রন্থের আদর হইবে, এই আশায়। বাঙ্গালা গানের অংশ পৃথক্ ভাবে বাঙ্গালা হরপে ছাপা হইয়াছে ;—উহা বিশেষতঃ বাঙ্গালীর আদরণীয় হইবে, এই ভরসায়। গ্রন্থখানি ছাপিতে রাজা বাহাদুরের বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে—রাজা বাহাদুর অকাতরে এই অর্থাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলির মত বীণা-পুস্তক-ধারিণী বাণীর চরণকমলে উৎসর্গ করিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির সমুদয় স্বত্ব রাজা বাহাদুর তাঁহার চিরপ্রিয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অর্পণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া ইহা প্রকাশিত হইল। সাহিত্য-পরিষৎও এ জন্য ধন্য হইল। এই পুস্তক বিক্রয়ের সমস্ত অর্থ সাহিত্য-পরিষৎ পাইবেন, এবং সেই অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রচারিত হইবে।

রাজা বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। দরিদ্র সাধারণের পক্ষে উচিত মূল্যে এই গ্রন্থ ক্রয় করা সুসাধ্য হইবে না। কিন্তু দেশের ধনি-সমাজে সঙ্গীত-রসজ্ঞের অভাব নাই। তাঁহারা এই গ্রন্থের কিরূপ আদর করেন, তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহলী থাকিলাম। দেবী ভারতীকে তাঁহার সপত্নীর দ্বারস্থ হইতে হয়—ইহা যুগমাহাত্ম্য ; এ জন্য ক্ষোভ নিষ্ফল। ভগবতী লক্ষ্মী তাঁহার সতীনটিকে কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত করিবেন না। মনে রাখিবেন, মহৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও তিনি নিজে চঞ্চলা, আর তাঁর মুখরা সপত্নী নিত্যা। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিষদের হস্তে পৃথক্ ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিবে ;—পুস্তকের মূল্যরূপে বা পুস্তকোপহারের বিনিময়ে বা সঙ্গীত-শাস্ত্র-প্রচারে সাহায্যরূপে যিনি যাহা

দয়া করিয়া দান করিবেন, তাহা এইরূপে সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে সঙ্গীত-সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরক্ত ভক্ত রাজা বাহাদুরের ইহাই একান্ত অভিপ্রায়—মনের বাসনা। আশা করি, তাঁহার বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র "মুখবন্ধ"

(১৩২৩)

বসন্ত বাবুর* নিতান্ত ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। এক দিন বসন্ত বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিষ বটে।

চণ্ডীদাসের নামে বাঙ্গালী চিরকাল মুগ্ধ;—চণ্ডীদাসের নূতন গ্রন্থের নামে চমক লাগিবারই কথা। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শৈশবেই আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকগুলি নূতন পদ প্রকাশ করেন। নীলরতন বাবু বীরভূমির অধিবাসী—তিনি তখন কীর্ণাহার ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন,—এখন রামপুরহাটে শিক্ষকতা করেন। তিনি পরে আরও বহুসংখ্যক পদের সন্ধান পান। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি তিনি পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশার্থ আমার হাতে দিয়াছিলেন—পরিষৎ তাঁহাকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদাবলীমধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ সকল পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতন বাবুর সম্পাদিত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে;—ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এতগুলি পদ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

* বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।—সম্পাদক।

নীলরতনবাবুর সম্পাদিত এবং পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল ; কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি ? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের গৌরব বাড়াইবার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্‌টি নকল বা জাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি ? এ বিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে কোনরূপ বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও ভাব লইয়া। কোন একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাষা বটে কি না ? বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে একেবারে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই—এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এত কাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিস বাহির হইতে পারে কি না ? পাঠকের রুচিভেদ অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অন্যের বিবেচনায় তাহা হয়ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপৎ নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোন্‌টা আসল, আর কোন্‌টা নকল।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সকল পদকেই পদাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিচারের ভার তিনি নিজের উপর লন নাই—সাহিত্য-সমাজের উপর ফেলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক উঠিয়াছিল—বানান লইয়া। পদাবলীর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা কেবল রসলিপ্সু, তাঁহারা কোন্ শব্দের বানান কিরূপ হইবে, তজ্জন্য আদৌ ব্যাকুল নহেন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ কেবল কাব্যরস-পিপাসুর জন্য প্রচারিত হয় না। এ কালে ভাষা-বিজ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞানবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে; সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ ঐ বিজ্ঞানামোদীদের মুখ চাহিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস বিদ্যা। ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া কেবল তাহার ছিবড়া ভক্ষণের জন্য লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট রামী রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, না হ্রস্ব-ই-কারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কত কাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জন্য এই বিজ্ঞানবিদ্যার শিরঃপীড়া ঘুচে না। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিজ্ঞানবিদ্যার খাতিরে পুরাণ পুথি পাইলেই তাহার "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" বানান বজায় রাখিয়া ছাপিতে দেন। একাধিক পুথি পাইলে, তাহার মধ্যে একখানিকে আদর্শ পুথি ধরিয়া, তাহার বানান অনুসরণ করেন, আর অন্য পুথির বানান-ভেদ ছোট হরপে ফুটনোটে পাঠান্তর-স্বরূপে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই সকল পাঠভেদ মিলাইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে এবং সে কালে বাঙ্গালা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবে। সাধারণ পাঠকে এই পণ্ডিতের লড়াইয়ে কৌতুক দেখে;—ফলে এই হয় যে, পরিষদ্-গ্রন্থাবলী-ভুক্ত মুদ্রিত পুস্তকের পাতা উল্টাইতে সাধারণ পাঠকের আতঙ্ক হয়; উহা অপাঠ্য বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়; বহিগুলি পোকায় কাটে এবং অবশেষে কাগজের দামে বেচিতে হয়।

নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীতে পরিষদের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নীলরতন বাবু বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য রাখিয়া

চণ্ডীদাসের 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং' সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই বা সম্মত হন নাই। পরন্তু নিজের খেয়ালের উপর বানান সংশোধন করিয়া—এ কালের বানান বসাইয়া পদাবলী ছাপাইয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলী সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ঐ সংস্করণ অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য নীলরতন বাবু তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন এবং আমিও এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছি বলিয়া কিঞ্চিৎ গঞ্জনা পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কারের পর এখন দেখিতেছি, নীলরতন বাবুরই জিত। পুরাতন পুথির পুরাতন বানান রক্ষা করিবার জন্য তিনি যদি পরিশ্রম করিতেন, তাহা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। এই নবপ্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষা হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, যত পুথি লইয়া আলোচনা হইয়াছে—কোনটারই ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নহে, সর্ব্বত্রই খাঁটি চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত, 'আধুনিকতাপাদিত' হইয়া গিয়াছে। এত কাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম, সে ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা—চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পড়িয়া আধুনিক ছাঁচে ফেলা ভাষা। সে ভাষা যখন চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে, তখন সে ভাষার বানানের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। যিনি এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাতা উল্টাইবেন, তিনিই এই কথায় সায় দিবেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাও খণ্ডিত, শেষের কতকগুলা পাতা নাই। একখানি মাত্র পুথি বলিয়া ইহা অবিকল ছাপান সম্ভবপর হইয়াছে—প্রত্যেক শব্দের বানান অবিকৃত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। ছাপাখানার কল্যাণে হয় ত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে—তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার

আর কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত এত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য এতই অধিক যে, পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে ইহার আদ্যোপান্ত ফটোগ্রাফ করিয়া ছাপান উচিত হইত। যাহা হউক, বসন্তরঞ্জন বাবু যেরূপ যত্নের সহিত ইহার খুঁটিনাটি বজায় রাখিয়া, ইহার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি সার্থকই হইয়াছে।

কয়টি বিশিষ্ট কারণে গ্রন্থখানি মহামূল্য। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব।

প্রথম, পুস্তকের রচনা-কাল। সন-তারিখের সমস্যা এ দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে জটিল সমস্যা। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস হইতে লক্ষ্মণসন, কোন ব্যক্তিরই আবির্ভাব-তিরোভাবের বৎসর-তারিখ নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—পণ্ডিতেরা কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন ও কথা কাটাকাটি করিতেছেন। চণ্ডীদাস ত দূরের কথা। সে কালের বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতাদের কেহ গ্রন্থশেষে আপনার বংশপরিচয় দিতেন, কেহ বা দয়া করিয়া রচনার কালটা দিবারও চেষ্টা করিতেন। যিনি পুথি নকল করিতেন, তিনিও গ্রন্থশেষে আপনার নাম-ধাম ও নকল করিবার তারিখ দিতেন। কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্য-দোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিক্‌টাই হয় ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্ত্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে। কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ-পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কালনির্ণয় হইল না। চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় গ্রন্থশেষে ছিল কি না, জানা গেল না; হয় ত ছিল না। কিন্তু পুথিখানি কে কবে নকল করিয়াছেন, তাহার পরিচয় হয় ত ছিল। কিন্তু তাহাও লুপ্ত থাকিল, ব্যক্ত হইল না। এখন পুথির হরফ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করুন। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা পাঠকেরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিবেন। তিনি বলেন—এই পুথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুথি—

উহার চেয়ে পুরাণ পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ দেখিয়া তিনি অনুমান করেন, পুথির তারিখ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পারে—সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পুথিখানি হয় ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহার আগে টানিয়া লওয়া চলে না। এই পুথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতে লেখা না হইলেও তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথিখানি তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় কথা—গ্রন্থের ভাষা। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছেও এই গ্রন্থ পরম আদরে গৃহীত হইবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম-বাঙ্গালার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপরে হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই। শূন্যপুরাণের ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন বটে, কিন্তু শূন্যপুরাণের পুথি তত পুরাণ পুথি নহে, কাজেই সেখানে নমুনা খাঁটি নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা আরও প্রাচীন—এত প্রাচীন যে, ঐ ভাষা বাঙ্গালা বটে কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও পুথির বয়স ও ভাষার বয়স সমান নহে, নমুনা হয় ত খাঁটি নাই। যাহা হউক, বৌদ্ধ গান ও দোঁহা,—তার পরে শূন্যপুরাণ,—তার পরে এই চণ্ডীদাস,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নিরূপণে পর পর এই তিনটা ধাপ পাওয়া গেল। এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পরিণতি নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের অধিকারী পণ্ডিতেরা দশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডা চালাইবার সুযোগ পাইলেন। বসন্তরঞ্জন বাবু নিজে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সুবিজ্ঞ—তিনি কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই গ্রন্থেই পাঠকেরা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের শেষে তিনি যে টীকা যোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শব্দের আলোচনায় যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি যে সকল

প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আছে—তাহাতেই পাঠকেরা তাঁহার বল পরীক্ষা করিবেন। আমি অব্যবসায়ী,—আমি তাঁহার উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় Etymology প্রকরণে এই গ্রন্থের নমুনা যেমন কাজে লাগিবে, আর কোন গ্রন্থ বোধ হয়, তেমন লাগিবে না। কেন না, ইহাতে যে নমুনা আছে, তাহা খাঁটি নমুনা,—সাত নকলে আসল জিনিসটা নষ্ট হইতে পারে নাই।

তার পরে তৃতীয় কথা;—তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এত কাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোদের প্রাণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এত কাল তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস, আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। এক জন তবে কি আসল, আর এক জন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন্। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ

ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক ; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জন বাবু ইহা খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আরও অনেক সুধী ব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ; আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক প্রশ্নই বড় প্রশ্ন—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক আলোচনা চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বকথার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছে—বাঙ্গালা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল—এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেইশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে যে একমনে, তন্ময়চিত্তে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছেন, আমি আজি পূর্ণানন্দে তাঁহাকে জানাইতেছি, তাঁহার পূজাও আজি সার্থক হইল। আমি তাঁহাকে বলিতেছি, আজি আপনি ধন্য হইলেন এবং আমার মধ্যবর্ত্তিতায় যদি এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।

প্রাথমিক রচনা

[হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক। প্রথম ভাগে' (১৩১১ সাল) প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—"১৮৮৬ বি. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামীতে লিখিয়াছিলাম" (পৃ. ৮০২)। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন: "বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু ['নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার] যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে [এই সংবাদ ভুল, নামে ছাপা হয় নাই।] প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি 'নবজীবনে' আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয়বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি।"

এই প্রথম প্রবন্ধের নাম "মহাশক্তি"। ইহা ১২৯১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, তিনি 'নবজীবনে' নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি লিখিয়াছিলেন—

বিবর্ত্তন—শ্রাবণ ১২৯২, মহাতরঙ্গ—অগ্রহায়ণ ১২৯২, জড় জগতের বিকাশ—আষাঢ় ১২৯৩, সৃষ্টি-তত্ত্ব—শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৯৩, বৈদেশিক সভ্যতা—শ্রাবণ ১২৯৪।

ইহার মধ্যে "সৃষ্টি-তত্ত্ব" প্রবন্ধটি "সৌর জগতের উৎপত্তি" নামে 'প্রকৃতি' পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধরূপে স্থান পাইয়াছে। আমাদের অনুমিত অন্য প্রবন্ধ কয়টি এই প্রাথমিক রচনা" ভাগে মুদ্রিত করিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে এই 'বিবিধ' খণ্ডে প্রকাশিত "অম্ল-মধুর" প্রবন্ধ (পৃ. ২৬৬-৬৯) দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

মহাশক্তি

তুমি কে? আমি কে? এই অনন্ত বৈচিত্র্য-চিত্রিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি? ইহা কোথা হইতে আসিল? কে জানে, ইহা কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন আর্য্য ঋষি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে দৃষ্টিহীন, বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। আমি কে যে, ইহার উত্তর দিব?

কে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছে, ইহারও কি উত্তর চাও মানব? কে বলিবে—এ ব্রহ্মাণ্ড কার রচিত? কে জানে এই ব্রহ্মাণ্ড কি? এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল ভ্রাম্যমাণ,—কে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদান্তিক বলিয়াছেন, এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর,—আমি জানি না।

এই যে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বসুন্ধরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া রূপের স্নিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের মন ভুলাইতেছে; পাখী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুসুমিত তরুশাখে অলি আসিয়া ঝঙ্কার দিল; মনুষ্য! বল দেখি—এ সব কি? এ সব সত্য, কি মিথ্যা, এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তত্ত্বদর্শী চক্ষে দেখিবে, এ সব কি, তা জান না। দেখিবে, প্রকৃতির এই ভুবনভুলান হাসি, ফুলের মধুময় বাস, কোকিলের এই উন্মাদক স্বর, এ সব মানুষ, তোমার কাছেই ভাল, তোমার কাছেই এরূপ। প্রকৃত কি, তা তুমি জান না। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের খর জ্যোতিঃ ও পূর্ণচন্দ্রের কনকসুধা বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থবিশেষের তরঙ্গায়িত গতি মাত্র। তোমার চক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, তুমি দেখ আলো। তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি দেখ আঁধার। জগৎ হইতে জীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক ও আঁধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত, কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। তেমনই জলদের গভীর গর্জ্জন ও বীণার মধুর নিক্কণ তোমার কাছেই পৃথক্ মাত্র। জগৎ হইতে জীবের জীবন লুপ্ত হউক, জগতে শব্দের আর পার্থক্য থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট বড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, সুরূপ কুরূপ, পাপ পুণ্য, সবই তোমার কাছে ও তোমার জন্যে।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে কিছুরই পৃথগস্তিত্ব দেখিবে না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বই আর দুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড; ইহা এক। বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই, ইহার চরম উত্তর—যাহা দেখিতেছ, তাহা নয়; তাহা কি, তুমি জান না। মানুষ অল্পবুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনন্ত কি, তাহা বলিবে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান নিজ অবস্থাসাপেক্ষ, দর্শনে বলে। প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানি না। একটি পিপিড়া যাহাকে ক্ষুদ্র বল, এক খণ্ড কাচ লইয়া দেখ—অতি বৃহৎ বোধ হইবে; বায়ুর বদলে অন্য পদার্থের ভিতর দিয়া দেখ, অন্য আকার লাগিবে; তোমার চক্ষুর যদি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে এখনই যাহাকে ছোট বল, তাহাকে বড় বলিবে, অথবা যাহাকে বড় বল, তাহাকে ছোট বলিবে। তোমার কাছে যাহা গরম, আমার কাছে তাহা শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত, আমার কাছে তাহা সহজ; তোমার কাছে যাহা সুন্দর, আমার কাছে তাহা কদাকার; কে বলিয়া দিবে—তাহার স্বরূপ কি? তুমি বসিয়া আছ, একজন সাধারণ লোক বলিবে—তুমি স্থির; একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে—তুমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত সহস্র ক্রোশ বেগে ঘুরিতেছ। আবার যদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে—কত কোটি ক্রোশ তুমি দিবামধ্যে ভ্রমণ করিতেছ? কে জানে—তুমি স্থির, কি অস্থির?

তবে কেন ভাই, এত বাগ্‌বিতণ্ডা? যে জগতের কিছুই জান না, সেই জগতের কর্ত্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন? তুমি কার্য্য জান না, কারণ অনুসন্ধান কর ও অনুসন্ধানে কৃতকাম হইয়াছি বলিয়া স্পর্দ্ধারবে জগৎ ফাটাও। এস ভাই, আমরা ভ্রান্ত জীব, দূরে চাহিয়া কাজ নাই; অজ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞেয় পুরুষকে

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসং——
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—

দূর হইতে প্রণাম করি—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

এস ভাই, সহজ পথে যাই। যাহা অজ্ঞেয়, তাহা জানিতে যাওয়াতেই কাজ নাই। যাহা সীমাবদ্ধ মনুষ্যজ্ঞানের গম্য, মনুষ্যজ্ঞানসাপেক্ষ,

তাহাই কি,—তাই ভাবি। ভুলো না, যাহা ভাবিবে, সমস্তই মনুষ্যজ্ঞান-সাপেক্ষ; প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি, তাহার স্থিরতা নাই।

মানুষের জ্ঞানসীমার অপর পারে ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ নাই, আঁধার আলো ভেদ নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ অপৃথক্, পাপ পুণ্য অভিন্ন। সেখানে সবই এক, সবই একধর্ম্মাক্রান্ত। সেখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান এক, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি ও গতি এক, কার্য্য ও কারণ এক। সেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, সুখ দুঃখে পার্থক্য নাই, হিংসা ভালবাসায় প্রভেদ নাই। সবই আছে, কিছুই নাই। সে তত্ত্ব কার সাধ্য ভেদ করে।

মনুষ্যের জ্ঞানসীমার ভিতরে আইস, দেখিবে—সেখানে কি বিচিত্র দৃশ্য। কোটি কোটি সূর্য্য চতুর্দ্দিকে রশ্মিরাশি বিকিরণ করিয়া প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণ্যমান; সূর্য্যের পর সূর্য্য, তার পর সূর্য্য—কে গণনা করে কত? অকূল সাগরে অগণ্য জলকণা, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বালুকণা, কে গণিবে কত? সূর্য্যের পাশে গ্রহ, গ্রহের পাশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বাঁধা। অনন্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডচয়, মানুষের চোখে যেন নীল চন্দ্রাতপে মাণিকের মত ঝিকিমিকি জ্বলে; এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও? "জগৎ মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়"—রূপের অতুল ভাণ্ডারে সৌন্দর্য্যের রাশি, রাশি রাশি, মধুমাখা, সুধামাখা,—যে যত পার, প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর; এ ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলি-কণাসমান পৃথিবী, সেখানেও রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোদের হাট, সুখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গভীর কল্লোল, এমন কি আর আছে? সাগরাম্বরা অদ্রিশেখরা বসুন্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর, কোথাও সাগর, কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন। শিশুর আধ হাসি, যুবতীর রূপরাশি, যৌবনের উদ্বেলতা, বার্দ্ধক্যের গভীরতা, যুবার হৃদয়, রমণীর প্রণয়, কি চাও—এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও?

আবার দেখ—এই জগৎ কি ভয়ঙ্কর। জগতের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বাহিরিতেছে। অগ্নিজিহ্ব মার্ত্তণ্ড পলকে পলকে কত কত ক্ষুদ্রতর জগৎ গ্রাস করিয়া স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলকে অগ্নি নিকলিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে কত

প্রকাণ্ড জগৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয়গর্জ্জনে মহীধ্রশিখর কাঁপিতেছে, কোথাও অগ্নি লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুসুমে কীট, অমৃতে বিষ, জীবনে পাপ, মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাঞ্ছনা, স্থবিরের অপমান, দুর্ব্বলের রক্তপান। কে বলে পৃথিবী সুখময়ী?

এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ বৈচিত্র্য নূতন, কি পুরাতন? ইহার উদ্ভব কোথা হইতে? ইহার কি আদি আছে, ইহার কি অন্ত আছে? মনুষ্যের জ্ঞান কি নিজবিষয়ীভূত? এই পার্থক্যের আদি অন্ত কল্পনা করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে—হাঁ। মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইয়াও ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভুত কৌশলবলে আপাতত অসামান্য ও অসীম। ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ, বিচিত্র ও মহান্ মনুষ্যের জ্ঞান এখানে নিজ অধিকারমধ্যে অব্যাহতপ্রভাব, এখানে উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্ত্তবাদ ইহার উত্তর দিয়াছে। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নূতন বা ভ্রান্তিহীন না হইলেও মনুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক।

জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্ত্তবাদী দেখিলেন, মনুষ্য-জ্ঞানায়ত্ত কালের আরম্ভে, মনুষ্যজ্ঞানায়ত্ত সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভে দুই সত্তা অথবা দুই রূপধারী এক সত্তা বর্ত্তমান। এই দুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই দুই সত্তার পৃথক্‌রূপে, অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীত হইলেও প্রয়োজনানুরোধে উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্র তিনটি—

১। জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কার্য্যবিশেষের মূল দুই ; জড় ও শক্তি।

২। জড় ও শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

৩। জড় ও শক্তির সমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধিহীন।

জগতে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নাই। শক্তির প্রয়োগে জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পার, কঠিনকে তরল, তরলকে বাষ্পীয় আকারে পরিবর্ত্তন করিতে পার, কিন্তু জড় পদার্থের অণুমাত্র একেবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ, শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ জড় পদার্থের সংযোগে কখন তাপরূপে, কখন তড়িৎরূপে,

কখন গতিতে, কখন রাসায়নিক আকর্ষণে প্রকাশিত হইলেও তাহার সমষ্টি সর্ব্বদা সমান, কখনও কমিবার নয়।

শক্তি জড়কে চালাইতেছে। জড়ের প্রতি অংশ অপরাংশকে টানিতেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ষিতেছে। প্রতি অণুর সহিত প্রতি অণুর সংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ দূরে যাইতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে; এ উহাকে আঘাত করিতেছে, এ উহার আঘাতে দূরে পলাইতেছে। এই শক্তিপ্রয়োগে জড়ে জড়ে সংঘর্ষণ, অণুতে অণুতে বিঘট্টন; ইহারই নাম কার্য্য, ইহা হইতেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি। কতকগুলি অণু দল বাঁধিয়া একবেগে চলিল, আমরা দেখিলাম গতি। কতকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে ইতস্তত নড়িতেছে, আমাদের ত্বকের স্নায়ুতে আঘাত করিল; আমরা বলিলাম—তাপ। আবার সেই আণবিক গতি ব্যোমে লাগিয়া, ব্যোম কর্ত্তৃক তরঙ্গায়িত ও চালিত হইয়া চাক্ষুষ স্নায়ুতে আঘাত করিল, আমরা বলিলাম—আলোক।

বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন, সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া জড় পরমাণু সর্ব্বত্র সমভাবে বাষ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল। এই বিশ্বব্যাপী পরমাণুরাশির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাক্ষত্রিক জগতের সৃষ্টি; সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে সৌর জগতের উৎপত্তি, সূর্য্য হইতে গ্রহের সৃষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। সেই একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, সূর্য্যমণ্ডল সৌর জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া পার্শ্বস্থ গ্রহদিগকে আকৃষ্ট ও জীবিত রাখিয়াছে; সেই নিয়মেই ভূমণ্ডল সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোটি কোটি বর্ষান্তে বাষ্পময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তরল হইয়াছে; আবার কত কাল পরে ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়াছে; কেন্দ্রস্থ তরল দ্রব্যের আকুঞ্চনে পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বত ও গহ্বরের সৃষ্টি; তাপক্ষয়ে ধরাপৃষ্ঠে জলের সঞ্চার ও সমুদ্র নদীর আবির্ভাব। তৎপরে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই একই নিয়মবলে জীবের উৎপত্তি। আবার সেই অবয়ব-রহিত প্রাথমিক জীব পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উন্নতির পর উন্নতি, তার পর উন্নতি, এইরূপে এই অদ্ভুতের অদ্ভুত মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। মানুষে সমাজ

বাঁধিয়াছে, গ্রাম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিয়াছে, রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়া-প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়া জগদীশ্বরের মহিমা গাইয়াছে। আবার কত বৎসর পরে এই মানুষ হইতে আবার কি জীবের উদ্ভব হইবে। আবার কত যুগান্তরে ভূমণ্ডল উন্নতির পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরন্তন নিয়মবশে হয় ত অবনতির আরম্ভ হইবে। ভূমণ্ডল আবার বিশ্বব্যাপী ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে বা জোয়ার ভাঁটার অবিরাম পরিচালিত জলরাশির বিঘট্টনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ হইয়া ক্রমশ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, তাহারই দেহে বিলীন হইয়া, পুনরপি বাষ্পময় হইয়া যাইবে। এইরূপ দশা বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল গ্রহেরই ভাগ্যে ঘটিবে; এবং সর্ব্বগ্রাসী সূর্যামণ্ডল বহিঃস্থ অপরাপর বাষ্পাভূত নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে যেমন ছিল, তেমনই আবার সবই হইবে। আবার হয় ত সৃষ্টি, আবার হয় ত লয়, এই অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব রহস্যের ইয়ত্তা করিবে কে?

জগতের কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে হইলে এই দুইটি পদার্থ চাই—জড় ও শক্তি। ধরিয়া লও, জড়পদার্থ আছে—সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন অণুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে ব্যাপিয়া আছে; ধরিয়া লও, শক্তি তাহার উপর কাজ করিল; উৎপন্ন হইল গতি বা পরিবর্ত্তন। কালে দেখিবে—সূর্য্যচন্দ্র-শোভিত, মানুষ-কীটাধ্যুষিত, অনন্ত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, শাদা কাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ; মেঘ বর্ষিবে, বায়ু গর্জ্জিবে, ফুল ফুটিবে, চাঁদ উঠিবে, যুবা হাসিবে, শিশু কাঁদিবে। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের নিয়ম এক—অখণ্ড ও অদ্বিতীয়।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে—কে জানে, কবে সৃষ্টির আরম্ভ—জড়ের উপর শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে; অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত প্রবাহে অনন্ত তরঙ্গে সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এই মহাতরঙ্গের মহাকল্লোলে সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে কোন্ দিক্ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। দিগন্তব্যাপী মহাকালের মহাকায় পূর্ণ করিয়া অচল অজর, অনাদি অনন্ত, সীমাহীন জড়ের মহামূর্ত্তি বিরাজমান; তদুপরি, মহেশ্বরের মহামহিমাময় জড়মূর্ত্তির উপরি, অনন্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণভূতা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টির প্রসবিনী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী

জগৎপ্রলয়কারিণী, বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তি ক্রীড়মানা। মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত করিয়া, বাক্যাতীত, মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাবে ভৈরব ভাবে ক্রীড়মানা—মহাশক্তি। ভৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া। অনন্তের গর্ভে মহাবেগে উছলিতেছে মহাতরঙ্গ—অতীতের অন্ধকারময় ভীম গর্ভে বজ্রনির্ঘোষে দিগন্ত আপূরিত করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, জড়ের সহিত ক্রীড়মানা—শক্তি; মহেশ্বরের সহিত ক্রীড়মানা মহেশ্বরী। ভীম নৃত্যে উন্মাদিতা মহাকালী। আদি নাই, অন্ত নাই, সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; অনন্তের গর্ভ দিয়া অনন্ত কল্লোলে ছুটিয়াছে; কে জানে কবে শেষ হইবে? কত কোটি সৌর জগৎ পলকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যাইতেছে; বিকট স্রোতের বিকট আবর্ত্তে, বিশ্বসৃষ্টির ঘূর্ণচক্রে তখনই ডুবিতেছে, ভীমাবর্ত্তে পড়িয়া কতই বা ছুটাছুটি করিতেছে—কে জানে ইহার শেষ কি, কে জানে ইহার আরম্ভ কোথায়?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ শরীর জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত অনাদি মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল,—

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুবাকাশমেব চ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চ————॥

এই অষ্ট মূর্ত্তিতে, সংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবেন্দ্রিয় প্রকাশমান সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বতঃ স্থায়ী, জড়রূপী, শবরূপী মহাদেবের মহাকায়—সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামূর্ত্তি;—সেই মহাশরীরের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, উন্মত্তভাবে ক্রীড়মানা, অবিরাম মহাসংগ্রামে উন্মত্তা, মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী মহাশক্তি—ভীমভাবে ভীম সমরে নিরতা।

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিশালখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতা।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননা।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চী হসন্মুখী।

দক্ষিণ-কালিকার ভীমা মূর্ত্তি, ঈশানের বক্ষোপরি বিকট বেশে সমারূঢ়া; দেবাসুরের ভীম সমরে অসুরনাশার্থ নৃত্যন্তী মহাকালী।

এই সৃষ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব—মানব, তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র। বিশ্বমণ্ডলের সর্ব্বত্র—নাক্ষত্রিক জগতে, সৌর জগতে, সূর্য্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর পতনে, সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোষ্ট্রনিক্ষেপে, ভূগর্ভোত্থ ধাতুপদার্থের উৎক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের অধঃপতনে—সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশমান—একই নিয়মে জাত, একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সৃষ্টি, অথবা জগৎই সেই অবিচ্ছেদোদ্ভবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পরা মাত্র।

পুরাণকল্পিত কালিকামূর্ত্তিতে আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু পূর্ব্বপুরুষগণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

জড় পদার্থকে মহাদেবের মহাশরীর বলিলাম, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। ধর্ম্মযাজকেরা জড়কে হেয় করুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ঈশ্বরে যাঁহার ভক্তি আছে, ঈশ্বরে যাঁহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাপী অনন্ত বিশ্বের কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবন্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়া ভীতিভরে নমস্কার করিবেন।

অনাদি সেই জড়—দার্শনিক যাহার তত্ত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার পূজা করেন, কবি যাহার গুণগান করেন,—ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত, বিশ্বের আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশ কোটি দেবতা যাহার অংশমাত্র, সেই সর্ব্বলোকপূজিত

অশেষজগতাং শেষঃ শেষো হি পরিকীর্ত্তিতঃ।
শেষকালে ধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঃ॥

যাহার মহাশরীরে

মহাপ্রলয়সম্ভূতং চিতাভস্ম চ দৃশ্যতে।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকো গণঃ।
ততোঽসৌ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ।
পাদৌ যস্য তু পাতালং কটির্ভূঃ দ্যৌঃ শিরস্তথা।
দিশো বাসাংসি যস্যাসন্ দিগ্বাসাস্তেন স স্মৃতঃ॥

সেই মহাপুরুষকে

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরম্।

কবি ও দার্শনিক যে মূর্ত্তিতেই কল্পনা করুন ও যে ভাবেই দেখুন, আমি সেই মহাপুরুষকে ভীতচিত্তে প্রণাম করি।

শিবের সহধর্ম্মিণী সহচারিণী শক্তি, যার বলে এই মহাচক্র চলিতেছে, জলে স্থলে, সূর্য্যে চন্দ্রে, আকাশে পাতালে, মনুষ্যহৃদয়ে, সমাজশরীরে, সর্ব্বত্র প্রকাশমানা শক্তি—জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত, পৃথিবীর গতিতে, সূর্য্যের তাপে, মেঘে বিদ্যুতে, চাঁদের আলোকে, ইংরেজের বিপুল বিভবে, ফরাসীর রাজ্যবিপ্লবে, সর্ব্বত্র প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জের সমষ্টিরূপা শক্তি—

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহাতেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজঃ তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

নদীতে পর্ব্বতে, পবনে বরুণে, সূর্য্যে সোমে, সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশমানা শক্তি—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ॥

প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস্ হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্‌সার প্রভৃতি পুরুষপ্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক, যে শক্তির বিদ্যমানতায় স্বয়ং শিবের বিদ্যমানতা, তান্ত্রিকের সূক্ষ্ম দর্শনে যে মহাশক্তি

মহাদেবের সঙ্গিনী হইয়াও জননী, সেই জগৎপ্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব ?

এখন দেখিলাম, বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য, যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানবমনের বিকাশে, সমাজ-শরীরের বিবর্ত্তনে, যেখানে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই গতি এবং সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুৎপন্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে,—পূর্ব্ব যদি কখন সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে—ঐশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উদ্ভব হয় এবং কালক্রমে জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিবর্ত্তবাদ আর কিছুই নয়, পুরাকালের কালিকামূর্ত্তিও আর কিছুই নয়,—উভয়ই এই গভীর তত্ত্বের বিকাশ মাত্র।

এই সৃষ্ট জগতে দেবাসুরে এক মহাসংগ্রাম চলিতেছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে চলিতেছে ; যে দিন এই সংগ্রাম থামিবে, সেই দিন আবার জগতে সমস্ত বৈচিত্র্য লোপ হইবে, সমস্ত জগৎ আবার একাকার হইয়া যাইবে, আবার সর্ব্বত্র একাকার হইবে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য যত দিন, দেবাসুরের এই সংগ্রাম তত দিন। এই দেবাসুরের মহাসমর, সুরের সহিত অসুরের, ভালোর সহিত মন্দের, কল্যাণের সহিত অকল্যাণের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের চিরন্তন এই মহাসমর—অসুরমজ্‌দের সহিত আহ্রিমানের, শেমাইতের অমার্জ্জিত কল্পনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের মহাসমর। এই মহাসমরের বৈজ্ঞানিক নাম জীবনযুদ্ধ ; এই যুদ্ধের পরিণাম—সুরের জয়, অসুরের পরাজয়, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয়, শয়তানের পরাজয়।

এই দেবাসুর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্তির নির্ম্মম খড়্গে অসুরের নিপাত। যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়া জগতের কল্যাণসাধন ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। সেই শক্তিচালিত নির্ব্বাচনে জগতের এই অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন, সৃষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের উদ্ভব ও মানবহৃদয়ের উন্নতি।

এই মহাসমরে দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অসুরের ক্ষয়ে, সুরের জয়ে সহায়ীভূতা কে ?—না, চিন্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের আরাধ্যা, সাধকের উপাস্যা, জগন্নিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস

ভাই, আমরা সামান্য মানব, সেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-প্রীতি-ভীতি-পূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হই।

দেবি বিপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

('নবজীবন', অগ্রহায়ণ ১২৯১)

বিবৰ্ত্তন

জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই তিনটি করিয়া অবস্থা। যে অবস্থাকেই আমরা কোন পদার্থের বর্ত্তমান অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লই না কেন, সেই অবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বে উহার অন্য একটি অবস্থা ছিল; আর, অবস্থিতি কালের পরেও আবার অপর একটি অবস্থা ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভাবে, অন্য আকারে অবস্থিত ছিল; আবার, স্থিতিকাল নানা ভাবে কাটাইয়া, পরে প্রত্যেক বস্তুই অবস্থান্তর পরিগ্রহ করে। পদার্থের অবস্থার এই ত্রিকালব্যাপী বিবরণের নাম বিবৰ্ত্তন। প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় এই বিবৰ্ত্তন আনুপূর্ব্বিক সর্ব্বতোভাবে জানিতে হয়;— অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর ভাব ধারণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া, ইন্দ্রিয়গোচর ভাব পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত, পদার্থের যে যে রূপভেদ হয়, পদার্থের ইতিহাসে পর্য্যায়ক্রমে সে সমস্তই জানিবার বিষয়। এই বিবৰ্ত্তন-জ্ঞানই পদার্থতত্ত্বের চরম জ্ঞান। আংশিকরূপে এ জ্ঞান সকলেরই কিছু না কিছু আছে; বিজ্ঞান কেবল পরিধি বাড়াইয়াছে মাত্র। কতকগুলি পদার্থের কতকগুলি অবস্থার ইতিহাস সকলেই জানেন; বিজ্ঞান, জগতের সমস্ত

পদার্থের সমগ্র ইতিহাস জানাইতে ব্যগ্র। সকলেই জানেন যে, মানবের ইতিহাস, ক্রমান্বয়ে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু; বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, শৈশবের পূর্ব্বেও একটা জরায়ু-বাসাবস্থা আছে, আর মৃত্যুর পরেও শরীরের একটা ধ্বংসাবস্থা আছে। জরায়ুমধ্যে শুক্র ও বীজের সংযোগে সূক্ষ্মতম মানবাণুর সৃষ্টি হইল। একটি মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ এইখান হইতে। আর, মৃত্যুর পর যখন দেহ-ধ্বংস হইতে লাগিল, যখন সংশ্লিষ্ট পরমাণুসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া দেহ-ভাগের লোপ হইয়া গেল, তথায় সেই মনুষ্যদেহের ইতিহাসের শেষ। শুধু মানুষ বলিয়া নহে, জগতের প্রত্যেক পদার্থের,—অগণ্য নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম বালুকাকণা পর্য্যন্ত,—জীবোত্তম মানব হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটি লতা কীট পর্য্যন্ত,—এই বিশাল ক্ষেত্রান্তর্গত সমস্ত জড় পদার্থেরই যে একটি একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান সে সকলেরই অনুশীলন করিতেছে। ইহাই বিবর্ত্তন।

এখন সহজেই বুঝা যায় যে, দুইটি প্রধান ঘটনা লইয়াই বিবর্ত্তন;—একটি বিকাশ, আর একটি বিনাশ। যত কাল কোন একটি পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর ভাবে থাকে, তত কালের মধ্যে উহার যে সকল অবস্থা-পরম্পরা ঘটে, তাহাতে দুইটি সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়;—একটি বিকাশাবস্থা, আর একটি বিনাশাবস্থা। সঞ্চার-সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পদার্থের বিকাশাবস্থা, আর পূর্ণতা প্রাপ্তির পর হইতে বিচ্ছেদ, বিলয়বিঘটন পর্য্যন্ত বিনাশাবস্থা। নব সঞ্চারিত ভ্রূণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ-যৌবন-বিভাসিত সুঠাম গঠন পর্য্যন্ত মানবের বিকাশাবস্থা; আর পূর্ণ যৌবন হইতে আরম্ভ করিয়া বিচ্ছিন্ন—গলিত—দেহভাগজাত বাষ্পাকার পর্য্যন্ত মানবদেহের বিনাশাবস্থা। যেমন মানবের, সকল পদার্থের বিবর্ত্তনেই তেমনই দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়,—বিকাশ, আর বিনাশ। এ স্থলে আরও একটু বুঝিতে হইবে। অবিমিশ্র বিকাশ বা অবিমিশ্র বিনাশ জগতে কোথাও ঘটে না। কোন একটি পদার্থের ক্রমাগত কিছু কাল বিকাশ হইতে থাকিল, তখন তাহাতে বিনাশের সংস্পর্শ মাত্র নাই; তার পর আর কিছু কাল ক্রমাগত বিনাশ চলিতে লাগিল, তখন তাহাতে বিকাশের

লেশ মাত্র নাই; এরূপ ঘটনা অসম্ভব। বিবর্ত্তনে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিকাশ ও বিনাশ জড়িতভাবে চলিতেছে। পদার্থের ইতিহাসে এমন এক সময়ও নাই, যখন বলিতে পারা যায় যে, এখন ইহার বিশুদ্ধ বিকাশ হইতেছে বা অমিশ্র বিনাশ চলিতেছে। পদার্থের সকল সময়ের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ, দুই বিরাজমান। তবে, যখন বিনাশাপেক্ষা বিকাশের পরিমাণ বেশী, তখনই সমগ্র পদার্থটির বিকাশাবস্থা বলা যায়; আর যখন বিকাশাপেক্ষা বিনাশের পরিমাণ বেশী, তখনই তাহার বিনাশাবস্থা। বিকাশ যেমন, বিনাশও তেমনই, দুই সমভাবে চলিয়াছে, পদার্থটি ন-বিকাশ ন-বিনাশ ভাবে রহিয়াছে, এরূপ স্থিরাবস্থা পদার্থের কখনও ঘটে না। এক সময়ে বিকাশের জয়, বিনাশের পরাজয়; আবার তাহার পরেই বিনাশের জয়, বিকাশের পরাজয়; যত দিন বিকাশ বিনাশের জয় পরাজয়, পর পর এইরূপ ভাবে চলিতে থাকে, তত দিন স্থুল দৃষ্টিতে আমরা পদার্থের স্থিরাবস্থা দেখি। বস্তুত উহা স্থিরাবস্থা নহে,—উহা জয়-পরাজয়ের চক্রপরিবর্ত্তন মাত্র। ইহাই পদার্থের যৌবন। যখন অল্প স্বল্প বিনাশ সত্ত্বেও পদার্থটি বিকাশোন্মুখ, তখন বিকাশ-প্রবল বাল্য; যখন বিকাশ ও বিনাশ, দুই প্রবল,—কখনও একের জয়, কখনও অন্যের জয়, তখন পদার্থের মধ্যকাল বা যৌবন; আর যখন বিনাশই প্রবল, বিনাশের মুখে বিকাশ "থই" পাইতেছে না, ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই বিনাশোন্মুখ বার্দ্ধক্য। বিবর্ত্তনে পদার্থের এই তিনটি অবস্থা,—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। ফলে মূল কথা ঐ বিকাশ ও বিনাশ লইয়া; সুতরাং বিকাশ কি, বিনাশই বা কি; কিসে পদার্থের বিকাশ হয়, কিসেই বা বিনাশ ঘটে, এখন ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

পদার্থ মাত্রই পরমাণুসমষ্টি*। ক্ষুদ্রতম পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পদার্থ-আকার ধারণ করে। সুতরাং আকর্ষণভেদে পদার্থের রূপভেদ হয়। কঠিন পদার্থের পরমাণুদিগের পরস্পর যেরূপ

* পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু নামে অভিহিত হইল; অর্থাৎ পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশটুকুকে তাহার পদার্থত্ব বজায় রাখিয়া আর ভাগ করা যায় না, সেই কাল্পনিক বিন্দুবৎ পদার্থাংশকেই পরমাণু বলা গেল।

আকর্ষণ, তরল পদার্থের পারমাণবিক আকর্ষণ ততটা নহে; আবার বাষ্পীয় পদার্থের আরও কম। তাই কঠিনের পরমাণুদিগের মিলন যত দৃঢ়, তরলের তত নহে; বাষ্পীয় পদার্থের পরমাণুসকল ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিলেই বাঁচে। তাই কঠিন পদার্থ নিজের নির্দ্দিষ্ট আয়তন-পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট; বিশেষ চাপ কিম্বা বিশেষ তাপ না দিলে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিলে, সহজে উহার ব্যাপকতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তরলের ব্যাপকতা সহজেই বাড়ে। আর, বাষ্প ত ব্যাপকতার জন্য আকুল বলিলেই হয়; যতটুকু বাষ্প যতখানি স্থানেই ছাড়িয়া দেও না কেন, তৎক্ষণাৎ উহা সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া বসিবে; বাষ্পের পারমাণবিক আকর্ষণ এতই কম, উহার পরমাণু-সকল এতই বিচ্ছেদোন্মুখ। অবশ্য, এই আকর্ষণ—পদার্থের আভ্যন্তরীণ পরমাণুদিগের পরস্পরের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এক পদার্থের সহিত বা উহার পরমাণুর সহিত অন্য পদার্থের কিম্বা অন্য পদার্থের পরমাণুর যে আকর্ষণ, সে স্বতন্ত্র কথা। এখানে কেবল পদার্থের গঠনগত পরমাণু-সমাবেশের কথাই হইতেছে। পদার্থের এই ব্যাপকতার কারণ কি? কেনই বা চাপের পীড়নে, তাপের তাড়নে উহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়? কথাটি ভাল করিয়া বুঝা চাহি। পদার্থের পরমাণুগুলি কখনও স্থির নিস্পন্দ ভাবে থাকে না; নিরন্তর তাহাদের স্পন্দন হইতেছে। পদার্থসকলের বাহ্যিক স্থিরভাব আমরা নিয়ত দেখিতেছি। নিরন্তর স্পন্দন কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা যে বাহ্যিক স্থিরভাব দেখি, তাহা পরমাণুসমষ্টির। কিন্তু এক একটি পরমাণুর অবস্থা অন্যরূপ; তাহা চক্ষুরতীত একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বেগে এই আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক স্পন্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কঠিনে এই স্পন্দন যত, তরলে তদপেক্ষা বেশী, আবার বাষ্পে তাহার অপেক্ষাও বেশী। অর্থাৎ বাষ্পের পরমাণু-সকলের স্পন্দন সুদূরব্যাপী। পদার্থগত তেজই এই স্পন্দনের কারণ। সুতরাং তেজের সংযোগে ঐ স্পন্দন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার তেজের বিয়োগে স্পন্দনেরও বেগ হ্রাস হয়। এই স্পন্দনেই পদার্থের ব্যাপকতা। বিজ্ঞানের চক্ষে পদার্থের গঠন-রহস্য কি চমৎকার! কঠিনতম শিলাখণ্ড হইতে অদৃশ্য বাষ্প পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত পদার্থই যেন এক একটি আবর্ত্ত।

সকল পদার্থেই নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ পরমাণুসকল নির্দ্দিষ্ট বেগে নাচিতেছে, সকলই চাঞ্চল্যময়। এই চাঞ্চল্যেই, এই স্পন্দনেই পদার্থে তারল্য কাঠিন্য ভেদ, পদার্থের ব্যাপকতা।

পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আর একটি কথা এইখানেই বলা ভাল। পূর্ব্বে যাহা বলা গেল, তাহা কেবল পদার্থের কাঠিন্য ও অবস্থাভেদ সম্বন্ধে। তদ্ভিন্ন পদার্থের এক একটা প্রকৃতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। পদার্থনিচয়ের মধ্যে যেমন কাঠিন্য ভেদ ও অবস্থাগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই প্রকারগত বৈষম্যও দেখা যায়। পরমাণুগণের পরস্পর সমাবেশের বিভিন্নতাই পদার্থের এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের কারণ। পদার্থের কাঠিন্য ও অবস্থা যেমন পরমাণুগণের স্পন্দনের উপর নির্ভর করে, পদার্থের প্রকৃতি তেমনই পরমাণুগণের সমাবেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ক-ক-খ-খ, এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ এক প্রকৃতির, ক-খ-ক-খ, এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ আর এক প্রকৃতির; আবার ক-খ-খ-ক, এইরূপ সমাবেশের মিশ্র পদার্থ ঐ দুই হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। কি মিশ্র, কি অমিশ্র, সকল পদার্থেই পরমাণুগণের নানারূপ সমাবেশ হইতে পারে। আর সমাবেশের ঐরূপ ভেদেই পদার্থের প্রকৃতিগত বৈষম্য হয়। আবার, আর এক প্রকারেও পদার্থের প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পরমাণুগণের পরস্পর সান্নিধ্যের তারতম্যেই এই বৈষম্য। এক পদার্থেই কোন কারণবিশেষে, এক অংশের পরমাণুগণ যেরূপ সন্নিহিত, হয় ত অপরাংশের পরমাণুগণ সেরূপ সন্নিহিত নহে। ইহাতেও পদার্থটির একরূপ প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটে। এ বৈষম্য এক পদার্থেরই এক অংশের সহিত আর এক অংশের। বায়ুর কিম্বা জলের নিম্ন স্তর যেরূপ ঘন সন্নিহিত, উচ্চ স্তর সেরূপ নহে; একটি লৌহদণ্ডের এক দিকে তাপ সংযোগ ও অন্য দিক্ হইতে তাপ সংহরণ করিলে, দুই দিকের তাপের তারতম্যবশতঃ পরমাণুসমাবেশেরও তারতম্য ঘটে। এইরূপ সান্নিধ্যসম্বন্ধীয় তারতম্যই পদার্থে প্রকৃতিগত আর একরূপ বৈষম্য ঘটায়। প্রথমোক্ত প্রকারের সমাবেশকে আমরা মিশ্র সমাবেশ ও অমিশ্র সমাবেশ, আর শেষোক্ত প্রকারের সমাবেশকে সম সমাবেশ ও বিষম সমাবেশ বলিতে পারি। পরমাণু-সমাবেশ যতই মিশ্র বা বিষম ভাব ধারণ করে, ততই পরমাণুসমষ্টি অধিকতর গতিসম্পন্ন হয়; সুতরাং

সামান্য তেজসংস্পর্শে পরমাণুসকলে গতি বৃদ্ধি হইয়া পরস্পর হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার ততই অধিকতর সম্ভাবনা; সামান্য কারণেই একরূপ সমাবেশ ঘুচিয়া আর একরূপ সমাবেশ ঘটিয়া পড়ে। মিশ্র সমাবেশ বা বিষম সমাবেশ পদার্থকে এইরূপ পরিবর্ত্তনপ্রবণ করিয়া রাখে। পরমাণুসমষ্টির এই জটিলগঠন ও কুটিল গতি রহস্য' কত দূর পরিস্ফুট হইল, বলিতে পারি না। সংক্ষেপেই সারিতে হইল। বিস্তারিত-রূপে উদাহৃত করিয়া এ কথা বলিতে গেলে, এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠে। আর, তাহার প্রয়োজনও নাই। বিবর্ত্তন বুঝিতে যতটুকুর প্রয়োজন, সংক্ষেপে ততটুকুই বলা গিয়াছে। ক্রমে এ কথা আরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এখন ধরা যাউক, বিকাশ কি, বিনাশই বা কি,—কিসে পদার্থের বিকাশ হয়, কিসেই বা বিনাশ ঘটে।

যখন পরমাণুর অবস্থান ও গতি লইয়াই পদার্থ, তখন পদার্থে যে রূপপরিবর্ত্তন ও যে গুণপরিবর্ত্তনই হউক না কেন, পরমাণুর অবস্থান ও গতির পরিবর্ত্তনেই তাহা সংঘটিত হইবে বৈ কি। আর যখন রূপ-পরিবর্ত্তন ও গুণপরিবর্ত্তন লইয়াই পদার্থের বিবর্ত্তন, তখন পরমাণুর অবস্থানের ও গতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলেই বিবর্ত্তনের মূল তত্ত্ব জানা হইল। সুতরাং শেষ কথা দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—পরমাণুর অবস্থানের ও গতির পরিবর্ত্তন লইয়াই বিবর্ত্তন। এখন, সে পরিবর্ত্তন কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়-অগোচর অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থায় আসিবার সময়, বিচ্ছিন্ন সুদূরগতিসম্পন্ন পরমাণুনিচয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও কেন্দ্রাভিসারী হইয়া আইসে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গতিরও হ্রাস হয়। পরমাণু-সমষ্টির এই সমাহারেই, এই গতিহ্রাসেই পদার্থের বিকাশ। আর, উহার বিপরীতেই বিনাশ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থা হইতে পুনরায় অতীন্দ্রিয় ভাব ধারণ করিতে,—ঘনিষ্ঠ, হ্রস্বগতি পরমাণুকুলের ঘনিষ্ঠতা ঘুচিয়া যায়, গতিও বাড়ে;—পরমাণুর আবার সেই কেন্দ্রাপসারিণী বিচ্ছিন্নতা, আবার সেই দূরব্যাপিনী দীর্ঘ গতি সংঘটিত হয়। ইহাতেই পদার্থের বিনাশ। **বিকাশের পারমাণবিক ঘটনা,—ঘনিষ্ঠতা ও গতিহ্রাস;—আর, বিনাশের পারমাণবিক ঘটনা,—বিচ্ছিন্নতা ও গতিবৃদ্ধি।**

পদার্থের যে অবস্থাই হউক না কেন, ঐ বিস্তৃত নিয়মের সীমামধ্যে পড়িতেই হইবে। হয় উহার পরমাণুসকল ঘনিষ্ঠ হইতেছে এবং উহাদের গতি কমিতেছে, নয় উহার ঘনিষ্ঠ পরমাণুসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, আর তাহাদের সঙ্কীর্ণ গতি ঘুচিয়া আবার গতিবৃদ্ধি হইতেছে। যে অবস্থাতেই দেখ না কেন, হয় দেখিবে—বিকাশ চলিতেছে, নয় বিনাশ ঘটিতেছে। না বিকাশ, না বিনাশ, পদার্থের এরূপ স্থিরভাব একেবারে অসম্ভব। বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর পরিবর্ত্তন আমরা সচরাচর গ্রাহ্য করি না; বস্তুত তখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। সে পরিবর্ত্তন—হয় বিকাশের দিকে, নয় বিনাশের দিকে। যে পদার্থের দিকেই তাকাই না কেন, হয় তাহার পরমাণু বৃদ্ধি হইতেছে, ঘনিষ্ঠতা হইতেছে—নয় পরমাণুর হ্রাস হইতেছে ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িতেছে। তাপ একটি জগদ্‌ব্যাপী তরঙ্গ। সে তরঙ্গে সমস্ত পদার্থের সমস্ত পরমাণুই নিরন্তর তরঙ্গায়িত হইতেছে। সুতরাং তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে পদার্থান্তর্গত পরমাণুর গতিরও তদনুযায়ী হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাপ হ্রাসে পরমাণুসকল ঘনিষ্ঠ হয়, তাপের বৃদ্ধিতে পরমাণুসকল দূরপ্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু পদার্থে এই তাপ-তরঙ্গ কখনই সমভাবে থাকে না; হয় তাপ বাড়িতেছে, নয় কমিতেছে, এবং তৎফলে তাহার পরমাণুনিচয় হয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, না হয় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাই বলা গেল যে, পদার্থের যে অবস্থাই লওয়া যাউক না কেন, উহা ঐ মূল সূত্রে আবদ্ধ।

মূল সূত্র ত পাওয়া গেল। এখন ঐ সূত্র ধরিয়া পদার্থের একটু বিশেষ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। জাগতিক সমস্ত পদার্থই যে ঐ মূল সূত্রে আবদ্ধ, সমস্ত পদার্থেই যে ঐ নিয়ম বিরাজমান, ইহা স্পষ্টত দেখা কর্ত্তব্য। বিবর্ত্তন বুঝিতে গিয়া সার কথাগুলি সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে; বেশী উদাহরণ দিয়া বিশেষরূপে দেখা হয় নাই। বিস্তৃত কথার মূল তত্ত্ব জানিতে গেলে প্রথমে সংক্ষেপেই জানিতে হয়, বেশী উদাহরণ চলে না। এখন আমরা এক একটি ভাগ একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিব। ক্রমে পূর্ব্বের অনেক কথা পরিস্ফুট হইয়াও আসিবে। বিকাশ ও বিনাশ, বিবর্ত্তনের এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ এক একটি করিয়া লওয়া যাইবে।

('নবজীবন,' শ্রাবণ ১২৯২)

মহাতরঙ্গ

এই জগৎ এক মহাতরঙ্গ। তুমি আমি কি তাহার বুদ্বুদের মধ্যেও গণ্য নহি?

ঐ যে সান্ধ্য প্রদোষে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া প্রকৃতির অঙ্গে রজতকিরণ ঢালিয়া দিতেছে; সান্ধ্য সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কুসুম-রেণু বহন করিয়া তাপিত প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে; অদূরে কলনাদিনী তরঙ্গিণী কুল কুল রবে বহিয়া, প্রশস্ত হৃদয়ে চন্দ্রকান্তি ধারণ করিয়া, স্বর্ণতরঙ্গের লহরীর সহিত তোমার চিন্তাকুল মানসসরসে অবিচ্ছিন্ন ঊর্ম্মিমালা তুলিতেছে; প্রকৃতির এই অনুপম লাবণ্যবিকাশ, সৌন্দর্য্যের এই অলৌকিক স্ফুরণ, বল দেখি—ইহা আসিল কোথা হইতে? ইহার উদ্ভব কোথায়? ইহার লয় কোথায়? বিজ্ঞান বলিবে—ইহা এক বিশাল সৌন্দর্য্যসাগরের ক্ষণবর্ত্তী তরঙ্গ মাত্র; পূর্ব্ববর্ত্তী ঊর্ম্মিতে ইহার জন্ম, পরবর্ত্তী ঊর্ম্মিতে ইহার নাশ। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক।

জগতের তাবৎ বস্তুই গতিশীল। ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে মহাকায় সৌরমণ্ডল মহাবেগে অসীম আকাশপথে ধাবমান। জড়রূপী মহাদেবের বিরাট্ শরীরের উপর মহাশক্তির যে বিকট নৃত্য চলিতেছে, সেই বিকট নৃত্যের ফল এই গতিক্রিয়া—সৃষ্টির এই বিচিত্র লীলা, জগতের এই জীবন। কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগদ্‌যন্ত্র কি অনিয়ন্ত্রিত? এই বিশাল গতিক্রিয়ার কি কোন নিয়ম নাই? বিজ্ঞান বলিবে—আছে। দেখা যাউক, সে নিয়ম কি।

মহামতি নিউটনের নামে প্রচলিত গতির প্রথম নিয়মানুসারে কোন জড়পিণ্ড একবার চালিত হইলে, যদি তাহার গতি অপর শক্তিকর্ত্তৃক প্রতিহত না হয়, তবে চিরকালই সমান বেগে একই দিকে চলিতে থাকিবে। যেখানে দেখিবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেইখানেই বুঝিবে, কোন এক বহিঃস্থ শক্তির বলে এই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। পথের উপর এই মৃৎপিণ্ড গড়াইয়া দাও, একটু পরেই ইহা স্থির হইল। তুমি যে গতি ইহাতে প্রয়োগ করিয়াছিলে, তাহার সমস্তই পথের ঘর্ষণজনিত প্রতিক্রিয়ায় পিণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার সেই পিণ্ডটি লইয়া শূন্যপথে নিক্ষেপ কর, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহা বক্রপথে ভূতলে পতিত হইল।

এখানে পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার সরল গতির ব্যত্যয় ঘটাইল এবং তাহার গতির কিয়দংশ বায়ুরাশিতে সংক্রামিত ও অপরাংশ পতনস্থলের তাপ-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইল। বস্তুত সর্ব্বত্রই কোন পদার্থে শক্তি প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সমান বেগে একই মুখে ধাবিত হইবে এবং যদি বহিঃস্থ কোন শক্তি তাহার প্রতিকূলে না দাঁড়ায়, তবে চিরকালই সেই একই বেগে ও একই মুখে চলিতে থাকিবে। কিন্তু শক্তির ক্রীড়াভূমি এই জগতে এই নিয়ম অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা কোথায়? শক্তি যেখানে সর্ব্বব্যাপিনী, প্রত্যেক পরমাণু যেখানে এক এক স্বতন্ত্র শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, centre of force, সেখানে এইরূপ অব্যাহত গতি প্রদর্শনের স্থল কোথায়? যেখানে প্রত্যেক পরমাণু atom, প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রত্যেক অণুর সহিত প্রত্যেক অণুর Molecule সংঘর্ষণ হইতেছে।* যেখানে কোন পরমাণু অপর পরমাণুকে আঘাত না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না, সেখানে এই অপ্রতিহত বেগে ধাবিত জড় পদার্থ দেখিতে পাইব কিরূপে? তবে সেরূপ স্থলে গতির নিয়ম হইবে কিরূপ?

একটি সামান্য উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। মনে কর, দুইটি গোলক পরস্পর আকর্ষণ করিতেছে। অন্য কোথাও কোন শক্তি বা জড় নাই। মনে কর, একটি গোলককে নির্দ্দিষ্ট বেগে নির্দ্দিষ্ট মুখে চালান গেল। কিন্তু অপর বর্ত্তুলটি তাহাকে অবিরত নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এইরূপ চলিতে চলিতে ধাবমান বর্ত্তুলের বেগ ক্রমশই কমিতে থাকিবে এবং তাহার পথও ঠিক সরল রেখা না হইয়া ক্রমশ স্থির বর্ত্তুলটির দিকে বক্রীভূত হইবে। এইরূপে তাহার পূর্ব্বতন বেগ কমিতে কমিতে একবারে লোপ পাইলে বর্ত্তুলটি ক্ষণমাত্র স্থির থাকিবে ও পরক্ষণেই অপর বর্ত্তুলের আকর্ষণে ক্রমশ বর্ত্তমান বেগে বিপরীত দিকে ধাবমান হইবে। মনে কর, এইরূপে তাহা আবার আকর্ষক বর্ত্তুলের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন তাহা নিশ্চল হইবে?—না। আকর্ষণী শক্তিবলে ইহা এত বেগ পাইয়াছে যে, আর সে স্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়া, সেই বেগেরই প্রভাবে সেই আকর্ষণ-শক্তির বিরুদ্ধে আকর্ষণ-গোলকের পার্শ্বস্থল অতিক্রম করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিবে। আবার সেই চিরন্তন নিয়মবশে সেই বেগ কমিয়া গেলে

* According to the kinetic theory of gases.

আবার বিপরীত মুখে গতি আরম্ভ, আবার সেই আকর্ষকের পার্শ্বদেশ প্রাপ্তি, আবার বর্দ্ধিতবেগে সেই স্থল অতিক্রম করিয়া গমন, এইরূপে সেই বর্ত্তুলকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার চারি দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। একবার নিকটে আসিবে, একবার দূরে যাইবে, আবার বর্ত্তমান বেগে নিকটে আসিবে, আবার হ্রাসমান বেগে দূরে যাইবে, এইরূপ একবার দূরে, একবার সমীপে, একবার ঊর্দ্ধে, একবার নীচে, এই তরঙ্গভঙ্গীক্রমে পরিক্রমণ করিতে থাকিবে। (গণিতবেত্তারা জানেন যে, এই গতির পথ একটি conic-section, এবং স্থির গোলকটি সেই পথরেখার এক অধিগ্রয়ে focus এ অবস্থিত।)

ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলক উল্লিখিত গতিক্রিয়ার সহজ উদাহরণস্বরূপ দর্শিত হইতে পারে।* পরিদোলকটি একবার নাড়িয়া দিলেই সেই বল-প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কিছু দূব উত্থিত হয়, কিন্তু শীঘ্রই মাধ্যাকর্ষণ তাহার সেই বেগ নষ্ট করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া ফেলে। কিন্তু নীচে নামিতে নামিতে তাহার বেগ পৃথিবীর আকর্ষণবলেই এত বৃদ্ধি পায় যে, স্থির থাকিতে না পারিয়া অপর দিকেও কিছু দূর উত্থিত হয়। আবার উত্থানকালে মাধ্যাকর্ষণবলে সে বেগ ক্ষয় হইলে ক্রমে নীচে নামিয়া পুনরায় অপর দিকে উঠিতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত গতি, বায়ু ও অপরাপর পদার্থের ঘর্ষণে অন্তর্হিত না হয়, ততক্ষণ একবার এ দিক্, একবার ও দিক্ করিয়া দুলিতে থাকে ; ও একবার উপরে উঠিয়া, একবার নীচে নামিয়া, তরঙ্গগতির (Rythm) সরল উপহার প্রদর্শন করে।

এই গেল আকর্ষণশক্তির ক্রিয়া। এখন একবার বিপ্রকর্ষণশক্তি লইয়া দেখা যাউক। এই বিপ্রকর্ষণশক্তিবলে সকল দ্রব্যই স্থিতিস্থাপকতাগুণ-বিশিষ্ট। কোন পদার্থকে বল দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেই এই বিপ্রকর্ষণবলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্মেরই নাম Elastic। মনে কর, কতিপয় Elastic জড়াণু পাশাপাশি রহিয়াছে। একটিকে সঙ্কুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হইয়া সন্নিকটস্থ অণুকে আঘাত করিবে ও তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাহত হইয়া সাম্যাবস্থা

* উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের পথরেখাও ঐ নিয়মের অধীন। পৃথিবীর পার্শ্বে চন্দ্রের, সূর্য্যের পার্শ্বে পৃথিবীর সামান্তত জ্যোতিষিক গতিমাত্রই এই পর্য্যায়ভুক্ত। -

Equilibrium প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক আহত অণুটি আঘাতবশত আকুঞ্চিত ও পরক্ষণেই প্রসারিত হইয়া পরবর্ত্তী অণুকে আঘাত করিবে। এইরূপ ক্রমিক আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা সেই গতি অণু হইতে অণুতে সংক্রামিত হইয়া আণবিক গতির তরঙ্গমালা উৎপাদন করিতে থাকিবে। কতকগুলি গোলক সূত্র দ্বারা পাশাপাশি বিলম্বিত করিয়া, এক প্রান্তে আঘাত করিলে অপর প্রান্তস্থ গোলকটি নড়িবে ও মধ্যস্থ সবগুলি স্থির থাকিবে। এই সেই আণবিক গতির স্থূল উদাহরণ।*

আমরা এই জটিল তত্ত্ব যথাসাধ্য সরল করিয়া লইয়াছি। পাঠক জানেন, যথা—এই বিশ্বে দুইটি বা চারিটি মাত্র পদার্থ নাই এবং দুইটি বা চারিটি মাত্র স্থলে শক্তি কাজ করিতেছে না ; জড় পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, শক্তিও সর্ব্বব্যাপিনী। সুতরাং এই শক্তিনিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষে যে গতি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাও নিরতিশয় জটিল ও সর্ব্বথা দুরধিগম্য। তথাপি প্রণিহিতচিত্তে দেখিলে বোধ হইবে যে, এই বিশ্বস্থ কোন জিনিস সমান ভাবে সরল রেখায় চলে না। সর্ব্বত্রই তরঙ্গভঙ্গীতে বক্র রেখায় এই বিশাল প্রবাহ চলিয়াছে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, ঊর্ম্মির উপর ঊর্ম্মি, অনন্ত শক্তির অনন্ত ক্রিয়াপারম্পর্য্যে এই লহরীলীলা সকল সময়ে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

ঐ যে তরঙ্গিণীর সৈকতভূমে উপবেশন করিয়া তাহার কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া ভাবিতে বসিয়াছ, ঐ তরঙ্গিণীকে কি কখন সোজা পথে যাইতে দেখিয়াছ? প্রভবভূমি সানুমানের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়া তটিনী কতই না বিবিধ ভঙ্গীতে বাঁকিয়া বাঁকিয়া সাগরোদ্দেশে চলিয়াছে। আবার দেখ, ঐ লীলাময়ী স্রোতস্বিনীর বক্ষের উপর জলরাশি কেমন তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি, তার পর ঊর্ম্মি, অগণিত ঊর্ম্মিমালা অনন্ত প্রবাহে অনন্তমুখে ছুটিয়াছে। ঐ দেখ, কূলস্থ বৃক্ষ হইতে বিগলিত পত্রটি কেমন

* শব্দ এই গতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিকীর্য্যমান তাপ Radiant heat এবং আলোক ব্যোমনামক পদার্থের আণবিক তরঙ্গ বই কিছুই নহে। Clerk Maxwellএর মতে তাড়িত ও চৌম্বক প্রবাহও আলোকের রূপান্তর মাত্র। সাধারণত যাহাকে উত্তাপ বলে, তাহাও অণুসকলের আন্দোলনের ফল মাত্র।

দুলিতে দুলিতে, নদীবক্ষে পতিত হইয়া কেমন নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া গেল। আবার দেখ, তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড সেই উর্ম্মিমালামধ্যে পতিত হইয়া কিরূপ তরঙ্গমালা উৎপাদন করিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া নদীর জলতরঙ্গের উপর দিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কূলে গিয়া প্রতিহত হইতে লাগিল। যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে—তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড জলের ভিতর কেমন দুলিতে দুলিতে যাইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল। ঐ যে প্রবাহিণীর কুল কুল গীতিশব্দ, যাহা তোমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতস্রোতে ইন্দ্রিয়সকল অবশ করিতেছে, তাহাও ত এই প্রান্তরস্থিত বায়ুরাশির আণবিক তরঙ্গ বই আর কিছুই নয়। স্রোতস্বতীর স্রোতের মাঝে উৎপন্ন অগণিত তরঙ্গমালা সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরাশিতে তরঙ্গরাজি উৎপাদন করিতেছে, সেই তরঙ্গরাজি আবার চারি দিকে প্রসারিত হইয়া, আকাশ প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দিগন্তে প্রধাবিত হইতেছে। আবার দেখ, যে মেদুর সমীর শব্দ বহিয়া তোমার কর্ণকুহর তৃপ্ত করিতেছে, গন্ধ আনিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জন্মাইতেছে এবং শীতল স্পর্শে তোমার সর্ব্বাঙ্গে সুধাধারা ঢালিয়া দিয়া কবিকল্পিত অমরাবতীর অপূর্ব্ব সুখের পূর্ব্বাস্বাদ দিতেছে, উহাও ত হিল্লোলময়। উপরে নীল নভঃপটে স্তিমিতমুখী তারকাবলীর মধ্যস্থলে পূর্ণ গৌরবে প্রভান্বিত সুধাকর অকাতরে অবিরত সুধাধারা ঢালিতেছে। বসুন্ধরা বিভোর ভাবে পান করিয়া তৃপ্তি পায় না, সেই বিমলেন্দুর বিমল প্রভা, কবির চক্ষে যাহা রজততরঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান, বিজ্ঞানের চক্ষে সেও ত তরঙ্গমালা বই আর কিছুই নয়। বিশ্বব্যাপী ব্যোমসাগরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম উর্ম্মিমালা প্রবল বেগে বহিতেছে, ও ত সেই উর্ম্মিরই প্রবাহ মাত্র।

তরঙ্গিণীর সৈকতভূমি ত্যাগ করিয়া দূর দেশে চাহিয়া দেখ, যে পর্ব্বত-শ্রেণীর ক্রোড়দেশ হইতে নির্ঝরিণী ঝুরু ঝুরু নাদে নিপতিত হইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গীতে চলিয়াছে, সেই পর্ব্বতমালার আকার কিরূপ—সেও ত তরঙ্গমালা, এখানে উঁচু, ওখানে নীচু, এখানে অধিত্যকা, ওখানে উপত্যকায় পরিণত। আবার যে সাগরে গিয়া তরঙ্গিণী সঙ্গতা হইয়াছে, সে সাগর ত তরঙ্গেরই সমষ্টি, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে তরঙ্গময়। কোথাও নদী, কোথাও চন্দ্র, কোথাও সূর্য্য, কোথাও বায়ু, নূতন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া সাগরের বক্ষ

আন্দোলিত রাখিয়াছে। যোজনব্যাপী বড় বড় ঢেউ, তাহার উপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ঢেউ, তার উপর আরো ছোট, একের উপর শত, শতের উপর সহস্র, ক্রমে অগণ্যে গিয়া পরিণত। সমুদ্রের বেলাতে, নদীর সৈকতভূমি—সৈকতে বালুস্তর কেমন মনোহর ভঙ্গীক্রমে বিন্যস্ত। বিশাল দেশব্যাপী প্রান্তর—উচ্চ নীচ ক্রমে প্রসারিত প্রান্তরে শস্যক্ষেত্রে শস্যনিচয় সমীরণের মৃদুলদোলে দোলায়মান।

এইরূপ এ জগতে যেখানে যাইবে, সেইখানেই দেখিবে, সকল দ্রব্যই তরঙ্গায়িত গতিতে চলিয়াছে। তাহার একটি ঊর্ম্মি কোথাও যুগব্যাপী, কোথাও বর্ষব্যাপী, কোথাও আবার পলকের মধ্যে সহস্র ঊর্ম্মি উথলিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের গতির নিয়ম এই, ইহা কোথাও সরল পথে চলে না, ইহার গতি একবার এ ধারে, একবার ও ধারে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, একবার উন্মুখী, একবার অধোমুখী।

একবার অনন্ত আকাশে নিরীক্ষণ কর, মহা মহা সৌর মণ্ডল কাহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রবলবেগে এ দিক্ ও দিক্ ছুটিতেছে। দেখ, কত সৌর মণ্ডল কত দিন মহাতেজে জ্বলিয়া আবার স্তিমিতপ্রভ হইয়া গেল। আবার দেখ, কিছু দিন পরে নববলে জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে কখন সূর্য্যের নিকটে (peri-helion) আসিতেছে; কখন দূরে (aphelion) যাইতেছে। তাহার অক্ষরেখা আবার যুগ ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবর্ত্তন করিতেছে।*

পৃথিবীর উপরেই বা গতির কি বিচিত্র নিয়ম। গ্রীষ্মের পর শীত, শীতের পর গ্রীষ্ম, এই ঋতুবর্ত্তনও তরঙ্গভঙ্গীতে। বায়ুর প্রবাহ, জলের প্রবাহ তরঙ্গে; দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি তরঙ্গে; আবার দিনের মধ্যেই উত্তাপের ন্যূনাতিরেক, পার্থিব তাড়িত প্রবাহ, লৌহে চুম্বকে প্রবাহ—সেও তরঙ্গ। ভূগর্ভস্থ তরল প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া ভূপৃষ্ঠ আন্দোলিত করে, থাকিয়া থাকিয়া লেলিহান অগ্নিজিহ্বা প্রকট করে, ভূপঞ্জরের স্তরাবলীকে তরঙ্গের ন্যায় বাঁকাইয়া দেয়, আবার সাগরগর্ভকে হিমালয় করিয়া, প্রশস্ত মহাদেশকে প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত করিয়া মহাকালের সঙ্গে সঙ্গে চপল চরণে নৃত্য করে। শীতের পর বসন্ত আইসে, বসন্ত আগমে রাশি রাশি সৌর কিরণতরঙ্গের আনুকূল্যে তরু লতা নব মাধুরী বিকাশ

* যে কারণে Precession of equinoxes ঘটে।

করে, বনের লতা মলয়মারুতে ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, পাপিয়া কোকিল হর্ষস্রোতে গা ঢালিয়া সঙ্গীততরঙ্গে বনভূমি ভাসাইয়া দেয়। গ্রীষ্ম বর্ষা ফুরাইয়া গিয়া আবার যখন শীত আইসে, তখন লতার সেই মোহন মাধুরী, পিকের সেই স্বরলহরী কোথায় যায়? বর্ষাগমে ভেককুল কলরব করে, জলচর পক্ষিকুল জলের উপর নাচিয়া বেড়ায়, তার পর বর্ষা ফুরাইলে তাহাদের উল্লাস পুনর্বর্ষাগম পর্য্যন্ত নিবাইয়া থাকে। জীবের শারীর ক্রিয়ায় শ্রমের পর বিরাম, বিরামের পর শ্রম, উল্লাসের পর অবসাদ, অবসাদের পর উল্লাস। জীবের শরীরমধ্যে শোণিতপ্রবাহ তরঙ্গে বহে, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র যখনই কুঞ্চিত হয়, তখনই আবার প্রসারিত হয়; স্নায়ুযন্ত্রের ক্রিয়াপ্রণালী সেইরূপ আকুঞ্চন-প্রসারণেই সম্পাদিত হয়। মনুষ্যের চিন্তাপ্রবাহ মস্তিষ্কের তরঙ্গমালা সঙ্গে বহিতে থাকে, মানুষের ভাবের গতি সেই স্নায়ুমণ্ডলের তরঙ্গগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসি কান্না যে নিয়মে মাংসপেশীর কুঞ্চন প্রসারে সঞ্জাত, শোক দুঃখ হর্ষ আহ্লাদও কি সেই নিয়মের অধীন নয়? আজ তুমি হাসিতেছ, কাল কাঁদিবে, পরশু আবার উচ্চ হাস্যে গৃহপ্রাচীর ধ্বনিত করিবে। সমাজের মধ্যে আইস; বাজারের দর, বাণিজ্যের গতি, রুচি, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, কাব্য, সবই সেই নিয়মের অধীন। আজ ধর্ম্ম লইয়া লোকে পাগল হইল, কাল অধর্ম্মের তরঙ্গে গা ঢালিয়া নরকের পথে ভাসিতে লাগিল। আবার কোন পুণ্যাত্মা আসিয়া স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল। আজ দাসত্বের কঠিন নিগড়ে সাধারণের হস্তপদ শৃঙ্খলিত রহিয়াছে; কালি দেখ, অত্যাচারী মহারাজের ছিন্ন মুণ্ড রাজপথ শোণিতাক্ত করিতেছে। আজ কবিতার উন্মাদিনী মাধুরীতে পুলকিত হইয়া মোহন চাঁদের আলোকে শুধু ফুলের মধু লইয়াই বিভোর; কালি আবার বীণাপাণিকে বিসর্জ্জন দিয়া উদরান্নের জন্য ঐহিকার্থে লালায়িত। সমাজের উত্থান পতনও কি ঐ নিয়মের অধীন নহে? গ্রীস গিয়াছিল, গ্রীস উঠিয়াছে; ইতালি গিয়াছিল, ইতালি উঠিয়াছে; ভারত গিয়াছে, ভারত কি আর উঠিবে না? বিধাতঃ। ভারত কি আর উঠিবে না?

এইখানে একটি একাদশবর্ষব্যাপী তরঙ্গের কথা বলা আবশ্যক। আকাশস্থ নক্ষত্রের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল (variable stars); এইগুলি কিছু কাল উজ্জ্বল থাকে এবং ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

আবার কিছু কাল পরে দীপ্তিমান্ হয়। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলও এই শ্রেণীর নক্ষত্রের অন্তর্গত। অনেকেই জানেন, চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যেও কাল কাল "কলঙ্ক" দৃষ্ট হয়। যে কারণেই হউক, এই চিহ্নের সংখ্যা কখন বাড়ে, কখন কমে, এগার বর্ষের মধ্যে একবার বৃদ্ধির সীমা, একবার হ্রাসের সীমা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এগার বৎসরের মধ্যে সূর্য্যালোক কিছু দিন বেশি পরিমাণে, কিছু দিন অল্প পরিমাণে বিকীর্ণ হয়। Balfour Stewart* অনুমান করেন, চন্দ্র যেমন পৃথিবীর জলরাশিতে তরঙ্গমালা জন্মায়, সেইরূপ সূর্য্য-মণ্ডলের পরিবেষ্টিত বাষ্পরাশিতে পার্শ্বস্থ গ্রহগণ কর্তৃক কোনরূপ নিয়মিত তরঙ্গমালা উৎপন্ন হওয়ায় এরূপ ঘটে। যাহা হউক, সূর্য্যের এই কলঙ্কের সহিত অনেক পার্থিব ঘটনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্যের চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব তাড়িত ও চৌম্বক স্রোতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যখন সূর্য্যের কলঙ্কসংখ্যা বেশী হয়, তখন ঠিক সেই সময়েই চুম্বক জলাশয়ে "আবর্ত্ত" (storms) উপস্থিত হয়, এবং সেই সময়েই মেরুপ্রদেশে Aurora borealis নামক আলোকের আধিক্য দেখা যায়। আবার পৃথিবীর শস্যজন্ম সূর্য্যালোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কাজেই আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসরান্তে দুর্ভিক্ষ ও ইউরোপে শস্যের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয়। আবার পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তি সভ্যসমাজের বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতিও প্রায় ১০।১১ বৎসরের মধ্যে এক চক্র ঘুরিয়া আইসে। যাহাকে commercial crisis or collapse বলে, সেও প্রায় ১১ বৎসরান্তে ঘটিয়া থাকে।

বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক জানেন, এই জৈব জগতে সৃষ্টিপ্রণালী কিরূপ দেবাসুরের মহাসমরে সমুদ্ভূত। তিনি জানেন, কেমন এই মহাযুদ্ধ এই মুহূর্ত্তেও সর্ব্বত্র চলিতেছে। কোন জাতি উঠিতেছে, কোন জাতি নামিতেছে; বাঘের বংশ মৃগজাতি ধ্বংস করিয়া অবশেষে খাদ্যাভাবে নিজেই লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে; এবং হতাবশিষ্ট মৃগকুল কেমন আবার সুবিধা পাইয়া দলে দলে বাড়িয়া উঠিতেছে। দেবের জয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও এই যুদ্ধলীলা কেমন জটিল পথে চলিয়াছে। কখন দেবের জয়, কখন

* ব্যালফুর স্টুয়ার্ট, স্কটলণ্ডীয় পদার্থবিদ্ ও আবহবিদ্, জন্ম ১৮২৮, মৃত্যু ১৮৮৭।—সম্পাদক।

অসুরের জয়; নন্দনবনে স্বরীশ্বর ক্রীড়ামগ্ন, বৃত্রাসুর আসিয়া ছত্র দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মহেন্দ্রকে কেমন পথের ভিখারী করিতেছে। সৃষ্টির আদি হইতে এই অপূর্ব্ব যুদ্ধলীলা তরঙ্গভঙ্গীতে চলিয়াছে, কে জানে—ইহার শেষ কবে? এই ধরণীতলে এককালে মৎস্যকুল আধিপত্য করিয়াছে, তার পর ইহা উভচর জীবের আবাসভূমি হইয়াছে; পরে স্তন্যপায়ী আসিয়া তাহার আরাম-ভবন কাড়িয়া লইয়াছে। এই মানুষই একদিন ম্যামথ ও মাষ্টোডনের সহিত লতাপাতা লইয়া বিবাদ করিত; কিন্তু মানবের এই বৈভবের দিনে মানবের সেই আদি শত্রু কোথায়? মানুষ আজি পৃথিবীর রাজা, সৃষ্টির তরঙ্গে ভাসমান দর্শনীয় জীব। তরঙ্গের পর তরঙ্গ গিয়াছে, এ তরঙ্গও চলিয়া যাইবে, পর তরঙ্গে মানুষ কোথায়?

আর মানুষের জীবন? কে জানে, মানুষের জীবন কি? মানুষের জীবন কত বড় বড় ছোট ছোট তরঙ্গের সমষ্টি;—কত আশা ভালবাসা এই মনুষ্যজীবনে স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, কে জানে? কত প্রাণের পুত্তলী সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কার সাধ্য সে গতি রোধ করে? জীবনের প্রতি উর্ম্মি আবার কত ক্ষুদ্রতর উর্ম্মির সমষ্টি, সেই ক্ষুদ্রতর উর্ম্মিতেই আবার কত আরও ক্ষুদ্র উর্ম্মি চলিয়াছে। মনুষ্যের জীবন—প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবনও কি একটি বিশালতর স্রোতের একটি উর্ম্মিমাত্র।

ঐ যে জলাশয়ে একটি উর্ম্মি দেখিতেছ, ওটি কি ঠিক উহার পূর্ব্ববর্ত্তী উর্ম্মির প্রতিরূপ নহে? কিন্তু যাহা দেখিতেছ, সে কেবল আকারগত সাম্য, পূর্ব্বগত তরঙ্গের একটি জলকণাও হয় ত পরবর্ত্তী তরঙ্গে নাই; সাদৃশ্য যে কিছু, সে আকৃতিতে, শক্তিতে, ধর্ম্মে, পার্থক্য—জড় উপাদানে। একটির পর আর যে একটি ঢেউ আইসে, সে তাহার পূর্ব্বগামীর নিকট হইতে তাহার আকার, তাহার শক্তি, তাহার প্রাণ গ্রহণ করে; তাহার উপাদানভূত অণুগুলি মাত্র তাহার নিজের সম্পত্তি। দীপশিখা অবিরাম জ্বলিতেছে; উহার আকার, উহার ধর্ম্ম ঠিক সমানই রহিয়াছে। কিন্তু যে তৈল, যে জড়াণু যে carbo-hydrate উহার উপাদান, তাহা পলকে পলকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্যও কি তাহাই, মনুষ্যও কি একটি তরঙ্গ মাত্র, মনুষ্যও কি একটি দীপশিখা মাত্র? দীপশিখার ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার শারীর উপাদান বাহ্য জড়জগৎ হইতে সংগ্রহ করিতেছে;

প্রতিনিয়ত পুরাতন উপাদান বিসর্জ্জন দিয়া নূতন উপাদানে গঠিত হইতেছে, কিন্তু ইহার আকার, ইহার ধর্ম্ম, ইহার প্রাণ কি দীপশিখার মত, জলাশয়ের উর্ম্মিটির মত কোন পূর্ব্বগামী অবিনাশী প্রাণের অংশমাত্র? মনুষ্যের জীবন কি কোন বিরাট্ জীবনের অংশীভূত একটি উর্ম্মি মাত্র? বৈজ্ঞানিক! তুমি ঘরে বসিয়া সূর্য্যরশ্মিমালার এক প্রান্ত বিশ্লেষণ করিয়া অপর প্রান্তে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পরমাণুপুঞ্জের তরঙ্গগতি গণিয়া দিতেছ; বৈজ্ঞানিক! তুমি বলিতে পার—এই মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বগত তরঙ্গ কি? কে বলিবে—এই জীবনের পূর্ব্বগত জীবন কি? কে বলিবে—ইহার পরস্থিত তরঙ্গ কেমন? সেরূপ বৈজ্ঞানিক আসিবে কি?

এই জগৎও একটি মহাতরঙ্গ মাত্র। বিশ্বব্যাপী নিরবয়ব পরমাণুরাশির ক্রমিক ঘনীভবনে গঠিত এই অপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্রিত জগৎ কালক্রমে আবার সূর্য্যে সূর্য্যে সংঘর্ষ হইয়া, নক্ষত্রে নক্ষত্রে আঘাত লাগিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবে, বৈজ্ঞানিক এ কথা গণিয়া বলিয়াছেন। আবার যখন সেই অবস্থা, আবারও ত তবে সৃষ্টি সম্ভব। তবে কি অপূর্ব্ব জগৎও এক বিশাল স্রোতের একটি বিশাল উর্ম্মিমাত্র? মহাশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, মহাকাল ব্যাপ্ত করিয়া যে মহাস্রোত চলিয়াছে, এই জগৎ তাহারই একটি মহাতরঙ্গ মাত্র। তুমি আমি কি তাহার বুদ্বুদমধ্যেও গণ্য নহি? ('নবজীবন,' অগ্রহায়ণ ১২৯২)

জড় জগতের বিকাশ

পরমাণুগণের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের গতির হ্রাস, এই দুইটি বিকাশের প্রধান লক্ষণ,—একমাত্র লক্ষণ বলিলেও চলে। তবে যে এই ঘনিষ্ঠতা কেবল মাত্র সরল ভাবে চলিতেছে, এমত নহে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার জটিল ভাবের ঘনিষ্ঠতাও ঘটিতে থাকে; অর্থাৎ পরমাণুগণ যেমন পরস্পর সন্নিহিত হইতে থাকে, অনেক স্থলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিন্ন ভিন্নরূপ সমাবেশও ঘটিয়া পড়ে; বিকাশে যেমন পরমাণুগণের পরস্পর দূরত্বের হ্রাস হয়, তেমনি অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের সমাবেশেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই দূরত্ব-হ্রাস-জনিত, সরল-ঘনিষ্ঠতা-ঘটিত যেরূপ বিকাশ, তাহাকেই সরল বিকাশ,

আর সমাবেশের বৈচিত্র্যে যেরূপ বিকাশ, তাহাকেই জটিল বিকাশ বলা যাউক। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, বিকাশ ও বিনাশ সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঘটে না, দুই-ই জড়িতভাবে চলিতেছে।* তবে কখনও একের আধিপত্য, কখনও বা অন্যের। এখানেও সেইরূপ একটু বুঝিতে হইবে যে, সরল বিকাশ ও জটিল বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয় না। কোন পদার্থে বিকাশক্রিয়া যে কেবলই সরলভাবে চলিতেছে, কেবলই তাহার পরমাণুগণের পরস্পরের দূরত্ব কমিতেছে, আবার অন্য কোন পদার্থে বিকাশ কেবলই জটিল, কেবলই তাহার পরমাণুসমাবেশের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এরূপ ব্যাপার ঘটে না। পদার্থের বিকাশকালে দুই প্রকারের বিকাশই জড়িতভাবে ঘটিতে থাকে, কম আর বেশী। তবে কেবল বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই, আমরা বিকাশের এই দুইটি রূপ পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যালোচনা করিব। প্রথমে সরল বিকাশের কথাই পাড়া যাউক।

সমগ্র জগতের রূপ আমরা অল্পই জানি। অধিকাংশই অজ্ঞাত পড়িয়া রহিয়াছে। তথাচ মোটামুটি যেটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, যেন নাক্ষত্রিক জগতে এই পারমাণবিক ঘনিষ্ঠতারূপ একটা মহাব্যাপার চলিতেছে। বিচ্ছিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলী কোথাও সুদূর ব্যবহিত, কোথাও বা ঘনসমাবিষ্ট; আবার সে দূরত্বও নির্দ্দিষ্ট নহে,—অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া অগণ্য তারকামণ্ডলী জগতে বিরাজ করিতেছে। আবার অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়াই মণ্ডলান্তর্গত অগণ্য তারকাগণ মণ্ডলমধ্যে বিরাজ করিতেছে। এ ছাড়া ঘন, বিরল, নানাপ্রকারের নীহারিকা জগৎ-পটে দেখা যায়। সেগুলি দেখিতে কুহেলিকার মত বটে; তবে উহার মধ্যেই আবার কোনটি ঘন, কোনটি বা বিরল; কোনটি অধিক ঘন, কোনটি বা অল্প ঘন; কোনটি অধিক বিরল, কোনটি বা অল্প বিরল;—ঘনত্বের এইরূপ নানা ক্রম উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, যেন জগতে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া ক্রমশঃ একটা ঘনিষ্ঠতার ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে।

নাক্ষত্রিক জগতের অপেক্ষা সৌর জগতের কথা আমরা অধিক জানি। সৌর জগতে এই ঘনিষ্ঠতা-কাণ্ড আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান। সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ মত এই যে, বিশাল বিস্তৃত ঘূর্ণ্যমান বাষ্পমণ্ডল ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সৌর জগৎ হইয়াছে। কেবল যে সমগ্র

* "বিবর্ত্তন" প্রবন্ধ, পৃ. ৪৭০-৭১।

সৌর জগৎটি ক্রমশই ঘনীভূত হইতেছে, এমত নহে ; সৌর পরিবারমণ্ডলীর প্রত্যেকেই,—গ্রহ, উপগ্রহাদি সকলেই—ঐরূপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছে। সকল গ্রহ উপগ্রহকেই বিরল বাষ্পাকার হইতে, তদপেক্ষা ঘন বাষ্পাকার, তার পর তরল, তার পর কঠিন, এইরূপ অবস্থাপরম্পরা পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। এখনও কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, কোনটি বাষ্পাকার দৃষ্ট হয়। সৌর জগতে ও সৌর জগতের পরিবারমধ্যে ঘনিষ্ঠতার এ নিদর্শন জাজ্বল্যমান্। এ ছাড়া সৌর জগতের ঘনিষ্ঠতার আরও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূর্য্য চতুর্দ্দিকে কিরণ বিকিরণ করিতেছে। এই বিকিরণে, এই তেজের হ্রাসে, সৌর পরমাণুগণের গতিহ্রাস হইতেছে ; এবং তৎফলে তাহার পরমাণু সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইতেছে। তেজ বিকিরণে সৌর-দেহের সঙ্কোচ, ঘনিষ্ঠতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। আরও দেখ। গ্রহগণের প্রদক্ষিণকাল ক্রমশই একটু একটু বেশী হইতেছে ইহা অনুমিত হইয়াছে ; আর, ধূমকেতুগণের প্রদক্ষিণকাল সম্বন্ধেও ঐরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এ কাল-বিলম্বের এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে আকাশ ক্রমশই ঘন হইতেছে, তাই গ্রহগণের ও ধূমকেতুগণের গতির ক্রমশ অধিকতর ব্যাঘাত, তাই তাহাদিগের প্রদক্ষিণ ক্রমশ বিলম্বিত। আকাশে এ ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে চলিতেছে।

সৌর জগৎ ছাড়িয়া আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর কথা ভাবিয়া দেখ। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সরল-বিকাশ অতি সুন্দররূপে উদাহৃত। প্রথমাবস্থায় সমগ্র পৃথিবী একটি বিশাল বিস্তৃত জ্বলন্ত বাষ্প-গোলক ছিল। এখন যাহা স্থল, জল, পাহাড়, পর্ব্বত, প্রস্তর, মাটি, সকলই তখন তাপের তাড়নে দুরগতি-সম্পন্ন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে তেজের বিকিরণে গতির হ্রাস হইল ; পরমাণু সকলের সমাহার হইতে লাগিল। জলীয় বাষ্প, পরমাণু সমাহার নিবন্ধন বাষ্পাকার ত্যাগ করিয়া জলাকার ধারণ করিল,—পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল।* পৃথিবী শীতল হইয়াছে বলিয়াই পৃথিবীতে জল। পৃথিবী তেজ বিকিরণ করিয়াছে বলিয়াই, সেই তেজ-হ্রাস-ফলে জলীয় বাষ্পের

* এখনও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যৎকিঞ্চিৎ আছে, সে কেবল সূর্য্যের তাপের গুণে। নতুবা, হয় ত এতদিনে বায়ুমণ্ডল একেবারে জলীয় বাষ্পহীন নীরস হইয়া যাইত।

পরমাণুগণের ঘনিষ্ঠতা ও স্তূপীকরণ সম্পাদিত হইয়া জলের বিকাশ হইয়াছে। স্থলবিকাশ সম্বন্ধেও ঐরূপ। জ্বলন্ত অবস্থায় যে সকল স্থলীয় উপকরণ বাষ্পাকারে ছিল, বিকিরণ জন্য তাপের যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন বাষ্পাকার সেই সকল স্থলীয় উপকরণের পরমাণুগুলি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে যতই তেজের হ্রাস হইয়াছে, ততই সেগুলি অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া তরলতম অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান এই কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে।* এখন যাহা শীতল ও কঠিন ভূমি, পূর্ব্বে তাহা তপ্ত ও দলদলির মত নরম ছিল; তাহার পূর্ব্বে আরও তপ্ত ও তরল ছিল, এবং তাহারও পূর্ব্বে অগ্নিময় বাষ্পাকার ছিল। তেজের হ্রাসে পরমাণুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া বাষ্প এখন মাটি হইয়াছে,—পৃথিবী দাঁড়াইবার স্থল হইয়াছে। শীতল হওয়ায় পৃথিবীর আরও রূপান্তর হইয়াছে। তাপক্ষয়ে কঠিনস্তরের সঙ্কোচ ঘটিয়াছে; আর সেই সঙ্কোচেই কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। সঙ্কোচে, ঘনিষ্ঠতায় পৃথিবীর উপরিস্তরের এই উঁচু নিচু আকার। এ সকল ছাড়া, পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থানীয় অবান্তর ঘনিষ্ঠতা অনেক ঘটিয়াছে। এই অবান্তর ঘনিষ্ঠতা হইতেই বড় বড় দ্বীপের উদ্ভব, বিশাল মহাদেশের বিস্তার, পলিময় স্তরভূমির বিন্যাস।

আমরা এখন কেবল বিকাশের সরল ভাবটুকু দেখিতেছি। বস্তুত ইহার সহিত জড়িত জটিল ভাবই বেশী। কেবল সরল ভাবটুকু দেখিলে খুব মোটামুটি দেখা হয় মাত্র। কিন্তু এই মোটামুটি দেখাই আগে চাই। জড় জগতের বিকাশের জটিল ভাবটি পরে দেখা যাইবে। ('নবজীবন,' আষাঢ় ১২৯৩)

* পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী কঠিন হইতে পায় নাই, সে কেবল উপরিতন স্তরের কাঠিন্য প্রযুক্ত। উপরিভাগ হইতেই অবশ্য অধিক তেজ বিকিরিত হইয়াছে; তাই ভিতর অপেক্ষা উপর অধিক শীতল হইয়া পড়িয়াছে। উপরের স্তর আগেই কঠিন হইয়া ভিতর হইতে তেজ বিকিরণের ব্যাঘাত দিয়াছে। অন্তর-স্তর হইতে বেশী তাপ বিকিরিত হয় নাই; উহা এখনও উত্তপ্ত, জ্বলন্ত; এখনও তরল, অগ্নিময়।

বৈদেশিক সভ্যতা

সৌভাগ্যবশতই হউক আর দুর্ভাগ্যবশতই হউক, আমি বাল্যকালাবধি ইংরাজি মতে শিক্ষিত। আমাদের সমাজের রক্ষণার্থ সম্প্রদায় বা সংস্কার-প্রয়াসী দল আমার সহিত একমত হইবেন কি না, জানি না। আমি নিজের শিক্ষানুসারে ইংরাজি মতে, বৈদেশিক সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না, এতৎসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিব।

আমার মতে ইংরাজি সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমি এখানে ইহাকে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। এই উৎকৃষ্ট সভ্যতা আমাদিগের গ্রহণীয় কি না, তাহাই আমার আলোচ্য।

বলা উচিত, আমি জাগতিক সাধারণ বিবর্ত্তবাদে বিশ্বাস করি এবং জৈব বিবর্ত্তনে ডারউইনের মতে শ্রদ্ধা করি। বিবর্ত্তবাদের সাহায্যে আমি নিজমত সমর্থনে প্রয়াস পাইব। যাঁহারা বিবর্ত্তবাদে অশ্রদ্ধা করেন, অথবা ডারুইনের নামে নাসিকা সঙ্কোচ করেন, তাঁহাদিগকে আমার এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কষ্ট পাইতে বলি না।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান অধুনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, মনুষ্য-সমাজ একরূপ শরীর পদার্থ। প্রাণিশরীরের ক্রিয়া যে যে সাধারণ নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সমাজ-শরীরও সেই সেই নিয়মের অনুযায়ী। সমাজকে কি কারণে শরীরী বলা যায়, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রথম বৎসরের "নব জীবনে" প্রকাশিত সমাজ-শরীর প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সমুদয় মনুষ্যজাতির সমষ্টি লইয়া একটি শরীর নহে; ইংরাজ সমাজ, হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন দেহধারী। তন্মধ্যে কোনটিই এত উন্নত নয় যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্যদেহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। প্রাণিজগতে যেমন অবয়বরহিত কীটাণু কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবয়বাদিসম্পন্ন স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ভুক্ত জীব আছে, সমাজজগতেও সেইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-

রহিত বর্ব্বর জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা অবয়বসম্পন্ন সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত বিবিধ পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। [কোন্ জীবের সহিত কোন্ সমাজের তুলনা করা যাইতে পারে, যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা Spencer-প্রণীত Principles of Sociology পাঠ করিবেন।]

বিবর্ত্তবাদের একটি সাধারণ নিয়ম এই—জীবমাত্রের গঠন বহিঃস্থ প্রকৃতির অনুযায়ী হয়। যে জীব বহিঃস্থ প্রকৃতির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহার বেশি দিন বাঁচিবার আশা নাই। এই বহিঃস্থ প্রকৃতির ইংরাজি নাম Environment এবং এই উপযোগিতার নাম Adaptation। যে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহ্য প্রকৃতির উপযোগী, সেই জীব সংগ্রামে জয়লাভ করে, অন্যান্য অনুপযুক্ত প্রাণী লোপ পায়। এইরূপে উপযুক্তের স্থিতি ও অনুপযুক্তের বিনাশে কালক্রমে সকল জীবই বাহ্য জগতের উপযোগী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই মৎস্যাদির নিঃশ্বাসযন্ত্র একরূপ, আবার স্থলচর জীবের শ্বাসযন্ত্র অন্যবিধ। এই নিমিত্তই শীতপ্রধান দেশের জীবের লোম দীর্ঘ ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীবের লোম খাট। এই নিমিত্তই মাংসাশী জন্তুরা তীক্ষ্ণ নখদন্তশালী ও হিংস্রপ্রকৃতিক হয় এবং উদ্ভিজ্জাদি মৃদুপ্রকৃতিক হয় ও তীক্ষ্ণায়ুধরহিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি—

Adaptation to Environment বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিবর্ত্তবাদের একটি মূলমন্ত্র। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী জীব বা উদ্ভিদ শীতপ্রধান দেশে বিশেষ যত্ন না করিলে বাঁচে না; কিম্বা শীতল দেশের তরু লতা গরম দেশে বৃদ্ধি পায় না। জলজন্তু স্থলে আসিয়া জীবিত থাকে না অথবা স্থলের জন্তু জলে ফেলিয়া দিলে মরিয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

তন্মধ্যে একটি কথা আছে। জীব মাত্রেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে এরূপ শক্তি আছে, যদ্দারা বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিলে নিজ আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তদুপযুক্তরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এই শক্তিটুকু না থাকিলে জীবের অবস্থানই অসম্ভব হইত। এমন কি, পৃথিবীতে জীবের উদ্ভবই ঘটিত না। কেন না, বহিঃপ্রকৃতি সদা পরিবর্ত্তনশীল; পলে পলে, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে, শতাব্দে শতাব্দে ভূপৃষ্ঠে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জলে, স্থলে, বায়ুমণ্ডলে, সর্ব্বত্র অবিশ্রাম গতিতে পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম।

দিবসের মধ্যে আলো আঁধার, সৌর তাপের পরিবর্ত্তন, বর্ষের মধ্যে ঋতু-পরিবর্ত্তন, জলের গতি, বায়ুর গতি, ভোজ্য বস্তুর পরিমাণ, নৈসর্গিক বিপৎপাত,—এ সকলের পরিবর্ত্তন আছেই ত। তদ্ভিন্ন যুগব্যাপী পরিবর্ত্তনে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া দেশ প্রস্তুত হয় এবং সাগরগর্ভ পর্ব্বতাধিত্যকায় পরিণত হয়।

ভূপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া ও নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহে পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, কোটি বর্ষ পুর্ব্বে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল এখন তাহার সমধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই মহা মহা পরিবর্ত্তনের কথা ভূপঞ্জরের স্তরাবলিতে স্ফুটাক্ষরে লেখা আছে। এই বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবজগতেও মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কত শত নূতন জীব পৃথিবীতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং কিছু কাল লীলাখেলা করিয়া চিরকালের মত লয় পাইয়াছে। যে কালে যে জাতি প্রকৃতির উপযোগী ছিল, সে কালে তাহারাই আধিপত্য করিয়াছে এবং তৎপরকালে বহির্জ্জগতে রূপান্তর ঘটিলে অধিকতর উপযুক্ত জাতি আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজ অবস্থার সমন্বয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, যাহারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে নিজ অবস্থার উন্নতি করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াছে, তাহারাই কেবল রূপান্তরিত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে; অন্যান্য জাতি—যাহারা তাহা পারে নাই, তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়া ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে কঙ্কালাবশেষ রাখিয়া গিয়াছে। ইহারই নাম জীবজগতে বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ। এইরূপেই বিভিন্ন রূপধারী, বিভিন্ন স্থানবাসী, বিভিন্ন দেশকালোপযোগী, সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

আমরা যাহা দেখিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়ায়—(১) জীব মাত্রেই সাধারণতঃ বহিঃপ্রকৃতির অনুযায়ী শরীর ও প্রকৃতিবিশিষ্ট। (২) বহিঃ-প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য জীবশরীরও পরিবর্ত্তন-শক্তিবিশিষ্ট। (৩) বাহিরের পরিবর্ত্তন অল্প-পরিমাণ হইলে জীবশরীরও তদনুরূপ পরিবর্ত্তিত হয়; ইহারই নাম ক্রমবিকাশ। (৪) বাহিরের পরিবর্ত্তন আকস্মিক বা অমিতপ্রমাণ হইলে জীবশরীর তদপযুক্ত না হইতে পারিয়া মারা পড়ে।

এই কয়টি কথা যে কেবল বড় বড় বিষয়েই খাটে, এমন নহে ; প্রাত্যহিক ঘটনা হইতে সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ক্রমশঃ ঋতুপরিবর্ত্তনে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিলেই নানারূপ ব্যাধি—এমন কি, মহামারী পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। রেলওয়ে বিস্তারে ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষের সহচারী মড়ক—এ সকলই আমাদের নিত্য ঘটনা।

সকল জীবে যাহা, মনুষ্য পক্ষেও তাহা। মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন অক্লেশে সহ্য করে, মনুষ্যের শরীর ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে বাহ্য শক্তির অনুযায়ী। নতুবা ব্যায়ামশিক্ষা বা বিদ্যালোচনা বা নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য কি? বাহিরের শক্তিপ্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতে ও দৃঢ় করিতে পারা যায় বলিয়াই উহাদের উপকারিতা। কিন্তু যখনই এই বাহ্য শক্তি প্রবলবেগে আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করিবে, তখন আর মনুষ্যদেহ গঠিত হইবে না, বরং ভাঙিয়া যাইবে। নতুবা হঠাৎ শীত পড়িলে বা গরম পড়িলে পীড়া হয় কেন? অনিয়মে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় কি কারণে? গুরুতর পরিশ্রমে জীবনহানির কারণ কি? গুরুতর মানসিক ব্যায়ামে মনের গঠন না হইয়া প্রত্যুত মানসিক শক্তি নিপীড়িত ও ক্ষয়িত-তেজ হইয়া যায় কেন?

সুতরাং কি জীবজগতে, কি মনুষ্যজগতে, কি অতীত ইতিহাসে, কি বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাই ;—(৫) বাহ্য জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ; সুতরাং জীবদেহেরও আত্মবিকাশক্ষমতা আবশ্যক। এবং সাধারণতঃ জীবমাত্রেই এই ক্ষমতা অল্প বা অধিক পরিমাণে ধারণ করে ; (৬) বাহ্য জগতে আকস্মিক বা অমিতপ্রমাণ পরিবর্ত্তন ঘটিলে জীবদেহের মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং তাদৃশ পরিবর্ত্তন সর্ব্বথা অবাঞ্ছনীয়। (৭) জীবদেহ সর্ব্বতোভাবে তরল হইলে চলিবে না, যিনি একেবারে কাঠিন্যরহিত, তিনি সামান্য ফুৎকার মাত্রে বিচলিত, বিপর্য্যস্ত বা বহুধা ভগ্ন ও বিনষ্ট হইবেন। আবার সর্ব্বতোভাবে কঠিন হইলেও চলিবে না, একেবারে কঠিন হইলে অবশ্য কিছুকাল বাহ্য প্রকৃতির চাপল্যঘটিত নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিবে বটে ; কিন্তু একেবারে নোওাইতে না চাহিলে, বাহ্য শক্তি অতিপ্রবল হইলে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বস্তুতঃ জীবদেহ মাত্রেই নাতিতরল, নাতিকঠিন হইয়া থাকে।

এখন আমরা জীবদেহের সাত নিয়ম ব্যক্ত করিলাম। সমাজদেহের উপরেও উক্ত নিয়মগুলি অক্ষয়ে অক্ষরে খাটিবে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম নিয়ম।—সমাজশরীর যে বাহ্য প্রকৃতির অনুযায়ী, সে কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। Buckle সাহেব* এই কথা বুঝাইতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যভূমি প্রাচীন ঋষিচরিত্র এবং গ্রাস দেশের সাগর-পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রাচীন গ্রীকচরিত্র গঠন করিয়াছিল। সাগরগর্ভে ভাসমান, প্রকৃতির শস্যসম্পত্তিবঞ্চিত, কুজ্‌ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন-নভঃপ্রদেশ ইংলণ্ড দেশে ইংরাজ জাতি, আর সাহারার বিকট মরুতে আতপ-দগ্ধ কাফ্রি। এইরূপ যে জাতি দেখিবে, সকলেই যে বহিঃ-প্রকৃতির দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে।

দ্বিতীয় নিয়ম।—বহিঃপ্রকৃতি বা Environment বলিলে কেবল মাত্র নদী পর্ব্বত ও জল বায়ু মাত্র বুঝায় না, চেতন বা অচেতন বাহ্য জগতের শক্তিনিচয়ের সমষ্টিকে বুঝায়। বঙ্গের উর্ব্বরা ভূমি, ভাগীরথীর জলপ্রবাহ, ষড়্‌ঋতুর বিকাশ বা হিমালয় পর্ব্বত—আমার শরীর ও মানস প্রকৃতির যেরূপ নিয়ামক, আমার বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী দেশবাসী, জীব জন্তু বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত সেইরূপ আমার প্রকৃতির উপর আধিপত্য রাখে। এ সকলের পরিবর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন হয়। সেইরূপ সমাজেও। কেবল ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য বর্ত্তন, Gulfstreamএর উত্তপ্ত প্রবাহ বা সাহারার জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ইউরোপভূমির সভ্যতা বজায় রাখিয়াছে, এরূপ নহে; ভারতের অবাধ বাণিজ্য, কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণখনি, আফ্রিকার দাসজাতি ও চীনবাসীর অহিফেনপ্রিয়তাও সেইরূপ ইউরোপ সমাজকে নিয়মিত করিয়াছে ও করিতেছে। কে বলিবে—বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সমাজশরীরে পরিবর্ত্তন হয় না? পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ মূর্খ ছিল। কেন? ইউরোপের উপর বহিঃশক্তির বিশেষ পরিচালনা হয় নাই বলিয়া। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ তড়িদ্‌গতিতে উন্নতি-

---

* হেন্‌রি টমাস বাক্‌ল (১৮২১—১৮৬২)। 'হিষ্ট্রি অব সিভিলিজেশন ইন ইংলণ্ড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক।—সম্পাদক।

মার্গে আরোহণ করিল। কেন? তাহার Environment পরিবর্ত্তিত হইল বলিয়া। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল বলিয়া ও ভারতে বাণিজ্য প্রচার হইল বলিয়া। প্রাচীন বৃটন রোমানদের সংসর্গে আসিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বিজেতৃব্যবহার অনুকরণ করে। প্রাচীন সাক্‌সন নর্ম্মানদের সংসর্গে পড়িয়া, পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া Castle নির্ম্মাণ অভ্যাস করে এবং Arthur ও Charlemagneএর বীরত্বকাহিনী গাহিতে শিখে। বাহ্য প্রকৃতি যে জাতির প্রকৃতি গঠন ও নিয়মন করে, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না।

(৩) বাহ্য শক্তির পরিবর্ত্তন যেখানে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে ঘটে, সমাজও সেইখানে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতি ও বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। ইউরোপের বাহিরের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইউরোপীয় সমাজও ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি বিকাশ পাইয়াছে, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ এত দৃঢ়মূল, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ Constitutional Governmentএর এত গর্ব্ব করে। ফরাসী সমাজ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সমভাবে বিকাশ পায় নাই, তাই যখন বাহ্য শক্তির প্রচণ্ড বাত্যা ঘোর বেগে বহিয়া উঠিল, সমাজের মূল পর্য্যন্ত থরহরি কাঁপিয়া গেল, নরশোণিতে ফরাসী ভূমি আর্দ্র হইল। আজি পর্য্যন্ত ফরাসী সমাজ টলটলায়মান।

(৪) চতুর্থ নিয়ম। কিন্তু বাহিরের পরিবর্ত্তন যখন আকস্মিক ও অপরিমিত হয়, তখন জীবশরীরই হউক, আর সমাজশরীরই হউক, কাহার সাধ্য নাই যে, বাঁচিয়া উঠে। পরিবর্ত্তন যেখানে অল্প, জাতীয় প্রকৃতিরও সেইখানে বিকাশ; বাহিরের পরিবর্ত্তন যেখানে বেশী, জাতিরও তথায় বিনাশ।

নিকৃষ্ট সমাজই হউক, আর উৎকৃষ্ট সমাজই হউক, বিজাতীয় সমাজ যখন প্রবলবেগে আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত সমাজের সাধ্য নাই যে, সামঞ্জস্য বজায় রাখে। বিনাশ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। হুনদিগের আক্রমণে ইউরোপের প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়া গিয়াছিল। অসভ্য স্পানিয়ার্ডের প্রবল আক্রমণ, সভ্যতর মেক্সিকো ও পেরুর প্রাচীন সমাজ সহিতে পারে নাই। ইস্‌লামের প্রবল ঝটিকায় প্রাচীন পারস্যের জাতীয় জীবন

বিধ্বস্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের প্রচণ্ড বেগে স্পেনের কাথলিক সমাজ জীবন্মৃত হইয়াছে। এই ত গেল অসভ্যতার আক্রমণে সভ্যতার বিনাশ। এইবার সভ্যতার আক্রমণে অসভ্যতার দুর্দ্দশা দেখা যাউক। প্রাচীন রোমের সংসর্গে পড়িয়া অসভ্য বৃটন পশুবৃত্তি পরিহার করিয়া উৎকৃষ্টতর জীবনবৃত্তি অবলম্বন করে। বিজেতার অনুকরণে বিজেতার ভাষা, বিজেতার আচার, বিজেতার পরিচ্ছদ, বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহার নাম উন্নতি সন্দেহ নাই। প্রাচীন বৃটন উন্নতিমার্গে আরোহণ করিল, অসভ্যতা পরিহার করিয়া সভ্য পদবী প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার নাম বিকাশ নহে। বাহ্য শক্তির সহিত প্রাচীন বৃটন জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। রোম যখন আত্মরক্ষার জন্য বৃটনকে পরিত্যাগ করিল, তখন বৃটনের সেই উন্নতি, বৃটনের সেই সভ্যতা কোথায় রহিল, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই সেই দারুণ বার্ত্তা অবগত আছেন।

আর একটি আধুনিক উদাহরণ দিব। অষ্ট্রেলিয়া ও ফিজি দ্বীপের আদিম নিবাসী মনের আনন্দে পশুর সঙ্গে পশুর মত চরিয়া বেড়াইত। তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপ যে পদবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারাও তত্তুল্য অথবা আরও নীচ অবস্থায় ছিল। ভাষাহীন, জ্ঞানহীন, ধর্ম্মহীন ফিজিবাসী পশুর ন্যায় বিচরণ করিত এবং রুধিরপিপাসু দেবতার নিকট বৃদ্ধ পিতাকে বলিদান দিয়া পরম স্নেহে পিতৃদেবের আম মাংস উদরসাৎ করিত। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ও ঘৃণেয় ছিল সন্দেহ নাই—অকস্মাৎ ইউরোপ তাঁহার উৎকৃষ্টতর সভ্যতা ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম লইয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পাপীর পরিত্রাণার্থ খ্রীষ্টান পাদরি ধর্ম্মপুস্তক হস্তে করিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। ফল হইল কি? সকলেই জানেন, অষ্ট্রেলিয়াবাসীর উদ্ধারে আর বিলম্ব রহিল না, সামাজিক ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার অবসর রহিল না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসী ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবার উদ্যোগ দেখিতেছে।

সুতরাং (পঞ্চম নিয়ম) সমাজ মাত্রই অল্পমাত্রায় পরিবর্ত্তন সহিতে পারে এবং ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারে সত্য, কিন্তু (ষষ্ঠ নিয়ম) উন্নতির পক্ষেই হউক, আর অবনতির দিকেই হউক, পরিবর্ত্তন আকস্মিক হইলে বিনাশের সম্ভাবনাই বেশী। সমাজের বিকাশ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিপ্লব ভয়াবহ।

ভারতের সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য জানি না, বৈদেশিক শক্তির তরঙ্গ আসিয়া এই প্রাচীন সমাজের ভিত্তির উপর আঘাত করিতেছে। হইতে পারে ইংরাজি সভ্যতা উৎকৃষ্ট, হইতে পারে ইংরাজি সভ্যতা নিকৃষ্ট, সে বিষয়ে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। উৎকৃষ্টই হউক, আর নিকৃষ্টই হউক, প্রবলপরাক্রমে বাহ্য শক্তি আসিয়া এই সমাজের উপর আপতিত হইয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, এই শক্তি রোধ করে বা প্রতিহত করে। এই প্রাচীন তরুর উপর আরও ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, আরও প্রবল বাত্যা এই তরুর মূলোৎপাটনে সমর্থ হয় নাই। কে বলিবে এই নূতন আক্রমণের ফল কি? এ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে পারিবে, কি না পারিবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের Environment বিদ্যুদ্বেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ধীর গতিতে হইলে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ বিকাশক্ষমতা আজও লোপ পায় নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন যেরূপ আকস্মিক, তাহাতে সমধিক শঙ্কার বিষয়। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিণাম কি, কাহারও সাধ্য নাই যে, গণিতে পারে। পরিবর্ত্তনের উর্ম্মিমালা আঘাত করিতেছে, এই আঘাত নিবারণের উপায় নাই; তবে সেই আঘাতের আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য কি না, ধীর ব্যক্তির আলোচ্য বিষয়।

আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। ইউরোপীয় জীববিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র কয়টি বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, সুবোধ লোকে বিবেচনা করিবেন। সমাজবিজ্ঞান কেবল এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে মাত্র। সমাজবিজ্ঞান আর কিছু দেখাক্ আর না দেখাক্, এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চায় যে, জাগতিক সকল কার্য্যই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, মনুষ্যসমাজ সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নিচয়ে আবদ্ধ। সেই সকল নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে। মানুষ যেমন ইচ্ছা করিলে মাধ্যাকর্ষণের ব্যতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ সমাজশরীরের বিবর্ত্তনের উপরেও হাত দিতে পারে না। সমাজ আপনা হইতে উদ্ভূত হয়, আপনা হইতে বিকাশ পায়, মানুষ তাহার অন্যথা করিতে পারে না। সমাজের গঠন যেরূপ সম্ভবপর নয়, ইচ্ছাকৃত সমাজের উন্নতিও সেরূপ সম্ভবপর নয়। শারীর বিজ্ঞানের

সাহায্য লইয়া চিকিৎসক জীব-শরীরের ব্যাধি আরোগ্য করেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করেন না। জীব-শরীর যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাওয়ার তাঁহার ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করেন। যেখানে চিকিৎসক বিজ্ঞানের সাহায্য পান না, সেইখানেই পীড়া আরোগ্য করিতে গিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবদেহের চিকিৎসাপ্রণালী আজিও বৈজ্ঞানিক মতে পূর্ণতা লাভ করে নাই। জীবের শারীর বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু শরীর-চিকিৎসাপ্রণালী তদনুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। সমাজের বিজ্ঞান সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। সমাজের ব্যাধির বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক দেরি। যে সকল সংস্কারক নিজ অজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমাজের ব্যাধি আরোগ্য করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা হাতুড়ে চিকিৎসক। তাঁহাদের দ্বারা কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই, প্রত্যুত অপকারের সম্ভাবনা।

হইতে পারে আমাদের সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রান্ত সংস্কারক, ইহার ব্যাধি আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিও না। আমাদের বৃদ্ধ সমাজ-তরু অনেক বাত্যা সহ্য করিয়াছে। ইহার মূলোৎপাটন হয় নাই বটে, কিন্তু কে বলিবে ইহা অক্ষত শরীরে রহিয়াছে, কে বলিবে ইহার দুই একটি প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন হয় নাই? কে বলিবে ইহার প্রফুল্লতা, সজীবতা, নবীনতা পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান আছে? পুনরায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বাত্যা বহিতেছে। দুই একটি শাখা প্রশাখা জীর্ণমূল ও ভগ্ন হইয়াছে। উপরের পাতাগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। এই বাত্যা প্রতিরোধের উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজতরুর অঙ্গচ্ছেদ করিও না। আপনা হইতে যাহা ভাঙ্গিতেছে ভাঙ্গুক। ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষত-সংখ্যা বাড়াইও না।

স্বীকার করি, কোন জীবেরই পক্ষে কাঠিন্য শুভকর নহে; সপ্তম নিয়মানুসারে কাঠিন্য ও তারল্যের সমবায়েই জীবশরীর গঠিত হওয়া আবশ্যক; স্বীকার করি, পরিবর্ত্তন আবশ্যক; পরিবর্ত্তনের একান্ত অভাব বিকাশের অন্তরায়; কিন্তু পরিবর্ত্তন যেখানে মৃদুগতিতে আইসে,

সেইখানেই বিবর্ত্তন ও বিকাশ। পরিবর্ত্তনের বেগ যেখানে প্রবল, সেইখানেই ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন মধুর কথা; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন আশাজনক ও সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলাবহ। কিন্তু সম্মিলন সম্ভব কি না, আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অনেক প্রভেদ; প্রত্যেকে আপন আপন Environmentএর উপযোগী। সম্মিলন বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু একের বিনাশ ও অপরের উত্থান প্রার্থনীয় নহে। প্রাচ্যভূমে জাত বৃদ্ধ তরুর শাখা কর্ত্তন করিয়া তদুপরি প্রতীচ্য তরুর কলম বাঁধিলে সুফলের আশা করা যায় কি না, সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য, অজ্ঞ উদ্ধত-প্রকৃতিক সংস্কারকের অধিগম্য নহে।

ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মহামনস্বী হর্বার্ট স্পেনসরের গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"The unfolding of an organism after its special type, has its approximately uniform course taking its tolerably definite time; no treatment that may be devised will fundamentally change or greatly accelerate these. But it is quite easy to adopt a treatment which shall dwarf or deform otherwise injure: the process of growth and development may be hindered or deranged though they cannot be artificially bettered. Similarly with the social organism. Though, by maintaining favorable conditions, there can not be more good done than that of letting social progress go on unhindered, yet an immensity of mischief may by done in the way of disturbing and distorting and repressing by policies carried out in pursuance of erroneous conceptions."

Study of Sociology. P.—401.

পুনশ্চ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলনাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি)

Between organisms widely unlike in kind no progeny can arise; the physiological units contributed by them respectively to form a fertilized germ, cannot work together, so as to produce a new organism.

Evidently as while multiplying, the two classes of units tend to build themselves into two different structures their conflict prevents the formation of any structure. In cases where the conquering and the conquered widely unlike intermarry extensively, a kindred effect is produced. The half caste inheriting from one line of ancestry proclivities adapted to one set of institutions and form the other line of ancestry is not fitted for either. He is a unit whose nature has not been moulded by any social type and therefore can not evolve any social type. Spain with its diverse peoples Basque, Celtic, Gothic, Moorish Jewish, partially localized shew us this result,

Principles of Sociology, Vol. I. p. 592—594.

———

আত্ম-কথা ও পত্রাবলী

আত্মকথা

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুলগোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রামে বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র, জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমো গ্রামে বাস করেন। বলভদ্রের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর পরম ধার্ম্মিক ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও বাঙ্গলায় মাধব-সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণসিন্দূর সিংহ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। গোবিন্দসুন্দর প্রতিভায়, চরিত্রে, তেজস্বিতায় ও দেশানুরাগে স্থানীয় সমাজে শীর্ষস্থ বলিয়া পূজিত ছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দরের কোমল স্নেহসিক্ত চরিত্র সর্ব্বজনের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সেক্সপীয়রের পেরিক্লিস্ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি সংস্কৃত কাব্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ও দুর্গাদাস বর্ত্তমান। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পরিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।

"পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষার প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ

ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।"

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফাষ্ট´ আর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক লাভ করি।

"১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি, এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ ত্যাগ করি। ১৮৮৬ বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।

"পরবৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম, এ, দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটী "ক্লাস এক্সারসাইজ" দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ঐ Out of the way the best"—(কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার)—"Out of the way the best"। তাঁহার ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

"পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮)। পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—"The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps

the best student that has as yet taken up these subjects at this examination." অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এন্ট্রান্সপরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এন্ট্রান্সে অন্যতম হেড এক্‌জামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান বর্ষে কৃষ্ণকমল বাবুর পদত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছি।

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। "সাধনা" পত্রিকা বাহির হইলে মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া "প্রকৃতি" প্রকাশ করিয়াছি।

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া "জিজ্ঞাসা" প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

"১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি উহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছি। ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

অতঃপর রামেন্দ্রবাবু বিনয়-নম্র ভাবে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।" জগদম্বা তাঁহার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

কঠোর বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিষয়সমূহ ইনি অতি সরল ভাষায়,—অতি বিশদ ভাবে বুঝাইতে পারেন। এ শক্তি ইহাঁর অসাধারণ।

[—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১ সাল)]

পত্রাবলী

এক

[নিম্নের পত্রখানি কাহাকে লেখা জানা যায় না। 'সবুজ পত্রে' ইহা প্রকাশ করিয়া সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী পাদটীকায় লেখেন, "...৺ত্রিবেদী মহাশয়ের একখানি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে—যেখানি প্রকাশ করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। কেননা এই চিঠিখানিতে লেখক তাঁর মনের কথা আশ্চর্য্য রকম সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ চিঠি প্রকাশ করবার কোন বাধাও নেই, ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হলেও এ পত্র প্রাইভেট নয়, কেননা যাঁকে এ পত্র লেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ, তিনি একটি ষোলো বৎসরের যুবককে পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু বলে সম্বোধন করেছেন।"—সম্পাদক।]

জেমো, কান্দি। ১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,—আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে, ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে, আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানবজাতির অগ্রণীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন, সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

খুব সম্ভব, আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ-পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন, আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন-সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি, তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয় ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব ?

আমি যত দূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, তত দিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—তত দিন religiousness-ই একমাত্র উপায় ;—এই religiousness-এর মোটামুটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি, তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে ? এইরূপ attitude কোন যুক্তি তর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে, সে-ই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার কি হইবে—হয় ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন, তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে, সে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত—খৃষ্টানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণস্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান্ বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক, তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে, ততক্ষণ সংশয় যাতনা—যাহা মরণ-ভয় হইতে উৎপন্ন, তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ-ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎবিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলাভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কদ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, 'জিজ্ঞাসা'র ও 'কর্ম্ম-কথা'র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কীট কত দূর করিবে।

যাহাই হোক, আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাংলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর *Varieties of Religious Experience* (Cliflord Lectures)-খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন-সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর

ধরিয়া বাহির হইতেছে ['বিচিত্র জগৎ।'—সম্পাদক।], উহার শেষ ভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপান আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার নমস্কার লইবেন। ('সবুজ পত্র,' আষাঢ় ১৩২৬, পৃ. ১৮২-৮৬)

দুই

[নিম্নে মুদ্রিত পত্রখানি বর্দ্ধমান সেহাড়সোল রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামেন্দ্র-সুন্দরের শিষ্যস্থানীয়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৩২৪ সালের ২২ চৈত্র তারিখে লিখিত পত্রের উত্তর।—সম্পাদক।]

এপ্রিল ১৯১৮

পরম কল্যাণবরেষু,—একাদশী-তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মত ইংরাজীনবিশ অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছ, ইহা বিস্ময়ের বিষয়, এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমার ধৃষ্টতা।

একাদশীতে বিধবাগণের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে বাঙ্গালা দেশের কিয়দংশে চলিত আছে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা চলিত নাই। বাঙ্গালার বাহিরেও এই নিরম্বু উপবাস সর্ব্বত্র চলে না, ইহাই আমি জানি।

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুসমাজে ইহা প্রচলিত নাই, তখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও অন্যত্র যখন নিরম্বু উপবাস চলে নাই, তখন শাস্ত্রের বিধি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রঘুনন্দনাদি ব্যবস্থাদাতারা শাস্ত্রকার নহেন, শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদাতা মাত্র, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র।

যে কোন ব্রাহ্মণের স্বাধীনভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে। রঘুনন্দনের সহিত অন্য ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নাই। তবে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা book of reference-রূপে অসামান্য। তদবধি বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরা ঐ গ্রন্থখানি পঠন পাঠন করিয়াই সহজে

ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইতেছেন। মূল ধর্ম্মশাস্ত্র গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতাদি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। কাজেই অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ রঘুনন্দনের শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশে তাঁহারই মত চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে অন্য মত চলিয়াছে। ফলে প্রকৃত তত্ত্বটি এই—

বেদগ্রাহী সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতি অর্থে বেদের ব্রাহ্মণবাক্য। বেদের ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত বিরোধী হইলে কোন স্মৃতিই প্রামাণিক নহে। এমন কি, ঋষিপ্রণীত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থের এবং মন্বাদিপ্রণীত সংহিতা গ্রন্থের উপদেশও অগ্রাহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একাদশী-তত্ত্ববিষয়ে বেদের ব্রাহ্মণবাক্যে কিছুই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। যে সকল বিধিনিষেধ গৃহ্যসূত্রাদি এবং মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, অথচ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই, তাহা লুপ্ত বেদের অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হয়। গৃহস্থের দৈনন্দিন আচার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এই শেষোক্ত গ্রন্থমধ্যেও সমুদায় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য পুরাণাদির আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ গ্রন্থগুলিকেও এই জন্য লুপ্ত বেদানুযায়ী স্মৃতি বলিয়া মান্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ যে সকল বিধিনিষেধের সমর্থন গৃহ্যসূত্রে বা মন্বাদি সংহিতায় পান নাই, তাহার জন্য পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে এই জন্য বহু স্থানে পুরাণের প্রমাণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা লইয়া নানা গণ্ডগোল আছে। শঙ্করাচার্য্যের মত মনীষী মহাভারতের প্রমাণ অসঙ্কোচে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের আশ্রয় লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

প্রচলিত পুরাণ মধ্যে কোন্‌খানা খাঁটি, কোন্‌খানা জাল, কোন্‌খানায় কতটা প্রক্ষিপ্ত আছে, ইহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবপুরাণকে প্রাধান্য দেন, শৈবেরা শৈব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন; কাজেই পুরাণের প্রমাণ আশ্রয়ে যে সকল ব্যবস্থা, তাহাতে দেশভেদে ও কালভেদে নানা মুনির নানা মত দাঁড়াইয়াছে। কাজেই কোন ব্যবস্থাদাতা যদি রঘুনন্দনের দত্ত পৌরাণিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্য প্রমাণ দেখান, তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার হেতু নাই।

ফলে বাঙ্গালা দেশে বিধবার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা ঘটনাচক্রে চলিয়া গিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন ব্যক্তি যদি সরলচিত্তে অন্য দেশাচারচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিবে, তাহা আমি মনে করি না। তবে মোটের উপর সংযমের পক্ষে ব্যবস্থাই সমাজরক্ষার অনুকূল।

রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সংসারে নাই। ব্রাহ্মণের আচার শূদ্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ভালই, না করিলে দোষ দেখি না। (আশুতোষ বাজপেয়ী : 'রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ৩০০-০৩)

তিন

[আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের নিকট লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকখানি পত্র [১ হইতে ৯২ পৃষ্ঠাঙ্কিত] যোগেশচন্দ্র পরিষৎ-যাদুঘরে রক্ষার্থ দিয়াছিলেন। এই পত্রগুলি প্রধানতঃ পরিষৎ-কার্য্যালয়, গ্রন্থমুদ্রণ ও পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধ সংক্রান্ত। কৌতূহলী পাঠক এইগুলি পরিষৎ-যাদুঘরে গিয়া দেখিতে পারেন। আমরা নমুনা-স্বরূপ একটি পত্র মাত্র এখানে মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক।]

৮ মধুসূদন গুপ্তের লেন
২৭ মাঘ ১৩১৫

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার কয়েকখানি পত্রের উত্তর এ পর্য্যন্ত দিতে না পারিয়া অপরাধী আছি—আমার অবস্থা বা দুরবস্থা জানাইবার উপায় নাই—জানাইতে পারিলে আপনি স্বতই দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র পাইবার আগেই পরিষৎ-পত্রিকার ১ সংখ্যা কতক বিলি হইয়া গিয়াছিল; এ জন্য তখন উহার প্রকাশ সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকার ২ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে; ঐ সংখ্যার সহিত শুদ্ধিপত্রখানিও ছাপাইয়া বিলি করা যাইবে।

ইহার মধ্যে আপনার শঙ্কুযন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তিকাখানি পাইয়াছি। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। আপনার লেখার প্রতি আমি চিরকাল অনুরক্ত; এই বহিখানিতে সেই অনুরাগের মাত্রা বাড়িয়াছে মাত্র—অন্য সমালোচনা বাহুল্য মাত্র। আপনার অবিশ্রান্ত লেখনী মাতৃভাষার এইরূপে পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত থাক ইহাই প্রার্থনা করি।

রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলনে প্রায় ১৯।২০টি প্রবন্ধ জুটিয়াছিল। সময়াভাবহেতু অন্যান্য অনুপস্থিত লেখকগণের প্রবন্ধের সহিত আপনার প্রবন্ধটিও “পঠিত বলিয়া গৃহীত” হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ পি সি রায় হঠাৎ আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়িতে দেওয়ায় আপনার প্রবন্ধটি ঐ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অন্যের নিকট যাহাই হউক, প্রবন্ধের মধ্যে আমার শিক্ষার বিষয় অনেকগুলি ছিল। আমাদের প্রাচীন আচার্য্যেরা যে perpetual motion ঘটাইবার এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার আমি বিন্দুবিসর্গ জানিতাম না। আমি প্রবন্ধ পাঠমাত্র আনন্দের সহিত প্রবন্ধটি সভায় পড়িয়া শুনাইবার ভার গ্রহণ করি; এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুগ্রহে মূল প্রবন্ধের টীকা টিপ্পনী ও ভাষ্য করিবার অধিকারও পাইয়াছিলাম। Black board, chalk ইত্যাদি সরঞ্জাম পাওয়ায় কিছুক্ষণ মাষ্টারি করিবার অবকাশও পাইয়াছিলাম। আপনার প্রবন্ধ সভাস্থ সকলেরই, এমন কি, রাজসাহী কালেজের অধ্যাপক বক্তারও, প্রশংসালাভ করিয়াছিল, শুনিলে আপনি প্রীত হইবেন।

“স্বয়ংবহ” শব্দটি আপনার? না সিদ্ধান্তকারগণের?

“দণ্ড” শব্দ ও “ঘটিকা” শব্দের অর্থ লইয়া আপনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আমার অত্যন্ত মনে লাগিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় আপনার প্রবন্ধ সভাস্থলে উপস্থিত করিবার সময় আপনাকে “সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ” উপাধিযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতই আপনার বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন বিস্মিত হইতেছি।

স্বয়ংবহ যন্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া টীকা সমন্বিত একটি বৃহত্তর প্রবন্ধ লেখা চলে না কি? চলিলে তাহা diagram সহ পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিতে পারি। পরিষৎ-পত্রিকা এতকাল প্রাচীন সাহিত্য লইয়া মগ্ন আছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আলোচনা থাকে না বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিতেছেন।

আপনার ‘শব্দকোষ’ কতদূর? কবে তাহার কাপি পাইব?

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী